কর্নেল সমগ্র

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

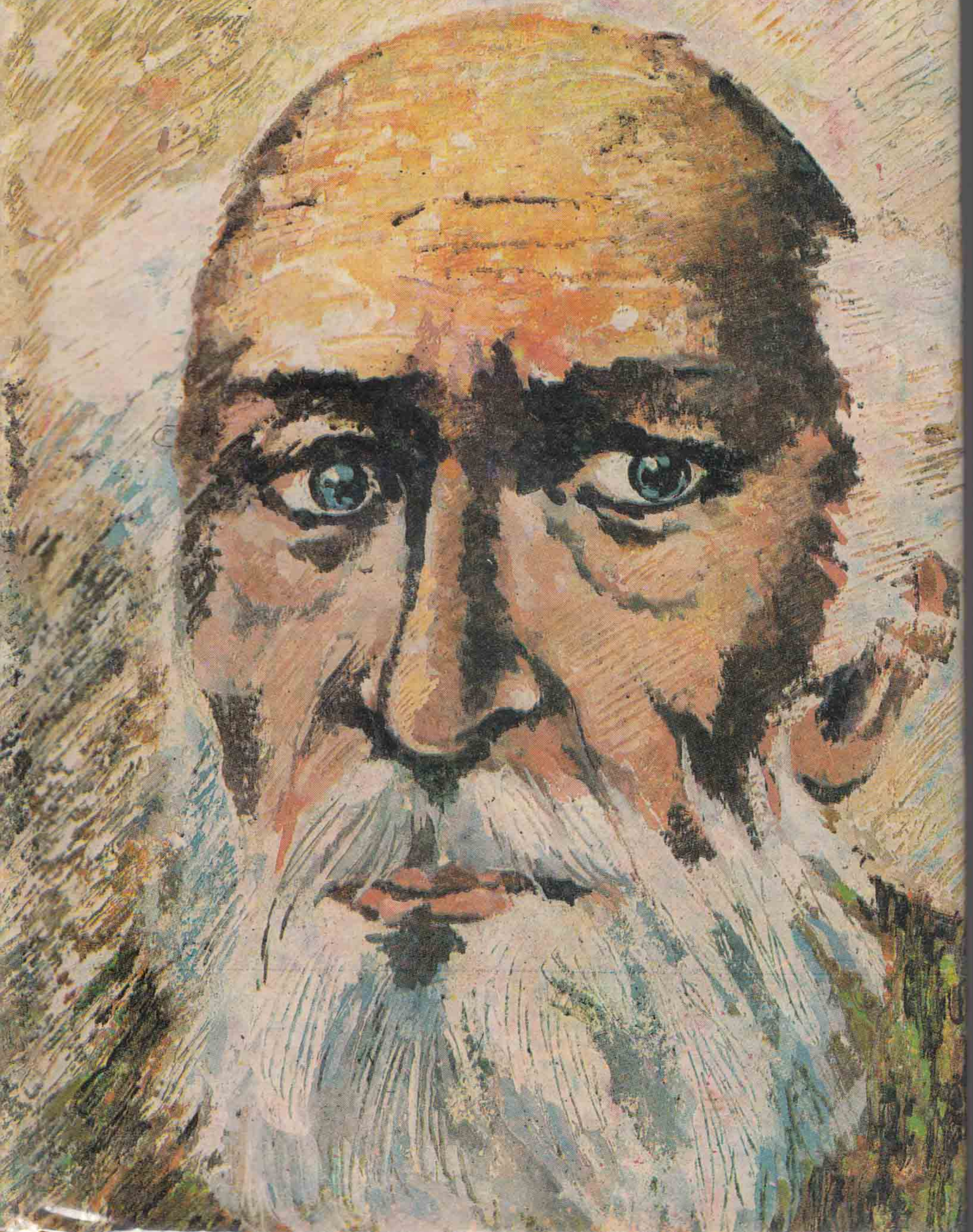

কর্নেল সমগ্র

৮

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

pathagar.net

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলকাতা ৭০০ ০৭৩

অপারেশান রেড হেরিং

বৈশম্পায়ন রায়

এক সন্ধ্যায় অনেকদিন পরে মুনলাইট বারে ঢুকেছিলাম। আজকাল আর আগের মতো নিয়মিত মদ্যপান করি না। কোনও কোনও দিন মন খারাপ থাকলে বড় জোর তিন পেগ টানি। বিকেলে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। জানি না, বৃষ্টি আমার মন খারাপের কারণ কি-না।

চৌরঙ্গিপাড়ার এই বারটা ছোট হলেও ছিমছাম, ভদ্র, শান্ত। দরদাম অন্যান্য বারের তুলনায় অনেক বেশি। আসলে যাঁরা নিরিবিলি নিঝুম পরিবেশে এবং শালীনতার মধ্যে থেকে মদ্যপানের অনাবিল আনন্দ পেতে চান, তাঁদের জন্য মুনলাইট চমৎকার।

দৈত্যের মতো প্রকাণ্ড একজন লোক কাউন্টারের কাছে দাঁড়িয়ে নজর রাখে। মাতলামির সূচনা দেখলেই সে সামনে এসে দাঁড়ায়। নিচু গলায় চলে যেতে বলে। না গেলে সে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে গিয়ে রাস্তায় ফেলে দেয়। অ্যাংলোইন্ডিয়ান এই লোকটির নাম চাংকো।

কয়েক চুমুকের পর সিগারেট ধরিয়েছি, কেউ আমার টেবিলের সামনে এসে বসল। আস্তে বলল, "এক্সকিউজ মি! যদি আমি ভুল না করে থাকি, তুমি বাসু না?"

ওকে দেখামাত্র চিনতে পারলাম। সমীর রুদ্র। পঁচিশটা বছর সামান্য সময় নয়। পঁচিশ বছরে পৃথিবীতে অনেকরকম ঘটনা ঘটে গেছে। অনেক কিছু ওলটপালট হয়েছে। সমীরকে শেষবার দেখেছি কবে? ভাবতে গিয়ে মাথার ভেতর ঠাণ্ডাহিম ঢিল গড়িয়ে গেল। মুখ নামিয়ে গেলাসে চুমুক দিয়ে বললাম, "সরি! আপনি ভুল করেছেন!"

সমীর আমার মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টে তাকানোর চেষ্টা করল। কিন্তু ওর দু'চোখে নেশার ঘোলাটে ছাপ দেখতে পেলাম। সে হঠাৎ হাসল। "নাহ্! আমি ভুল করিনি। তুমি বাসু। আরে বাবা! এই তো সেদিনকার কথা। তুমি দাড়ি-ফাড়ি রেখে মোটকু হয়েছ। চোখে চশমা-টশমা এঁটেছ! তাই বলে কি আমি চিনতে পারব না? হুঁ, ফরেনের সায়েবি খাদ্য খেয়ে হেল্‌থ্ ফিরিয়েছ। ক'বছর ছিলে যেন? সেভেন অর এইট ইয়ার্স?"

তার কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল। এই বারে ঢোকার সময় ওকে লক্ষ্য করিনি কেন? এখন আর কিছু করার নেই। এই সন্ধ্যায় নিয়তি আমাকে মুনলাইটে টেনে এনেছে।

"বাসু! পাস্ট ইজ পাস্ট। ডেড ইজ ডেড"। সমীর আরও হাসল। "আজকাল অবশ্য শেক্সপিয়ারের ভাষায় 'ফেয়ার ইজ ফাউল অ্যান্ড ফাউল ইজ ফেয়ার।' যাই হোক, কাম টু দা পয়েন্ট! অনি! অনিকে নিয়েই তো ব্যাপার। সো হোয়াট? আরে বাবা, আমি কি তোমাকে—"

হেঁচকি তার কথা বন্ধ করল। বেশ কয়েক পেগ হয়ে গেছে। এ অবস্থায় দুটো কাজ আমি করতে পারি। তাকে অনর্গল কথা বলতে দিতে পারি। তা হলে চাংকো ওকে বাইরে নিয়ে যাবে। কিংবা আমি উঠে যেতে পারি।

কিন্তু গেলাস শেষ না করে উঠে গেলে কে কী ভাববে! বললাম, "প্লিজ ডোন্ট ডিসটার্ব মিস্টার!"

সমীর বলল, "তুমি সুখে আছ। আমিও মন্দ নেই। আমার বউ পালিয়ে গেছে। তোমার হয়তো যায়নি! এই তো ডিফারেন্স। ফ্রেইলটি! দাই নেম ইজ উওম্যান। মেয়ে নিয়েই রামায়ণ-মহাভারত-ট্রয়ের যুদ্ধ। ওক্কে বাসু! অনির সঙ্গে আমার বিয়ের পিঁড়িতে বসার কথা ছিল। ফস্কে গেল। যাক্। তার জন্য দুঃখ করিনি। তো তুমি মাইরি—"

গেলাস শেষ করে উঠে দাঁড়ালাম। আমার শরীরের ওজন বেড়ে গিয়েছিল। বললাম, "এগেন সরি মিস্টার! য়ু আর টকিং টু আ রং পার্সন।"

"যা বাবা!" সমীরও উঠে দাঁড়াল। "রং পার্সন? মে বি। অনি আমাকে বলত, তুমি রং পার্সন! তা হলে রাইট পার্সন কে? প্রশান্ত? হ্যাঁ। কিন্তু শেষে প্রশান্তও রাইট পার্সন হতে পারল না। বাসু, উই দা থ্রি মাস্কেটিয়ার্স আর অল রং পার্সন।"

চাংকো এগিয়ে এল। তাকে বললাম, "ইট ইজ অল রাইট চাংকো!" তারপর কাউন্টারে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট রেখে দ্রুত বেরিয়ে গেলাম।

কালো অ্যাম্বাসাডার আস্তে ড্রাইভ করছিলাম। মনে হচ্ছিল একটা অচেনা শহরের রাস্তায় হারিয়ে যাচ্ছি।

একটু পরে দেখি, মৌলালি পেরিয়ে, সি আই টি রোড ধরে চলেছি। নিজের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেললাম। কোথায় যাচ্ছি আমি? নিয়তি আমাকে তুলে নিয়েছে।

পঁচিশ বছর আগে আমার বয়স ছিল পঁচিশ। অনির বয়স বড়জোর উনিশ বা কুড়ি। অনি আমাকে বলেছিল, "কলেজ থেকে বেরিয়েই বিয়ের মুখে পড়ার মানে হয় না। আমার মা তত সেকেলে মানুষ নন; কিন্তু আমার মামাটি একেবারে শকুনিমামা।"

অনি আমার কাছে কি পরামর্শ চেয়েছিল? জানি না। তখন আমি পরামর্শ বিশেষজ্ঞও ছিলাম না এখনকার মতো। এখন আমি ফরেন ট্রেডিং কনসালট্যান্সি খুলেছি। সারা পৃথিবী চক্কর খেয়ে কলকাতায় ফিরেছি গত জানুয়ারিতে। এখন অনেক লোককে পরামর্শ দিতে পারি। তখন আমি প্রায় নিঃসম্বল এক আনাড়ি যুবক।

আসলে হয়তো অনিকে আমি এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলাম। তার ওপর একটা চাপা ক্ষোভই এর কারণ।

তার আগের বছর দীঘা বেড়াতে গিয়ে সে এক কেলেঙ্কারি।

দীঘার হোটেল দা শার্কের ১৭ নম্বর ঘরের এপিসোডটি আমার খুব ভেতরকার একটি যন্ত্রণাদায়ক ক্ষত। কতকাল তার যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে। ব্যর্থতার যন্ত্রণা যে কত ভয়ঙ্কর হতে পারে, আমি জানি।

অনির প্রেমে তখন আমি এত অস্থির যে কোনও হঠকারিতায় পিছ-পা ছিলাম না। সব রকমের ঝুঁকি নিয়ে মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম।

দীঘা যাওয়ার প্রস্তাবটা যখন অনিকে দিই, ধরেই নিয়েছিলাম অনি সরাসরি না করে দেবে।

কিন্তু আমার বুক কাঁপিয়ে সে এক কথায় রাজি হয়ে গেল। কথাটা সে ঠিক বুঝেছে কি-না যাচাই করার জন্য বললাম, "তুমি আর আমি একা যাচ্ছি কিন্তু।"

অনি আমাকে আরও অস্থির করে বলল, "হ্যাঁ, একাই তো ভাল। দল থাকলে বড্ড বেশি হইচই হয়। তুমি তো জানো বাসুদা, আমি ওসব একেবারে পছন্দ করি না!"

"কিন্তু মাসিমা তোমাকে একা যেতে দেবেন তো?"

"কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে এক্সকারসনে যাচ্ছি বলব।"

হোটেল দা শার্কের সতের নম্বর ঘরের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যার সমুদ্র দেখছিল অনি। ব্যালকনির আলোটা নিভিয়ে দিয়ে ওকে আদর করতে গেলাম। অনি চমকে উঠে সরে গেল। "এ কী করছ বাসুদা! তুমি এত অসভ্য তা তো জানতাম না?"

"অনি, আমি তোমাকে ভালবাসি।"

"আশ্চর্য! ভালবাসলে অসভ্যতা করতে হয় বুঝি?"

"তুমি একে অসভ্যতা ভাবছ কেন? এটাই তো ভালবাসার ভাষা, অনি!"

"আমি ওসব ভাষাটাষা বুঝি না। তুমি আমাকে ওভাবে ছোঁবে না।"

রাগ হল। বললাম, "তুমি-আমি এই হোটেলে স্বামী-স্ত্রী বলে নাম লিখিয়েছি। তোমার সিঁথিতে সিঁদুর।"

অনি ফুঁসে উঠল। "তুমি বললে এটা ট্রিকস। স্বামী-স্ত্রী না হলে রুম পাওয়া যাবে না।"

আমার মেজাজ চড়ে গেল। "তুমি নেকি! তুমি আমার সঙ্গে একা চলে এলে। তুমি জানো না—জানিতে না এভাবে আসার কী মানে?"

অনি হঠাৎ কেঁদে ফেলল। "কিন্তু আমি তো সমুদ্র দেখতে এসেছিলাম। আমি কখনও সমুদ্র দেখিনি। সমুদ্র দেখার জন্য তুমি আমার কাছে দাম চাইছ বাসুদা? আমি তোমাকে এমন খারাপ তো ভাবিনি!"

সে একটা অসহ্য রাত। অনি কিছু খেল না। সারা রাত ব্যালকনিতে বসে কাটিয়ে দিল।

পরে এই এপিসোডটা খুঁটিয়ে স্মরণ করতাম আর বুঝতে চাইতাম, অনি কি সত্যি নিছক সমুদ্র দেখার জন্য এই ঝুঁকি নিয়েছিল, নাকি হঠকারিতার পর নিজেকে সামলে নিয়েছিল ওভাবে? অনির মধ্যে একটা রহস্য ছিল। অথবা অনি সেই দলের মেয়ে, যারা জানে না কী করতে কী করে বসছে?

শিজোফ্রেনিয়ার রোগীদের কাছে বাস্তব-অবাস্তবের সীমানা মুছে যায়। অনি হয়তো জন্ম-শিজোফ্রেনিক ছিল। সে জানত না, সে কী করছে।

অনির মায়ের ইচ্ছা ছিল আমিই অনিকে বিয়ে করি। কথাটা আমার কানে এলে সঙ্গে সঙ্গে না করে দিয়েছিলাম। তাই সমীর রুদ্র অনির কাছাকাছি এসে পড়ে। সমীরকে সামনাসামনি খুব পাত্তা দিত অনি; কিন্তু পেছনে আমার কাছে ওর বদনাম গাইত। কারণ সমীর ছিল দুর্ধর্ষ প্রকৃতির মস্তানটাইপ ছেলে। ওকে সে ভীষণ ভয় পেত। দীঘার এপিসোড সম্পর্কে অনি নিজেই একদিন আমাকে বলেছিল, "ভাগ্যিস তুমি! অন্য কেউ হলে আমার সাংঘাতিক সর্বনাশ হয়ে যেত। তোমার বিবেক আছে, বাসুদা!"

অনি আমার বিবেক থাকার কথা বলেছিল। আমি জানতাম না, আমার মধ্যে বিবেক আছে। তারপর থেকে সেই বিবেক আমাকে যখন-তখন চিমটি কাটে।

ডানদিকে গলির মুখে গাড়ি দাঁড় করিয়ে নেমে গেলাম। এই তো সেই গোড়াবাঁধানো বটগাছটা; তার পাশে একতলা বাড়ি ছিল। সেখানে পাঁচতলা বিশাল একটি বাড়ি। গেট বন্ধ। বটতলার কাছে একটা টালির ঘরে জামা-কাপড় ইস্ত্রি করছিল একটা লোক। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "ইয়ে মকান কিসকা হ্যায়?"

"কৈ আগরওয়ালসাবকা।"

"হেঁয়া এক ছোটা মকান থি। এক মা আউর এক লড়কি থি। খেয়াল হ্যায়?"

"জি। উও মাইজি তো বহত সাল আগে মর গেয়ি।"

"লড়কিকি খবর?"

"মুঝে নেহি মালুম, সাব! আউর কিসিকো পুছিয়ে!"

বাড়ি ফেরার পথে নিজেকে চড় মেরে সায়েস্তা করতে ইচ্ছা হচ্ছিল। এটাই তো নিয়ম। সবকিছু বদলে ওলট-পালট হয়ে গেছে। আবার কেন পিছু ফিরে খোঁজা?

অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে কতক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম। সারারাত ঘুমোতে পারলাম না। পরদিন সব বড় ইংরেজি-বাংলা দৈনিক পত্রিকার অফিসে গিয়ে বিজ্ঞাপন দিয়ে এলাম। অতিরিক্ত চার্জ দিয়ে জরুরি বিজ্ঞাপন। দুদিন পরে বিজ্ঞাপনটা বেরুল।

'অনামিকা সেন,
তুমি যেখানেই থাকো সাড়া দাও।
—বাসুদা।
বক্স নং....'

প্রায় এক সপ্তাহ পরে কাগজগুলো থেকে কয়েকটা চিঠি দিয়ে গেল। প্রত্যেকটি কাগজ থেকে একটি করে খাম। খামের ভেতর একটি করে চিঠি। প্রত্যেকটি চিঠিতে লালকালিতে লেখা আছে

'বৈশম্পায়ন রায় ওরফে বাসুকে সাবধান করা যাইতেছে, সে যেন অনামিকা সেন সম্পর্কে এতটুকু কৌতূহল প্রকাশ না করে। করিলে তাহার সাংঘাতিক বিপদ হইবে।'

ছ'খানা খামের ভেতর একই কাগজে একই কালিতে লেখা একই চিঠি।

কিছুক্ষণ আচ্ছন্ন অবস্থায় বসে রইলাম। সমীর রুদ্রের সঙ্গে দৈবাৎ যোগাযোগ হয়ে গিয়েছিল। তাকে পাত্তা না দিয়ে ভুল করেছি। তাকেই এখন সবচেয়ে বেশি দরকার। মুনলাইটে গিয়ে চাংকোর কাছে শুনলাম, সে তাকে সেদিন সন্ধ্যায় বের করে দিয়েছিল। কাজেই এ বারে তার আসার চান্স নেই।

এলাকার প্রায় প্রত্যেকটা বারে অনেকগুলো সন্ধ্যা কাটিয়েও সমীরকে আর খুঁজে বের করতে পারলাম না। প্রতি সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরে অনির কথা ভাবি আর মাথার ভেতর আগুন ধরে যায়। জীবনে অনেক চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করেছি। এই চ্যালেঞ্জটার সামনে দাঁড়াতে পারব না?

গতরাতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল, আমার এক পুরনো বন্ধু অরিজিৎ লাহিড়ির কথা। সে পুলিশ অফিসার! সম্ভবত আই পি এস। এখন কোথায় আছে সে? টেলিফোন ডাইরেক্টরি খুলে বসলাম।

লাহিড়ি এ। ডি সি ডি ডি।

কিন্তু একই নম্বরে অনেকগুলো নাম। আগে রিং করে জেনে নেওয়া যাক পুরো নামটা অরিজিৎ লাহিড়ি কিনা।

অনেকক্ষণ রিং হল। কেউ সাড়া দিল না। তখন ১০০ নম্বরে লালবাজারে ডায়াল করলাম। সাড়া এল। হ্যাঁ, এ লাহিড়ি অরিজিৎ লাহিড়ি। তবে এখন তাঁকে পাওয়া যাবে না।....

জয়ন্ত চৌধুরী

প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে কে হালদার খবরের কাগজ পড়ছিলেন। হঠাৎ খি খি করে হেসে উঠলেন।

জিজ্ঞেস করলাম, "কী হল হালদার মশাই? হাসছেন কেন?"

"হাসব না?" হালদারমশাই কাগজের পাতায় লম্বা তর্জনী রেখে বললেন, "লিখছে, মশার কয়টি দাঁত আছে? ৪৭টি। হঃ! গুনল কেডা? মশয়! আইজকাইল এই কুইজ-কুইজ ধান্দা পোলাপানগো সর্বনাশ কইরা ছাড়ব। আবার লিখছে, মাকড়সার জাল লম্বা করলে কত মাইল হয়? ৫০০ মাইল। কেডা লম্বা করল? খালি ধান্দাবাজি।"

হালদারমশাই কাগজ ভাঁজ করে সোফার কোণের দিকে ছুড়ে দিলেন। তারপর একটিপ নস্যি নিলেন। মনে হল, হাঁচবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু হাঁচি এল না। রুমাল বের করে নাক মুছে আপনমনে বললেন, "চাইরদিকে খালি ধান্দাবাজি।"

কর্নেল নীলাদ্রি সরকার একটা ঘাসফড়িংয়ের রঙিন ছবির ওপর আতস কাচ রেখে কী সব দেখছিলেন। বললেন, "হালদারমশাই ঠিকই বলেছেন। তবে—"

ওঁর কথার ওপর বললাম, "তবে ধান্দাবাজির অনেক ডাইমেনশন আছে। যেমন, প্রায় আধঘণ্টা ধরে একটা গ্রাসহপারের চিত্রদর্শন!"

"ডার্লিং! এটা সিস্টেসার্কা গ্রেগারিয়া প্রজাতির ফড়িং। এদেরই পঙ্গপাল বলা হয়। এরা মূর্তিমান সর্বনাশ।" কর্নেল ছবিটা টেবিলে রেখে আতসকাচ চাপা দিলেন। "যাই হোক, হালদারমশাই আজকের কাগজের একটা সেরা ধান্দাবাজি মিস করেছেন।"

কথাটা শুনেই গোয়েন্দা ভদ্রলোক সিধে হয়ে বসলেন, উত্তেজিতভাবে বললেন,, "মিস করছি?"

"হ্যাঃ।" কর্নেল সাদা দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন। "এডিটোরিয়াল পেজের চিঠিপত্রের কলামে একটা চিঠি আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে।"

হালদারমশাই বাঘের থাবায় কাগজটা তুলে নিলেন। একটু পরে দেখলাম, ওঁর চোখদুটো গোল হয়ে গেছে। গোঁফের ডগা তিরতির করে কাঁপছে। বিড়বিড় করে বললেন, "মড়া সিগারেট টানবে? মানে, ডেডবডি! কয় কী!"

কর্নেল নিভে যাওয়া চুরুট ধরিয়ে ওঁকে তাতিয়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, "চ্যালেঞ্জ হালদারমশাই, পান্টা চ্যালেঞ্জ করেছে।"

হালদারমশাই নিজের বুকে আঙুল রেখে বললেন, "আমারে?"

কর্নেল হাসলেন। "না, না! আপনাকে চ্যালেঞ্জ করবে কেন? আমার মনে হচ্ছে, আপনি খুঁটিয়ে চিঠিটা পড়েননি।"

হালদারমশাই ফের কাগজে চোখ রাখলেন। প্রায় বানান করার মতো বিড়বিড় করে পড়ে মুখ তুললেন। বাঁকা হেসে বললেন, "ম্যাজিক! ম্যাজিক!"

"কিন্তু অবধূতমশাই পাল্টা চ্যালেঞ্জ করেছেন। বিজ্ঞান প্রচার সমিতির প্রদীপ মিত্রকে যেন ডুয়েল লড়তে ডেকেছেন। ওঁর তন্ত্রশক্তি বুজরুকি প্রমাণ করতে পারলে আশ্রম ভেঙে দিয়ে সেখানে মুলোর চাষ করবেন।" কর্নেল গম্ভীর মুখে মাথার টাকে হাত রাখলেন। "শুধু তাই নয়, উনি সন্ন্যাসধর্ম ছেড়ে দিয়ে বাকি জীবন প্রদীপ মিত্রের চাকর হয়ে থাকবেন। বুঝুন তা হলে?"

"হঃ! বুঝছি।" হালদারমশাই আরেকটিপ নস্যি নিলেন।

জিজ্ঞেস করলাম, "কী বুঝলেন, বলুন শুনি?"

"কর্নেলস্যার তো অলরেডি কইয়া দিলেন। ধান্দাবাজি।"

কর্নেল ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজে বললেন, "হ্যাঁ, ধান্দাবাজি। কারণ অবধূতমশাইয়ের দ্বিতীয় শর্ত হল, প্রদীপ মিত্র হেরে গেলে নিজের চ্যালেঞ্জ অনুসারে তাঁকে একলক্ষ টাকা দিতে হবে।"

গোয়েন্দা কে কে হালদার নড়ে বসলেন। "প্রদীপ মিত্র কইছিল লক্ষ টাকা দেবে ওনারে?"

"চিঠিতে তো তা-ই দেখছি। তার মানে, প্রদীপ মিত্রের চিঠিটা আমি মিস করেছি।" কর্নেল চোখ বুজে চুরুট টানতে টানতে বললেন। "মিস করার একটাই কারণ। আমি গত সেপ্টেম্বরে প্রায় পুরো মাসটাই নাইজেরিয়ায় ছিলাম। তবে জয়ন্তের চোখে পড়া উচিত ছিল। চিঠিটা ওদের দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকায় বেরিয়েছে।"

বললাম, "নিজের লেখা রিপোর্ট বাদে সত্যসেবকের আমি কিছুই পড়ি না।"

হালদারমশাই ভুরু কুঁচকে বললেন, "ক্যান?"

"হিন্দিতে একটা প্রবাদ আছে, ঘরকি রোটি তিতা/পরকে রোটি মিঠা। আমি অন্য কাগজ পড়ি।"

গোয়েন্দা ভদ্রলোক খি-খি করে খুব হাসলেন। তারপর গম্ভীর হয়ে বললেন, "এই যে কাঁটালিয়াঘাট লিখছে, হোয়্যার ইজ দ্যাট প্লেস কর্নেল স্যার?"

কর্নেল বললেন, "কেন? আপনি কি প্রদীপ মিত্রের হয়ে চ্যালেঞ্জটা নিতেন ভাবছেন?"

"নাহ্। এমনি জিগাই।"

"হাওড়া-আজিমগঞ্জ লুপলাইনে গঙ্গার ধারে কাঁটালিয়াঘাট রোড স্টেশন। কাটোয়ার কাছে উদ্ধারণপুর মহাশ্মশানের পর অমন শ্মশান আর গঙ্গার ধারে নেই—অন্তত পশ্চিমবঙ্গে।" কর্নেল এতক্ষণে চোখ খুলে সোজা হলেন। "ও তল্লাটে 'কাঁটালঘাটের মড়া' বলে একটা কথা চালু আছে। কোনও-কোনও

মড়া নাকি চিতা থেকে উঠে পালিয়ে যায়। কাজেই বলা যায় না, অবধূতমশাইয়ের যে-মড়াটা সিগারেট টানবে, সেটা তেমন কোনও চিতা-পালানো মড়া কি না।"

কর্নেলের কথার ভঙ্গিতে হেসে ফেললাম। হালদারমশাই কিন্তু হাসলেন না। হাই তুলে ঘড়ি দেখে উঠে দাঁড়ালেন। আপনমনে বললেন, "যাই গিয়া।" তারপর পর্দা তুলে জোরে বেরিয়ে গেলেন। এই ড্রয়িং রুম থেকে বেরিয়ে একটা ছোট্ট ওয়েটিং রুম। তারপর বাইরে বেরুনোর দরজা। দরজায় ইন্টারলকিং সিস্টেম আছে। ভেতর থেকে খোলা যায়। কিন্তু বাইরে থেকে খোলা যায় না। সেই দরজায় বেশ জোরালো শব্দ হল।

বললাম, "হালদারমশাইকে খুব উত্তেজিত মনে হচ্ছে। সোজা হাওড়া স্টেশনে ট্রেন ধরতে গেলেন না তো?"

কর্নেল বললেন, "গেলে একটা এক্সপিরিয়েন্স হতেও পারে। পুলিশের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের রিটায়ার্ড ইন্সপেক্টর আমি অনেক দেখেছি, জয়ন্ত! কিন্তু আমাদের এই হালদারমশাইয়ের মতো কাউকে দেখিনি ; সবসময় রহস্যের গন্ধ শুঁকে বেড়ানো ওঁর বাতিক হতে পারে। তবে এটা খারাপ বাতিক নয়। এতে সৎ মানুষদের উপকার করা হয়। ওঁর প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি খোলার পেছনে—"

বাধা দিয়ে বললাম, "বাতিক আপনারও কিছু কম নয়। তবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটা পাখি বা প্রজাপতির পেছনে ছুটোছুটি করে বেড়ানোতে যদি কারও কোনও উপকার হয় না।"

"হয় জয়ন্ত, নিশ্চয় হয়। এই যে দেখছ, এই পঙ্গপালটা! নাইজেরিয়ায় এটার পেছনে অনেক ছুটোছুটি করে ছবি তুলে এনেছি। তুমি জানো না, এরা সারা আফ্রিকার কী সাংঘাতিক শত্রু। লক্ষ লক্ষ টন ফসল মাঠ থেকেই এদের পেটে চলে যায়। গাছপালা পর্যন্ত মুড়িয়ে খেয়ে ফেলে। মরুভূমি ডেকে আনে এরা। সাহারা মরুভূমির অন্যতম স্রষ্টা এরাও, জয়ন্ত। এই সিস্টেসার্কা গ্রেগরিয়া প্রজাতির ফড়িংকে তুমি নিরীহ জীব ভেবো না।"

আমার প্রকৃতিবিদ্ বন্ধুর ভাবাবেগ লক্ষ করে অবাক হয়েছিলাম। ওঁর আবেগপূর্ণ বক্তৃতা আরও কিছুক্ষণ চলত। থামিয়ে দিল ডোরবেলের টুংটাং বাজনা। বললাম, "হালদারমশাই কিছু ফেলে গেছেন হয়তো।"

কর্নেল বললেন, "যদি কিছু না মনে করো, ভদ্রলোককে নিয়ে এসো ডার্লিং!"

"কোন ভদ্রলোককে?"

"যিনি এসেছেন। দেখবে, মুখে সুন্দর দাড়ি আছে। আমার মতো লম্বাচওড়া।"

অবাক হয়ে বললাম, "আপনার কি দেয়াল ফুঁড়ে দৃষ্টি যায়?"

কর্নেল হাসলেন। "জয়ন্ত! ডোরবেলের শব্দ আমাকে বলে দিয়েছে কে এসেছেন। তা ছাড়া ঠিক সাড়ে দশটায় ওঁর পৌঁছুনোর কথা।"

pathagar.net

বেরিয়ে গিয়ে দরজার আইহোলে চোখ রাখলাম। কাঁচাপাকা ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। মুখে পোড়খাওয়া ভাব। চোখে সরু সোনালি ফ্রেমের চশমা। লম্বায় প্রায় কর্নেলের মতোই। দরজা খুলে একটু সমীহ করে বললাম, "আসুন!"

ভদ্রলোক বললেন, "আপনি কি কর্নেল সায়েবের অ্যাসিস্ট্যান্ট?"

"নাহ্। আমি জয়ন্ত চৌধুরি। নিছক একজন সাংবাদিক।"

"আমার নাম ভি রায়। ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিং কনসালট্যান্ট।"

"ভেতরে আসুন। কর্নেল আপনার অপেক্ষা করছেন।"

ভি রায় ড্রয়িং রুমে ঢুকে কর্নেলকে দেখে যেন একটু নিরাশ হলেন। নমস্কার করে বললেন, "আপনি কর্নেল সরকার?"

"আপনি বসুন মিঃ রায়! সকালে আমাকে অরিজিৎ ফোনে আপনার কথা বলেছে।"

রায়সায়েব সোফায় বসলেন। ব্রিফকেসটা পাশে রেখে বললেন, "অরিজিৎ প্রেসিডেন্সিতে আমার বন্ধু ছিল। আমি অবশ্যি ওর সিনিয়র ছিলাম। এনিওয়ে, ও আপনাকে কী বলেছে জানি না।"

কর্নেল হাঁকলেন, "ষষ্ঠী! কফি।" তারপর বললেন, "অরিজিৎ বলেছে, আমার পক্ষে সম্ভব হলে যেন আপনাকে সাহায্য করি। কী একটা মিসটিরিয়াস ঘটনার মধ্যে নাকি আপনি জড়িয়ে গেছেন। তো আমি ওকে বললাম, বরং প্রাইভেট ডিটেকটিভ মিঃ কে কে হালদারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলো। অরিজিৎ আসলে হালদার মশাইকে পছন্দ করে না। আপনি আসার জাস্ট্ দু-তিন মিনিট আগে ডিটেকটিভ ভদ্রলোক বেরিয়ে গেলেন। সম্ভবত নীচে আপনি ওঁকে দেখে থাকবেন।"

"আপনি প্রাইভেট ডিটেকটিভ নন?"

কর্নেল গম্ভীরমুখে কথা পাড়লেন। "সরি মিঃ রায়! আমি ডিটেকটিভ নই। অরিজিৎ কি আপনাকে বলেছে আমি—"

রায়সায়েব তাঁর কথার ওপর বললেন, "না। অরিজিৎ বলল, আপনি ছাড়া এই মিস্ট্রি কেউ সল্ভ্ করতে পারবে না।"

"মিস্ট্রি কী, সংক্ষেপে বলুন।"

রায়সায়েব একটু ইতস্তত করে বললেন, "বাট দিস ইজ প্রাইভেট অ্যান্ড কনফিডেন্সিয়াল!"

কর্নেল আমাকে দেখিয়ে বললেন, "জয়ন্ত চৌধুরি। দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার সাংবাদিক।"

"আলাপ হয়েছে। কিন্তু—"

"ওর কাছে আমার কিছু গোপন থাকে না। যদি ওর সামনে বলতে আপত্তি থাকে, তা হলে সরি মিঃ রায়, আমাকে ক্ষমা করবেন, আমারও গোপনে শুনতে আপত্তি আছে।"

রায়সায়েব আমাকে দেখে নিয়ে একটু হাসবার চেষ্টা করলেন। "তাই বুঝি। তবে খবরের কাগজের লোক বলেই—ঠিক আছে! অরিজিৎ যখন আপনার কথা বলেছে, তখন আই মাস্ট ফলো হিম।"

রায়সায়েব ব্রিফকেস খুলতে ব্যস্ত হলেন। ষষ্ঠীচরণ কফির ট্রে রেখে গেল। কর্নেল একটু হেসে বললেন, "কফি খেতে খেতে বলুন মিঃ রায়। কফি নার্ভকে চাঙ্গা করে। আমার ধারণা, আপনি খুব ডিস্টার্বড্।"

কয়েকটা খাম এবং বিজ্ঞাপনের কাটিং কর্নেলের হাতে তুলে দিয়ে রায় সায়েব কফির পেয়ালা নিলেন। চুমুক দিয়ে বললেন, "থ্যাংকস! সত্যিই আমি ভীষণ ডিস্টার্বড্। আমার জীবনটা অনেকগুলো অ্যাডভেঞ্চারের মধ্যে কেটেছে। অনেক সাংঘাতিক অবস্থার মধ্যে পড়েছি। কিন্তু এবারকারটা একেবারে অন্যরকম। আমি ভাল করে খেতে বা ঘুমোতে পারছি না। কোনও কাজকর্মে মন বসছে না। এ একটা অদ্ভুত চ্যালেঞ্জ।"

কর্নেল কাগজগুলো দেখতে দেখতে বললেন, "অনামিকা সেনের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কী?"

"পুরো ব্যাকগ্রাউন্ডটা আপনি শুনুন আগে।"

"বলুন।"

ন্যাশনাল জিওগ্র্যাফিক পত্রিকার পাতায় চোখ রেখে একটা অদ্ভুত কাহিনী শুনছিলাম। পঁচিশ বছর আগে সমীর রুদ্র নামে একজনের সঙ্গে অনামিকা সেনের বিয়ের সম্পর্ক হয়েছিল। বিয়ের আগের রাতে অনামিকা নিখোঁজ হয়ে যায়। রায় সায়েব তখন একটা কোম্পানিতে চাকরি করতেন। জামশেদপুরে ছিলেন। ঘটনাচক্রে সমীর রুদ্রের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর পুরনো কথা মনে পড়ে। তারপর অনামিকাদের বাড়ি গিয়ে দেখেন, সেখানে একটা বিশাল বাড়ি উঠেছে। অনামিকার মা বহুবছর আগে মারা গেছেন। অনামিকার খোঁজে রায়সায়েব কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। তার জবাবে হুমকি দিয়ে চিঠি এসেছে, অনামিকার খোঁজ করলে তাঁর সাংঘাতিক বিপদ হবে।

কর্নেল বললেন, "অনামিকার সঙ্গে আপনার এমোশনাল সম্পর্ক ছিল?"

"একসময় আমার দিক থেকে ছিল। এটুকু বলতে পারি। তবে সেটাও সাময়িক।"

"অনামিকার খোঁজ নিতে এতকাল পরে আপনি আগ্রহী। কেন?"

রায়সায়েব একটু উত্তেজিতভাবে বললেন, "বিয়ের আগে সে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল। সে কথা তো বললাম আপনাকে। তবে এটা ঠিক যে, এই হুমকি না এলে আমি এ নিয়ে এতটুকু মাথা ঘামাতাম না।"

"এমন তো হতে পারে, অনামিকা নিজেই হুমকি দিয়ে চিঠি লিখেছেন?"

রায়সায়েব একটু চুপ করে থেকে বললেন, "হুমকির কোনও দরকার তো

ছিল না। সে জানাতে পারত, ভাল আছে এবং তার জন্য আমাকে চিন্তা করতে হবে না।”

“ওঁর হাতের লেখা আপনার কাছে আছে?”

“নাহ্। তবে এই লেখাগুলো কিছুতেই ওর নয়। মেয়েদের লেখা বলে মনে হয় না।”

“কাউকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছেন। কোনও পুরুষ মানুষকে। এমন তো হতেই পারে। তিনিই এখন অনামিকার স্বামী।”

“স্বীকার করছি। কিন্তু অনি তো আমাকে পছন্দ করত না। পরে আমিও ওকে আর পছন্দ করতাম না। ওর সঙ্গে বিয়ের কথা উঠেছিল। আমিই না করে দিয়েছিলাম। কাজেই অনি ভালই জানে যে, আমি এই বয়সে ওর পেছনে লাগতে যাব না।”

কর্নেল ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, “আপনি কি সন্দেহ করছেন, অনামিকা—”

“আমার সন্দেহ, অনামিকা বেঁচে নেই। সি ওয়জ কিল্‌ড্। তাই তার কিলার চাইছে আমি যেন তার খোঁজে পা না বাড়াই। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড কর্নেল সরকার?”

আমি চমকে উঠেছিলাম। কর্নেল কফিতে চুমুক দিয়ে চুরুট ধরালেন।

“সমস্যা হল মিঃ রায়, খুব পুরনো কোনও মার্ডারের খোঁজখবর করা আমাদের দেশে বস্তুত অসম্ভব।”

“মার্ডারের নয়, মার্ডারারের খোঁজ পেতেই আমার আগ্রহ কর্নেল সরকার!” রায়সায়েব ডানহিল সিগারেট ধরালেন। “যদি সত্যিই অনিকে কেউ খুন করে থাকে, সে আমার বিজ্ঞাপন দেখেই ভয় পেয়ে গেছে বলে আমার সন্দেহ।”

“ইউ আর ভেরি ইনটেলিজেন্ট ম্যান, মিঃ রায়।”

“একটা বোকামি আমি করে ফেলেছি। সমীর রুদ্র যখন মুনলাইট বারে আমাকে দেখে চিনতে পেরেছিল, আমি তাকে না চেনার ভাণ করে কেটে পড়েছিলাম। এখন আপনি বলুন, ওকে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলে বিজ্ঞাপন দেব কি না?”

“দিয়ে দেখতে পারেন।” কর্নেল লালকালিতে লেখা চিঠিগুলোর ওপর আতস কাচ রেখে খুঁটিয়ে দেখতে থাকলেন।

রায়সায়েব বুকপকেট থেকে একটা খাম বের করে বললেন, “সরি! ভুলে গিয়েছিলাম। অরিজিৎ বলছিল, অনির কোনও ফটো আছে কি না। অনেক খুঁজে এই ফটোটা পেয়েছি। পুরনো ফোটো। নষ্ট হয়ে গেছে। দেখুন, যদি দরকার হয়—”

কর্নেল স্যাঁতলাধরা আবছা পোস্টকার্ড সাইজ ছবিটা নিয়ে বললেন, "সত্যিই অনামিকা খুন হয়ে থাকলে ওই সময়ের পুলিশ রেকর্ড বা খবরের কাগজে তাঁর ছবি থাকা সম্ভব। অবশ্য বডি যদি কেউ সঙ্গে সঙ্গে শনাক্ত করতে না পারে, তবেই। কিন্তু বডি নিখোঁজ হলে কিছু করার নেই। তার চেয়ে বড় কথা, অনামিকার বডি শনাক্ত করার জন্য তখন তাঁর আত্মীয়স্বজন বা পরিচিত লোকেরা ছিলেন। আপনার বন্ধু সমীর রুদ্র ছিলেন। অথচ সমীরবাবুর কাছে আপনি তেমন কিছু শোনেননি?"

"না।"

"তাহলে যদি আপনার সন্দেহমতো অনামিকা খুন হয়েই থাকেন, তাঁর বডিও নিখোঁজ হয়েছিল।"

'ইউ আর হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট, কর্নেল সরকার!"

কর্নেল হাসলেন। "সেক্ষেত্রে ছবি আমাদের কোনও সাহায্য করছে না।"

রায়সায়েব আস্তে বললেন, "কিন্তু যদি সে বেঁচে থাকে?"

কর্নেল দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, "হ্যাঁ। দেন ইটস্ আ রিয়্যাল মিস্ট্রি।"

ন্যাশনাল জিওগ্র্যাফিকের পাতা থেকে মুখ তুলে বললাম, "মিঃ রায়, যদি কিছু মনে না করেন, একটা কথা বলতে চাই।"

রায়সাহেব আমার দিকে তাকালেন। "বলুন!"

একটু ইতস্তত করে বললাম, "অনামিকা সেন' বিয়ের আগে নিখোঁজ হয়েছিলেন। কোনও মেয়ে ওইভাবে নিখোঁজ হয়ে গেলে তাঁর আত্মীয়স্বজন চুপচাপ বসে থাকতে পারেন না। পুলিশকে জানাবেন। কাগজে ছবি দিয়ে বিজ্ঞাপনও দেওয়া হবে। এমন কি, কেউ তাকে এলোপ করেছে বা কিডন্যাপ করেছে বলে সন্দেহ হবে এবং তার নামে পুলিশের কাছে—"

কর্নেল প্রায় একটা অট্টহাসি হেসে আমাকে থমিয়ে দিলেন। "স্ক্যান্ডাল জয়ন্ত, স্ক্যান্ডালকে শিক্ষিত বাঙালি পরিবার যমের মতো ভয় পায়। বিশেষ করে অনামিকাদের মতো পরিবার—মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত যাঁরা। বরং এসব পরিবারকে বাঙালি ভদ্রলোক পরিবার বলাই উচিত। এঁরা বাড়ির মেয়ে পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা সচরাচর চেপে রাখতেই চান। ব্যতিক্রম থাকতে পারে। সেটা ধর্তব্য নয়। তার চেয়ে বড় কথা, অনামিকা বিয়ের প্রাক্কালে নিখোঁজ হয়েছিলেন। কাজেই এ ক্ষেত্রে স্ক্যান্ডালের ভয়টা ছিল সাংঘাতিক।"

আবার ব্রিফকেস খুললেন রায়সাহেব। তারপর ব্যাঙ্কের একটা চেকবই বের করলেন। কর্নেল আস্তে বললেন, "আপনি আবার একটা ভুল করছেন মিঃ রায়!"

রায়সাহেব ভুরু কুঁচকে বললেন, "কী ভুল?"

pathagar.net

"আমি প্রাইভেট ডিটেকটিভ নই।"

"আপনি আমার এই কেস নিচ্ছেন না?"

"কেস হিসেবে নিচ্ছি না। বড় জোর বলতে পারি, আই অ্যাম ভেরি মাচ ইন্টারেস্টেড।" কর্নেল চোখ বুজে হেলান দিলেন। "আই শুড ট্রাই মাই বেস্ট টু সল্‌ভ দা মিস্ট্রি।"

"কিন্তু এতে আপনার সময় লাগবে। পরিশ্রম হবে। এমন কি কোথাও যেতে হলে—কিংবা কোনও কোনও ক্ষেত্রে টাকাকড়িও খরচ হতে পারে।"

"দ্যাটস্ মাই হবি, মিঃ রায়।"

রায়সাহেবের কণ্ঠস্বরে চাপা উত্তেজনা ফুটে উঠল। "কিন্তু এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। কাজেই আইনের দিক থেকে আপনার অধিকারের প্রশ্ন ওঠারও তো চান্স আছে। সে জন্য অন্তত একটা লেটার অব অথরিটি দরকার। কিংবা দুজনের সই করা একটা লেটার অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং—"

"দরকার হবে না। আপনি শুধু ওই কাগজগুলো আর আপনার নেমকার্ড রেখে যান।"

ভি রায় অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকার পর পকেট থেকে একটা নেমকার্ড বের করে টেবিলে রাখলেন। বললেন, "তা হলে আমি উঠি, কর্নেল সরকার! যখনই দরকার হবে, আমাকে রিং করবেন।"

উনি নমস্কার করে দরজার কাছে গেছেন, কর্নেল বললেন, "একটা কথা মিঃ রায়!"

রায়সাহেব ঘুরে দাঁড়ালেন।

"আপনি কি অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস করেন?"

"বুঝলাম না।"

"কোনও মানুষের অলৌকিক শক্তি থাকা সম্ভব মনে করেন?"

"কেন এ প্রশ্ন করছেন?"

"আপনার গলার চেনে ওই লকেটটা—"

রায়সাহেব হাসলেন। "তাই বলুন। দু বছর আগে একটা এক্সপোর্ট ডিলে প্রায় ফতুর হয়ে গিয়েছিলাম। তখন এক বন্ধু এটা আমাকে ধারণ করতে দেন। লকেটে একজন সন্ন্যাসীর ছবি আছে। তিনি কে, তা আমি জানি না। তবে এটা ধারণ করার পর পায়ের তলায় মাটি পেয়েছিলাম। সংস্কার বা কুসংস্কার যা-ই বলুন, লকেট সবসময় পরে থাকি।"

ভি রায় চলে যাওয়ার পর কর্নেল বললেন, "জয়ন্ত, তুমি ওইরকম একটা অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন লকেট ধারণ করছ না কেন?"

বললাম, "আমি ওসব বুজরুকিতে বিশ্বাস করি না।"

boighar.net

"ডার্লিং! বিশ্বাস করে দেখলে ক্ষতি কী? কত বছর ধরে তুমি দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার নিছক ক্রাইম রিপোর্টার থেকে গেলে।" কর্নেল হাত বাড়িয়ে টেলিফোন তুলে ডায়াল করতে থাকলেন। "বরং তুমি কাঁটালিয়াঘাটে চলে যাও। অবধূতজির কাছে গিয়ে সটান লুটিয়ে পড়ো।...হ্যালো! অরিজিৎ?...হ্যাঁ, এসেছিলেন।...হ্যাঁ ডার্লিং, এটা একটা রিয়্যাল মিস্ট্রি। তো শোনো! তোমাদের সেই আর্টিস্ট ভদ্রলোক—কী নাম যেন?...হ্যাঁ, সুমিত গুপ্ত। তাঁর ঠিকানাটা চাই...জাস্ট আধ মিনিট। লিখে নিচ্ছি। বলো..."

কর্নেল একটা কাগজে নাম-ঠিকানা লিখে নিয়ে ফোন রেখে দিলেন। জিজ্ঞেস করলাম, "পুলিশের আর্টিস্ট, ব্যাপারটা কী?"

"ছি ছি! এটা তোমার জানা উচিত ছিল, জয়ন্ত!"

"কী মুশকিল! জানি। প্রত্যক্ষদর্শীদের মুখে বর্ণনা শুনে ক্রিমিন্যালদের ছবি আঁকা হয়। কিন্তু আপনি পুলিশের আর্টিস্টকে কী কাজে লাগাবেন?"

কর্নেল একটা খাম থেকে অনামিকা সেনের সেই ধূসর বিবর্ণ ছবিটা বের করে বললেন, "সুমিতবাবুর সাহায্যে ছবিটি পুনরুদ্ধার করতে চাই। ভদ্রলোক শুধু পোর্ট্রেট আঁকিয়ে নন, একজন দক্ষ ফটোগ্রাফারও। তাছাড়া ওঁর অ্যানাটমি-জ্ঞানও অসাধারণ। এক মিনিট। ওঁর সঙ্গে একটা অ্যাপায়েন্টমেন্ট করে নিই।"

আবার টেলিফোন করে কর্নেল সুমিতবাবুর সঙ্গে কথা বললেন। তারপর উঠে দাঁড়ালেন। "চলো ডার্লিং! বেরিয়ে পড়া যাক। ফিরে এসে তুমি এখানেই লাঞ্চ খাবে। ষষ্ঠী!"

হাঁক ছেড়ে উনি পোশাক বদলাতে ভেতরে গেলেন।

অনামিকা সেনের অস্পষ্ট এবং রঙছুট সাদা-কালো ছবিটার দিকে তাকিয়ে তাকে খুঁজছিলাম। পঁচিশ বছর আগে সে নিখোঁজ হয়েছে। এই ছবিটা সেই সময়কার বলে মনে হয় না। একটি কিশোরীমুখের আদল আঁচ করা যাচ্ছে। তা যদি হয়, তা হলে এখন তাকে দেখলে কী করে চেনা সম্ভব হবে?

আবার, অনামিকা সেন যদি সত্যি খুন হয়ে থাকে, তা হলেই বা এই ছবি কোন কাজে লাগবে? কর্নেলের মাথায় একটা লোক উদ্ভট একটা বাতিক ঢুকিয়ে দিয়ে গেল। এখন এই নিয়ে কিছুদিন ছুটোছুটি করে বেড়াবেন। আমাকেও ছাড়বেন বলে মনে হচ্ছে না। অতএব সুমিতবাবুর বাড়ি থেকে ফিরে লাঞ্চটা খেয়েই কাট করব। আপাতত কিছুদিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকব বরং।

কিন্তু কর্নেল এসে খামগুলো গোছাতে গোছাতে বললেন, "লাঞ্চের পর একটু জিরিয়ে নিয়ে আমরা আরেক জায়গায় যাব, জয়ন্ত! তুমি আজ ক্যাজুয়াল লিভ নিচ্ছ। তার মানে, আপিসে যাচ্ছ না।"

ফোঁস করে একটা শ্বাস ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম।...

pathagar.net

কর্নেল নীলাদ্রি সরকার

·া সুমিত গুপ্ত ছবিটা অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করে দেখার পর বললেন, ·ন্যাল?”

·লাম, “না।”

·া হলে লুনাটিক।”

·া-ও না।”

সুমিতবাবু আবার আতস কাচ দিয়ে ছবিটা দেখতে দেখতে বললেন, “কিন্তু ·য়েটির মুখে আমি অস্বাভাবিকতার কিছু লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। আপনি বলতে ·ারেন, পুলিশের অর্ডারি ছবি আঁকতে আঁকতে আমার কোনও মানসিক বৈকল্য ·টে গেছে কি না।” চিত্রকর সকৌতুকে হাসলেন। “জানেন? লোকেরা আজকাল ·ামার কাছে পোর্ট্রেট আঁকাতে আসে না। আমি নাকি নিরীহ সজ্জন মানুষের ·খেও ক্রিমিন্যালের আদল এনে ফেলি! গত মাসে এক কোটিপতি ব্যবসায়ীর ·লে তার মরা বাপের ফটো দেখে অয়েলকালার পোর্ট্রেট আঁকতে ফরমাস ·রে গেল। বিশ হাজার টাকা দাবি করলাম। তাতেই রাজি। তারপর ব্যাটাচ্ছেলে ·ব নিতে এসে চটে আগুন। বলে, আমার বাবার ছবি না চম্বলের ডাকাতের ·ব এঁকেছেন মশাই? ছবি নিল না। ওই দেখুন ছবিটা। আসলে প্রতিকৃতির ·ধ্যে ব্যক্তির নিজস্ব রূপ কেউ দেখতে চায় না। সবাই চায় সুন্দর চেহারা। ·টোর বেলাতেও একই ব্যাপার। ফটোর চেহারা দেখতে সুন্দর হওয়া চাই। ·ামার নীতি হল, যা ঠিক, তাকে ঠিক তা-ই করতে হবে। কারণ প্রতিটি ব্যক্তির ·ধ্যে তার শারীরিক রূপের একটা করে নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য বলুন বা আইডেন্টিটি ·লুন, থাকতে বাধ্য।”

দেরি হয়ে যাচ্ছে দেখে বললাম, “খাঁটি কথা বলেছেন সুমিতবাবু! এই ছবিটা ঠিক যা ছিল, তা-ই আমি চাইছি।”

“চেষ্টা করব। জায়গায় জায়গায় অ্যানাটমি-লাইন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তবে আউটলাইনটা অনুমান করা যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে ভালরকমের সাহায্য পাব একটা অক্ষত চোখ থেকে। আর—হ্যাঁ, ঠোঁট দুটোর আদল স্পষ্ট। কপালের ডানদিক, ভুরু, ডান কান—” সুমিতবাবু আমার দিকে ঘুরলেন। “আপনি বললেন বছর পঁচিশ আগে নিখোঁজ হয়েছে?”

“হ্যাঁ। কিন্তু এ-ও বলেছি, ছবিটা তারও আগে তোলা।”

“কত বছর আগে?” বলেই সুমিতবাবু মাথা নাড়লেন। “নাহ্! আমার ওসব জানার প্রয়োজন নেই। আপনি আমাকে ইতিমধ্যেই একটু অসুবিধায় ফেলে দিয়েছেন।”

অবাক হয়ে বললাম, “কেন বলুন তো?”

Accession No. ৩৮০২৪
Date 2/3/05

"এ ধরনের ছবি পুনরুদ্ধারের কোনও আগাম ইনফরমেশন ক্ষতিকর। আমি নিজের অজ্ঞাতসারে কিছু এমোশনাল অনুভূতিতে বায়াস্‌ড্‌ হয়ে যেতে পারি। থাক, আর কিছু বলবেন না। বললেও আমি শুনব না।" সুমিতবাবু উঠে গেলেন একটা টেবিলের কাছে। অগোছাল স্টুডিওর এক কোনায় টেবিলটা জঞ্জালের মতো দেখাচ্ছে। ছবিটা ড্রয়ারে ঢুকিয়ে বললেন, "পুলিশকেও আমি ঠিক এই কথা বলি। ওঁরা বিরক্ত হন। লোকটা কী করেছে, আমার জানার দরকার নেই। আমার দরকার তার চেহারার মোটামুটি একটা বর্ণনা—অবজেকটিভ ডেসক্রিপশন ওন্‌লি।"

কথাগুলো যুক্তিপূর্ণ। বেশ কয়েকবার এই চিত্রকরের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। কিন্তু তখনও ওঁর বাড়িতে আসিনি। আসার দরকার হয়নি। তবে আজ এসে বুঝতে পারলাম, উনি এক অনন্যসাধারণ প্রতিভাবান মানুষ। অনেক বিষয় খুব তলিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেন।

জয়ন্ত বারবার আমার দিকে কেমন চোখে তাকাচ্ছিল। বুঝতে পারছিলাম, সে সুমিতবাবুর কথাবার্তা হাবভাবে খুব মজা পেয়েছে। এবার দেখলাম, তার ঠোঁটের কোনায় বাঁকা হাসি। কিছু বলার জন্য সে ঠোঁট ফাঁক করামাত্র তার দিকে চোখ কটমটিয়ে তাকালাম। অমনি সে গম্ভীর হয়ে সেই ব্যবসায়ীর বাতিল ছবিটা দেখতে মন দিল। ছবিটা সত্যিই চম্বলের ডাকাতের বলে মনে হবে।

সুমিতবাবুর বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি। রোগা বেঁটে মানুষ। লম্বা নাক। দাড়িগোঁফ পরিষ্কার করে কামানো। মাথায় লম্বা মেয়েলি চুল। চুলে কলপ মাখেন বলে মনে হল। অবশ্য কারও কারও চুল ষাট পেরিয়েও পাকে না। ওঁর পরনে বেজায় ঢোলা চকরা-বকরা লম্বাটে কুর্তা আর চোঙা জিনস্‌। দু'হাতে প্রচুর রঙ মেখে আছে। আমার ভয় হচ্ছিল, ছবিটাতে রঙ মেখে না যায়। কিন্তু সে ব্যাপারে উনি সচেতন দেখে আশ্বস্ত হয়েছিলাম।

ছবিটা রেখে হঠাৎ উনি ইজেলের দিকে এগিয়ে গেলেন। ইজেলে-আঁটা ক্যানভাসে কয়েকটা এলোমেলো রঙিন রেখা থেকে কিছু অনুমান করা কঠিন। বিমূর্ত চিত্রকলারও চর্চা করেন কি সুমিত গুপ্ত? ঘষঘষ করে সরু ব্রাসে একদলা লাল রঙ বুলিয়ে একটু পিছিয়ে এলেন। তারপর ব্রাসটা রেখে আমাদের কাছে ফিরে এলেন। "কবে চাই বলুন?"

বললাম, "যত শিগগির পারেন।"

"আগামী পরশু বিকেলে আসুন। তবে বলে রাখা দরকার, এ ক্ষেত্রে ওয়াটার-কালারই ভাল হবে। কারণ আপনি নিশ্চয় এ ছবি ঘর সাজানোর জন্য রাখবেন। ধরুন, আট বাই বারো ইঞ্চিই যথেষ্ট। নাকি—"

"নাহ্‌। ওই যথেষ্ট। কিন্তু কত দিতে হবে বলুন?"

সুমিতবাবু নড়ে বসলেন। "আমার মাথা খারাপ? আপনার মতো বিশ্বখ্যাত মানুষের কাছে টাকা নেব?"

হেসে ফেললাম। "আমাকে বিশ্বখ্যাত করে ফেললেন সুমিতবাবু!"

"নিশ্চয়। লাহিড়িসায়েবের কাছে শুনেছি আপনি ফরেন ম্যাগাজিনে আর্টিকেল লেখেন। বড় বড় ইন্টারন্যাশন্যাল সেমিনারে আপনার ডাক পড়ে। তাছাড়া কত সাংঘাতিক ক্রাইম আপনি ফাঁস করেছেন। বাব্বা! কর্নেল নীলাদ্রি সরকারকে একটা ছবি এঁকে দিয়ে আমি টাকা নেব? আমার চৌদ্দপুরুষ ধন্য হয়ে যাবে! এই যে আপনি আমার স্টুডিওতে পায়ের ধুলো দিয়েছেন—"

"প্লিজ সুমিতবাবু!"

সুমিত গুপ্ত হাসলেন। "পরশু পেয়ে যাবেন। বাড়িতে বসেই পেয়ে যাবেন। আপনাকে কষ্ট করে আর আসতে হবে না। আমি নিজে গিয়ে দিয়ে আসব।"

ঘড়ি দেখে বললাম, "তা হলে উঠি। আপনার খাওয়ার সময় হয়ে গেছে মনে হচ্ছে।" একটু রসিকতা না করে পারলাম না। "আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে, ওই দরজার পর্দার নীচে সম্ভবত মিসেস গুপ্তের পা দেখেছি।"

সুমিতবাবু চোখ বড় করে বললেন, "এই হল গিয়ে রহস্যভেদীর চোখ! তবে স্যার, একটু ভুল হয়েছে। আমি আপনার মতোই ব্যাচেলার। যার পা দেখেছেন, সে আমার বোন জয়িতা।"

"সরি সুমিতবাবু!"

সুমিতবাবু গলা চড়িয়ে ডাকলেন, "জয়ি! একবার এস। একজন ফেমাস ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।"

যে কাজের ছেলেটি কফি দিয়ে গিয়েছিল, সে পর্দা তুলে বলল, "দিদি বাথরুমে।"

"আচ্ছা। ঠিক আছে।" সুমিতবাবু উঠে গিয়ে আবার ইজেলের ক্যানভাসে একদলা রঙ বুলিয়ে দিলেন।

এবার একটা মুখের আভাস টের পেলাম। উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, "তা হলে চলি সুমিতবাবু!"

জয়ন্ত উঠে দাঁড়িয়েছিল। ইজেলের ছবিটার দিকে তার দৃষ্টি। "আচ্ছা সুমিতবাবু, যে ছবিটা আঁকছেন, সেটা কি কোনও ক্রিমিনাল কিংবা লুনাটিকের?" বলে সে আমার দিকে ঘুরে বাঁকা হাসল।

বুঝলাম অনামিকা সম্পর্কে জয়ন্তের ইতিমধ্যে একটা সেন্টিমেন্ট গড়ে উঠেছে। যৌবনের ধর্ম! সুমিতবাবু অনামিকা সম্পর্কে ক্রিমিন্যাল বা লুনাটিক বলায় সে চটে গেছে সম্ভবত।

সুমিতবাবু ঘুরে দাঁড়িয়ে বাঁ তর্জনী ঠোঁটে লম্বালম্বি রেখে এবং চোখে হেসে চাপাস্বরে বললেন, "চুপ! চুপ! জয়িতার কানে গেলে কেলেঙ্কারি হবে। এটা ওর গুরুদেবের পোর্ট্রেট।" চিত্রকর সামনের দেয়ালে কার্ডবোর্ডে পিন দিয়ে আঁটা একটা ছোট্ট সাদা-কালো ফটো দেখালেন। "দেখতে পাচ্ছেন তো?

গুরুদেব এই ক্যানভাসে এসে বিশাল হবেন—উইদ অল হিজ গ্রেটনেস অ্যান্ড গড্লি গ্র্যাঞ্জার।”

জয়ন্তকে অনেক সময় বাগ মানাতে পারি না। সে বলল, “উনি কাঁটালিয়াঘাটের সেই অবধূত নন তো?”

সুমিত গুপ্ত আগের মতো চাপাস্বরে এবং চোখে হেসে বললেন, “কাগজের লোক আপনি। ঠিকই ধরেছেন। আর বলবেন না মশাই! আজকাল এই এক হুজুগ উঠেছে! লোকে মিরাকলের ভক্ত। আসলে অনিশ্চয়তা, কালচার‍্যাল শক, কিছু কিছু ক্ষেত্রে দুঃখশোকঘটিত চিত্তবিকার—চলুন, নীচে অব্দি এগিয়ে দিই আপনাদের।”

সিঁড়িতে নামতে নামতে সুমিতবাবু বললেন, “মাস ছয়েক আগে আমার ভগ্নীপতি ট্রেন অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছেন। তারপর মেয়েদের যা হয়। আসলে জয়িতা বরাবর একটু কনজারভেটিভ প্রকৃতির। আমার মায়ের স্বভাবটি পুরোপুরি পেয়েছে। বাবা কিন্তু একেবারে উল্টো ছিলেন। আমার মতো খোলামনের মানুষ। সংস্কারমুক্ত, যুক্তিবাদী। যাই হোক, কর্নেলসায়েব! আগামী পরশু বিকেলে আপনি ছবি পেয়ে যাচ্ছেন।”

গাড়ি স্টার্ট দিয়ে জয়ন্ত বলল, “আমরা আজ সকাল থেকে মিরাকলের পাল্লায় পড়েছি, কর্নেল! আমার কেমন একটা অস্বস্তি হচ্ছে।”

“সর্বনাশ, ডার্লিং!” আঁতকে ওঠার ভঙ্গি করে বললাম। “এ অবস্থায় তোমার গাড়ি চালানো উচিত হবে না। বরং আমি ড্রাইভ করি।”

জয়ন্ত হাসল। “না, না। কথাটা সে-অর্থে বলিনি। ব্যাপারটা আপনি ভেবে দেখুন। আজ কাগজে যে গডম্যানের চ্যালেঞ্জ বেরুল, ঘটনাচক্রে এতক্ষণে তাঁর দর্শনও পাওয়া গেল। এদিকে আপনার ক্লায়েন্ট ভি রায়ের গলায় একটা লকেটে কোনও গডম্যানের ছবি ছিল। তিনিও সম্ভবত একই গডম্যান।”

গাড়ি বড়রাস্তায় পৌঁছুলে বললাম, “তুমি ঠিকই ধরেছ, জয়ন্ত! মিঃ রায়ের গলার লকেটের ছবিটা ছোট হলেও আমার দৃষ্টি এড়ায়নি। ফুট তিনেক দূরত্ব থেকে দেখা এক বর্গইঞ্চি লকেটের রঙিন ছবি। এ বুড়োবয়সেও আমার দৃষ্টিশক্তি কেমন, তা তুমি বিলক্ষণ জানো।”

“কিন্তু আপনি নিজেই আক্ষেপ করেন, আপনার ভীমরতি ধরেছে। বাহাত্তুরে ধরেছে!”

“হ্যাঁ, তা করি। তো তোমার বক্তব্যটা কী?”

“সুমিতবাবুর স্টুডিওতে ওই ছবিটা আপনার চোখ এড়িয়ে গেল কী করে? নেহাত আমি কথাটা না তুললে—”

ওর কথার ওপর বললাম, “চোখ এড়িয়ে যায়নি। একজন চিত্রকরের ডেরায় নানারকম মানুষ, এমন কি দেবদেবী তো বটেই, কিন্তু অদ্ভুত সবরকম বস্তু বা

প্রাণীর ছবি থাকা স্বাভাবিক। ভূতপেত্নী, যক্ষ-রক্ষ, পিশাচ-ডাকিনীদেরও দেখা পাওয়া যাবে। কাজেই কাঁটালিয়াঘাটের অবধূতজির ছবি নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কী?”

“ব্যাপারটা কেমন যেন গোলমেলে ঠেকছে আমার।”

“তার মানে তুমি সত্যিই মিরাকলে বিশ্বাস করছ!”

জয়ন্ত একটু ক্ষুব্ধ হল। “কী আশ্চর্য, আমার কথাটা আপনি বুঝতে পারছেন না!”

হাসতে হাসতে বললাম, “এতে কোনও অস্বাভাবিকতা নেই, ডার্লিং! একেক সময় একেকজন গডম্যান খুব হিড়িক ফেলে দেন। তখন অনেকের বাড়িতে তুমি তাঁর ছবি দেখবে। অনেকের লকেটে বা আংটিতেও তাঁর ছবি থাকবে। সম্প্রতি কাঁটালিয়াঘাটের শ্রীশ্রীভূতানন্দ অবধূত মিরাকল্ দেখিয়ে হোক বা যে-ভাবে হোক, একটা বড় রকমের হিড়িক ফেলতে পেরেছেন। কাজেই এখন অনেকের কাছেই তাঁর ছবি দেখতে পাওয়া স্বাভাবিক।”

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর জয়ন্ত বলল, “সুমিতবাবু অনামিকার ছবিতে কেন একজন ক্রিমিন্যাল কিংবা লুনাটিককে দেখতে পেলেন? আমার এটা খুব খারাপ লেগেছে।”

“ডার্লিং! তুমি রোমান্টিক—”

“কী মুশকিল! আমি আপনার মতামত জানতে চাইছি।”

“মানুষের মুখে কিছু লেখা থাকে না।”

“সুমিতবাবু কিন্তু অনামিকা সেনের ঝাপসা ছবি দেখেই বুঝে গেছেন, কী একটা অস্বাভাবিকতা ছিল।”

“থাকতে পারে। হয়তো উনি অ্যানাটমির কোনও গণ্ডগোলই বোঝাতে চেয়েছেন।”

জয়ন্ত জোর দিয়ে বলল, “ওঁর প্রথম ইম্প্রেসন অ্যানাটমি সংক্রান্ত নয়। চরিত্র সংক্রান্ত।”

কোনও মন্তব্য করলাম না। চোখ বুজে ঘটনাটা সাজানোর চেষ্টা করছিলাম। পঁচিশ বছর আগে অনামিকা সেন নামে একটি মেয়ে বিয়ের আগের দিন নিখোঁজ হয়ে যায়। পঁচিশ বছর পরে তার এক প্রাক্তন প্রেমিক তার নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার কথা শুনে কাগজে বিজ্ঞাপন দিল। বিজ্ঞাপনের জবাবে এল হুমকি দেওয়া লাল কালিতে লেখা চিঠি। কিন্তু এর মধ্যে কোথাও যেন একটা তথ্যগত ফাঁক থেকে যাচ্ছে। কী সেটা?

মিঃ রায় অনামিকার নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার কথা শুনে কেন এতকাল পরে হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন এবং কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে বসলেন?

অনামিকা তাঁর সঙ্গেই পালিয়েছে বলে রটেছিল কি? অনামিকা যে তাঁর সঙ্গে পালায়নি, সেটা প্রমাণ করতেই কি এই তৎপরতা?

pathagar.net

কিন্তু কেন? পঁচিশ বছর কম সময় নয়। তা ছাড়া অনামিকার মা বেঁচে নেই। তা হলে কার কাছে জবাবদিহির প্রয়োজন হল? এ-ও গুরুত্বপূর্ণ, সমীর রুদ্র তাঁকে চিনতে পারা সত্ত্বেও কেন এড়িয়ে গেলেন বৈশম্পায়ন রায়? সমীরবাবুকে বলতে পারতেন, গুজবটা মিথ্যা।

মিঃ রায়ের দুটি আচরণের ব্যাখ্যা দরকার। এক কেন কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন? দুই কেন সমীর রুদ্রকে এড়িয়ে গেলেন? প্রথম প্রশ্নের উত্তর যদি হয় 'নিছক কৌতূহল' এবং দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর যদি হয় 'অপছন্দ লোককে এড়িয়ে যাওয়া', তা হলে রহস্যের কেন্দ্র গিয়ে পড়ে লাল কালিতে লেখা হুমকিতে।

এ দিকে মিঃ রায় সন্দেহ করছেন, কেউ অনামিকাকে খুন করতেও পারে। তাই সে চাইছে না কেউ অনামিকা সম্পর্কে তদন্ত করুক। এক্ষেত্রে একটা সিদ্ধান্ত সহজেই করা চলে। অনামিকা তা হলে এমন সময়ের মধ্যে খুন হয়েছে, যাতে এখনও খুনীর বিরুদ্ধে মামলা করা চলে।

কিন্তু যদি অনামিকা বেঁচে থাকে?

আবার লাল চিঠির হুমকিতে ফিরে আসতে হচ্ছে। কেন এই হুমকি? মিঃ রায় বলছেন, অনামিকার প্রতি তাঁর নিছক সাময়িক আসক্তি ছিল। কাজেই এই পরিণত বয়সে তিনি অনামিকার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ার মানুষ নন।

তা নন। তা হলে কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন কেন? 'নিছক কৌতূহল'! নাকি কিছু গোপন করছেন? মোট কথা, একটা তথ্যগত গণ্ডগোল থেকেই যাচ্ছে।

"কর্নেল!"

চোখ খুলে দেখলাম, পৌঁছে গেছি। গাড়ি থেকে নেমে বললাম, "তুমি সুমিতবাবুর ফার্স্ট ইম্প্রেসনের কথা বলছিলে জয়ন্ত! আই এগ্রি। অনামিকার মধ্যে সত্যি একটা অস্বাভাবিকতা ছিল। সেটা খুঁজে বের করতে পারলেই এ রহস্যের সমাধান সম্ভব।"

জয়ন্ত গাড়ি লনের পার্কিং জোনে রেখে এল। তারপর সিঁড়িতে পা রেখে বলল, "খিদের মুখে এখন রহস্য-টহস্য ফালতু হয়ে গেছে, বস! কবিতায় আছে না? ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়—"

"অনামিকা সেন যেন ঝলসানো রুটি।"

জয়ন্ত হেসে ফেলল। "সত্যি! আপনি এ বয়সেও এত রস ধারণ করে আছেন, ভাবা যায় না!"

"ডার্লিং, অবধূতজির মিরাকলের মতো আজ আরও একটি মিরাকল তোমার চোখ এড়িয়ে গেছে।'

"কী বলুন তো?"

"আমি ব্যাচেলার। মিঃ রায় ব্যাচেলার। সুমিতবাবু ব্যাচেলার।"

"আমাকে হাফ-ব্যাচেলার বলতে পারেন। তবে ফুল ব্যাচেলারের ত্র্যহস্পর্শ সত্যি একটি মিরাকল্। এখন দেখা যাক, কী ঘটে।"

ডোরবেলের সুইচ টেপার সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে গেল। ষষ্ঠী বলল, "নাহিড়িসায়েব তিনবার ফোং করেছিলেন। বললেন, বাবামশাই ফিরলেই ফোং করতে বলবে। শিগগির ওঁকে ফোং করুন।"

চোখ কটমটিয়ে বললাম, "ফোং করছি। তুই খাবার রেডি কর।"

ষষ্ঠীকে আজ অব্দি কিছুতেই ফোন বলানো গেল না। নাকি ও ইচ্ছে করেই ফোং বলে? আমার এই প্রিয় মধ্যবয়সী পরিচারকটি এত বছরেও শহুরে হয়ে উঠতে পারল না। ল এবং ন-এ সবসময় গণ্ডগোল করে।

টেলিফোনে অরিজিৎকে তখনই পেলাম। বললাম, "এনিথিং রং, ডার্লিং?"

"হাই ওল্ড বস্! সুমিতবাবুর লাইন কি ডেড?"

"জানি.না। কেন?"

"আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্য বহুক্ষণ চেষ্টা করেও লাইন পেলাম না। এদিকে এক সাংঘাতিক ব্যাপার।"

"বৈশম্পায়ন রায়—"

"নাহ্। সমীর রুদ্র ইজ ডেড। বৈশম্পায়নের কাছে তার নাম শুনে থাকবেন।"

"মাই গড্! ডেড, মানে মার্ডার্ড?"

"নাহ। স্যুইসাইড বলেই মনে হয়েছে। ডান কানের ওপর কপালের ডান দিকে রিভলভারের নল ঠেকিয়ে ট্রিগার টেনেছেন। রিভলভারটা পয়েন্ট বাইশ ক্যালিবারের। পাশেই পড়ে ছিল।"

"কোনও স্যুইসাইডাল নোট পাওয়া গেছে?"

"নাহ্। তবে একটা হুইস্কির বোতল আর গ্লাস পাওয়া গেছে। বোতল অর্ধেকের বেশি খালি। মনে হচ্ছে, মাতাল অবস্থায় হঠাৎই ঝোঁকের বশে স্যুইসাইড করেছেন। ওঁর অফিসের কলিগ্‌রা বলছেন, কিছুদিন থেকে হতাশায় ভুগছিলেন। ওঁর বিরুদ্ধে কোম্পানির একটা অ্যালিগেশন ছিল। তদন্ত চলছিল। কাজেই—"

"কিন্তু কোথায় স্যুইসাইড করেছেন ভদ্রলোক?"

"শেক্সপিয়ার সরণিতে ওঁর এক বন্ধুর ফ্ল্যাটে। তিনি নাকি ওয়াশিংটনে থাকেন। ফ্ল্যাটটা দেখাশোনার জন্য সমীরবাবুকে চাবি দিয়ে গেছেন। গত রাত্রে ওখানেই ছিলেন উনি। দরজায় ইন্টারলকিং সিস্টেম আছে। বাইরে থেকে খোলা যায় না। সকাল আটটায় নীচের একটা রেস্তোরাঁ থেকে ব্রেকফাস্ট নিয়ে যায় একজন। রাত্রেই বলা ছিল। অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ আ রেগুলার অ্যারেঞ্জমেন্ট। যাই হোক, সে সাড়া না পেয়ে ফিরে আসে। নাও ইটস্ আ পয়েন্ট, সে ভেতরে ট্যাপ থেকে জল পড়ার শব্দ শুনেছিল।"

"মেক ইট ব্রিফ, অরিজিৎ! আমি ক্ষুধার্ত।"

"ওক্কে বস! বরং আমি যাচ্ছি।"

"এস। শুধু বলো, হাউ দা বডি ওয়জ ডিস্‌কভার্ড?"

"সমীরবাবু মা একটা জরুরি দরকারে ওঁর অপিসে ফোন করেন। তখন প্রায় সাড়ে এগারোটা। উনি অফিস যাননি শুনে ভদ্রমহিলা এই ফ্ল্যাটে চলে আসেন। উনিও জল পড়ার শব্দ শোনেন। তারপর—"

"দ্যাটস এনাফ। তুমি চলে এস। ছাড়ছি।"

ফোন রেখে দেখলাম, জয়ন্ত হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চমকানো গলায় বলল, "মিঃ রায় স্যুইসাইড করেছেন?"

"নাহ্। ওঁর সেই বন্ধু সমীর রুদ্র।" ওর হাত ধরে টানলাম। "ক্ষুধার রাজ্যে এখন পৃথিবী অন্যরকম হয়ে গেছে। দুটো বাজে। তুমি কি স্নান করবে? কী দরকার? আমি সপ্তাহে একদিন স্নান করি। আর শোনো ডার্লিং! খাওয়ার টেবিলে বসে খাদ্য ছাড়া অন্য কোনও আলোচনা চলবে না।"

তিনটেয় অরিজিৎ এল।

জয়ন্তকে দেখে বলল, "জয়ন্তবাবু যে! গন্ধ পেয়েই ছুটে এসেছেন? তবে এই স্টোরিতে রোমহর্ষক বা রুদ্ধশ্বাস কিছু নেই, সো মাচ আই ক্যান টেল ইউ!"

pathagar.net

বললুম, "জয়ন্তকে আজ সকাল থেকে আমিই আটকে রেখেছি।"

অরিজিৎ হাসতে লাগল। "তা হলে আপনার স্নেহবন্ধনে পড়ে ভদ্রলোকের খুব দুর্ভোগ হচ্ছে! ঠিক আছে। দেখুন, অন্তত বৈশম্পায়নের ব্যাপারটা থেকে একটা জমকালো স্টোরি ওঁকে দিতে পারেন নাকি।"

জয়ন্ত বলল, "মিঃ লাহিড়ি! আমার ধারণা, দা স্টোরি অলরেডি ইজ দেয়ার। এখন শুধু একটুখানি লিংক-আপ দরকার। বিটুইন এ অ্যান্ড বি।"

"সর্বনাশ!" অরিজিৎ চোখ বড় করে বলল। "প্রবাদ আছে, আমরা পুলিশেরা নাকি ছাইয়েরও দড়ি তৈরি করতে পারি। সাংবাদিকরা দেখছি আরও এককাঠি সরেস। গন্ধ দিয়েও দড়ি তৈরি করতে পারেন! আপনি সম্ভবত বৈশম্পায়নের সঙ্গে সমীর রুদ্রকে লিংক-আপ করার কথা ভাবছেন? কর্নেল হোয়াট ডু ইউ থিংক অব ইট?"

চোখ বুজে চুরুট টানছিলাম। বললাম, "একটা লিংক তো আছেই। পঁচিশ বছর পরে মিঃ রায় একটা বারে তাঁর এক সময়ের বন্ধু মিঃ রুদ্রের দেখা পান। মিঃ রুদ্র ওঁকে চিনতে পারেন। অ্যান্ড ইউ নো হোয়াট হ্যাপন্‌ড্। অনামিকা সেনের এপিসোড এসে যায় স্বভাবত। মিঃ রায় তাঁর বন্ধুকে এড়িয়ে চলে আসেন। তারপর বিজ্ঞাপন, হুমকি দেওয়া লাল চিঠি। তারপর মিঃ রুদ্রের স্যুইসাইড। তো এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। মিঃ রায় বলছিলেন, অনামিকা

রহস্যের ব্যাপারে মিঃ রুদ্রকে ওঁর খুব দরকার হয়ে উঠেছে। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে তাঁকে যোগাযোগ করতে বলবেন।”

অরিজিৎ বলল, “বাসুকে আমি ওর অফিসে কন্ট্যাক্ট করেছিলাম। ও যখন ঘটনাস্থলে পৌঁছুল, তখন বডি মর্গে পাঠানো হয়ে গেছে। বাসু সমীরবাবুর মাকে নিয়ে কসবায় পৌঁছে দিতে গেছে।”

বললাম, “ওঁর রিঅ্যাকশন কী?”

“ভীষণ আপসেট।”

“মিঃ রুদ্রের স্ত্রী?”

“স্ত্রীর সঙ্গে ক'বছর আগে ডিভোর্স হয়ে গেছে। ভদ্রমহিলা আবার বিয়ে করেছেন। এখন মাদ্রাজে থাকেন। সমীরবাবুর হ্যাপিলাইফ ছিল না।”

একটু চুপ করে থাকার পর বললাম, “পাশের ফ্ল্যাটের কেউ গুলির শব্দ শোনেনি?”

“শুনে থাকতে পারে। বলছে না।” অরিজিৎ সিগারেটের প্যাকেট বের করে জয়ন্তকে দিল। নিজে একটা ধরাল। তারপর বলল, “পার্ক স্ট্রিট থানা থেকে লালবাজারে ও সি হোমিসাইডকে ঘটনাটা জানানো হয়েছিল। কারণ প্রথমে ওটা মার্ডার মনে হয়েছিল। যাই হোক, ওই সময় আমি সি পি-র ঘরে কনফারেন্সে ছিলাম। খবরটা দৈবাৎ পেয়েছিলাম। তবে সমীর রুদ্র নামটা শুনেই আমি ইন্টারেস্টেড হয়েছিলাম। বাসুকে ফোন করে আমি ঘটনাস্থলে গেলাম। ততক্ষণে বডি সরানো হয়ে গেছে। বডির পজিশন—একটা কাগজ দিন। এঁকে দেখাচ্ছি।”

টেবিল থেকে প্যাড দিলাম। অরিজিৎ চমৎকার একটা স্কেচ করল। দেখার পর বললাম, “বডি বাঁ পাশে কাত হয়ে পড়েছিল?”

“ইনভেস্টিগেটিং অফিসারের বর্ণনা। শোবার ঘরের মেঝেয় কার্পেটের ওপর বাঁ পাশে কাত হয়ে—”

“বাঁ পাশে?”

অরিজিৎ তাকাল। “এনিথিং রং?”

“নাহ্। রিভলভারটা দেখছি ডান হাতের বুড়ো আঙুলের কাছে!”

“ফটো তোলা হয়েছে। এক কপি প্রিন্ট পেয়ে যাবেন—ইফ ইউ আর ইন্টারেস্টেড!”

“হ্যাঁ। তো রিভলভারটা ফরেন্সিক ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয়েছে?”

“অবশ্যই। আঙুলের ছাপ কালকের মধ্যেই পাওয়া যাবে। গুলিটা ওই রিভলভারের কি না, সেটাও দেখা দরকার। ছটা গুলির মধ্যে পাঁচটা আছে।”'

“জল পড়ার ব্যাপারটা কী?”

“ডাইনিংয়ের বেসিন খোলা ছিল।”

“হুইস্কির বোতল আর গ্লাস কোথায় ছিল?”

"সরি। এঁকে দেখাচ্ছি।"

"থাক। মুখে বলো। পরে ফটোতে দেখে নেব।"

"শোবার ঘরেরই একটা গোল নিচু টেবিলে। টেবিলের তিনদিকে তিনটে কুশন। বডি থেকে জাস্ট দেড়-দু মিটার দূরে।"

"অ্যাশট্রে ছিল টেবিলে?"

অরিজিৎ হাসল। "অবশ্যই ছিল এবং একটা চারমিনারের প্যাকেটও ছিল। একটা লাইটার ছিল। প্যাকেটে একটামাত্র সিগারেট ছিল। অ্যাশট্রেতে অন্য ব্র্যান্ডের সিগারেটের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। আর কিছু?"

"ঘর থেকে শুধু বডি আর রিভলভার ছাড়া আর কিছু নিয়ে যাওয়া হয়নি?"

"নাহ্। আমাদের অফিসাররা অভিজ্ঞ এবং দক্ষ। তাঁরা কনভিন্সড্ যে এটা স্যুইসাইড কেস।"

একটু হেসে বললাম, "কিন্তু তুমি কি কনভিন্সড্?"

অরিজিৎ আস্তে বলল, "না হওয়ার কী আছে?"

"ডার্লিং! তুমি আমাকে তিনবার রিং করেছিলে। তারপর তুমি ছুটে এসেছ। তুমি নিজের উৎসাহেই এসেছ। তোমার মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা লক্ষ করছি। হোয়াই ইট ইজ, অরিজিৎ? তুমি সিগারেটটাও এত শিগগির শেষ করে ফেললে!"

অরিজিৎ শুকনো হেসে সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিল। "মে বি—বাসু আমার পুরনো বন্ধু এবং ওর এক পুরনো প্রেমিকার ব্যাপারটা আমাকে হন্ট করছে। এমনও হতে পারে, জয়ন্তবাবুর মতো আমিও নিজের অজ্ঞাতসারে একটা লিংক-আপ করে ফেলেছি। তবে সেটা বাসুর সঙ্গে নয়, অন্য কিছুর সঙ্গে। কিন্তু সেই অন্য কিছুটা এখনও আমার কাছেই স্পষ্ট নয়।"

"দেখ অরিজিৎ! অনেকসময় আমরা জানি না যে, আমরা কী জানি!"

অরিজিৎ একটু চুপ করে থাকার পর বলল, "বেসিন থেকে জল পড়ার ব্যাপারটাতে আমার একটা খটকা লেগেছে। একটা সহজ ব্যাখ্যা আমাকে দেওয়া হয়েছে মাতাল সমীরবাবু বেসিন বন্ধ করেননি। এদিকে ডাক্তারের মতে, সমীরবাবুর মৃত্যু হয়েছে রাত দশটা থেকে বারোটার মধ্যে। কারণ বডির রাইগর মর্টিস শুরু হয়ে গিয়েছিল। তার মানে, প্রায় বারো ঘণ্টা ধরে বেসিনে জল পড়া উচিত।"

জয়ন্ত বলল, "পড়তেই পারে।"

অরিজিৎ বলল, "ওই ফ্ল্যাটের ডাইনিং রুমের সংলগ্ন মিসেস কাপাড়িয়ার ফ্ল্যাট। ভদ্রমহিলা জোর গলায় বলছিলেন, ভোর ছটা থেকে সাড়ে ছটার মধ্যে কোনও একসময় উনি জলপড়ার শব্দ শুনতে পান। রাত্রে তেমন কোনও শব্দ

তিনি নাকি শোনেননি। ওঁর স্বামী বললেন, শি ইজ আ মেন্টাল পেশ্যান্ট। আমি ভদ্রমহিলাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি গুলির শব্দ শুনেছিলেন নাকি? উনি বললেন, নাহ্। দুপুর রাত্রি অব্দি নীচের রাস্তায় প্রচণ্ড গাড়ির শব্দ হয়। বিশেষ করে কয়েকটি মোটরসাইকেল আছে ওই বাড়িরই যুবকদের। তারা নাকি ইচ্ছে করেই যখন-তখন আওয়াজ দেয়। ফ্ল্যাটটা দোতলায়। কাজেই গুলির শব্দ মোটরসাইকেলের ব্যাকফায়ারের সঙ্গে মিশে যেতেই পারে। কিন্তু মিসেস কাপাড়িয়ার জলপড়ার শব্দ শোনাটা সন্দেহজনক। হ্যাঁ, মেন্টাল পেশ্যান্ট উনি। ওঁর স্বামী রিটায়ার্ড ডক অফিসার। ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন দেখালেন আমাকে। ওঁর স্ত্রী ততক্ষণে হিস্টেরিক হয়ে উঠেছেন। এ নিয়ে, তখন ব্যাপারটাকে আর গুরুত্ব দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু—"

অরিজিৎ হঠাৎ চুপ করল। বললাম, "মেন্টাল পেশ্যান্ট হলেই যে মিথ্যা বলবেন, তার মানে নেই। তবে মেন্টাল পেশ্যান্টদের সমস্যা হল, ওঁদের কাছে রিয়্যাল-আনরিয়্যাল একাকার হয়ে যায়। মানসিক দিক থেকে সুস্থদের কছে যা অবাস্তব, মানসিক রোগীদের কাছে তা বাস্তব। নাহ্—সবসময় নয়, অন্তত কোনও-কোনও সময়! কাজেই জলপড়ার ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই।"

pathagar.net

জয়ন্ত বলল, "মিঃ রায় কিন্তু এখনও আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করছেন না, কর্নেল!"

অরিজিৎ বলল, "হি ইজ আপসেট। পরে করবেন নিশ্চয়।"

জয়ন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠল। "ভুলে যাবেন না, একটা বারে সমীর রুদ্রের সঙ্গে রায়সায়েবের হঠাৎ দেখা হয়ে যাবার পর থেকেই এই ড্রামার শুরু। কর্নেল, বলুন তা-ই কি না?"

বললাম, "তুমি ড্রামা বলছ?"

"নিশ্চয় ড্রামা। রায়সায়েব সমীরবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন মনে হচ্ছিল কি না বলুন? কাগজে বিজ্ঞাপন দেবার কথাও বলছিলেন। মনে করে দেখুন।"

"হুঁ।" সায় দিয়ে বললাম। "তোমার কথায় যুক্তি আছে।"

"হুমকি দেওয়া চিঠির পর রায়সায়েবের সমীরবাবুকে দরকার হল। কেন হল, এটা একটা পয়েন্ট।"

অরিজিৎ বলল, "আজ সকালে বাসু আমার ঠিকানা যোগাড় করে আমার কোয়ার্টারে গিয়ে দেখা করে। সবটা শোনার পর আমিও ওকে এই প্রশ্নটা করেছিলাম। ও বলল, অনামিকা কীভাবে নিখোঁজ হয়েছিল এবং তারপর কী কী ঘটেছিল, ও জানতে চায়। সেইসঙ্গে লালচিঠির হুমকি সম্পর্কেও সমীরবাবুর

সঙ্গে বাসুর আলোচনা করার ইচ্ছা ছিল। ওর ধারণা, সমীর ওকে সাহায্য করতে পারবে। কোনও ইনফরমেশনও দিতে পারবে। কাজেই এ পয়েন্টটাতে কোনও গণ্ডগোল আমি অন্তত দেখছি না জয়ন্তবাবু!"

চুরুটটা নিভে গিয়েছিল। ধরাতে যাচ্ছি, ষষ্ঠী কফি আনল। সে 'নালবাজারের নাহিড়িসায়েব'-কে স্যালুট ঠুকতে ভুলল না। অনেক ছোটখাটো ব্যাপার আমাকে অবাক করে। ষষ্ঠী এমন চমৎকার স্যালুট ঠোকা কোথায় শিখল? চারটে বাজে। ওকে বললাম, "ছাদে যা শিগগির। দেখবি কয়েকটা টব ঢাকা দেওয়া আছে। খুলে দিয়ে আয়।"

ষষ্ঠী চলে গেলে অরিজিৎ বলল, "আপনার শূন্যোদ্যানের খবর কী?"

"মোটামুটি ভাল।"

"মোটামুটি কেন?"

"নাইজেরিয়ান অক্টোপাস প্ল্যান্টটা এখনও কলকাতার ক্লাইমেটের ধকল সামলাতে পারছে না।"

অরিজিৎ এবং জয়ন্ত খুব হাসতে লাগল। তারপর কিছুক্ষণ চুপচাপ কফি খাওয়ার পর অরিজিৎ বলল, "আমার একটা ব্যক্তিগত অনুরোধ, কর্নেল! শেকস্‌পিয়ার সরণির ওই ফ্ল্যাটটা আপনি গিয়ে একবার দেখুন। বহু কেসে অফিসিয়ালি আপনার সাহায্য পুলিশ নিয়েছে। কিন্তু এটা আন্‌অফিসিয়ালি। কারণ বাসু আমার পুরনো বন্ধু।"

"আচ্ছা অরিজিৎ! রিভলভারটার কি লাইসেন্স আছে? থাকলে কার নামে আছে?"

"সুইডিশ রিভলভার। সমীর রুদ্রকে কখনও কোনও ফায়ারআর্মসের লাইসেন্স দেওয়া হয়নি। কাজেই ওটা বেআইনি এবং চোরাচালানি জিনিস।"

"ফ্ল্যাটের চাবি পাওয়া গেছে?"

"হ্যাঁ। বালিশের তলায় ছিল। তবে একটা কথা জানিয়ে রাখা দরকার। ফ্ল্যাটের ওনারের শুধু ফার্নিচার ছাড়া কোনও কাগজপত্র নেই। সমীরবাবুরও নেই। তন্নতন্ন খোঁজা হয়েছে। আগেই বলেছি, সমীরবাবু মাঝেমাঝে গিয়ে থাকতেন। ও-বাড়ির লোকেরা ওঁর সঙ্গে কখনও কোনও লোককে দেখেননি। একা যেতেন এবং একা থাকতেন। কাজেই কেসটি স্যুইসাইড।"

"কিন্তু তোমার মনে প্রশ্ন জেগেছে কেন?"

"বেসিনে জল পড়ার ব্যাপারটা আমার মাথায় ঢুকে গেছে।" অরিজিৎ হাসল। "মাথার ভেতর জলের শব্দ—"

অরিজিতের কথার ওপর বললাম, "চলো, বেরুনো যাক।"

জয়ন্ত চৌধুরি

অরিজিৎ লাহিড়ি ফ্ল্যাটটার চাবি নিয়ে গিয়েছিলেন। ভেতরে ঢুকে আলো জ্বেলে দিলেন। প্রথমে বসার ঘর। তারপর কিচেন এবং ডাইনিং। তার লাগোয়া বেডরুম। নেহাত দু'ঘরের ছোট্ট ফ্ল্যাট। কর্নেল ডাইনিংয়ে ঢুকলেন। অরিজিৎ বললেন, "আগে বেডরুমটা দেখে নিলে ভাল হত।"

কর্নেল হাসলেন। "তোমার মাথার ভেতর জল পড়ার শব্দ। কাজেই আগে বেসিনটা দেখে নিই।"

বেসিনটার কাছে গিয়ে তিনি ট্যাপ খুলে দিলেন। খুব জোরে জল পড়তে থাকল। জলের শব্দটা অদ্ভুত মনে হল আমার। জল কি কোনও কথা বলছে? কর্নেল যেন সেই কথা শুনছিলেন। কাছে গিয়ে বললাম, "কী বুঝছেন? জল কি কিছু বলছে?"

কর্নেল আমার রসিকতা গ্রাহ্য করলেন না। গম্ভীরমুখে বললেন, "এই দেয়ালের ওধারে একজন মানসিক রোগী থাকলে শব্দটা তার পক্ষে অসহ্য হতেই পারে। হয়েছেও বটে। অরিজিৎ! তুমি কী বলতে চেয়েছ, বুঝতে পারছি।"

অরিজিৎ একটু অবাক হয়ে বললেন, "আমি কিছু বলতে চেয়েছি কি না আমি এখনও নিজেই জানি না, কর্নেল।"

কর্নেল বললেন, "ডার্লিং! তোমাকে বলেছি, আমরা নিজেরাই জানি না যে আমরা কী জানি!"

"একটু খুলে বললে বুঝতে পারব।"

কর্নেল ডাইনিং টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলেন। "কেউ চেয়েছিল মিসেস কাপাড়িয়া উত্তেজিত হয়ে হইচই বাধান এবং বেসিন বন্ধ করতে বলুন। তার মানে, সে চেয়েছিল সমীরবাবুর ডেডবডির কথা জানাজানি হোক। এবং সে জানে, মিসেস কাপাড়িয়া মানসিক রোগী।"

অরিজিৎ আস্তে বললেন, "ঠিক এভাবে কথাটা না ভাবলেও এ ধরনের একটা প্রশ্ন আমার মাথায় ছিল। সম্ভবত কেউ ভোরের দিকে এ ফ্ল্যাটে ঢুকেছিল।"

বললাম, "সে কী করে ঢুকবে? চাবি ছাড়া—"

আমাকে থামিয়ে কর্নেল বললেন, "ঠিক বলেছ জয়ন্ত! চাবি যদি সমীরবাবুর কাছেই থাকে, কেউ বাইরে থেকে কী করে ফ্ল্যাটে ঢুকবে? অরিজিৎ! এক্ষেত্রে একটা ডুপ্লিকেট চাবি এবং কোনও দ্বিতীয় ব্যক্তির অস্তিত্ব এসে পড়ছে। দ্বিতীয় ব্যক্তি জানে, প্রতিবেশিনী মিসেস কাপাড়িয়া মানসিক রোগী। এবার প্রশ্ন হল, কে সে? কেনই বা সে ভোর ছটায় এই ফ্ল্যাটে ঢুকতে এল? কী কাজ ছিল তার? ধরে নিচ্ছি, পুলিশের পাল্লায় পড়ার ভয়ে সে নিজে ঘটনাটা জানানোর ঝুঁকি নেয়নি। তাছাড়া তার ফ্ল্যাটে ঢোকা নিয়েও প্রশ্ন উঠত। কিন্তু একটা কাজ তো

pathagar.net

সে সহজেই করতে পারত। বেরিয়ে এসে দরজায় ধাক্কা দিয়ে প্রতিবেশীদের ডাকাডাকি করে সমীরবাবুর আত্মহত্যার ঘটনা জানাজানি হওয়ার ব্যবস্থা করতে পারত। কিন্তু তা হলে বোঝা যাচ্ছে, সে চুপিচুপি এসে ঢুকেছিল। বেসিন খুলে দিয়ে চুপিচুপি বেরিয়ে গিয়েছিল।”

কর্নেল বেডরুমে ঢুকলেন। বেডরুমটা বেশ বড়। অরিজিৎ আলো জ্বেলে তিনটে জানালাই খুলে দিলেন। জানালায় পুরু নস্যি রঙের পর্দা। গোল নিচু টেবিলে হুইস্কির বোতল, একটা গ্লাস, একটা সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার দেখতে পেলাম। কর্নেল হুইস্কির বোতলটা তুলে নিয়ে দেখতে থাকলেন। তারপর বললেন, “জনি ওয়াকার কোম্পানির স্কচ। এয়ারপোর্টের ডিউটি ফ্রি শপ থেকে সদ্য কেনা হয়েছে।

অরিজিৎ দ্রুত বললেন, “আমরা লক্ষ করেছি। এতে কোনও অস্বাভাবিকতা আছে বলে মনে হয়নি। সম্ভবত সমীরবাবুর কোনও বন্ধু বিদেশ থেকে ফেরার সময় এটা এয়ারপোর্টে কিনেছেন এবং উপহার দিয়েছেন। কিংবা সমীরবাবু কোনও পরিচিত লোকের কাছে কিনে নিতেও পারেন।”

কর্নেল ঘরের ভেতরটা চোখ বুলিয়ে দেখার পর একটা জানালার কাছে গেলেন। উঁকি মেরে কিছু দেখে সরে এলেন। মেঝের কার্পেটে শুকনো একটু রক্তের ছোপের দিকে অরিজিৎ তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। কর্নেল শুধু বললেন, “হুঁ!”

অরিজিৎ বললেন, “বডির পজিশন ফটোতে দেখলে বুঝতে পারবেন। তবে সরেজমিনে দেখানো যাক। এখানটায় বাঁপাশে কাত হয়ে—”

কর্নেল হাত তুলে বললেন, “সে তো বলেছ। কিন্তু অরিজিৎ, আমার মাথার ভেতরও বেসিনে জলপড়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছি!”

কর্নেলের মুখে কোনও কৌতুকের ছাপ দেখলাম না। অরিজিৎ হাসতে হাসতে বললেন, “হ্যাঁ, দ্যাটস্ দা পয়েন্ট।”

বললাম, “সেই দ্বিতীয় ব্যক্তি যদি সমীরবাবুর আত্মহত্যার ঘটনা জানাজানি হওয়ার জন্য বেসিন খুলে দিয়ে থাকে, তার উদ্দেশ্য কিন্তু সফল হয়নি। সমীরবাবুর মা আসার পর জানাজানি হয়েছে। এটা কি কোনও পয়েন্ট নয়?”

অরিজিৎ বললেন, “মিসেস কাপাড়িয়া কোনও কিছুতে হইচই শুরু করলে তাঁর স্বামী তাঁকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দেন। এটা আসুরিক চিকিৎসা বলতে পারেন জয়ন্তবাবু! কিন্তু এ ছাড়া ভদ্রলোকের তো আর কিছু করার নেই।”

কর্নেল আবার হুইস্কির বোতলটার কাছে গেলেন। “অরিজিৎ, সমীরবাবু নিশ্চয় স্কচ খাননি। কোথাও সোডাওয়াটারের বোতল দেখলাম না। জলের বোতলও না। ডাইনিং টেবিলেও জলের জগ নেই।” বলে তিনি দাড়ি মুঠো করে ধরলেন। আপনমনে বিড়বিড় করলেন, “র হুইস্কি? কেন? অন্তত একটা জলের গ্লাসও থাকা দরকার ছিল! নেই! কেন নেই?”

অরিজিৎ তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। বললেন, "আমাদের অফিসারদের থিওরি হল, এই গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে সমীরবাবু বেসিনে গিয়ে জল মিশিয়েছেন।"

আমি বললাম, "ফ্রিজের ভেতর জলের বোতল ঢুকিয়ে রেখে এসে স্যুইসাইড করতে পারেন। ফ্রিজ দেখা উচিত ছিল।"

অরিজিৎ একটু হেসে বললেন, "ফ্ল্যাটে কোনও ফ্রিজ নেই। ওনার প্রশান্ত স্যান্যাল কোনও কারণে ফ্রিজ কেনেননি। অনুমান করা চলে, পরে কিনবেন— যখন এসে পাকাপাকিভাবে থাকবেন। ফ্ল্যাটের ভেতরটা খুঁটিয়ে লক্ষ করুন জয়ন্তবাবু! বহু দরকারি আসবাব কিংবা গেরস্থালির সরঞ্জাম নেই।"

এতক্ষণে সেটা আমার চোখে পড়ল। কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন, "জয়ন্তকে আমি বরাবর বলি, দক্ষ রিপোর্টারের থাকা চাই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আর প্রচণ্ড কৌতূহল। সাংবাদিকের পেশা নিছক কলম-বাজির নয়, আ রিয়্যাল জর্নালিস্ট ইজ আ রিয়্যাল অবজার্ভার! জয়ন্তের ব্যাপারটা যাকে বলে ক্রিয়েটিভ জার্নালিজম। তাই না জয়ন্ত? দশ পার্সেন্ট দুধে নব্বুই পার্সেন্ট জল মেশানো। হুঁ—জল!"

আমাকে তর্কের সুযোগ না দিয়ে কর্নেল ডাইনিংয়ে ঢুকে গেলেন। আবার বললেন, "জল একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। তবে মরুভূমিতে প্রচণ্ড তৃষ্ণায় জলের মরীচিকা দেখা যায়। আমরা জলকে সেভাবেই দেখছি কি না জানি না। অরিজিৎ! ব্যাপারটা চিন্তা করে দেখ। হুইস্কির তিনভাগের একভাগ মাত্র পান করা হয়েছে। প্রতিবার হুইস্কি ঢেলে সমীরবাবু বেসিনে এসে জল মিশিয়েছেন— দ্যাটস ইওর অফিসার্স ভার্সান। কিন্তু মদ্যপানে অভ্যস্ত কোনও লোক এই ঝক্কি পোহাবে কেন? ওই দেখ, কিচেনের ভেতর দেয়াল আলমারিতে জলের জগ, দুটো গ্লাস—আরও দেখ, তিনটে ছোট-বড় দিশি হুইস্কির খালি বোতল আছে।"

কর্নেল গ্লাসদুটো নামিয়ে পরীক্ষা করলেন। তারপর মদের বোতলগুলোও খুঁটিয়ে দেখলেন। বারবার শুঁকলেন। তারপর মাথা নেড়ে সরে এলেন। বললেন, "ছিটেফোঁটা জলের চিহ্নও নেই। গত রাতে এগুলোতে জল ব্যবহার করা হলে তার চিহ্ন এখনও থাকত। অক্টোবরে আবহাওয়া শুকনো নয়। গ্রীষ্মকাল হলে বরং কথা ছিল।"

অরিজিৎ বললেন, "তা হলে অফিসার্স ভার্সানই ঠিক।"

"নাহ্।" কর্নেল মাথা নাড়লেন। "বলেছি, মদ্যপানে অভ্যস্ত লোকের পক্ষে এটা অস্বাভাবিক। বিশেষ করে বিদেশী মদ বা বিখ্যাত স্কচের ক্ষেত্রে সমীরবাবুর মতো লোকের প্রায় একটা রিচ্যুয়াল পালন করবেন তাতে সন্দেহ নেই। ঘনিষ্ঠ কাউকে তো ডাকবেনই। কলোনিয়াল হ্যাং-ওভারের জের, ডার্লিং! জনি ওয়াকার স্কচ বলে কথা!"

"কিন্তু যে স্যুইসাইড করবে, সে—"

"অরিজিৎ! তোমাদের থিওরি, মদ্যপানের পর মাতাল অবস্থায় হঠাৎ ঝোঁকের মুখে সমীরবাবু স্যুইসাইড করে ফেলেছেন?

অরিজিৎ আস্তে বললেন, "দ্যাট্‌স্ রাইট। কিন্তু আপনার থিওরি কী দাঁড়াল তা হলে?"

"ওই মদের বোতল আর গ্লাসের সঙ্গে সমীরবাবুর সম্পর্ক নেই। সিগারেট আর লাইটারের সম্পর্ক থাকতে পারে।"

"হো-য়া-ট?"

"আমার ভুল হতেই পারে। তবে দোজ টু থিংস আর পসিবলি প্ল্যান্টেড; সমীরবাবুকে গুলি করে মারার পর—"

অরিজিৎ দ্রুত বললেন, "মার্ডার?"

"আমার তাই মনে হচ্ছে।" কর্নেল এতক্ষণে চুরুট ধরালেন। "বিশেষ করে বডি বাঁপাশে কাত হয়ে পড়ার ব্যাপারটাও গুরুত্বপূর্ণ। নিজের ডানকানের ওপর নিজে গুলি চালালে সমীরবাবুর বডি ডানপাশেই পড়ার চান্স ছিল। অন্য কেউ গুলি করলে তবেই বাঁপাশে বডি কাত হয়ে পড়তে পারে। পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জে গুলির ধাক্কায় বডি বাঁপাশেই কাত হয়ে পড়বে। তাছাড়া যে গুলি করছে, সে চায় না ভিকটিমের বডি তার ওপর পড়ুক। সে রিভলভারের নল মাথায় ঠেকিয়ে গুলি করলে চাপও দেবে—এটা তার সহজাত বোধের প্রক্রিয়া।"

আমি বললাম, "আপনি বলছেন স্কচের বোতল আর গ্লাসটা খুনীই সাজিয়ে রেখেছে। কিন্তু পোস্টমর্টেমে সমীরবাবুর পেটে যদি মদ পাওয়া যায়?"

কর্নেল হাসলেন। "পাওয়া যেতেই পারে। তবে তা জনি ওয়াকার স্কচ কি না পরীক্ষার উপায় এখনও উদ্ভাবিত হয়নি জয়ন্ত! বিশুদ্ধ অ্যালকোহলের কোনও দেশ-বিদেশ নেই। যে-কোনও খাদ্য-পানীয় পাকস্থলীতে গেলেই জাত খুইয়ে বসে। তুমি মার্কিন কপি খেয়েছ না ধাপার কপি খেয়েছ, পাকস্থলী তার প্রমাণ লোপ করে। বিশেষ করে বারোঘণ্টা পরে তো কপি আর কপিই থাকে না। সমীরবাবুর পাকস্থলীর বিলিতি অ্যালকোহল বারো ঘণ্টা পরে পেডিগ্রি খোয়াতে বাধ্য। তবে আমার মতে, ওঁর পাকস্থলীতে বিলিতি অ্যালকোহল ঢোকেনি।"

কর্নেল বসার ঘরের দিকে পা বাড়ালেন। অরিজিৎ বেডরুমের জানালা বন্ধ করতে গেলেন। আমি বললাম, "তা হলে বোতল আর গ্লাসে খুনীর হাতের ছাপ থেকে গেছে।"

কর্নেল বললেন, "খুনী অত বোকা নয়। তা ছাড়া পুলিশ অফিসাররা ও দুটো জিনিস নাড়াচাড়া করেছেন। আমিও করলাম। তবে রিভলভারে সমীরবাবুর আঙুলের ছাপ যাতে পাওয়া যায়, তার ব্যবস্থা খুনী করে রেখেছে। সিওর।"

ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে দেখি এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন পাশের ফ্ল্যাটের দরজায়। অরিজিৎ তাঁকে চড়া গলায় ইংরেজিতে সম্ভাষণ করলেন, "হ্যালো মিঃ কাপাড়িয়া! আপনার মিসেস কেমন আছেন?"

মিঃ কাপাড়িয়া করুণ হাসলেন। "সারাদিন ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি।"

অরিজিৎ কর্নেলকে বললেন, "ওঁকে কিছু জিজ্ঞেস করবেন নাকি?"

কর্নেল বললেন, "উনি কানে কম শোনেন।"

অরিজিৎ হেসে ফেললেন। "তবে চোখে ভালই দেখেন।"

কর্নেল মিঃ কাপাড়িয়ার উদ্দেশে গলা চড়িয়ে বললেন, "আপনি কি মর্নিংওয়াক করেন মিঃ কাপাড়িয়া?"

কাপাড়িয়া সায়েব সন্দিগ্ধভাবে অরিজিতের দিকে তাকালেন। অরিজিৎ বললেন, "উনি সি বি আই অফিসার।"

কাপাড়িয়াসায়েব একটু হাসলেন। "তা হলে যা ভেবেছিলাম, তা ঠিক।"

কর্নেল বললেন, "কী ভেবেছিলেন?"

"এ ফ্ল্যাটে সমীরবাবুর আনাগোনা আমার কাছে সন্দেহজনক ঠেকত।"

"কেন?"

কাপাড়িয়াসায়েব একটু ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, "জানি না। তবে আমার মনে হত লোকটা ভাল না। কারও সঙ্গে কথা বলত না। কেমন যেন একটা—"

"কাল ভোরে আপনি কখন মর্নিংওয়াকে বেরিয়েছিলেন?"

"পাঁচটায়। ময়দানে ভিক্টোরিয়ার সামনে কিছুক্ষণ হাঁটাচলা করি। সাড়ে ছটায় ফিরি।"

"কাল রাত্রে কখন আপনি শুয়ে পড়েছিলেন?"

"সাড়ে নটায়। আমি রাত্রিজাগা পছন্দ করি না।"

"কাল সন্ধ্যায় বা তারপরে আপনার সঙ্গে কেউ দেখা করতে এসেছিল?"

"না, না। কেন?"

"নিছক একটা প্রশ্ন, মিঃ কাপাড়িয়া!" বলে কর্নেল সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। কাপাড়িয়াসায়েব তখনই ফ্ল্যাটে ঢুকে দরজা বন্ধ করলেন।

ফুটপাতে পৌঁছে বললাম, "দারোয়ানকে কিছু জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল, কর্নেল!"

অরিজিৎ বললেন, "অফিসাররা ওকে অনেক জেরা করেছেন। বিশেষ কিছু জানা যায়নি। এ বাড়িতে অনেক রাত পর্যন্ত লোকেরা যাতায়াত করে। চারতলায় বারোটা ফ্ল্যাট। দারোয়ানের পক্ষে মনে রাখা সম্ভব নয়, কতজন লোক যাতায়াত করেছে। তবে সে গেট বন্ধ করে রাত বারোটায়। খুলে দেয় ভোর পাঁচটায়।"

"গতরাতে সমীরবাবু একা গিয়েছিলেন কি না—"

"একা।" অরিজিৎ হাসলেন। "তবে আড়াইশো টাকা মাইনের দারোয়ানের কাছে ততবেশি দারোয়ানি আশা করা ঠিক নয়, জয়ন্তবাবু!"

কর্নেল বললেন, "জয়ন্তকে বহুবার বলেছি, হালদারমশাইয়ের অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে যাও। গোয়েন্দাগিরি বলতে কী বোঝায়, হাড়ে-হাড়ে ট্রেনিং পেয়ে যাবে।"

চটে গিয়ে বললাম, "কী আশ্চর্য! আমি গোয়েন্দাগিরি করতে যাব কোন দুঃখে? আপনি জোর করে আটকে রেখেছেন এবং টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছেন। তাই

থার্ড পার্সন হিসেবে কিছু প্রশ্ন তুলছি মাত্র। ঠিক আছে, মুখ বুজে রইলাম। কোনও সাংঘাতিক পয়েন্ট মাথায় এলেও চেপে যাব।"

কর্নেল আমার কাঁধে হাত রাখলেন। "ডার্লিং! এ বৃদ্ধের ওপর রাগ করার অর্থ হয় না। শোনো, তুমি যে সব প্রশ্ন তুলছ তা কোনও ক্রাইম ডিটেকশনের ক্ষেত্রে অবশ্যই মূল্যবান প্রশ্ন। কাজেই আমি চাই, তুমি প্রশ্ন তুলবে। কিন্তু যদি দেখ যে আমি তোমার প্রশ্নে কোনও সাড়া দিচ্ছি না, তা হলে জেনো, সেই প্রশ্নের জবাব আমার জানা। কিংবা জানা না হলেও একই প্রশ্ন আমার মনেও রয়ে গেছে।"

অরিজিৎ লাহিড়ি তাঁর জিপের দিকে পা বাড়িয়ে সকৌতুকে বললেন, "জয়ন্তবাবু! কর্নেল মাঝেমাঝে আমাকে নিয়েও একই জোক করে থাকেন। থিংক্ ইট! আমি ডিটেকটিভ ডিপার্টের লোক এবং পুলিশমহলে কিছু সুনাম আছে। অথচ আমাকেও হাস্যস্পদ করে ছাড়েন। পরে বুঝতে পারি হি ইজ কারেক্ট। আমিই ভুল করেছি।"

রাস্তায় প্রচণ্ড জ্যাম। কর্নেলের অ্যাপার্টমেন্টে যখন ফিরলাম, তখন সাতটা বেজে গেছে। ষষ্ঠী জানাল, একটু আগে রায়সাহেব এসেছিলেন। বলে গেছেন, "ফোন করব।" কর্নেল চোখ কটমটিয়ে হাঁকলেন। "কফি!" ষষ্ঠী বেজার মুখে চলে গেল।

অরিজিৎ বললেন, "কফি খেয়েই সোজা বাড়ি ফিরব। আমার মাথা ভোঁ ভোঁ করছে।"

কর্নেল ইজিচেয়ারে বসে দাড়িতে হাত বুলোচ্ছিলেন। চোখ বন্ধ। বললেন, "তোমার মাথার ভেতর বেসিনটা আশা করি বন্ধ হয়েছে!"

"হয়েছে। তবে—"

"তবে তুমি কফি খাবার জন্য আমার ঘরে আসোনি অরিজিৎ! তোমার মনে একটা প্রশ্ন উঠেছে। কেন খুনী চেয়েছিল শিগগির সমীরবাবুর স্যুইসাইডের ঘটনা জানাজানি হোক? তাই না?

"আপনি নাকি অন্তর্যামী। অন্তত এ ধরনের একটা প্রবাদ চালু আছে পুলিশ মহলে। আই এগ্রি।"

আমি না বলে থাকতে পারলাম না, "আজ ভোরে যে ওই ফ্ল্যাটে ঢুকেছিল—মানে, যাকে দ্বিতীয় ব্যক্তি বলা হচ্ছে, সে-ই যে খুনী তার প্রমাণ কী?"

কর্নেল চোখ বন্ধ রেখেই দাড়ি নেড়ে বললেন, "রাইট জয়ন্ত! সঙ্গত প্রশ্ন। হুঁ, প্রমাণ আমার হাতে নেই। কিন্তু একটা থিওরি আছে। আর সেই থিওরি ধরে এগোলে একটা ব্যাখ্যা মেলে। ধরা যাক, খুনীর নাম এক্স। এক্স গতরাতে ওই ফ্ল্যাটে যায়। সে সমীরবাবুর চেনা লোক এবং সে এ-ও জানে, পাশের ফ্ল্যাটের মিসেস কাপাড়িয়া মানসিক রোগী। ওঁর স্বামী কানে কম শোনেন, সকাল-সকাল শুয়ে পড়েন এবং সকাল-সকাল উঠে মর্নিংওয়াকে যান—এ সমস্ত কিছুই সে জানে। বাড়িটা 'এল' প্যাটার্ন। দোতলার তিন নম্বর ফ্ল্যাট সিঁড়ির অন্যপাশে। চার এবং পাঁচ পাশাপাশি। চারে থাকেন কাপাড়িয়ারা। পাঁচে গতরাতে সমীর রুদ্র ছিলেন।

এক্স সমীরবাবুকে গুলি করে মেরে ফ্ল্যাটের চাবি নিয়ে চলে যায়। কেন চাবি নিয়ে যায় এর জবাব হতে পারে খুনটা আত্মহত্যা সাব্যস্ত করার একটা উপায় হঠাৎ তার মাথায় এসেছিল। হ্যাঁ, মদের বোতল আর গ্লাস টেবিলে রাখার কথাই সে ভেবেছিল। গ্লাস কিচেনে পাওয়া যাবে। কিন্তু অতরাতে মদ খুঁজে পাওয়ার সমস্যা আছে। সব দোকান বন্ধ হয়ে গেছে তখন। যদি বা পাওয়া যায়, যোগাড় করে আনতে গেটে তালা পড়ে যাবে। কাজেই তাকে নিজের স্কচের বোতল নিয়ে ভোরবেলা ওই ফ্ল্যাটে যেতে হয়েছিল।"

অরিজিৎ বললেন, "এবার আমার প্রশ্নটা!"

"এক্স চেয়েছিল ঘটনাটা শিগগির জানাজানি হোক। কেন? এই তো তোমার প্রশ্ন?"

"হ্যাঁ।"

"কসবায় সমীরবাবুর ফ্ল্যাটে তাঁর মা ছাড়া আর কে থাকেন?"

"আর কেউ না।"

কর্নেল চোখ তুলে সোজা হয়ে বসলেন। "এক্স চেয়েছিল, সমীরবাবুর মা খবর পেয়েই ছুটে আসবেন এবং সে সেই সুযোগে কসবার ফ্ল্যাটে গিয়ে ঢুকতে পারবে। ধরা যাক, কোনও গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট সমীরবাবুর কাছে আছে।"

বললাম, "আজ দুপুরেও সেই সুযোগ তার ছিল। সমীরবাবুর মা—"

আমাকে থামিয়ে কর্নেল বললেন, "জনি ওয়াকার স্কচ বলে দিচ্ছে এক্স ওটা এয়ারপোর্টে কিনেছিল বিদেশ থেকে ফেরার সময়। আজ সকালের দিকে তার ফ্লাইট ছিল সম্ভবত। অরিজিৎ! এয়ারপোর্টে তোমরা খোঁজ নাও, কোনও বিদেশযাত্রীর মর্নিং ফ্লাইটের টিকিট বাতিল হয়েছে কি না। তার মানে যে নামে টিকিট ছিল, সেই নামে কোনও লোক প্লেনে চাপেনি এবং ওয়েটিং লিস্টের কাউকে সেই আসনটা দেওয়া হয়েছে কি না। একটা টাইমলিমিট ঠিক করা যাক। অন্তত বেলা দশটা পর্যন্ত যে-সব প্লেন এয়ারপোর্ট ছেড়ে গেছে, সেগুলোর ক্ষেত্রেই দেখা যেতে পারে।"

ষষ্ঠী কফি আনল। অরিজিৎ টেলিফোন তুলে ডায়াল করার পর চাপা গলায় কার সঙ্গে কথা বললেন। তারপর ফোন রেখে কফির পেয়ালা তুলে নিলেন। চুমুক দিয়ে বললেন, "খোঁজ নিতে একটু সময় লাগবে। যাই হোক, সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে জানিয়ে দেব।"

বললাম, "প্লেনের বদলে এক্স যদি ট্রেনে যায়, তা হলে কি এ থিওরি টিকবে না?"

কর্নেল হাসলেন। "জনি ওয়াকার, ডার্লিং! কাজেই আমার ফার্স্ট প্রেফারেন্স প্লেন। তারপর ট্রেনের কথা ভাবা যাবে।"

"মোটরগাড়িকেই বা বাদ দেবেন কেন?"

কর্নেল ও অরিজিৎ একইসঙ্গে খুব হাসলেন। গম্ভীর হয়ে ভাবছিলাম, আমার প্রশ্নে কোনও বোকামি তো দেখছি না। তা হলে ওঁদের হাসির কারণ কী? কর্নেলের চোখে চোখ পড়তে বললেন, "মিঃ এক্সের মোটরগাড়িতে কোথায় যাওয়ার কথা ভাবছ তুমি? মোল্লার দৌড় মসজিদ। এয়ারপোর্ট অব্দি যেতে পারে। আর ট্রেনেই বা কোথায় যাবে সে? মিঃ এক্স যদি বোকা হয়, ট্রেনে—ধরো দিল্লি বা বোম্বাই যাওয়ার ঝুঁকি নেবে। আমার ধারণা সে অত বোকা নয়। বরং সে বিকেলে বা সন্ধ্যার একটা ফ্লাইটের চেষ্টা করবে।"

"তা হলে এয়ারপোর্টে খোঁজ নেওয়া উচিত, বিকেল বা সন্ধ্যার ফ্লাইটে সকালের ফ্লাইটের সেই যাত্রী গেছে কি না।"

অরিজিৎ বললেন, "তা গিয়ে থাকলে আমাদের পস্তাতে হবে অবশ্য।"

কর্নেল বললেন, "পস্তানোর আগে জানা দরকার সত্যি তেমন কিছু ঘটেছে কি না। এক সকালের দিকে কেউ ফ্লাইট মিস বা ক্যানসেল করেছে কি না। দুই সমীরবাবুর কসবার ফ্ল্যাটে কিছু চুরি গেছে কি না।"

"চুরি গেলে আমরা খবর পেতাম।"

"অরিজিৎ! আবার বলছি, আমরা অনেকসময় জানি না যে, আমরা কী জানি। সমীরবাবুর মা না-ও জানতে পারেন, তাঁর ছেলের কিছু হারিয়েছে কি না।"

অরিজিৎ এক চুমুকে কফি শেষ করে বললেন, "সমীরবাবুর মায়ের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলে দেখব নাকি? অবশ্য এ সময় ওঁর মার মানসিক অবস্থা—যাই হোক, চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।"

পকেট থেকে খুদে নোটবই বের করে নাম্বার দেখে ডায়াল করলেন অরিজিৎ। কিছুক্ষণ চেষ্টা করেও লাইন পেলেন না। অন্য একটা নাম্বারে ডায়াল করে চাপা স্বরে কিছু বললেন। তারপর ফোন রেখে দিলেন। "এক্সচেঞ্জ থেকে খোঁজ নিতে বললাম। একচেঞ্জ যোগাযোগ করিয়ে দেবে। আমাদের পুলিশের কিছু বাড়তি সুবিধে আছে। জানেন তো জয়ন্তবাবু?" অরিজিৎ আমাকে সিগারেট দিয়ে বললেন। সিগারেটে কয়েকটা টান দিয়েছি, ফোন বাজল। অরিজিৎ ফোন তুলে সাড়া দিলেন, "হ্যাঁ ডিসি ডিডি এ লাহিড়ি বলছি।....কী? ....কিন্তু শুধু ওই লাইনটাই আই মিন, সমীর রুদ্রের.... হ্যাঁ, হ্যাঁ, দ্যাটস দা নাম্বার।.... সামথিং রং?... ওক্কে, ওক্কে! থ্যাংকস।" অরিজিৎ ফোন রেখে গম্ভীর মুখে বললেন, "লাইনটা ডেড। অথচ আজ বেলা এগারোটায় সমীরবাবুর মা কোম্পানির অফিসে ফোন করেছিলেন। কর্নেল! আমি উঠি। ব্যাপারটা দেখা দরকার। আপনাকে আর কষ্ট দেব না। আমি নিজেই গিয়ে দেখছি। সমীরবাবুর মায়ের সঙ্গে কথাও বলছি।"

কর্নেল বললেন, "উইশ য়ু গুড লাক!"

অরিজিৎ লাহিড়ি চলে যাওয়ার পর সিগারেট অ্যাশট্রেতে গুঁজে বললাম, "হালদারমশাইয়ের ভাষায় বলা চলে প্রচুর রহস্য। বাপ্স! এবার আমার মাথা ঝিমঝিম করছে। উঠে পড়া যাক।"

"এ সময় হালদারমশাইয়ের কিছু সাহায্য দরকার। দেখ তো জয়ন্ত, ওঁকে বাড়িতে পাও নাকি।"

টেলিফোনের দিকে হাত বাড়িয়েছি, রিং হল। ফোন তুলে সাড়া দিলাম। কোনও মহিলা কর্নেল নীলাদ্রি সরকারকে চাইছেন। বললাম, "কে বলছেন? নাম বলুন প্লিজ!"

"মিসেস চিত্রা মিত্র। লেকটাউন থেকে বলছি। আপনি কি কর্নেল—"

"না। ধরুন, দিচ্ছি।"

কর্নেল ফোন নিয়ে বললেন, "বলুন!.... হ্যাঁ। বলছি।.... দেখা করবেন? কী ব্যাপার?.... আগামীকাল সকালে আটটার পর আসুন। সাড়ে আটটার মধ্যে কিন্তু।.... ঠিক আছে।"

কর্নেল ফোন রেখে নিভে যাওয়া চুরুট ধরালেন। বললাম, "আপনাকে বিরক্ত মনে হচ্ছে। মহিলাদের প্রতি আপনার প্রচুর সহানুভূতি দেখতে আমি অভ্যস্ত।"

"বিজ্ঞান প্রচারসমিতির প্রদীপ মিত্রের স্ত্রী।"

"দাম্পত্যকলহের মীমাংসা করে দিতে বলছেন না নিশ্চয়!"

"কতকটা তা-ই।"

"সে কী! আপনি ওঁকে তো আসতে বললেন!"

"না বললেও চিত্রা মিত্র আসতেন।" কর্নেল একটু হাসলেন। "ওঁর স্বামী কাঁটালিয়াঘাটের অবধূতের চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট করেছেন। সেই নিয়ে ঝামেলা বেধেছে দুজনে। চিত্রা দেবীর কী একটা গোপন বক্তব্য আছে। আমাকে শুনতে হবে।" কর্নেল ফোন তুলে ডায়াল করলেন। একটু পরে বললেন, "মিঃ কে কে হালদার আছেন?... নেই?... কোথায় গেছেন?... ও! আচ্ছা।"

বললাম, "কোথায় গেছেন হালদারমশাই? কাঁটালিঘাটে নাকি?"

কর্নেল শুধু বললেন, "হুঁ।"

বৈশম্পায়ন রায়

কর্নেল সরকার আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন অলৌকিক শক্তিতে আমি বিশ্বাস করি কি না। করি। খুবই বিশ্বাস করি। সেই বিশ্বাস সমীরের মৃত্যুর পর আরও দৃঢ় হল। কোনও এক অলৌকিক শক্তি অদৃশ্যভাবে থেকে মানুষকে চালাচ্ছে। আমিও তার ক্রীড়নক ছাড়া কিছু নই।

শুধু সমস্যা হল, অনি সেই যে বলেছিল, আমার নাকি বিবেক আছে, সেই বিবেক আমাকে প্রশ্ন করে মাঝেমাঝে। খচ খচ করে কাঁটার মতো বেঁধে প্রশ্নগুলো।

সমীর মানসিক অবসাদে ভুগছিল। কোম্পানির টাকা তছরুপের অভিযোগ ছিল ওর নামে। ওর বউ ওকে ছেড়ে কার সঙ্গে ভেগে গিয়েছিল। এমন অবস্থায় মানুষ আত্মহত্যা করে বসতেই পারে।

কিন্তু আমি ওকে বাঁচিয়ে রাখতে পারতাম। আমার অনেক টাকা আছে। সেই টাকা ওকে দিতে পারতাম। কোম্পানির অভিযোগ থেকে সে নিষ্কৃতি পেত। আমার অফিসে ওকে কাজ দিতে পারতাম। সে বিয়ে করতে চাইলে ঘটকালিও করতে পিছপা ছিলাম না।

এখন মুনলাইট বারে সামনে হুইস্কির গ্লাস রেখে এইসব কথা আমার মনে আসছে। এসব কথা বিবেকের কথা।

অথচ কেন যে সেদিন ওকে এড়িয়ে গেলাম!

অলৌকিক শক্তির কি ইচ্ছা ছিল, আমি ওকে এড়িয়ে যাই? আমি ওর কথা জেনে ওকে সাহায্য না করি? ওর সঙ্গে পুরনো বন্ধুত্বে ফিরে না যাই?

কেন ওকে দেখামাত্র প্রচণ্ড ঘৃণা আমাকে খেপিয়ে দিয়েছিল সেদিন? পঁচিশ বছর খুব কম সময় নয়। তবু আমার মধ্যে ঘৃণা উঠে এসেছিল।

অনির কথা ভেবেই কি ঘৃণা? তা হলে বলতেই হবে, অনি এক সর্বনাশা মেয়ে। স্মৃতির ভেতর থেকে সে আমাকে প্ররোচিত করেছে।

নাকি অনির ছদ্মবেশে সেই অলৌকিক শক্তিই আমাকে দিয়ে নিজের কাজ করিয়ে নিয়েছে। সেই অদৃশ্য শক্তিই সমীরকে মেরে ফেলেছে। সমীরের হাতে সে-ই রিভলভার তুলে দিয়েছিল গতরাত্রে। কেউ ওকে বাঁচাতে পারত না।

হাসপাতালের মর্গে এখনও হয়তো সমীরের অফিসের কলিগ্রা, ওর পাড়ার ছেলেরা আর ওর আত্মীয়স্বজন বডি ফেরতের জন্য অপেক্ষা করছে। সমীর নিছক বডি হয়ে গেছে, ভাবতেই বুকটা কেঁপে উঠছে। আমার নিজেকেও আর বিশ্বাস হচ্ছে না। কোন অমোঘ নির্দেশে আমিও নিছক বডি হয়ে যেতে পারি। আমার শরীর নিঃসাড় হয়ে গেল কথাটা ভাবতে গিয়ে।

চাংকো কাছে এসে আস্তে জিজ্ঞেস করল, "এনিথিং রং স্যার?"

বললাম, "থ্যাংকস্ চাংকো। আই অ্যাম অলরাইট!"

চাংকো আমার দিকে নজর রেখেছে কেন? একটু অস্বস্তি হল। গেলাস শেষ করে ঘড়ি দেখলাম। সাড়ে সাতটা বাজে। এতক্ষণ কর্নেল সরকার ফিরেছেন হয়তো। ওঁর সঙ্গে দেখা করা খুবই দরকার। এমন একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেল! ওঁর সঙ্গে আলোচনা করা উচিত।

বেরিয়ে গিয়ে একটু ভেবে নিলাম। উত্তেজনা থিতিয়ে যাক। আমার মাথার ভেতরটা কেমন হয়ে আছে। বাড়ি ফিরে কর্নেলসায়েবকে রিং করে তারপর যদি দরকার হয়, যাব। ওঁর বাড়ির লোকটাকে তো বলেই এসেছি রিং করব।

কালো অ্যাম্বাসাডার সাবধানে গড়াচ্ছিল। কসবায় সমীরের মায়ের কাছে আবার যেতে ইচ্ছে করছিল। ইচ্ছেটা দমন করলাম। ওই বোবা চাহনি আমাকে বিব্রত করবে। আমার আশ্চর্য লেগেছে, সমীর আমাকে দেখামাত্র চিনেছিল। তার মা চিনতে পারেননি। ওঁকে যখন প্রশান্ত সান্যালের ফ্ল্যাট থেকে হাসপাতালের মর্গে

নিয়ে গেলাম, তখনও ওঁর মনে পড়ছিল না আমি কে। সেখান থেকে কসবায় নিয়ে গেলাম। তারপর শুধু একবার জড়ানো গলায় বললেন, "ও! তুমি বাসু?" কিন্তু কোনও কথা জিজ্ঞেস করলেন না আমার বাবা-মা সম্পর্কেও। হয়তো জিজ্ঞেস করার সময় এটা নয়।

শুধু মাঝেমাঝে বোবার চাহনিতে আমাকে দেখছিলেন। সত্তর বছর বয়সী বৃদ্ধার পুত্রশোকে কাঁদতেও কষ্ট হয়। মনের শোকের হাহাকার জরাগ্রস্ত শরীর দিয়ে প্রকাশ করা যায় না। এইটে দেখেই আমি বিব্রত বোধ করেছি।

লেকটাউন পৌঁছুতে একঘণ্টার বেশি সময় লাগল। গাড়ি গ্যারেজে ঢুকিয়ে তিনতলার ফ্ল্যাটে উঠতে গিয়ে টের পেলাম হাঁপাচ্ছি। ঘামছি। জিভ শুকনো।

জামাকাপড় বদলে বাথরুমে গেলাম। স্নান করব ভাবলাম। করলাম না। কাজের ছেলেটি দেশে গেছে। তবে আমি নিজের কাজ নিজে করতে ভালবাসি। দেশ থেকে ফিরলে ওকে টাকাকড়ি দিয়ে বিদায় দেব! ছেলেটিও চাংকোর মতো আমার দিকে সবসময় যেন বড্ড বেশি নজর রাখে।

এক কাপ কফির লিকার নিয়ে ব্যালকনিতে বসলাম। তাহলে সমীর রুদ্র মরে গেল? আবার মাথার ভেতর ঠাণ্ডা হিম টিল গড়িয়ে গেল।

সেই প্রশ্নটাও আবার ফিরে এল। সমীরের মৃত্যুটা যদি আত্মহত্যা না হয়ে হত্যা হয়?

হত্যা কেন হবে?

যদি হয়?

হত্যার একটা মোটিভ থাকে। ওকে হত্যার মোটিভ কী থাকতে পারে?

ধরা যাক, কউকে ব্ল্যাকমেল করত। সে ওর মুখ বুজিয়ে দিয়েছে চিরকালের মতো। ধরা যাক না, ওয়াশিংটনবাসী প্রশান্ত সান্যাল নামে একটা লোককে সে ব্ল্যাকমেল করত বলে সেই প্রশান্ত সান্যাল তাকে ফ্ল্যাটটা ব্যবহার করতে দিয়েছিল। এও ধরা যেতে পারে, সেই ফ্ল্যাটে সমীর মেয়ে নিয়ে স্ফূর্তি করত। তারপর ধরা যাক, অফিসের টাকা তছরুপ করার পর সমীর দায়ে পড়ে প্রশান্ত সান্যালের কাছে অনেক বেশি টাকার দাবি করেছিল। শেষে প্রশান্ত স্যান্যাল এসে তাকে গুলি করে মেরে আজই কলকাতা ছেড়ে চলে গেছে। যাবার সময় ব্ল্যাকমেল-সংক্রান্ত ডকুমেন্ট উদ্ধার করে নিয়ে গেছে। এটা তো হতেই পারে।

তা পারে। কিন্তু সেই ডকুমেন্ট ওই ফ্ল্যাটে রাখার পাত্র সমীর নয়।

কসবায় নিজের ফ্ল্যাটে রেখেছিল।

তা হলে প্রশান্ত সান্যালকে সেখানে যেতে হয়েছিল।

গিয়েছিল।

কিন্তু কখন? তা ছাড়া কসবার ফ্ল্যাটে সমীরের মা ছিলেন।

এগারোটা অব্দি ছিলেন। তারপর চলে আসেন শেক্সপিয়ার সরণির ফ্ল্যাটে

pathagar.net

ছেলের খোঁজে। এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে প্রশান্ত কসবার ফ্ল্যাটে ঢোকার সুযোগ পেতে পারে।

সব ঠিক আছে বাসু, যদি শেষমেশ ঘটনাটা স্যুইসাইড না হয়ে হোমিসাইড হয়।

হ্যাঁ, যদি হোমিসাইড অর্থাৎ হত্যাকাণ্ড হয়।....

কফি শেষ করে ঘরে ঢুকলাম টেলিফোন করতে। কর্নেল সরকারকে করব, নাকি অরিজিৎকে? প্রথমে কর্নেল সরকারকেই করা যাক। দেখি, উনি কী ভাবছেন।

ডোর-বেল বাজল। চমকে উঠলাম। আই হোলে চোখ রেখে দেখলাম চিত্রা দাঁড়িয়ে আছে। দরজা খুলে বললাম, "কী ব্যাপার চিত্রা?" এমন অসময়ে।"

চিত্রা বলল, "আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে, বাসুদা!"

ব্যালকনিতে বসলাম দুজনে। চিত্রা চাপা গলায় বলল, "আজকের সত্যসেবক পত্রিকা দেখেছেন বাসুদা?"

"না তো! কেন?"

"আপনার গুরুদেব প্রদীপকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। প্রদীপ জেদ ধরেছে, আগামীকালই ওঁর আশ্রমে যাবে। আপনি ওকে বুঝিয়ে বলুন বাসুদা!"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও হেসে ফেললাম। "যে অবিশ্বাসী, তাকে কিছু বুঝিয়ে বলা যায় না চিত্রা!"

চিত্রা একটু চুপ করে থেকে বলল, "মানুষ সাধনার বলে অলৌকিক শক্তির অধিকারী হতে পারে, এটা আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু প্রদীপ বিশ্বাস করে না। তবে সেই অবিশ্বাস থেকে প্রদীপ আপনার গুরুদেবের সঙ্গে লড়তে যাচ্ছে না।"

একটু অবাক হয়ে বললাম, "তার মানে?"

চিত্রা ফিসফিস করে বলল, "প্রদীপ নাকি আপনার গুরুদেবকে চিনতে পেরেছে। ওঁর পূর্বাশ্রম সম্পর্কে অনেক ইনফরমেশন যোগাড় করেছে।"

"কী ইনফরমেশন?"

"আমাকে তো বলছে না খুলে। শুধু বলছে, এবার ঢিঢি পড়ে যাবে দেশে।"

লকেটটা বের করে ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। একটু পরে বললাম, "ইনি আমার সে-অর্থে গুরুদেব নন, চিত্রা! আমি এঁর মুখোমুখি কখনও হইনি। এক বন্ধু আমাকে এটা ধারণ করতে দিয়েছিল। ধারণ করে ফল পেয়েছি। এজন্যই এটা আমি সবসময় সঙ্গে রাখি।"

চিত্রা হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠল। "প্লিজ বাসুদা! ওকে আপনি যেভাবে পারুন, আটকান। আমার মন বলছে, ওর কোনও ক্ষতি হবে।"

"প্রদীপ আছে বাড়িতে?"

"না। ওর ক্লাবে আছে। দলবল নিয়ে যাবে।"

"ওরা কখন যাবে, জানো?"

"দুপুরের দিকে বেরুবে। রাত্রে সেখানে থাকবে।"

একটু ভেবে নিয়ে বললাম, "প্রদীপ আমার কথা শুনবে বলে মনে হয় না, চিত্রা! ওর কাছে কী ইনফরমেশন আছে, তা-ও আমাকে বলবে না। বরং তুমি কোনও প্রাইভেট ডিটেকটিভের সাহায্য নাও। তিনি প্রদীপের সঙ্গে কাল সকালের মধ্যেই যোগাযোগ করে এটা সেট্‌ল্ করে ফেলতে পারবেন। কিংবা ধরো, প্রদীপের সেফটির ব্যবস্থাও করতে পারবেন।"

চিত্রা হতাশভঙ্গিতে বলল, "কিন্তু কোনও প্রাইভেট ডিটেকটিভকে আমি তো চিনি না!"

একটু দ্বিধার পর বললাম, "কর্নেল নীলাদ্রি সরকার নামে একজন আছেন। তাঁর ফোন নম্বর দিচ্ছি। কিন্তু দুটো শর্ত। আমার সঙ্গে তোমার পরিচয়ের কথা বলবে না এবং ওঁকে ভুলেও ডিটেকটিভ বলবে না। শুধু বলবে, আপনার পরামর্শ চাই। যদি পাত্তা না দেন, একটা ট্রিকস্ কি তোমার মাথায় আসবে না?"

"আসবে। বলব, গোপন কিছু কথা-টথা আছে।"

চিত্রা হাসছিল। আমি একটুও হাসছিলাম না। লকেটের ছবিটা সম্পর্কে আজ সকালে কর্নেল সরকার আমাকে সচেতন করেছেন। সারাদিন ধরে বারবার দেখেছি। এঁকে আমার চেনার দরকার ছিল না এতদিন। সমীরের মৃত্যুর পর দরকার হচ্ছে। আসলে অনির স্মৃতি আমার অস্তিত্বে ঝড় হয়ে ফিরেছে। অনির সঙ্গে এই ছবিটার বা অলৌকিক শক্তিধর মানুষটার একটা গোপন যোগসূত্র আমাকে বারবার তাতিয়ে দিচ্ছে। পুরনো স্মৃতি ঝাঁপিয়ে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলছে আমাকে।

চিত্রা ফোন নম্বর পেয়ে আমার টেলিফোনের সামনে বসে পড়ল। ব্যালকনিতে ফিরে গিয়ে বসলাম। চিত্রা ফোন করে এসে উজ্জ্বল মুখে বলল, "আগামীকাল মর্নিংয়ে আটটা থেকে সাড়ে আটটায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট। থ্যাংকস বাসুদা। চলি।"

চিত্রা চলে গেলে আমি লকেটটা আবার মাথায় ঠেকালাম। প্রভু, অপরাধ ক্ষমা কোরো। আমি শুধু একটা কথাই জানতে চাই। আর কিছু না। অনির আত্মার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কী? তুমি কি তাকেই লড়িয়ে দিয়েছ আমার সঙ্গে? বেশ কিছুক্ষণ পরে টেলিফোনের কাছে গেলাম। কর্নেল সরকারকে এবার রিং করা উচিত। আমার হাত কাঁপছিল। সমীরের আত্মা যেন এসে আমার সামনে দাঁড়িয়েছে। উজ্জ্বল আলোয় ভরা ঘরে আতঙ্ক।

এনগেজড টোন। কয়েকবার চেষ্টার পর লাইন পেলাম। "কর্নেল সরকার! আমি ভি রায় বলছি।"

"বলুন মিঃ রায়!"

"সমীরের শোচনীয় মৃত্যুর পর—"

"দ্যাটস আ মার্ডার, মিঃ রায়!"

"মার্ডার? বাট হাউ—"

"সমীরবাবু লেফ্‌ট্‌হ্যান্ডার ছিলেন। ন্যাটা। ওঁর অফিসের কলিগদের কাছে কিছুক্ষণ আগে পুলিশ জানতে পেরেছে। কাজেই মার্ডার। মার্ডারার—"

"কর্নেল সরকার! মার্ডারার প্রশান্ত সান্যাল নয় তো?"

"কেন প্রশান্ত সান্যাল?"

"নিছক সন্দেহ। তার ফ্ল্যাটে থাকতে দিয়েছিল সমীরকে। ব্ল্যাকমেল হতে পারে।"

"কিন্তু সান্যাল তো ওয়াশিংটনে।"

"কর্নেল সরকার! এয়ারপোর্টে খোঁজ নেওয়া উচিত। ওই নামের কোনও যাত্রী—"

"ইউ আর ইনটেলিজেন্ট্ মিঃ রায়। আজ ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের লন্ডন-আবুধাবি-কলকাতা-হংকং মর্নিং ফ্লাইটে হংকংয়ের একজন যাত্রীর টিকিট ছিল কলকাতা থেকে পি সান্যাল নাম। কিন্তু সেই যাত্রী—"

"ফ্লাইট মিস করেছে?"

"এগেন—ইউ আর ভেরি ইনটেলিজেন্ট মিঃ রায়! পি সান্যাল সকালের ফ্লাইট মিস করেছে। ওদিকে সমীরবাবুর কসবার ফ্ল্যাট থেকে একটা হ্যান্ডব্যাগ চুরি গেছে।"

"দেন ইট ওয়াজ আ কেস অব ব্ল্যাকমেলিং!"

"ইট অ্যাপিয়ারস্, সো।"

"কর্নেল সরকার! হোয়াই ইট অ্যাপিয়ারস্ সো?"

"আপনি সম্ভব হলে অফিস যাওয়ার পথে একবার আসবেন। কথা হবে। ছাড়ছি।"

ফোন রেখে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। তা হলে আমার থিওরির সঙ্গে কর্নেল সরকারের থিওরি মিলে গেছে! আমি যা-যা ভেবেছি, তা-ই উনিও ভেবেছেন। নিজের বুদ্ধিসুদ্ধি সম্পর্কে আমার কিছু আস্থা ছিল। সেই আস্থা বেড়ে গেল। শুধু ওই কথাটা—'ইট অ্যাপিয়ারস্ সো' একটু কানে বাজল। উনি বলতে চাইছেন, 'আপাতদৃষ্টে তাই মনে হচ্ছে।' কেন আপাতদৃষ্টে?

কিন্তু সমীর যে ন্যাটা ছিল, এ কথাটা আমার মনে ছিল না। আসলে পঁচিশটা বছর কম সময় নয়। কর্নেল সরকার কথাটা বলামাত্র মনে পড়ে গেছে, সমীর ন্যাটা ছিল। বাঁহাতে লিখত। বাঁহাতে খেত। সেই নিয়ে অনি ওকে খুব ঠাট্টা করত। বলত, "তুমি শ্বশুরবাড়ি গিয়ে বাঁহাতে খেলে কিন্তু কেলেঙ্কারি! ডানহাতে খাওয়া প্র্যাকটিস করে নাও।"

সমীর আমার সামনেই বলত, "অনামিকা সেন নামে কাউকে বিয়ে করলে কেলেঙ্কারি হবে না।"

অনি বলত, "অনামিকা সেন কোনও ন্যাটার বউ হবে না।"

অনি ছিল সবসময় স্মার্ট, তেজী, দুঃসাহসী আর অ্যাডভেঞ্চারার টাইপ মেয়ে। দীঘায় আমার সঙ্গে আসলে একটা অ্যাডভেঞ্চার করতেই গিয়েছিল। নিজের সাহসের পরীক্ষা দিতে আর আত্মরক্ষায় নিজের পটুতা বুঝে নিতে। নাহ্, সমুদ্রদর্শন একটা ছুতো মাত্র।

আবার কথাটা ধাক্কা দিল আমাকে, 'সমীর ন্যাটা ছিল।' ন্যাটা লোক বাঁহাতে রিভলভার ধরে নিজের মাথার ডানদিকে গুলি চালাতে পারে না। একটু মদ্যপান করতে পারলে ভাল হত। কিন্তু বেশি খেয়ে ফেলার ভয়ে ঘরে মদ রাখি না। ঘড়ি দেখলাম। মদের দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। কোনও বারে যাব কি?

আর বেরুতে ইচ্ছে করছে না। শরীরের ওজন ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। ব্যালকনির আলোটা নিভিয়ে দিয়ে বসে রইলাম। এতক্ষণে মনে হল, সেদিন মুনলাইট বারে সমীরের সঙ্গে দেখা হয়ে না গেলে আমার জীবন যেমন চলছিল, তেমনই চলত।

জড়িয়ে যাওয়া একটা সুতোর খেই হয়ে সমীর আমার সামনে এসেছিল। খেই ধরে টানতে গিয়েই অনিবার্যভাবে অনি এসে পড়েছিল। অমনি আমি বুদ্ধিসুদ্ধি হারিয়ে ফেললাম। কাগজে বিজ্ঞাপন দিলাম। তারপর যা-যা করেছি, অদ্ভুত দুঃস্বপ্নের ঘোরে করে ফেলি।

নাহ্। এসব করতে যাওয়া ঠিক হয়নি। বেশ তো ছিলাম।....

pathagar.net

জয়ন্ত চৌধুরি

খুনজখম আর রহস্যের মারপ্যাঁচে মাথার ভেতরটা যখন ঘুলিয়ে উঠেছে, সেই সময় প্রাইভেট ডিটেকটিভ হালদারমশাইয়ের কাঁটালিয়াঘাট যাত্রার খবর চমৎকার রিলিফ। হালদারমশাই মানুষটা পুলিশজীবনে কেমন ছিলেন বিশেষ জানি না। কিন্তু বেসরকারি গোয়েন্দা জীবনে অদ্ভুত ধরনের খেয়ালি। খেয়ালের চোটে বিপদে-আপদে বহুবার ওঁকে সাংঘাতিক ভুগতে দেখেছি। অথচ পরে সেই ভোগান্তি চমৎকার ভুলে যান।

রাতে শুয়ে পড়ার সময় হঠাৎ মনে হল, এক রহস্যের পাশাপাশি আরেক রহস্য উঁকি মারছে না তো? বিজ্ঞান প্রচার সমিতির প্রদীপ মিত্রের স্ত্রী সকালে কর্নেলকে কোনও গোপন কথা বলতে আসছেন। তার মানে, কর্নেলের ডাইনে-বাঁয়ে দুই রহস্য এসে গেছে।

অবশ্য বহুবার কর্নেলকে ডাইনে-বাঁয়ে কেন, সামনে-পেছনেও রহস্যের জটিল বান্ডিলে ফাঁদে পড়া প্রাণীর মতো আঁকুপাকু করতে দেখেছি। এই বুড়োবয়সে পারেনও বটে।

রাত দশটায় চোখের পাতা ঘুমে টেনে ধরেছে, হঠাৎ বিরক্তিকর ফোনের শব্দ। পত্রিকা অফিস থেকে কোনও জরুরি তলব ভেবে ফোন তুলতেই বললাম, "রং নাম্বার।"

"রাইট নাম্বার ডার্লিং! ঘুমের ব্যাঘাত ঘটানোর জন্য দুঃখিত।"

"সুখী করার মতো সুসমাচার আছে নিশ্চয়? হালদারমশাই আশা করি অবধূত-রহস্য ফাঁস করে ফিরে এসেছেন।"

"না জয়ন্ত! সমীরবাবুর মৃত্যু সম্পর্কে আমার থিওরিতে তোমার অবিশ্বাস ঘোচাতে এই খবরটা দেওয়ার ইচ্ছে হল। আমার চোখ এড়ায়নি জয়ন্ত! তোমার মুখে অবিশ্বাস শুধু নয়, বাঁকা হাসিও দেখেছি। বিশেষ করে তুমি—"

"ওঃ হো! ব্যাপারটা বলবেন তো?"

"সমীরবাবুকে সত্যিই খুন করা হয়েছে। তার শক্ত প্রমাণ একটু আগে পাওয়া গেছে।"

"শক্ত প্রমাণ? ইটের না পাথরের?"

"সমীরবাবু ন্যাটা—লেফ্‌টহ্যান্ডার ছিলেন। কোনও ন্যাটালোক নিজের মাথার ডানদিকে গুলি করে আত্মহত্যা করতে পারে না।"

"বস্‌! আপনার কণ্ঠস্বরে উত্তেজনা টের পাচ্ছি।"

"ও কিছু না। তুমি শুনলে অবাক হবে, কসবার ফ্ল্যাট থেকে সমীরবাবুর একটা হ্যান্ডব্যাগ চুরি গেছে—মানে, পাওয়া যাচ্ছে না।"

"আপনার থিওরি সেন্ট পারসেন্ট কারেক্ট প্রমাণিত হল। আনন্দে ঘুমিয়ে পড়ুন।"

"আনন্দ কোথায়? আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, কেউ আমাকে লাল হেরিং মাছের পেছনে ছোটাচ্ছে। ইউ নো দা টার্ম ডর্লিং! 'চেজিং আফটার আ রেড হেরিং।' মরীচিকা, জয়ন্ত! আমি কি মরীচিকার পেছনে ছুটছি?"

"এবার আপনার গলায় বিষাদ-সঙ্গীতের সুর, বস্‌!"

"হুঁ, আর একটা ব্যাপার দেখ। সমীরবাবুর মা প্রতিবেশী এক বৃদ্ধ-বৃদ্ধার সঙ্গে তাঁদের গাড়িতে রোজ ভোরে গঙ্গাস্নানে যান। আজও গিয়েছিলেন। সেই দম্পতির কিশোরী নাতনিকে ফ্ল্যাটে রেখে গিয়েছিলেন সমীরবাবুর মা গৌরী দেবী। কারণ গতরাত থেকে সমীরবাবু বাইরে আছেন এবং সকালে ফিরতে পারেন। তো মেয়েটি বলেছে, তিন-চারবার ফোন করে কেউ জানতে চেয়েছিল গৌরীদেবী আছেন কি না। শুনে সে বলেছিল, গৌরীদেবী ফিরলেই যেন ছেলের খোঁজ করেন। গৌরীদেবী আজ গঙ্গাস্নানের পর বালিগঞ্জে তাঁর বোনঝির কাছে নেমে যান। প্রায় সাড়ে দশটা অব্দি সেখানে ছিলেন। বাড়ি ফেরার পর মেয়েটির মুখে ফোনের খবর শুনে ব্যস্তভাবে তার অফিসে ফোন করেন। তারপর—"

"হালদার মশাইয়ের ভাষায় প্রচুর রহস্য এবার ঘনীভূত রহস্য হল।"

"অবশ্যই ঘনীভূত হল। প্রতিবেশী মৈত্রেয় দম্পতির নাতনির ডাকনাম মিম্মি। গৌরীদেবীর নাকি ভীষণ চোরের বাতিক। তাই কাজের লোক রাখেন না। তবে মিম্মিকে বিশ্বাস করেন। তাই ফ্ল্যাটে ছেড়ে গেলে মিম্মিকে নজর রাখতে বলেন। স্কুলে পুজোর ছুটি। মিম্মি বাড়িতেই ছিল এবং গৌরীদেবীর ফ্ল্যাটে রেকর্ডপ্লেয়ার বাজিয়ে সময় কাটাচ্ছিল। টু মেক ইট শর্ট, জয়ন্ত গৌরীদেবী ছেলের খোঁজে চলে

আসার পর কারও ওঁর ফ্ল্যাটে ঢোকার চান্স ছিল না। মিস্মি ওয়জ দেয়ার। কাজেই সমীরবাবুর হ্যান্ডব্যাগ হারানো এবং সেটা আজই হারানো একটা নতুন প্রশ্ন এনেছে। আর একটা ঘটনা ফোনের তার ছেঁড়া নীচের টেলিফোন বক্সে।”

“থাক্ কর্নেল! আমার মাথায় ভীমরুল ঢুকে গেছে।”

“আমারও।....হ্যালো! হ্যালো!”

“বলুন।”

“সকাল আটটার মধ্যে চলে এসো। তোমাকে একটা জরুরি কাজের দায়িত্ব দেব। হালদারমশাই নেই বলেই—না ডার্লিং, গোয়েন্দাগিরি নয়! তুমি রিপোর্টার হওয়ায় অনেক সুবিধে আছে। এটা তুমি সহজে পারবে।”

“আপনি না বললেও যেতাম। চিত্রদর্শনে—সরি! চিত্রাদর্শনে!”

“হাঃ হাঃ হাঃ! রাখছি ডার্লিং! হ্যাভ আ নাইস স্লিপ।”

যাক্, বৃদ্ধ ঘুঘুপ্রবরকে হাসাতে পেরেছি। হাসি উত্তেজনা দূর করে। কিন্তু নিজের উত্তেজনাটি আমার মাথায় পাচার করে দিলেন দেখছি। জরুরি কাজটা কী ধরনের হতে পারে ভেবে পেলাম না। 'নাইস স্লিপের' বারোটা বেজে গেল।

সকালে কর্নেলের অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছুতে প্রায় সওয়া আটটা বেজে গেল। ড্রয়িং রুমে ঢুকে চোখ জ্বলে গেল বলা চলে। কিন্তু কর্নেল আলাপ করিয়ে দিলেন না চিত্রা মিত্রের সঙ্গে। আমাকে ইশারায় বসতে বলে তাঁকে বললেন, “ঠিক আছে। আমি দেখছি। তবে কথা দিতে পরছি না। কারণ খবরের কাগজে আপনার স্বামীর যে-সব কীর্তিকলাপ পড়েছি, তাতে আমার ধারণা হয়েছে, উনি জেদী এবং দুঃসাহসী মানুষ। আমার পরামর্শে কান দেবেন না। আর আপনি বলছেন টেলিফোনে হুমকি দেওয়ার কথা। কাগজেই পড়েছি, প্রদীপবাবুকে এধরনের হুমকি বহুবার দেওয়া হয়েছে। এটা তো আপনারও জানার কথা।”

চিত্রা বললেন, “তাহলে ওর সেফটির ব্যবস্থা করুন।”

কর্নেল হাসলেন। “সরি মিসেস মিত্র! আমি বডিগার্ড সাপ্লায়ার নই।”

“না, না! কথাটা ওভাবে নেবেন না কর্নেল সরকার!” চিত্রা একটু বিব্রতভাবে বললেন। “বডিগার্ডের কথা বলছি না। আসলে আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, ওর যাতে কোনও ক্ষতি না হয়, তেমন কোনও ব্যবস্থা করুন। আমি জানি, আপনি এটা পারেন।”

“আপনি জানেন? তার মানে, কেউ কি আপনাকে বলেছে আমি এধরনের কাজ করি?”

চিত্রা আস্তে বললেন, “শুনেছি।”

কর্নেলের জেরার মুখে সুন্দরীর সৌন্দর্য বেঁকেচুরে গেল। আমার খারাপ লাগছিল। কর্নেলকে মেয়েদের ব্যাপারে এমন কড়া হতে কখনও দেখিনি। চিত্রা ঠোঁট কামড়ে ধরে আঙুল খুঁটতে থাকলেন।

কর্নেল বললেন, "কেউ আপনাকে বলেছে আমি প্রাইভেট ডিটেকটিভ?"

চিত্রা তাকিয়েই মুখ নিচু করলেন। আস্তে বললেন, "হুঁ।"

"প্রদীপবাবু কাঁটালিয়াঘাটের অবধূতের কোনও গোপন তথ্য জানেন বলছিলেন। কী ধরনের গোপন তথ্য বলে আপনার ধারণা?"

"আপনাকে তো বলেছি, আমাকে ও কিছুই খুলে বলেনি। তবে অবধূতজির পূর্বাশ্রম সম্পর্কে নাকি ইনফরমেশন জোগাড় করেছে।"

"আপনি লেকটাউনে ব্লক এ-তে থাকেন?"

"হ্যাঁ। আচার্য রোডে।"

"আপনি তাহলে মিঃ ভি রায়—বৈশম্পায়ন রায়কে চেনেন?"

চিত্রা একটু ইতস্তত করে বললেন, "হুঁ।"

কর্নেল হাসলেন। "কেন বলছেন না তিনিই আপনাকে আমার কথা বলেছেন?"

"আসলে বাসুদা আমাকে নিষেধ করেছিলেন।"

"কী আশ্চর্য! ওঁর কথা বললে এতক্ষণ বাজে সময় নষ্ট হত না। ঠিক আছে। প্রদীপবাবুর সেফটির ব্যবস্থা আমি করব।"

চিত্রা খুশি মুখে উঠে দাঁড়ালেন।

কর্নেল বললেন, "একটা কথা মিসেস মিত্র! আজকের কাগজ পড়েছেন?"

"না। আমি মেয়েকে স্কুলে পৌঁছে দিয়েই আপনার কাছে ছুটে এসেছি। কেন বলুন তো?"

"আপনি কোন্ কাগজ পড়তে ভালবাসেন?"

"সত্যসেবক পত্রিকা পড়তে আমার ভাল লাগে।"

কর্নেল মিষ্টিমিষ্টি হেসে বললেন, "তা হলে আলাপ করিয়ে দিই। দৈনিক সত্যসেবকের সাংবাদিক জয়ন্ত চৌধুরি! আর জয়ন্ত, ইনি বিজ্ঞান প্রচার সমিতির মিঃ প্রদীপ মিত্রের স্ত্রী মিসেস চিত্রা মিত্র।"

চিত্রা হাসিমুখে নমস্কার করলেন আমাকে। তারপর বসে পড়লেন। বললেন, "আপনাদের কাগজ আমি খুঁটিয়ে পড়ি। আচ্ছা জয়ন্তবাবু, রূপচর্চার পাতায় আমি কিছু লিখতে চাই। একটু হেল্প করতে পারেন না আমাকে? শুনেছি, চেনা-জানা না থাকলে সত্যসেবকে লেখা ছাপানো যায় না। আপনি যদি—"

আমি কথা বলতে যাচ্ছি, কর্নেল আমাকে থামিয়ে দিয়ে টেবিল থেকে আজকের সত্যসেবক পত্রিকা তুলে নিয়ে বললেন, "মিসেস মিত্র! আজকের সত্যসেবক পড়ে দেখুন!"

আমি যেমন, তেমনি চিত্রাও যেন একটু অবাক হলেন। তারপর কাগজটা নিয়ে প্রথম পাতায় চোখ রেখেই চমকে উঠলেন। আস্তে বললেন, "সে কী!"

কর্নেলও আস্তে বললেন, "কোনও সেনসেশন্যাল খবর আছে বুঝি?"

pathagar.net

চিত্রার মুখে তীব্র উত্তেজনার ছাপ লক্ষ করলাম। বললেন, "আমার পরিচিত এক ভদ্রলোক স্যুইসাইড করেছেন।"

"ভদ্রলোককে আপনি চিনতেন নাকি?"

"হ্যাঁ। মানে, একটু-আধটু চিনতাম।"

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন, "আজকাল স্যুইসাইড খুব বেড়ে যাচ্ছে। মানুষের ফ্রাস্ট্রেশন বাড়ছে। ব্যাপারটা হল, বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে এমন করে তুলেছে, যার সঙ্গে বাস্তব জীবনকে খাপ খাইয়ে নিতে গিয়ে আত্মিক সঙ্কট এসে যাচ্ছে।"

চিত্রা দ্রুত বললেন, "সমীরদার স্ত্রীই এ জন্য দায়ী।"

"আপনি চিনতেন নাকি?"

"একটু-আধটু চিনতাম। কসবায় সমীরদা যে বাড়িতে থাকত, সেই বাড়িতে আমার দিদি থাকেন। স্কুলটিচার। সেই সূত্রে আলাপ হয়েছিল। আচ্ছা, আমি উঠি।" চিত্রা আবার উঠে দাঁড়ালেন।

কর্নেল বললেন, "কিন্তু একটা ব্যাপার লক্ষ করেছেন? ভদ্রলোক নিজের ফ্ল্যাটে স্যুইসাইড না করে শেক্সপিয়ার সরণিতে অন্য একজনের ফ্ল্যাটে গিয়ে স্যুইসাইড করেছেন। অদ্ভুত ব্যাপার না?"

চিত্রা আস্তে বললেন, "স্ত্রীর সঙ্গে ডিভোর্সের পর সমীরদা মাঝে মাঝে ওখানে গিয়ে থাকত। দিদির কাছে শুনেছি। আচ্ছা, চলি!"

"মিসেস মিত্র! বরং এক কাজ করুন। আপনি আপনার স্বামীর সঙ্গে কাঁটালিয়াঘাটে চলে যান। স্বামীর সেফটি স্ত্রীই বেশি দিতে পারেন। আপনি যেভাবেই হোক, ওঁর সঙ্গে চলে যান। আমি তো আছিই। আড়াল থেকে লক্ষ রাখব।"

"আমি যাব? কিন্তু আমার মেয়ে কার কাছে থাকবে?"

"মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে যান। আপনার মেয়ে নিশ্চয় ইংলিশ মিডিয়ামে কোনও খ্রিশ্চিয়ান মিশনারি স্কুলের ছাত্রী! না—এটা জানায় ডিটেকটিভের বাহাদুরি নেই। মেয়েকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে এসেছেন বললেন। অন্যান্য স্কুলে এখন পুজোর ছুটি। কাজেই এটা অনুমান করা খুব সহজ।"

চিত্রার চোখেমুখে যে বিস্ময় ফুটে উঠেছিল, মুছে গেল। কিন্তু বিষণ্ণতার গাঢ় ছাপটা আবার ফিরে এল। বললেন, "আপনি কি লোক পাঠাবেন, না নিজে যাবেন?"

"আমি নিজে যাব।"

"থ্যাংকস কর্নেল সরকার!" বলে চিত্রা মিত্র চলে গেলেন। সত্যসেবক পত্রিকার রূপচর্চার পাতায় লেখার ব্যাপারে আর কোনও কথা তুললেন না এবং আমাকে প্রাপ্য নমস্কারটি পর্যন্ত দিলেন না। আমি হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম।

কর্নেল মিটিমিটি হেসে বললেন, "কী বুঝলে জয়ন্ত?"

"আপনার জেরার পদ্ধতিটি অভিনব।"

"তত কিছু অভিনব নয়। আমার বরাবরকার একটি তত্ত্ব হল, সত্য জিনিসটা অসংখ্য ফালতু জিনিসের মধ্যে গাঢাকা দিয়ে থাকে। তাই ফালতু জিনিসগুলো উল্টেপাল্টে দেখা উচিত।"

ষষ্ঠী এসে বলল, "বেকফাস রেডি, বাবামশাই!"

কর্নেল ঘড়ি দেখে বললেন, "এস জয়ন্ত, আগে ষষ্ঠীর বেকফাস শেষ করে নিই। তারপর অন্য কাজ।"

ডাইনিংয়ে ঢুকে বললাম, "আমি কিন্তু বেকফাস সেরে বেরিয়েছি। শুধু এককাপ কফি খাব।"

ষষ্ঠীচরণ গম্ভীরমুখে বলল, "না হয় মুখ ফস্কে বেইরেই গেছে। বেরেকফাস্ট্ বেরেকফাস্ট্! নিন, এবার হল তো?"

বলে সে কিচেনে ঢুকে গেল। কর্নেল অট্টহাসি হাসলেন। "না রে ষষ্ঠী! তুই বেকফাস্ট বল্ কিংবা বেরেকফাস্টই বল্, জিনিসটা তো একই। হালদারমশাই বলেন ব্র্যাকফাস্ট্। তাতেও কি এই খাদ্যের স্বাদ বদলে যায়? বসে পড়ো জয়ন্ত! ষষ্ঠীকে বলা ছিল তোমার কথা। কাজেই তুমি না খেলে ষষ্ঠী রাগ করবে।"

কর্নেলের স্বভাব খাওয়া-দাওয়ার সময় ঘোর নীরবতা পালন। ওঁর মতে, খাওয়ার সময় কথা বললে—এক খাদ্যের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হতে হয়, দুই গলায় আটকে যেতে পারে, তিন কথার ভেজাল মিশলে খাদ্য ঠিকমতো হজম হয় না ইত্যাদি।

কিছুক্ষণ পরে কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে মুখ খুললেন। "সুন্দরীরা যদি নিজের রূপ সম্পর্কে বেশি সচেতন হন, তা হলে তাঁদের বুদ্ধির উৎকর্ষে ঘাটতি পড়ে। মিসেস মিত্রকে অবশ্য বোকা বলব না, তবে চিন্তাধারায় বেজায় সাদাসিধে। এধরনের মহিলাদের কাছ থেকে সহজে পেটের কথা আদায় করা যায়।"

"কিন্তু সমীরবাবু ওঁর পরিচিত; এটা কি অলৌকিক শক্তির সাহায্যে জানতে পেরেছিলেন?"

"নিছক একট চান্স নিয়েছিলাম। মিঃ রায় ওঁকে পাঠিয়েছেন। তাই অন্ধকারে একটা ঢিল ছুড়লাম। লেগে গেল।" কর্নেল কফিতে চুমুক দিলেন। "যে-কোনও রহস্যের সঙ্গে বহু আকস্মিকতার সম্পর্ক অচ্ছেদ্য, জয়ন্ত!"

"মিঃ রায় ওঁকে বলতে নিষেধ করেছিলেন—"

"সেটা স্বাভাবিক। এধরনের নাছোড়বান্দা মহিলার চাপে পড়েই আমার নাম ঠিকানা দিয়ে থাকবেন। ওঁর একটা কেস আমি নিয়েছি। এ অবস্থায় আরেকটা কেস আমার ওপর চাপালে আমি বিরক্ত হতেই পারি। তাই নিষেধ করে থাকবেন। তাছাড়া উনি জানেন, ডিটেকটিভ কথাটা সম্পর্কে আমার প্রচণ্ড অ্যালার্জি আছে।"

"কিন্তু আপনি কি সত্যিই কাঁটালিয়াঘাটে যাবেন নাকি?"

"দেখা যাক। তবে মিসেস মিত্রের উদ্বেগ আমাকে টাচ করেছে।" কর্নেল হঠাৎ একটু গম্ভীর হলেন। "প্রদীপ মিত্রের এক লক্ষ টাকা বাজি ধরার ব্যাপারটা আমার ভাল ঠেকছে না। ওঁর স্ত্রীর কাছে শুনলাম, প্রদীপবাবুর তো বটেই, ওঁর বিজ্ঞান প্রচার সমিতিরও লক্ষ টাকা দেওয়ার সামর্থ্য নেই। এমন বাজি ধরার ঝুঁকিও সাংঘাতিক। যদি অবধূতজির কীর্তিকলাপ ম্যাজিকই হয়, সেই ম্যাজিক কি প্রদীপবাবুরও জানা? তার মানে, তুমি যে ম্যাজিক ফাঁস করতে চাও, সেই ম্যাজিক তোমারও জানা চাই।"

"প্রদীপবাবুর সঙ্গে কথা বলে দেখুন না! নিশ্চয় ম্যাজিকটা জানেন বলেই বাজি ধরেছেন।"

কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। "তার আগে চলো, এক জায়গায় ঘুরে আসি। সাড়ে নটায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা আছে।"

"কোথায়? কার সঙ্গে?"

"এন্টালি এলাকায় অজিতপ্রসাদ আগরওয়ালের সঙ্গে।"

"কী ব্যাপার?"

"চলো তো! ষষ্ঠী, বেরুচ্ছি।"

কিছুক্ষণ পরে কর্নেলের নির্দেশমতো একটা গলিরাস্তায় পৌঁছে গাড়ি দাঁড় করলাম। অন্যদিক থেকে আর একটা গলি এসে এখান থেকে খানিকটা চওড়া হয়ে সি আই টি রোডে মিশেছে। গোড়া-বাঁধানো বটগাছের তলায় গাড়ি রাখতে বললেন কর্নেল। সামনে একটা পাঁচতলা বাড়ি। খানিকটা জাহাজের গড়ন। বাড়িটার মধ্যে স্থাপত্য-কাঠামোর সৌন্দর্য্য আছে, কিন্তু রঙবেরঙে একেবারে কিম্ভূত হয়ে পড়েছে।

বন্ধ গেটের সামনে গেলে দারোয়ান মিলিটারি সেলাম ঠুকল। আমাকে নয়, কর্নেলকেই। দশাসই সায়েবি চেহারা, ঋষিসুলভ দাড়ি এবং মাথায় সায়েবি টুপি ; টুপি পরার কারণ অক্টোবরের তেজী রোদে টাক ঝলসে যাবে। আশেপাশে তত উঁচু বাড়ি নেই এবং বোঝাই যায়, এটা এক সময় বস্তি এলাকা ছিল।

কর্নেল কিছু বলার আগেই দারোয়ান বলল, "আপ কর্নিলসাব?"

"হাঁ। আগরওয়ালজি হ্যায়?"

"আইয়ে, আইয়ে! অন্দর আইয়ে!"

আমরা ভেতরে লনে ঢুকলে পোর্টিকোর দিক থেকে একজন রোগা গুঁফো ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। নমস্কার করে বসার ঘরে নিয়ে গেলেন। বুঝলাম, ইনিই আগরওয়ালজি। চমৎকার বাংলা বলেন। হাবভাবে অত্যন্ত বিনয়ী এবং ভদ্র বলেই মনে হল।

ঘরের ভেতরটাও খুব রঙচঙে। আমাদের বসতে বলে আগরওয়ালজি আপ্যায়নের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। কর্নেল বললেন, "আমরা এইমাত্র ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়েছি। আপনি বসুন।"

আগরওয়ালজি তবু দাঁড়িয়ে রইলেন বিনীত ভঙ্গিতে।

কর্নেল বললেন, "আপনি না বসলে তো কথা হবে না আগরওয়ালজি!"

এবার বুঝতে পারলাম, এই মারোয়াড়ি ব্যবসায়ী ভদ্রলোক কোনও কারণে শঙ্কিত। দ্বিধার সঙ্গে বসে কাঁচুমাচু মুখে হাসলেন। "দেখুন কর্নেলসাব! এই জমি আমি ঠিক-ঠিক দাম দিয়ে সাত বছর আগে কিনেছি। সব পেপার দেখে তবে কিনেছি। রেজিস্টার্ড ডিড, কর্পোরেশন পেপার্স—যা কিছু দেখতে চান, দেখাচ্ছি। এত বছর পরে কেন ঝামেলায় পড়তে হবে, আমি তো বুঝতে পারছি না।"

"চারুলতা সেনের কাছে কিনেছিলেন?"

"হ্যাঁ। ডিডের উইটনেস তাঁর ভাই হেমাঙ্গ সেনগুপ্ত। হেমাঙ্গবাবুই দিদির সিগনেচার আইডেন্টিফাই করেছেন?"

"হেমাঙ্গবাবু এখন কোথায় আছেন?"

"তা তো জানি না। আগে থাকতেন ভবানীপুরে।"

"ডিডে ওঁর অ্যাড্রেস থাকার কথা।"

"হ্যাঁ। আমি আপনাকে ডিড এনে দেখাচ্ছি।"

আগরওয়ালজি ভেতরে গেলে চাপাস্বরে বললাম, "রিস্ক নেওয়া হচ্ছে না?"

কর্নেল একটু হেসে আস্তে বললেন, "এন্টালি থানাকে বলে রেখেছি। আগরওয়ালজির পক্ষে থানায় ফোন করে জনৈক কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের আসার ব্যাপারটা পুলিশকে জানানোর চান্স ছিল। ইতিমধ্যে ফোন করেছিলেন সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে। আজকাল প্রতারকদের যা কাণ্ডকারখানা, তাতে এমন একজন ঝানু লোকের সতর্ক হয়ে ওঠারই কথা।"

হাসতে গিয়ে সামলে নিলাম। আগরওয়ালজি সম্ভবত কাজগপত্রের ফাইল বের করেই রেখেছিলেন। ব্যস্তভাবে ঘরে ছুটে ফাইল খুলে ডিড বের করলেন। "আপনি দেখুন। ওরিজিন্যাল ডিড আছে। এই দেখুন হেমাঙ্গবাবুর সিগনেচার।"

কর্নেল ঠিকানাটা টুকে নিয়ে বললেন, "চারুলতা দেবীর একটি মেয়ে ছিল। অনামিকা। এই প্রপার্টিতে তার শেয়ার ছিল।"

আগরওয়ালজি চমকে উঠলেন। "সে কী কথা!"

"অনামিকার কথা আপনি জানেন না?"

আগরওয়ালজি একটু হাসলেন। "ঠিক আছে। তাকে নিয়ে আসবেন। যদি সে ঠিক-ঠিক অনামিকা বলে প্রুভ করতে পারে, তার শেয়ার মিটিয়ে দেব।"

"অনামিকার কথা আপনি সত্যিই জানেন না? শোনেননি কিছু তার সম্পর্কে?"

"একটু-একটু শুনেছি। এই জমি কেনার আগেই শুনেছি। কর্নেল সাব! আমি সবকিছু খবর না নিয়ে জমি কিনিনি।"

"কী শুনেছেন বলুন!"

কর্নেলের কণ্ঠস্বরে চ্যালেঞ্জ ছিল। আগরওয়ালজি একটু ইতস্তত করে বললেন, "শুনেছি, অনেক বছর আগে বিয়ের আগের রাতে নাকি তাকে কে কিডন্যাপ

করেছিল। তারপর আর তার খবর পাওয়া যায়নি। তবে আপনি তার শেয়ারের কথা বলছেন। আমি নিউজপেপারে অ্যাডভার্টাইজ করেই এই প্রপার্টি কিনেছি। এতদিন পর্যন্ত কেউ শেয়ার ক্লেম করেনি। এখন ক্লেম করলে আমি তাকে আপনার খাতিরে টাকা মিটিয়ে দেব। ঠিক আছে কর্নেলসাব?"

"কে কিডন্যাপ করেছিল, শুনেছেন কি?"

আগরওয়ালজি মাথা নেড়ে বললেন, "তা জানি না। তবে মেয়েটা ভাল ছিল না শুনেছি। আমি ওসব ঝামেলায় থাকি না স্যার! আমি বিজনেসম্যান। বিজনেস ছাড়া কিছু বুঝি না। আপনি ওসব খবর জানতে হলে ওই মোড়ে এক ডাক্তারবাবু আছেন, তাঁর সঙ্গে কথা বলুন।"

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "ধন্যবাদ আগরওয়ালজি!"

লনে এসে আগরওয়ালজি বললেন, "আমি কিছু বুঝতে পারলাম না। কর্নেলসাব! এ কিসের কেস আছে?"

"সরি আগরওয়ালজি! সেটা বলা যাবে না। বাট এগেন থ্যাংকস্ ফর ইওর কো-অপারেশন!"

ব্যবসায়ী ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গে রাস্তায় এলেন। দারোয়ান আবার মিলিটারি সেলাম ঠুকল। লোকটি সম্ভবত মিলিটারিতে সেপাই-টেপাই ছিল।

আগরওয়ালজি বললেন, "ওই দেখুন ডাক্তারবাবুর বাড়ি। চলুন, আমি আলাপ করিয়ে দিই।"

সাইনবোর্ডে লেখা আছে ডাঃ পি কে দত্ত। তার পাশে ইংরেজি বর্ণমালার মিছিল। কিন্তু ঘরে বসে মাছি তাড়াচ্ছেন ডাক্তারবাবু। খটখটে বুড়োমানুষ। আগরওয়ালজি কর্নেলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। সি বি আই অফিসার শুনেই ডাঃ দত্ত কেমন যেন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। আগরওয়ালজি সবিনয়ে বললেন, "কর্নেলসাব! আমাকে এবার বেরুতে হবে। আমি চলি। যখন দরকার হবে, আসবেন। নমস্তে।"

ডাঃ দত্ত এবার ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। "আপনারা বসুন। বলুন কী ব্যাপার?"

কর্নেল বললেন, "একটা পুরনো কেসের তদন্তে এসেছি। আপনার সাহায্য চাই ডঃ দত্ত।"

"একশোবার। বলুন, কী সাহায্য করতে পারি?"

"আপনি অনামিকা সেনকে চিনতেন?"

ডাঃ দত্ত চমকে উঠলেন। "অনামিকা সেন?"

"হ্যাঁ, অনামিকা সেন।"

"সে তো অনেকবছর আগের কথা। বাসু নামে পাড়ার একটা ছেলে বিয়ের আগের রাতে তাকে জোর করে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর পুলিশ কেসও হয়েছিল। যতদূর মনে পড়ছে, পুলিশ খুঁজে পায়নি ওদের। বাসু—"

"বৈশম্পায়ন রায়?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। এই গলিতেই থাকত ওরা। এখন ওদের বাড়িতে একটা কিন্ডারগার্টেন স্কুল হয়েছে। বাসুর বাবা-মাও কবে মারা গেছেন। তা প্রায় বছর বিশেক হয়ে গেল। বাসু নাকি জামশেদপুরে পালিয়ে গিয়েছিল। তারপর আর তার খবর পাওয়া যায়নি। আর অনির—মানে, অনামিকার কথা বলছেন?" ডাঃ দত্ত স্মরণ করার চেষ্টা করে বললেন, "অনির মায়ের কাছে শুনেছিলাম, অনি একটা চিঠি লিখে জানিয়েছে সে ভাল আছে। তার জন্য চিন্তার কারণ নেই। চিঠিতে ঠিকানা ছিল না।"

"কতদিন আগে, মনে পড়ছে আপনার?"

"এই তো!" ডাঃ দত্ত আবার একটু ভেবে বললেন, "বছর আষ্টেক হবে বলে মনে হচ্ছে। হ্যাঁ—তার পরের বছর অনির মামা ওদের বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে অনির মাকে নিয়ে গেল। বোধ করি ভবানীপুরে না কোথায়—"

"ভবানীপুরে অনির মামা থাকতেন, আমরা জানি।"

"তাহলে সেখানেই"।

"অনির মা আপনাকে বলেছিলেন অনি চিঠি লিখেছে?"

"হ্যাঁ।"

"আট বছর আগে?"

"হ্যাঁ। আগরওয়ালজি ওদের বাড়িটা কিনলেন, তার আগের বছর।" ডাঃ দত্ত নড়ে বসলেন। "কী কেসের তদন্ত স্যার?"

"সরি ডঃ দত্ত! বলা যাবে না। তো আপনি সমীর রুদ্রকে চিনতেন?"

ডাঃ দত্ত আবার চমকে উঠলেন। টেবিলে পড়ে থাকা দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকা দেখিয়ে বললেন, "আজই কাগজে দেখলাম সমীর স্যুইসাইড করেছে। কী সাংঘাতিক কাণ্ড! এই দেখুন।"

"দেখেছি। আপনি সমীরবাবুকে চিনতেন?"

"হাঁ। পাড়ারই ছেলে সব। ওই যে গ্যারেজ দেখছেন, তার পাশের বাড়িতে থাকত ওরা। কসবায় ফ্ল্যাট কিনেছে শুনেছিলাম। হঠাৎ আজকের কাগজে এই খবর।"

"আচ্ছা ডঃ দত্ত, বাই এনি চান্স আপনি প্রশান্ত সান্যাল নামে কাকেও চিনতেন?"

ডাঃ দত্ত তাকালেন। "প্রশান্ত সান্যাল?"

"হ্যাঁ। প্রশান্ত সান্যাল।"

"বুঝেছি। পরেশের ছেলে। শুনেছি সে তো এখন বিলেতে না কোথায় থাকে। কোটিপতি হয়েছে নাকি।"

"এই পাড়ার থাকতেন ওঁরা?"

"বলতে পারেন। আগরওয়ালজির বাড়ির পাশের গলিতে থাকত। প্রশান্তর এক ভাই আছে। স্টেশনারি দোকান করেছে। মহাকালী ভাণ্ডার। ডাকনাম তপু। তাপস। ওর দোকানে গেলে প্রশান্তর খবর পাবেন।"

pathagar.net

"থ্যাংকস্ ডঃ দত্ত! চলি!"

গলিরাস্তার হাঁটতে হাঁটতে বললাম, "একটা পুরনো নাটকের ব্যাপার মনে হচ্ছে. জমেও উঠেছে। কারণ আট বছর আগে অনামিকা সেন তার মাকে চিঠি লিখেছিল। তার মানে—"

কর্নেল বললেন, "তার মানে আট বছর আগে তার অস্তিত্ব ছিল।"

"এখনও আছে। রায়সায়েবকে লেখা লালচিঠির হুমকি সেটা বলে দিচ্ছে।"

"কিছু বলা যায় না, জয়ন্ত! মিঃ রায়ের সন্দেহ, অনামিকাকে কেউ খুন করেছে এবং সে চাইছে না, অনামিকা সম্পর্কে কেউ খোঁজ নিক। খোঁজ নিতে গেলে তার ধরা পড়ার চান্স আছে।"

একটু চমকে উঠলাম। অস্বস্তিতে শরীর ছমছমিয়ে উঠল। গাড়ির কাছে এসে বললাম, "ওই গলির ভেতর গাড়ি ঢোকানো ঠিক হবে?"

"নাহ্। গাড়ি থাক। ওই দেখ, আগরওয়ালজির দারোয়ান নজর রেখেছে।"

"কর্নেল, বাজি রেখে বলতে পারি লোকটা মিলিটারিতে সেপাই ছিল।"

"বাজি রাখার দরকার নেই।"

কর্নেলের সঙ্গে থাকার এটাই মজা। একটু আগের অস্বস্তিটা ঘুচে গেল। হেসে ফেললাম। গলিটা ঘুরে-ঘুরে এগিয়েছে। খানিকটা গিয়ে 'মহাকালী ভাণ্ডার' দেখা গেল। আমাদের খদ্দের ভেবে একজন গাব্দাগোব্দা চেহারার ভদ্রলোক সম্ভাষণ করলেন, "বলুন স্যার!"

কর্নেল বললেন, "আপনি কি তাপসবাবু?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। কী ব্যাপার?"

"আপনার দাদার নাম প্রশান্ত সান্যাল?"

তাপসবাবু একটু অবাক হলেন যেন। "আপনারা কোত্থেকে আসছেন স্যার?"

কর্নেল মিষ্টি হাসলেন। "প্রশান্তবাবু আমার পরিচিত, অ্যামেরিকায় আলাপ হয়েছিল। কলকাতা আসার কথা বলেছিলেন। এসেছেন কি?"

"না তো!"

"এলে আপনার এখানে ওঠেন?"

"না। থিয়েটার রোডে একটা ফ্ল্যাট কিনে রেখেছে। সেখানেই ওঠে। তবে কলকাতা এলে একবার দেখা করে যায়, এইমাত্র।"

"বলেছিলেন, অক্টোবরে একবার আসবেন কলকাতা।"

তাপসবাবু হাসলেন। "দাদা বছরে একবার মাত্র আসে। পুজোর সময়। এবার পুজো চলে গেল। এল না। প্রায় ছ-সাত বছর হল, আমেরিকায় আছে। প্রত্যেকবছর পুজোয় এসেছে। এবার এল না কেন কে জানে? আপনার সঙ্গে কতদিন আগে দেখা হয়েছিল স্যার?"

"গতমাসে। আপনার বউদি—"

"বউদির তাড়াতেই আসে। মেমসায়েব বউদি স্যার,—বুঝলেন? ইন্ডিয়ান কালচারের খুব ভক্ত।"

"আপনার বউদির সঙ্গে আলাপ হয়নি অবশ্যি। আমি ভেবেছিলাম আপনার বউদি কলকাতার মেয়ে। প্রশান্তবাবুর কথা শুনে তা-ই মনে হয়েছিল।"

তাপসবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, "মেমসায়েব দাদার সেকেন্ড ওয়াইফ স্যার!"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ! ফার্স্ট ওয়াইফ কলকাতার মেয়ে বলছিলেন। বুঝতে ভুল করেছি।"

"দাদা স্যার বড্ড খেয়ালি লোক।"

"তা-ই বুঝি?" কর্নেল চুরুট ধরালেন। "আপনার কলকাতার বউদি সম্ভবত মারা যান।"

"হ্যাঁ!"

"অসুখ হয়েছিল বুঝি?"

"হ্যাঁ!"

"কলকাতায় মারা যান?"

"তা তো জানি না।" তাপসবাবুর মুখে এতক্ষণে সন্দেহের ছাপ ফুটে উঠল। "আমি স্যার দাদার ফার্স্ট ওয়াইফকে দেখিনি। কাজেই বলতে পারব না।"

"আচ্ছা, চলি তাপসবাবু! নমস্কার।"

আমরা কয়েক পা এগিয়ে আসতেই তাপসবাবু সঙ্গ নিলেন। "একটা কথা স্যার! আপনাদের পরিচয় তো দিলেন না? দাদা আবার কোনও কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়েনি তো?"

কর্নেল হাসলেন। "কেন ও কথা মনে হল আপনার?"

"আপনারা আই বি কিংবা সি আই ডি অফিসার। তাই না স্যার?"

"হলেও আপনার ভয় পাওয়ার কিছু নেই।"

তাপসবাবু শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বললেন, "আজ কাগজে দেখলাম, দাদার থিয়েটার রোডের ফ্ল্যাটে সমীরদা স্যুইসাইড করেছে। সেজন্যই জিজ্ঞেস করছি, স্যার!"

কর্নেল আস্তে বললেন, "আপনার কলকাতার বউদির নাম কী ছিল তাপসবাবু?"

তাপসবাবুর মুখ সাদা হয়ে গেল। কাঁপা-কাঁপা গলায় বললেন, "শোনা কথা স্যার! আমি বউদিকে কখনও দেখিনি। বড় হয়ে শুনেছি। দাদা আমার চেয়ে একুশবছরের বড় স্যার! আমার বাবার প্রথমপক্ষের ছেলে হল দাদা। আমি স্যার দ্বিতীয় পক্ষের। আমার স্যার—"

"আপনার কলকাতার বউদির নাম ছিল অনামিকা। তাই না?"

"শুনেছি স্যার! দাদা বড্ড ঝামেলা করে বেড়াত বলে বাবা ওকে ত্যাজ্যপুত্র করেছিলেন।"

"থ্যাংকস্, তাপসবাবু! আপনার চিন্তার কারণ নেই। চলি।"

গাড়িতে বসে দেখলাম, তাপসবাবু অপটু হাতে আঁকা ছবির মতো দাঁড়িয়ে আছেন। গাড়ি স্টার্ট দিয়ে বললাম, "নাহ্! তত জমল না। রহস্যের জটগুলো পটাপট্ ছেড়ে যাচ্ছে।"

কর্নেল বললেন, "একটা থিওরি মাথায় রেখে এগোলে অনেক সুবিধে হয়। বিনা থিওরিতে তথ্য খুঁজে বেড়ানো খড়ের গাদায় সুচ খোঁজার শামিল, জয়ন্ত! একটা থিওরি যদি তথ্যের ভিত্তি না পায়, যদি নড়বড় করে, তা হলে দ্বিতীয় থিওরি তৈরি করো! আবার এগোও।"

"এবার কোনদিকে এগোব, বলুন?"

"ইলিয়ট রোডে সানি ভিলা।"

"বাড়ি ফিরে কী লাভ? চলুন, লেকটাউনে প্রদীপ মিত্রের বাড়ি ঘুরে আসি।"

"ডার্লিং! তুমি পরস্ত্রীর প্রেমে পড়ে গেছ!"

"কী আশ্চর্য!"

কর্নেল হাসলেন। "আশ্চর্য তো বটেই। চলো, আগে বাড়ি ফিরে কফি খেয়ে ঘিলু চাঙ্গা করা যাক। তারপর তোমাকে একটা ছোট্ট কাজের দায়িত্ব দেব।"

তিনতলায় কর্নেলের অ্যাপার্টমেন্টের দরজায় পৌঁছে বললাম, "মিস্ট্রি ইজ সলভ্‌ড্, বস্! মিঃ রায়কে তাঁর অফিসে ফোন করে জানিয়ে দিন, অনামিকা সেনের কিলার প্রশান্ত সান্যাল।"

কর্নেল ডোরবেলের সুইচ টিপে বললেন, "বাই দা বাই, তোমাকে বলতে ভুলে গেছি, গতকাল ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের মর্নিং ফ্লাইটে পি সান্যালের নামে হংকংয়ের কনফার্মড্ টিকিট ছিল। বাট হি মিস্‌ড্ দা ফ্লাইট।"

"তা হলে আর কী? খেলা শেষ।"

কর্নেল বললেন, "খেলা শেষ কোথায় ডার্লিং? এই তো সবে শুরু।'

ষষ্ঠী দরজা খুলে মুচকি হেসে চাপাস্বরে বলল, "হালদারমশাই এয়েছেন।"

ড্রয়িং রুমে ঢুকে দেখি, হালদারমশাই সোফায় পা ছড়িয়ে হেলান দিয়েছেন। চেহারা উস্কোখুস্কো। চোখ বন্ধ। নাক ডাকছে। ডাকলাম, "হালদারমশাই!"

হালদারমশাই তড়াক করে লাফ দেওয়ার ভঙ্গিতে সোজা হয়ে বসলেন। তারপর করুণ হাসলেন।

কর্নেল হাঁকলেন, "ষষ্ঠী! শিগগির কফি।" তারপর হালদারমশাইয়ের দিকে ঘুরলেন। "অবধূতজির মাহাত্ম্যদর্শন করে আপনার চেহারার জ্যোতি আশা করেছিলাম হালদারমশাই!"

হালদারমশাই হাই তুলে বললেন, "খুব টায়ার্ড।"

"কী দেখলেন বলুন?"

হালদারমশাই বুকপকেট থেকে একটা লকেট বের করে কর্নেলকে দিলেন। বললেন, "এইটুকখান লকেট। তার দাম দশ টাকা। আবার কয় কী, সোনার চেন ছাড়া পরন যাইব না।"

"হুঁ! তো মড়ার সিগারেটটানা দেখলেন?"

"মড়া মানে একটা স্কেলিটন! কংকাল।"

"আহা! কংকাল সিগারেট টানল কি না তা-ই বলুন?"

"টানল। তবে—"

"তবে কী?"

"ঠিক বোঝা গেল না কিছু। স্ত্রীলোকের কংকাল। কারণ মা মা বলে ডাকলেন। বললেন, ওঠ তো মা! সিগারেট টানো তো মা! কংকালটা হাত বাড়াইয়া সিগারেট নিল। সাধুবাবা ধরাইয়া দিলেন। কিছু বোঝা গেল না। স্ত্রীলোকের সিগারেট টানা মনঃপূত হইল না।" হালদারমশাই আমার দিকে ঘুরলেন। "আচ্ছা, কন তো জয়ন্তবাবু! এই কাজটা আমাগো কালচার-ট্রাডিশনের অ্যাগেন্স্টে না? একটা গণ্ডগোল আছে কোথাও।"

বললাম, "রাত্রে না দিনে দেখলেন?"

"রাত্রে। তখন প্রায় বারোটা। তারপর কীর্তন শুরু হল। আমি রাত দেড়টার ট্রেন ধরলাম। হাওড়ায় পৌঁছতে সকাল সাড়ে নটা। চাকা গড়ায় না এমন একখান ট্রেন!"

কর্নেল লকেটটা আমাকে দিয়ে বললেন, "চিনতে পারছ জয়ন্ত?"

বললাম, "হ্যাঁ। আর্টিস্ট সুমিতবাবুর ঘরে এঁর ছবি দেখেছি।"

"এবং এই লকেট আছে মিঃ রায়ের গলায়।"

pathagar.net

লকেটটা কর্নেল নিলেন আমার হাত থেকে। বললেন, "তো হালদারমশাই, আপনি কি অবধূতজির এই লকেট ধারণ করবেন বলেই কিনে এনেছেন?"

হালদারমশাই প্রচণ্ড হাত নেড়ে বললেন, "না কর্নেলস্যার! এটা আপনাকে দেখানোর জন্য কিনে এনেছি।"

ষষ্ঠী কফি এনে হালদারমশাইয়ের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে হাসি চাপল। হালদারমশাইকে দেখলে ষষ্ঠীর কেন হাসি পায় জানি না। হালদারমশাই কফির পটের দিকে তাকিয়ে কিছু ভাবলেন। তারপর আপনমনে বললেন, "দুই কাপ খাইছি।" বলে নস্যির কৌটো বের করে নস্যি নিলেন।

ষষ্ঠীর দিকে চোখ কটমট করে তাকিয়ে কর্নেল বললেন, "হাঁ করে কী দেখছিস তুই?"

সঙ্গে সঙ্গে সে কেটে পড়ল। বললাম, "কর্নেল, বরং লকেটটা ষষ্ঠীকে ধারণ করতে দিন।"

হালদারমশাই হাসলেন। "আমি রামকৃষ্ণঠাকুরের ভক্ত। উনি কইছিলেন, একজন লোক বিশ বৎসর সাধনা কইরা অন ফুট নদী পার হওন শিখল। কথা হইল, এক পয়সায় নদী পার হওন যায়। তার জন্য বিশটা বৎসর নষ্ট! স্কেলিটনের সিগারেট টানা দেখতে দেখতে সেই কথাটা মনে পড়ছিল। হোয়াট ইজ দা মিনিং অব ইট?"

কর্নেল বললেন, "বিজ্ঞান প্রচার সমিতির প্রদীপ মিত্র সদলবলে আজ দুপুরের ট্রেনে কাঁটালিয়াঘাট যাচ্ছেন।"

"অ্যাঁ?" হালদারমশাইয়ের চোখ গোল হয়ে গেল।

"আপনার মনে হচ্ছে না প্রদীপ মিত্র একটা সাংঘাতিক ঝুঁকি নিচ্ছেন?"

"হঃ!"

"আমার আশঙ্কা হচ্ছে, প্রদীপবাবু যদি প্রমাণ করতে পারেনও যে ওটা ম্যাজিক, অবধূতজির চেলারা তা মানবে না। প্রদীপবাবুর ওপর হামলা চালাবে।"

"হঃ!"

কর্নেল কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বললেন, "এর আগে প্রদীপবাবু অনেক গডম্যানকে চ্যালেঞ্জ করেছেন, কাগজে পড়েছি। তবে তাঁদের কলকাতার প্রেস ক্লাবে সাংবাদিকদের এবং গণ্যমান্য নাগরিকদের উপস্থিতিতে যুদ্ধে ডেকেছেন। কোনও গডম্যান প্রেস ক্লাবে আসতে রাজি হননি। তাঁদের কৈফিয়ত অবশ্যই যুক্তিযুক্ত। তাঁরা অলৌকিক শক্তি যেখানে-সেখানেই বা দেখাতে আসবেন কেন? তাঁদের সাধনপীঠে বসেই দেখাবেন। কিন্তু প্রদীপ মিত্র তাতে রাজি হননি। হামলার আশঙ্কা করেছেন। প্রদীপ মিত্রের কৈফিয়তও যুক্তিযুক্ত। অথচ এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, উনি এক গডম্যানের সাধনপীঠে গিয়েই লড়বেন। এটা একটা সাংঘাতিক রিস্ক্।"

আমি বললাম, "স্থানীয় পুলিশকে নিশ্চয় জানিয়ে রেখেছেন।"

হালদারমশাই মাথা নাড়লেন। "পুলিশ কিছু করবে না জয়ন্তবাবু! কাঁটালিয়াঘাটে থানার ওসি অবধূতজির ভক্ত। আমার স্বভাব তো জানেন। সব খোঁজ নিয়েছি। লোকাল পলিটিক্যাল মাতব্বররাও ওনার ভক্ত।"

কর্নেল বললেন, "ভোটের রাজনীতির এটাই সাম্প্রতিক হালচাল। যাই হোক, প্রদীপ মিত্র সাংঘাতিক রিস্ক নিচ্ছেন। চিন্তা করুন হালদারমশাই, এক লাখ টাকা বাজি।"

হালদারমশাই সোজা হয়ে বসলেন। "কেউ কোনও কারণে প্রদীপবাবুকে বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে না তো কর্নেল স্যার? কেউ ওনাকে প্রোভোক করছে না তো?"

"আপনি বুদ্ধিমান, হালদারমশাই! ঠিকই ধরেছেন।"

হালদারমশাই আরেক টিপ নস্যি নিয়ে হাঁচবার চেষ্টা করে বললেন, "হঃ!"

কর্নেল কি তাতিয়ে দিচ্ছেন প্রাইভেট ডিটেকটিভকে? চাপাস্বরে এবার বললেন, "আমার হাতে রিলায়েব্‌ল্ সোর্সের খবর আছে, প্রদীপ মিত্র অবধূতজির কিছু গোপন তথ্য জানেন এবং তাঁর পূর্বাশ্রমের কথাও নাকি জানেন। সে সব কথাও তিনি জনসমক্ষে ফাঁস করে দিতে যাচ্ছেন। তাহলেই বুঝুন!"

হালদারমশাই দুই ঊরুতে দুই হাত রেখে সোজা হয়ে বসে নীচের দিকে দৃষ্টি রাখলেন। এটা ওঁর চিন্তাকুল ভঙ্গি। কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের মুখে ওঁর এই ভঙ্গিটি বরাবর দেখে আসছি।

কর্নেল ষড়যন্ত্রসংকুল স্বরে বললেন, "আজ সকালে ওঁর স্ত্রী চিত্রাদেবী এসেছিলেন আমার কাছে। উনিও উদ্বিগ্ন! স্বামীর সেফটির ব্যবস্থা করে দিতে বলছিলেন। আমি ওঁকে বলেছি, স্ত্রীই স্বামীর শক্ত সেফটি। কাজেই চিত্রাদেবীও সম্ভবত স্বামীর সহগামিনী হচ্ছেন।"

হালদারমশাই ঘড়ি দেখে বললেন, "পৌনে বারোটা বাজে। ট্রেন বারোটা কুড়িতে। তবে কাল ছাড়ছিল পৌনে একটায়!"

"গতরাত্রে আপনাকে ফোন করেছিলাম—"

এই পর্যন্ত শুনেই হালদারমশাই উঠে পড়লেন। "আগে এ সব জানলে কাঁটালিয়াঘাটে থেকে যেতাম। ঠিক আছে। কর্নেলস্যার যখন বলছেন, তখন আর কী?" বলে জোরে বেরিয়ে গেলেন।

বললাম, "ভদ্রলোক রাত্রি জেগে ক্লান্ত হয়ে সদ্য ফিরেছেন। আবার ওঁকে তাতিয়ে দিয়ে সেখানে ফেরত পাঠালেন?"

কর্নেল হাসলেন। "কী আশ্চর্য! আমি কি একবারও ওঁকে বলেছি আপনি আবার কাঁটালিয়া ঘাটে চলে যান? আমি ওঁকে নিছক কিছু খবর জানিয়েছি।"

"এটাই তো প্রভোকেশন!"

"হ্যাঁ। প্রভোকেশন। জয়ন্ত, হালদারমশাই এবং প্রদীপ মিত্রের মধ্যে তা হলে দেখ কী চমৎকার মিল! যে-কোনও রহস্যভেদে দুজনেই প্রচণ্ড আগ্রহী!"

"ভুলে যাচ্ছেন, আপনিও একজন প্রখ্যাত রহস্যভেদী।"

"বলতে পারো। তবে আমাকে কেউ প্রোভোক করতে পারে না। বিন্দুমাত্র তাতিয়ে দেওয়া চেষ্টা টের পেলে আমি—" কর্নেল হঠাৎ চুপ করলেন। চোখ বুজে হেলান দিয়ে দাড়িতে আঁচড় কাটতে থাকলেন।

বললাম, "আমি চলি, বস্!"

"তোমাকে একটা ছোট্ট কাজের দায়িত্ব দেব বলেছি, জয়ন্ত! পালাতে চাইছ কেন?"

"সরি! ভুলে গিয়েছিলাম।"

কর্নেল পকেট থেকে খুদে নোটবই বের করে পাতা উল্টে বললেন, "হুঁ, ইন্দরজিৎ সিং। শেক্সপিয়ার সরণির ওই বাড়িতে দোতলার তিন-নম্বর ফ্ল্যাটের ওনার। সিঁড়িতে উঠে বাঁদিকের ফ্ল্যাট। ওঁর ফ্ল্যাট থেকে পাঁচ নম্বর সোজাসুজি চোখে পড়ে।"

"আমাকে কী করতে হবে তা-ই বলুন না!"

"পুলিশ সূত্রে জেনেছি, মিঃ সিং একজন ফ্রিল্যান্স জার্নালিস্ট্। অনেক বিদেশি কাগজেও তিনি লেখালিখি করেন। তুমিও একজন জার্নালিস্ট্। তুমি একবার ওঁর সঙ্গে দেখা করো।"

"আমার সঙ্গে ওর চেনাজানা নেই। নামটা চেনা-চেনা মনে হচ্ছে যদিও।"

"আহা, কথাটা শোনো! তুমি ওঁকে মিট করো। ধরো, তুমি তোমাদের বাংলা কাগজের জন্য সমীর রুদ্র সম্পর্কে একটা অন্তর্তদন্তমূলক স্টোরি করতে চাও। তাই ওঁর সাহায্য দরকার। আমার পয়েন্টটা বুঝতে পারছ তো?"

"বুঝতে পারছি। কিন্তু যদি ভদ্রলোক আমাকে পাত্তা না দেন?"

"গিয়ে দেখ না! পুলিশকে যে সব কথা উনি হয়তো বলতে চাননি, তোমাকে বলতে আপত্তি না-ও করতে পারেন।" কর্নেল আমাকে তাড়া দিলেন। "দেরি কোরো না। দরকার হলে তোমার আইডেন্টিটি কার্ড দেখাবে। এমন কি এ-ও বলবে, স্টোরিটা বেরুলে ওঁকেই ক্রেডিট এবং দক্ষিণা দেওয়া হবে।"

"ওঁর ফোন নাম্বার জানেন? ফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে যাওয়া উচিত। তা ছাড়া এখন উনি আছেন কি না, সেটাও তো জানা দরকার। গিয়ে যদি দেখি উনি বেরিয়েছেন?"

"ফোনে ওঁকে পাবে না। কারণ ওঁর ফোন ডেড হয়ে আছে ক'দিন থেকে।"

কিছুক্ষণ পরে সেক্সপিয়ার সরণিতে সেই বাড়ির সামনে গাড়ি রেখে গেটে গেলাম। দারোয়ান টুলে বসে খৈনি ডলছিল। আমাকে দেখে সে বলে উঠল, "এক মিনিট ঠারিয়ে!" তারপর একটা নতুন এক্সারসাইজ খাতা বগল থেকে বের করে দিল। "কিসিকা সাথ মুলাকাত কারনে যাতা, ইসমে লিখ দিজিয়ে। ডেট, টাইম, আপকা অ্যাড্রেস—সব কুছ লিখনা পড়েগা।"

বুঝলাম, ফ্ল্যাট-ওনারদের সোসাইটি এবার সতর্ক হয়েছেন। মনে-মনে হাসলাম। চোর পালালে গৃহস্থের বুদ্ধি বাড়ে বলে একটা বাংলা প্রবাদ আছে। কিন্তু এভাবে কি নিরাপত্তা বজায় রাখা সম্ভব? ভুল নাম-ঠিকানা লিখে যে-কেউ বাড়িতে ঢুকতে পারে। এ মহানগরে শুধু হাতের লেখা দেখে কোনও দুষ্কৃতীকে খুঁজে বের করা খড়ের গাদায় সুচ খোঁজার শামিল।

দারোয়ান আমার লেখার ওপর চোখ বুলিয়ে বলল, "আপ সিং সাবকা সাথ মুলাকাত করনে আয়া?"

ওকে খুশি করার জন্য বললাম, "বাহ্! তব তুম তো ইংলিশ ভি জানতা!"

"থোড়াসা।" সে খাতাটি আগের মতো বগলদাবা করল। বলল, "যাইয়ে। সিংসাব অভি বাহারসে আয়া।"

সিঁড়ি বেয়ে উঠে বাঁদিকে সংকীর্ণ করিডর। তিন নম্বর ফ্ল্যাট থেকে প্রশান্ত সান্যালের পাঁচ নম্বর ফ্ল্যাট সোজাসুজি দেখা যায়। ডোরবেলের সুইচ টেপার প্রায় মিনিট দুই পরে দরজা একটু ফাঁক হল। এক শিখ ভদ্রলোকের মুখ দেখতে পেলাম। চোখে সানগ্লাস, মাথায় পাগড়ি, মোমদেওয়া গোঁফ, দাড়ি কালো সুতোয় সাঁটা। বললেন, "ইয়েস?"

খুব ডাঁটিয়াল লোক দেখছি! ঝটপট নিজের পরিচয় আইডেন্টিটি বের করে দেখাতে যাচ্ছি, বললেন, "নাও আইম বিজি মিস্টার!" তার দরজা বন্ধ করে দিলেন।

অপমানিত বোধ করে চলে এলাম। কর্নেলের বাড়ির দিকে যেতে যেতে হঠাৎ মনে হল, ওই মুখটা কোথায় যেন দেখেছি। ঘরের ভেতর চোখে সানগ্লাস পরেছেন। চোখের অসুখ? কিন্তু মুখটা যেন চেনা।

কর্নেল আমাকে দেখে বললেন, "তোমাকে খুব আপসেট দেখাচ্ছে! এনি মিসহ্যাপ, জয়ন্ত?"

ধপাস করে বসে বললাম, "এভাবে যেখানে-সেখানে আমাকে পাঠাবেন না প্লিজ! অপমানের একশেষ। মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিল লোকটা।"

কর্নেল হাসলেন। "রিপোর্টার হিসেবে তুমি সত্যিই ব্যর্থ, ডার্লিং! রাগ লজ্জা ভয়, এই তিন থাকতে নয় প্রবচনটা একজন ভাল রিপোর্টারের প্রতি প্রযোজ্য।"

"স্বীকার করছি। কিন্তু একই পেশার লোকেদের মধ্যে ওই প্রবচন খাটে না। লোকটা মন্ত্রী নয়, নেতাটেতা নয়, আমলা নয়। আমি তবু তো ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট। আর ও ব্যাটা ফ্রিল্যান্স করে। তার এই ব্যবহার অদ্ভুত। তা ছাড়া মুখটা চেনা মনে হল।"

"চেনা মনে হল?"

"হ্যাঁ। কোথায় যেন দেখেছি। তাছাড়া ওই অ্যাকসেন্টে শিখরা ইংরেজি বলে না।"

কর্নেল একটু পরে বললেন, "তা হলে তোমার মিশন ব্যর্থ হয়নি জয়ন্ত!"

অবাক হয়ে বললাম, "তার মানে?"

কর্নেল চোখ বুজে দাড়িতে হাত বুলিয়ে আস্তে বললেন, "ফরগেট ইট।"

pathagar.net

কর্নেল নীলাদ্রি সরকার

বিকেলে ভবানীপুরে গেলাম অনামিকার মামা হেমাঙ্গবাবুর খোঁজে। একটা জরাজীর্ণ বাড়ির ছাদে ছোট্ট ঘরে থাকতেন হেমাঙ্গবাবু। পুরনো এক বাসিন্দা বললেন, "বাউণ্ডুলে লোক ছিলেন স্যার! দিদিকে ছলেবলে ভুলিয়ে তার বাড়ি বেচে টাকাগুলো মেরে দিয়েছিলেন। তারপর হাওয়া! আমরা ওঁর দিদিকে সাহায্য করতাম। রোগে ভুগে মারা গিয়েছিলেন। আমরাই ওঁকে হাসপাতালে রেখে এসেছিলাম।"

আরেক ভদ্রলোক সন্দিগ্ধভাবে জানতে চাইলেন, হেমাঙ্গবাবুর বিরুদ্ধে কোনও কেস-টেসের তদন্তে এসেছি নাকি। তাঁকে বললাম, "নাহ্। উনি আমার পরিচিত ছিলেন। এ পাড়ায় একটা কাজে এসেছিলাম। হঠাৎ ওঁর কথা মনে পড়ল। তাই একবার দেখা করার ইচ্ছে ছিল।"

আমার গাড়িটা পুরনো আমলের ল্যান্ডরোভার। পৌরাণিক বীরের মতো স্থিতধী এবং শক্তিমান। কিন্তু কসবায় গৌরীদেবীর ফ্ল্যাটে পৌঁছুতে সাড়ে ছটা বেজে গেল। সারাপথ আজ বড্ড বেশি জ্যাম।

একটি কিশোরী দরজা খুলে অবাক চোখে তাকিয়ে রইল। বললাম, "তুমি নিশ্চয় মিম্মি?"

সে আরও অবাক হল। "আপনি আমাকে চেনেন?"

"চিনি তা তো বুঝতেই পারছ।"

"ইমপসিবল! আমি আপনাকে কখনও দেখিনি। আপনি কি ক্রিশ্চিয়ান ফাদার?"

"নাহ্ মিম্মি! খাঁটি বাঙালি।"

মিম্মি চোখে অবিশ্বাস রেখে বলল, "আপনি কার সঙ্গে দেখা করবেন?"

"সমীরবাবুর মায়ের সঙ্গে। বলো, কর্নেল নীলাদ্রি সরকার এসেছেন।"

"দিদা এখন শুয়ে আছে।"

"আহা, গিয়ে তুমি বলো ওঁকে।"

মিম্মি আমার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে ভেতরে গেল। একটু পরে ফিরে এসে বলল, "ভেতরে এসে বসুন। দিদা আসছে।"

সমীরবাবুর মা গৌরীদেবী এসে নমস্কার করে বললেন, "পুলিশের লাহিড়ি সায়েব আপনার কথা আমাকে বলেছেন। দুপুরে ফোন করেছিলেন।"

"ফোনের লাইন কাটা ছিল শুনেছি?"

গৌরীদেবী সোফায় বসে বললেন, "হ্যাঁ। নীচের বক্সে তার ছেঁড়া ছিল। মিম্মির দাদা সেরে দিয়েছে।"

বৃদ্ধাকে লক্ষ করছিলাম। অনেকটা সামলে উঠেছেন। তবে কণ্ঠস্বর ভাঙা। আড়ষ্ট। বললাম, "এ অবস্থায় আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। কথা বলতে আপনার কষ্ট হচ্ছে না তো?"

গৌরীদেবী আস্তে মাথা নাড়লেন। "না। বলুন কী জানতে চান?"

"আপনারা একসময় এন্টালি এলাকায় থাকতেন?"

"হ্যাঁ।" একটু ইতস্তত করে গৌরীদেবী বললেন, "প্রশান্ত, বাসু ওরা সব একই পাড়াতে থাকত। দুজনেই সমীরের বন্ধু ছিল।"

"চারুলতা সেনও থাকতেন?"

"চারু খুব ভাল মেয়ে ছিল। তবে বড্ড বোকা। ওর ভাই এমন সর্বনাশ করবে বুঝতে পারেনি।"

"আপনি ওঁদের বাড়ি বিক্রির কথা বলছেন?"

"বাড়ি বিক্রি। তারপর চারুর মেয়ে ছিল একটা—অনি। অনিকে নিয়েও গোলমেলা। অনিও ভাল। কিন্তু মায়ের মতো বোকা।"

"অনির সঙ্গে সমীরের বিয়ের ব্যাপারটা বলুন?"

গৌরীদেবী একটু চুপ করে থেকে বললেন, "চারু আমার হাতে ধরে বলল। ওদিকে সমীরেরও ইচ্ছে। কী করব?"

pathagar.net

"বিয়ের আগের রাতে অনিকে বাসুবাবু কিডন্যাপ করে—"

"না, না! বাসুও ভাল ছেলে। কিডন্যাপ কেন করবে? অনি পালিয়ে ছিল প্রশান্তর সঙ্গে।"

"আপনি ঠিক জানেন?"

"জানি. মানে আমার তা-ই সন্দেহ হয়েছিল। বাসু তো তখন জামশেদপুরে।"

"সমীরবাবুর মুখে অনি সম্পর্কে কিছু শুনেছেন?"

"সমীর বলত, অনি বাসুর সঙ্গে পালিয়েছিল। ক'বছর আগে সমীর একদিন বলল, অনি বাসুর কাছ থেকে পালিয়ে গেছে। আমি বিশ্বাস করিনি।" গৌরীদেবী মিম্মিকে বললেন, "লক্ষ্মী দিদি! কর্নেল সায়েবের জন্য এক কাপ চায়ের ব্যবস্থা করে দে। তোর মাকে গিয়ে বল্।"

বললাম, "না, না। আমি চা খাই না। আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না।"

গৌরীদেবী তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। মিম্মি ফিক করে হাসল। "কোল্ড ড্রিংক?"

বললাম, "নাহ্। থ্যাংকস।"

"কফি?"

হেসে ফেললাম। "খাব।"

মিম্মি চলে গেল। গৌরীদেবী বললেন, "মিম্মি না থাকলে আমার এবার কী যে হত ভেবে পাই না কর্নেলসায়েব! কোন জন্মে আমার খুব আপন কেউ ছিল মেয়েটা।"

"আচ্ছা, সমীরবাবুর কাছে অনির কোনও ছবি ছিল জানেন?"

"ছবি? অনির ছবি?"

"হ্যাঁ, অনির ছবি। সমীরবাবুর অ্যালবাম নিশ্চয় আছে?"

"দেখাচ্ছি।" বলে গৌরীদেবী ভেতরে গেলেন। একটু পরে দুটো প্রকাণ্ড অ্যালবাম নিয়ে এলেন।

অ্যালবামের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে তরুণ সমীরবাবুর পাশে এক তরুণীর ছবি দেখতে পেলাম। ছবিটা দেখিয়ে বললাম, "ইনি কি আপনার বউমা?"

গৌরীদেবী ছবিটা অনেকক্ষণ ধরে দেখে বললেন, "নাহ্! অনির ছবি।"

দুটো অ্যালবাম ঘাঁটতে সময় লাগল ; মিম্মি কফি আনল। সে আমার পাশে বসে ছবি দেখতে থাকল। একটা পোস্টকার্ড সাইজ ছবির ওপর আঙুল রেখে সে বলল, "এটা কার ছবি দিদা?"

আমি বললাম, "অনি নামে একটি মেয়ের।"

"আপনি চেনেন? কে অনি?"

গৌরীদেবী দেখে নিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, অনির ছবি।"

pathagar.net

বললাম, "ছবিটা আমার দরকার। একটা প্রিন্ট করিয়ে নিয়ে ফেরত দেব।"

গৌরী বললেন, "নিন না। ফেরত দিতে হবে না। ও ছবি আমি কী করব?"

ছবিটা বের করে পকেটস্থ করলাম। মিম্মি বলল, "কে অনি, দিদা?"

"ওকে তুমি চিনবে না ভাই!"

মিম্মি আমার দিকে তাকিয়ে রইল। গৌরীদেবীকে বললাম, "আর একটা কথা। অনির মামাকে আপনি চিনতেন?"

"কয়েকবার দেখেছি। লোকটা ভাল ছিল না। চারু ভাইকে বিশ্বাস করেই সর্বস্বান্ত হয়েছিল। অনি বলত শকুনিমামা।"

"গতকাল বাসুবাবুকে অনেক বছর পরে দেখলেন। চিনতে পেরেছিলেন?"

"প্রথমে চিনতে পারিনি। পরে চিনলাম। বাসু খুব ভাল ছেলে। বাসু আমাকে বলল, প্রশান্তের জন্যই নাকি সমীর স্যুইসাইড করেছে। কেন এ কথা বলল জানি না। জিজ্ঞেস করার মতো মনের অবস্থা ছিল না।"

কফি শেষ করে উঠে দাঁড়ালাম। "চলি! দরকার হলে আবার আসব। বিরক্ত হবেন না তো?"

গৌরীদেবী উঠে এসে দরজা খুলে দিয়ে আস্তে বললেন, "কর্নেলসায়েব! সমু কি সত্যি স্যুইসাইড করেছে?"

"কেন? আপনার কি মনে হচ্ছে ওকে কেউ খুন করেছে?"

গৌরীদেবী দ্বিধাজড়িত ভঙ্গিতে বললেন, "কে জানে! আমার সন্দেহ হচ্ছে। সমু পিস্তল কোথায় পাবে?

"পিস্তল নয়, রিভলভার।"

"একই কথা। কর্নেলসায়েব! ইদানীং সমুর হাবভাব যেন বদলে গিয়েছিল। আমার ছেলেকে আমি ছাড়া কে বেশি চিনবে? সমু কেন যেন খুব ভয়ে-ভয়ে থাকত। প্রয়ই বলত, কেউ তার খোঁজে এসেছিল কি না। আরও সব কথাবার্তা—ঠিক মনে করতে পারছি না।"

মিম্মি বলল, "সমুকাকু স্যুইসাইড করেনি।"

বললাম, "কেন বলো তো?"

"সমুকাকু স্যুইসাইড করলে কিছু লিখে রাখত। কোনও কিছু না লিখে কেউ আজকাল স্যুইসাইড করে না। বাবা বলছিল।"

চুপচাপ চলে এলাম। সারাপথ আমাকে একটা চিন্তা অন্যমনস্ক করে দিচ্ছিল।

ড্রয়িংরুমে বসে অনির ছবিটা খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম। এই ছবিটা স্পষ্ট। অসামান্য সৌন্দর্য বললে কিছু বোঝায় না। এমন কোনও মেয়ে এই ধুলোমাটির জগতে যেন এক অমর্ত্য মায়া। একে নিয়ে তিন যুবকের লড়াই বাধতেই পারে।

রাত আটটায় চিত্রকর সুমিতবাবুকে ফোন করলাম। "সুমিতবাবু! আপনার আঁকা কতদূর এগোল?"

"মর্নিংয়ে পেয়ে যাবেন।"

"সুমিতবাবু! ছবিটার দরকার হবে না। অকারণ আপনাকে পরিশ্রম করিয়েছি। ক্ষমা চাইছি।"

"সে কী!"

"হ্যাঁ। আমি একটা ছবি পেয়ে গেছি। তাতেই কাজ হবে।"

"ঠিক আছে। তবে ছবিটা আমি শেষ করব। আমার স্টুডিওতে থাকবে। যে ছবি পেয়েছেন, মিলিয়ে নিতে পারেন। আমার ধারণা, আপনি অবাক হবেন।"

"অবাক নিশ্চয় হব। তবে আপনি ছবিটা স্টুডিওতেই রাখবেন।"

সুমিতবাবু নিশ্চয় নিরাশ হলেন। কী আর করা যাবে? ভাল নিখুঁত ফটো যখন পেয়ে গেছি, তখন হাতে আঁকা ছবির দরকার নেই।

আধঘণ্টা পরে অরিজিতের টেলিফোন এল। "হাই ওল্ড বস্! দা মিস্ট্রি ইজ সলভ্ড্।"

"কী ভাবে?"

"প্রশান্ত সান্যাল মার্ডারার। গত ২৩ সেপ্টেম্বর সে কলকাতা এসেছিল। দমদম এয়ারপোর্টের পেপার্স থেকে সেটা জানা গেছে।"

"অরিজিৎ! দেশে আরও ইন্টারন্যাশন্যাল ফ্লাইটের জন্য এয়ারপোর্ট আছে। বোম্বে এবং দিল্লির কথাই বলছি।"

একটু পরে অরিজিৎ বলল, "হ্যালো! আর ইউ দেয়ার?"

'ইয়া।"

"আমরা বোম্বে-দিল্লিতে খোঁজ নিচ্ছি। তবে প্রশান্ত সান্যাল যে কিলার, এটা সিওর।"

"ছাড়ছি ডার্লিং!"

ফোন রেখে আবার ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। পঁচিশ বছর আগের একটা চলচ্চিত্র। কোথাও-কোথাও অস্পষ্ট। তবু অনুমান করা যায় ঘটনাবলি।

রাত নটায় ফোন করলাম বৈশম্পায়ন রায়কে। ফ্ল্যাটে কেউ নেই। অনেকক্ষণ রিং হল। ফোন রেখে দিলাম। প্রথম দিন বাসুবাবুকে দেখে মনে হয়েছিল, ভেতরে একটা চাপা উত্তেজনা আছে। কেন এই উত্তেজনা এবং তাগিদ এতদিন পরে? পঁচিশ বছর আগের চলচ্চিত্রে অস্পষ্ট জায়গাগুলো অনুমান করছিলাম। সমীর রুদ্রের সঙ্গে অনির বিয়ের কথা পাকা হয়েছিল। হঠাৎ আগের রাতে অনি নিখোঁজ হয়ে যায়। সতের বছর পরে অনিকে প্রশান্ত সান্যালের স্ত্রীর ভূমিকায় দেখতে পাচ্ছি। তারপর অনির মৃত্যু হয়েছিল। প্রশান্ত পাড়ি জমালেন আমেরিকায়। ভয় পেয়ে পালিয়ে যাননি তো বিদেশে?

ষষ্ঠী এসে বলল, "বাবামশাই, খেতে দেরি হচ্ছে। আমার ঘুম পাচ্ছে খুব।"

বললাম, "টেবিলে খাবার রেখে তুই খেয়ে নে। নাক ডাকিয়ে ঘুমো।"

ষষ্ঠী বেজার হয়ে চলে গেল।

আবার চোখ বুজে চলচ্চিত্রটি দেখতে থাকলাম। অনির জীবনের সতেরটা বছরে অনেকগুলো সিকোয়েন্স থাকা সম্ভব। এই অংশটা একেবারে সাদা হয়ে আছে। তার মৃত্যু কি স্বাভাবিক মৃত্যু? এই প্রশ্নের জবাবটা এই কেসে সবচেয়ে জরুরি।

ফোন বাজল আবার। বিরক্তিকর। সাড়া দিয়ে বললাম, "কর্নেল নীলাদ্রি সরকার বলছি।"

তারপর হালদারমশাইয়ের কথা ভেসে এল। "কর্নেল স্যার! আইজ প্রোগ্রাম পোস্টপন্‌ড্।"

"কিসের প্রোগ্রাম হালদারমশাই?"

"কম্পিটিশনের। অবধূতজি কইয়া দিছেন আগামীকাইল অমাবস্যা। অমাবস্যার রাত্রে স্কেলিটন সিগারেট টানবে।"

"আপনি কোথা থেকে ফোন করছেন?"

"কাঁটালিয়াঘাট থানা থেইক্যা।"

"বড়বাবুর সঙ্গে ভাব জমিয়েছেন মনে হচ্ছে?"

"কী কইলেন? জোরে কন এট্টু। বড্ড ডিসটার্ব করছে।"

"উইশ ইউ গুড লাক।"

"কর্নেলস্যার! আপনি জয়ন্তবাবুরে লইয়া আয়েন। ওনারে কইবেন, সব কাগজ থেইক্যা রিপোর্টার সঙ্গে লইয়া আইছেন প্রদীপবাবু। প্রচুর রহইস্য কর্নেলস্যার!"

"উইশ ইউ গুড লাক।"

"কী কইলেন? হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো—"

লাইনটা কেটে গেল। জয়ন্তের ফ্ল্যাটে ফোন করলাম। জয়ন্ত সাড়া দিল। "রং নাম্বার!"

"এগেন রাইট নাম্বার ডার্লিং!"

জয়ন্তের হাসি শুনলাম। সে বলল, "হঠাৎ রাতদুপুরে হামলার কারণ কী বস্?"

"কাঁটালিয়াঘাটে তোমাদের কাগজের কেউ গেছে জানো?"

"আমি যাইনি।"

"তুমি যাওনি, তা তো বোঝা যাচ্ছে। কাকেও কি পাঠানো হয়েছে?"

"নাহ্। সত্যসেবক এ সব ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড নয়। তা ছাড়া জেলার সদরে আমাদের স্থানীয় সংবাদদাতা আছে।"

"শোনো। এইমাত্র হালদারমশাই ট্রাংককল করেছিলেন। আগামীকাল অমাবস্যা তিথি। কাজেই লড়াইটা হবে আগামীকাল। সব কাগজ থেকে রিপোর্টার গেছেন। সম্ভবত প্রদীপ মিত্র পাবলিসিটি চান।"

"আমাদের কাগজ গ্রাম-টাম এ সব ফালতু ব্যাপারে ইনটারেস্টেড নয়।"

"তুমি সকাল-সকাল চলে এসো।"

"আপনি কাঁটালিয়াঘাট যাবেন নাকি?"

"জানি না। তুমি অবশ্যই এসো। রাখছি। হ্যাভ আ নাইস স্লিপ, ডার্লিং!"

"গুড নাইট ওল্ড বস!"

আজ রাতে নিজের মনের চাঞ্চল্য দেখে নিজেরই অবাক লাগছিল। টেলিফোন করার জন্য আমার অদ্ভুত ব্যগ্রতা। আবার বৈশম্পায়ন রায়কে রিং করলাম। অনেকক্ষণ রিং হল। কেউ সাড়া দিল না। হঠাৎ কোনও জরুরি কাজে বাইরে গেছেন সম্ভবত। নাকি তাঁর কোনও বিপদ হল?

অরিজিতের বাড়িতে রিং করলাম। সাড়া পেলাম। বললাম, "এত রাতে একটু জ্বালাতে হল। সরি ডার্লিং!"

অরিজিৎ বলল, "এনিথিং রং কর্নেল?"

"অরিজিৎ! তোমার বন্ধু মিঃ রায়কে ফোনে পাচ্ছি না। রিং হচ্ছে। কেউ ধরছে না।"

"হয়তো বাইরে গেছে। আমি ওকে বলে দিয়েছি, দা মিস্ট্রি ইজ সলভ্‌ড্‌। তুমি এ নিয়ে আর চিন্তা কোরো না। আমরা প্রশান্তকে দেশে ফেরত পাঠানোর জন্য হাই লেবেলে অ্যাপ্রোচ করছি।"

"অরিজিৎ! লেকটাউন থানাকে বলো, এখনই মিঃ রায়ের ফ্ল্যাটে গিয়ে খোঁজ নিক।"

"আই সি!"

"ইট ইজ আর্জেন্ট, ডার্লিং! কী হল আমাকে জানাবে।"

ফোন রেখে চুরুট ধরালাম। ষষ্ঠী আবার এসে ডাকল, "বাবামশাই!"

"তুই এখনও জেগে আছিস হতভাগা? তোকে বললাম—"

"অনুগ্রু করে আগে খেয়ে নিন।"

ষষ্ঠী বরাবর এরকম করে। কিন্তু আজ হঠাৎ মনে হল, মানুষের সঙ্গে মানুষের এই যে একটা সম্পর্ক, এটা নিশ্চয় কোনও মহত্তর মূল্যবোধের ব্যাপার। এইজন্যই কি মানুষ এখনও চমৎকার টিকে আছে পৃথিবীতে?

খাওয়ার পর আবার ড্রয়িংরুমে গেলাম। অরিজিতের ফোনের প্রতীক্ষা করছিলাম। ফোন এল রাত সাড়ে এগারোটায়। অরিজিৎ বলল, "বাসুর পাশের ফ্ল্যাটের ভদ্রলোকের কাছে জানা গেছে, বাসু বাইরে গেছে। ওঁকে বলে গেছে। আগামী পরশু-তরশু ফিরবে। ডোন্ট ওয়ারি বস! এবার শুয়ে পড়ুন।"

"আর একটা রিকোয়েস্ট।"

"বলুন।"

"শেক্সপিয়ার সরণির ফ্ল্যাটের তিন নম্বরের ওনার ইন্দরজিৎ সিংকে মিট করতে বলো পার্ক স্ট্রিট থানাকে। এ-ও আর্জেন্ট। তুমি বলছিলে ওঁর ফোন খারাপ হয়ে আছে—"

"কর্নেল! প্লিজ—আর ও নিয়ে মাথা ঘামাবেন না।"

"অরিজিৎ! তুমিই আমাকে আসরে নামিয়েছ।"

"বাট দা গেম ইজ ওভার, কর্নেল!"

"না অরিজিৎ! এতক্ষণে খেলার শুরু।"

"বলেন কী?"

"ইন্দরজিৎকে এখনই মিট করা জরুরি।"

ফোন রেখে আবার অনামিকার ফটোটা দেখতে থাকলাম। আবার সেই পুরনো বিবর্ণ চলচ্চিত্র ভেসে উঠল।

রাত বারোটায় অরিজিৎ ফোনে জানাল, ইন্দরজিৎ সিং বাইরে গেছেন। দারোয়ানকে বলে গেছেন, বোম্বে যাচ্ছেন। ফিরতে দেরি হবে।

তা হলে সত্যিই কি আমি মরীচিকার দিকে দৌড়ে চলেছি?...

জয়ন্ত চৌধুরি

আমার ফ্রেন্ড-ফিলজফার-গাইড কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের মাথায় একটা কিছু ঢুকলে আর ছাড়াছাড়ি নেই। একবার নিছক একটা পাখির পেছনে ছোটাছুটি করে সারাদিন না-খাওয়া না-দাওয়া কাটাতে দেখেছি। জায়গাটা ছিল গহন জঙ্গল। বাঘ-ভালুক ছিল প্রচুর।

আমার ঘুম ভাঙতে দেরি হয়েছিল। কর্নেলের অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছুতে সাড়ে আটটা বেজে গেল। গিয়ে দেখি, একটু আগে উনি বেরিয়ে গেছেন। ষষ্ঠী বলল, "বাবামশাই বলে গেছেন, কাগজের দাদাবাবু এলে অপিখ্যে করতে বলিস।"

"তুমি অপিখ্যে করছ! ভাল কথা। আমি এবার অপিখ্যে করি।"

ষষ্ঠীচরণ খি খি করে হাসল। "দাদাবাবু! তা-ই করুন। এই ফাঁকে আমি বাজার করে আসি।"

সে চলে গেল বাজারের থলি-হাতে।

ন্যাশানাল জিওগ্র্যাফিক আমার প্রিয় পত্রিকা। কত অদ্ভুত-অদ্ভুত জায়গা আর তাজ্জব ঘটনার খবর দেয় পত্রিকাটি। সাহারা মরুভূমির বাসিন্দা তুয়ারেজ উপজাতির সচিত্র বিবরণে মন দিলাম। ষষ্ঠী মিনিটকুড়ি পরে ফিরল। সে আমাকে কফি আর স্ন্যাক্স পরিবেশন করল। কফিটা অর্ধেক খাওয়া হয়েছে, ডোরবেল বাজল। কর্নেল ফিরলেন।

বললাম, "আপনার অপিখ্যে করছি।"

কর্নেল হাসলেন না। মুখটা গম্ভীর। ইজিচেয়ারে বসে চুরুট ধরালেন। তারপর বললেন, "আর্টিস্ট সুমিতবাবু ফোন করেছিলেন। ওঁর বাড়ি গিয়েছিলাম। গিয়ে শুনি একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে।"

কর্নেল চুপ করলে বললাম, "অবধূতজির মিরাক্‌ল্?"

"কে জানে? চুরি।"

"চুরি? মানে, সুমিতবাবুর বাড়িতে চুরি? কী চুরি হয়েছে?"

"সেই ছবির একটা রি-টাচ করা ফটোকপি।"

"কী করে চুরি গেল?"

"সুমিতবাবুও খুব অবাক হয়েছেন। ছবিটা দেয়ালে সাঁটা ছিল। নেই। পাশে ইজেলে ওটা দেখেই ছবি আঁকছিলেন। ওঁর আঁকা ছবিতে ধ্যাবড়া করে কেউ রঙ মাখিয়ে দিয়েছে। ছবিটা প্রায় শেষ করে এনেছিলেন।"

"তা হলে মিঃ রায়ের দেওয়া ফটোটা চুরি গেছে বলুন।"

"সেটা ওরিজিন্যাল। সুমিতবাবু ওটা থেকে একটা ফোটোকপি তৈরি করে নিয়েছিলেন। ওরিজিন্যাল ছবিটা অবশ্য আছে।"

"একটু সহজ ভাষায় বলুন না!"

কর্নেল একরাশ ধোঁয়ার মধ্যে বললেন, "সহজ ভাষায় বলেছি, ডার্লিং! আসলে আমার মাথার ভেতর কী একটা হয়েছে গতরাত থেকে। হ্যাঁ, মিঃ রায়ের দেওয়া ছবিটা আছে। কেন আছে, বোঝা যায়। এই ছবিটা ছিল ডার্করুমে অনেক ছবির তলায়। চোর সময় পায়নি খোঁজার। কিন্তু এই ছবি থেকে ফটো তুলে রিটাচ করে যে দ্বিতীয় ফটো তৈরি করেছিলেন সুমিতবাবু, সেটা দেখেই ছবি আঁকছিলেন। দ্বিতীয় ফটোটা নেই। এ দিকে আঁকা ছবিটায় লাল-কালো রঙ মাখিয়ে দিয়ে গেছে চোর।"

"বুঝতে পারলাম। কিন্তু স্টুডিওতে চোর ঢুকল কী করে?"

"সুমিতবাবু বললেন, অন্যমনস্কতার ফলে স্টুডিওর দরজা খোলা ছিল সম্ভবত। আসলে শিল্পীরা বড় অন্যমনস্ক থাকেন। জয়িতা—ওঁর বোন কাঁটালিয়াঘাটে গুরুদেবকে দর্শন করতে গেছেন গতকাল। জয়িতাই রাত্রে দরজা বন্ধ আছে কি না চেক করেন। কারণ উনি খামখেয়ালি দাদার স্বভাব জানেন।" কর্নেল চোখ বুজে হেলান দিলেন। "কিন্তু আরেকটা অদ্ভুত ব্যাপার হল, কাল সন্ধ্যায় এক শিখ ভদ্রলোক গিয়েছিলেন ছবি কিনতে।"

চমকে উঠে বললাম, "ইন্দরজিৎ নন তো?"

"তা বলা কঠিন। ইন্দরজিৎ গতকাল বোম্বে গেছেন।"

"যা-ই বলুন, ইন্দরজিৎ মিসটিরিয়াস ক্যারেকটার।"

"তুমি ওঁর ওপর এখনও রেগে আছ, জয়ন্ত!"

ষষ্ঠী কফি আনল 'বাবামশাইয়ে'র জন্য। উনি চোখ বুজে আছেন দেখে বলল, "কফি বাবামশাই!"

pathagar.net

কর্নেল চোখ খুলে কফির পেয়ালা তুলে নিলেন। বললেন, "এগারোটার মধ্যে আমরা খেয়ে নেব। মনে আছে তো?"

ষষ্ঠী বলল, "মনে আছে। দাদাবাবুও খাবেন।"

সে চলে গেলে বললাম, "এত সকাল-সকাল খেয়ে কোথায় যাবেন?"

"কাঁটালিয়াঘাট। তুমিও যাবে।"

"কী সর্বনাশ!"

কর্নেল আস্তে বললেন, "হ্যাঁ, একটা সর্বনাশের আশঙ্কা আমিও করছি, জয়ন্ত! তবে তৈরি থাকো। তোমার কাগজের জন্য একটা চমৎকার স্টোরি পাবে।"

একটু ভেবে নিয়ে বললাম, "স্টোরির কথা পরে। কিন্তু শিখ ভদ্রলোক কী ছবি কিনতে গিয়েছিলেন?"

"যে-কোনও ছবি। উনি নাকি সুমিতবাবুর ভক্ত।"

"ছবি কিনেছেন?"

"একটা ছবির দরদাম করে এসেছেন।" কর্নেল কফিতে চুমুক দিলেন। "আমি ন্যায়শাস্ত্রে অবভাসতত্ত্ব আওড়াই। সবসময় দুইয়ে দুইয়ে চার হয় না—এও বলি। কিন্তু ব্যাপারটা হয়তো কাকতালীয় নয়।"

"তার মানে, ইন্দ্রজিৎ সিংহই গিয়েছিলেন?"

"ওই তো বললাম, এটা বলা কঠিন। কিন্তু প্রশ্ন হল, কে চাইছে না অনামিকার ছবি আঁকা হোক? সে কে? কেন সে—"

কর্নেল হঠাৎ চুপ করলেন। বললাম, "শিখ ভদ্রলোক নিজের পরিচয় দেননি?"

"নিজেকে ইন্দ্রজিৎ বলেননি, এটা সুমিতবাবুর মনে আছে।"

"অনামিকার ছবিটা সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করেননি?"

কর্নেল একটু হেসে বললেন, "নাহ। তোমাকে বলেছি জয়ন্ত, উনি শুধু একটা ছবি কিনতে গিয়েছিলেন। যে ছবিটা ওঁর পছন্দ হয়েছিল, সেটা এক মৃত ব্যবসায়ীর পোর্ট্রেট। তাঁর ছেলেরা বাবার ছবি দেখে চটে গিয়েছিল। নেয়নি। ছবিটা আমি দেখলাম। পোর্ট্রেট হিসাবে অসাধারণ। কিন্তু দেখলেই কেমন নিষ্ঠুর খুনী মানুষের মুখ মনে হয়। হ্যাঁ, মুখ দেখে মানুষের সত্যিকার পরিচয় পাওয়া যায় না। এ-ও ঠিক।"

কর্নেল চুপচাপ কফির পেয়ালা শেষ করে নিভে যাওয়া চুরুট ধরালেন। বললাম, "আপনি তো অনেক সময় ডাইনে-বাঁয়ে সামনে-পেছনে রহস্য নিয়ে হাঁটেন। ব্যবসায়ী ভদ্রলোকের ঠিকানা নিয়ে আসা উচিত ছিল। কিছু বলা যায় না। ওঁর ছবি কিনতেই বা কেন আগ্রহ হল শিখ ভদ্রলোকের?"

"জয়ন্ত! লাল হেরিং মাছের পেছনে ছোটা আর মরীচিকার দিকে ছোটা একই ব্যাপার।" বলে হঠাৎ একটু উত্তেজিত হলেন কর্নেল। "ডার্লিং! জীবনে আমাকে কেউ বোকা বানাতে পারেনি। এই প্রথম আমাকে বোকা বানাতে চাইছে কেউ। এ যেন আমার সঙ্গে অঘোষিত যুদ্ধ!"

এই সময় ডোরবেল বাজল। কর্নেল হাঁকলেন, "ষষ্ঠী!"

pathagar.net

ডি সি ডি ডি অরিজিৎ লাহিড়ি এলেন। "জয়ন্তবাবু যে! গুরুশিষ্য দুজনেই এত গম্ভীর। কী ব্যাপার?"

আমি কথা বলতে যাচ্ছিলাম, কর্নেল আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "সুমিত গুপ্ত ফোন করেছিলেন তোমাকে?"

অরিজিৎ হাসলেন। "আপনার এ প্রশ্নে অবাক হচ্ছি না।"

"ফোন করেছিলেন সুমিতবাবু?"

"হ্যাঁ। আমার মনে হয়, প্রশান্তেরই কীর্তি। সে এখনও কলকাতা ছেড়ে চলে যেতে পারেনি।

"কিন্তু অরিজিৎ, প্রশান্ত সান্যাল কেন অনামিকার ছবি নষ্ট করবেন কিংবা রিটাচ করা ফটো চুরি করবেন?"

অরিজিৎ মিটিমিটি হেসে বললেন, "ইউ নো দা পোলিস নেটওয়ার্ক। প্রশান্তের ভাই তাপসকে জেরা করে জানা গেছে, প্রশান্তই অনামিকা সেনকে এলোপ করেছিল। তাকে সাহায্য করেছিলেন অনামিকার মামা হেমাঙ্গ সেনগুপ্ত। সমীরবাবুকে ভদ্রলোক অপছন্দ করতেন।"

কর্নেল বললেন, "আমি বলছি। অনামিকাকে বিয়ে করলে হেমাঙ্গবাবু দিদির বাড়ি বেচে টাকা আত্মসাতের সুযোগ পেতেন না। সমীরবাবু বাধা দিতেন। তাই হেমাঙ্গবাবু নিজের ভাগনি এবং প্রশান্তকে কলকাতার বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর কিডন্যাপ কেস সাজিয়েছিলেন প্রশান্ত এবং বাসুবাবু দুজনেরই নামে। আমার এই থিওরি।"

"কারেক্ট।" অরিজিৎ জোর দিয়ে বললেন। "এন্টালি থানার পুরনো রেকর্ডে দুজনের নামেই এফ আই আর করার হদিস মিলেছে। অবশ্য বাসু নির্দোষ। কারণ ওইসময় সে সত্যি জামশেদপুরে ছিল। এদিকে প্রশান্ত অনামিকাকে নিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায়। আটবছর আগে অনামিকা—"

"অনামিকা তার মাকে চিঠি লিখে জানায়, সে ভাল আছে।"

"আপনার তদন্তের এই অংশ ঠিক আছে।"

"কোন অংশ ঠিক নেই?"

"আপনি প্রশান্তকে ক্লিন সার্টিফিকেট দিচ্ছেন।"

"আমি কাউকে কোনও সার্টিফিকেট দিইনি, অরিজিৎ!"

অরিজিৎ ঘড়ি দেখে বললেন, "কফি খাব না। উঠি।"

"অনামিকা সেন ওয়জ মার্ডার্ড, অরিজিৎ!"

অরিজিৎ তাকালেন।

"হ্যাঁ। আট বা সাত বছর আগের ফেরারি আসামীর রেকর্ড খুঁজে দেখা দরকার।"

আরিজিৎ হাসলেন। "অলরেডি খোঁজা হচ্ছে।"

"বধূহত্যা সংক্রান্ত রেকর্ড খুঁজে দেখ।"

অরিজিৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "কর্নেল! পুলিশ অত ফুলিশ নয়, ইউ নো

দ্যাট। লোকে বলে পুলিশ ইচ্ছে করলে অনেক কিছু পারে। করে না। দ্যাটস্ রাইট। তবে ক্ষেত্র বিশেষে পুলিশ কী অসাধ্য সাধন করে, আশা করি জানেন।"

অরিজিৎ দরজার কাছে গেছেন, কর্নেল বললেন, "অরিজিৎ! আমরা আজ দুপুরের ট্রেনে কাঁটালিয়াঘাটে অবধূতদর্শনে যাচ্ছি।"

"অবধূত দর্শন! হোয়াটস্ দ্যাট?"

"দ্যাটস্ দ্যাট, ডার্লিং!"

অরিজিৎ লাহিড়ি ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন।

কর্নেল বললেন, "আজ অমাবস্যার রাত্রে কালীপুজোর ধুমও দেখব। শুনেছি, কাঁটালিয়াঘাটের শ্মশানকালী জাগ্রত দেবী। তবে অবধূতজি একটা নর—সরি, নারীকংকালের মুখে সিগারেট টানা দেখাবেন। তাঁকে চ্যালেঞ্জ করতে গেছেন বিজ্ঞান প্রচার সমিতির প্রদীপ মিত্র। খুব জমজমাট লড়াই হবে।"

অরিজিৎ হাসতে হাসতে চলে গেলেন।

বললাম, "লাহিড়িসায়েব ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিলেন না!"

কর্নেল মুচকি হেসে বললেন, "অরিজিৎ ইজ চেজিং আফটার আ রেড হেরিং। আমারই মতো। তবে আমি এখন সেটা টের পেয়েছি। ও পায়নি।"

একটু অবাক হয়ে বললাম, "অনামিকা খুন হয়েছে বললেন আপনি। বধূহত্যার পুরনো রেকর্ড খুঁজতে বললেন। এখন বলছেন, লাল হেরিংয়ের পেছনে দৌড়ুচ্ছেন লাহিড়িসায়েব। আপনার এই এক অদ্ভুত স্বভাব বস্! হেঁয়ালি করা!"

"হ্যাঁ। হেঁয়ালি বলেই হেঁয়ালি করছি।"

বলে কর্নেল ড্রয়ার থেকে একটা ছবি বের করে আমার হাতে দিলেন। উনিশ কুড়ি বছর বয়সের এক অসামান্য সুন্দরী তরুণীর ফটো। বললাম, "কার ছবি?"

"অনামিকা সেনের। সমীরবাবুর অ্যালবাম থেকে চেয়ে এনেছি।"

"তা হলে সুমিতবাবুর স্টুডিওর চোর বোকা বনে গেল।"

"তা তো গেলই।"

"ভি রায়ের দেওয়া ছবিটার সঙ্গে মিলিয়ে দেখি। দিন তো!"

কর্নেল ড্রয়ার থেকে খামে ভরা ছবিটা বের করে দিলেন। মেলাতে গিয়ে মনে হল, দুটো ছবি কিছুতেই একজনের নয়। বললাম, "কর্নেল! আপনার ভুল হয়েছে। এ দুটো ছবি একজনের হতে পারে না।"

"একটা অস্পষ্ট বে-রঙা ছবি। অন্যটা অক্ষত ছবি। কাজেই মিল হবে না। তাছাড়া সব ফোটোতে দেখবে, একই মানুষের ছবি একেক রকম। আলোর ত্রুটি, নেগেটিভ ডেভালাপের ত্রুটি, প্রিন্টের ত্রুটি, রিটাচ করার ত্রুটি—অসংখ্য ত্রুটি এর কারণ।"

"তা ঠিক। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বড্ড বেশি গরমিল।"

কর্নেল টাকে হাত বুলিয়ে তারপর দাড়ি মুঠোয় ধরলেন। আস্তে বললেন, "মিঃ রায়ের দেওয়া ছবিতে কোনও কেমিক্যাল জিনিস দৈবাৎ পড়ে গিয়েছিল। ছবিটা অক্ষত থাকার কথা। কিন্তু যেন কোনও অ্যাকসিডেন্টে নষ্ট হয়ে গেছে।"

টেলিফোনে রিং হল। আমি টেলিফোনের কাছে। তাই সাড়া দিলাম। একটি মেয়ের গলা ভেসে এল। "কর্নেলদাদু?"

বললাম, "ধরুন দিচ্ছি।"

কর্নেল ফোন নিয়ে বললেন, "বলছি।...ও! তুমি মিম্মি? কী ব্যাপার?...বলো কী! তা হলে তো চোর লোকটি সাধু!...সাধু নয়? হাঃ হাঃ হাঃ!...না, না! ব্যাগ নিয়ে আসার দরকার নেই। আমিই যাচ্ছি। এখনই যাচ্ছি।"

কর্নেল ফোন রেখে উঠে দাঁড়ালেন। বললাম, "কী ব্যাপার?"

"ব্যাপার বুঝতে তোমার অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। চলো, ঘুরে আসি।"

"বুঝেছি। কসবায় সমীরবাবুর ফ্ল্যাট থেকে যে হ্যান্ডব্যাগটা চুরি গিয়েছিল, চোর সেটা ফেরত দিয়েছে।"

কসবায় সমীরবাবুর ফ্ল্যাট কোথায় আমি জানি না। কর্নেলের নির্দেশ অনুসারে ড্রাইভ করছিলাম। শেষপর্যন্ত যেখানে কর্নেল থামতে বললেন, সেটা সংকীর্ণ রাস্তা। একটা পুকুরের পাশে বাড়িটা। গেটের ভেতর একচিলতে ফুলবাগিচা। বারো-তেরো বছরের একটি মেয়ে গেটে দাঁড়িয়ে ছিল। কর্নেলকে দেখে সে হইচই শুরু করল। গেটের ভেতর একটা পাতাবাহারের ঝোপ দেখিয়ে বলল, "এখানে! এই গাছটার ভেতর পড়েছিল। দিদা দেখতে পায়নি। আমি দেখতে পেয়েছি।"

সে আমাদের দোতলায় নিয়ে গেল। এক বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে ছিলেন ব্যালকনিতে। কর্নেল তাঁকে নমস্কার করলেন। আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। সমীরবাবুর মা গৌরী দেবী।

ঘরে ঢুকে আমরা বসতে না বসতে কিশোরী মেয়েটি একটা ছোট্ট হ্যান্ডব্যাগ নিয়ে এল। কর্নেল ব্যাগটা খুলে ভেতরটা দেখে বললেন, "কিছু নেই দেখছি। খালি ব্যাগ ফেলে দিয়ে গেছে চোর। মিম্মি! তুমি ঠিকই বলছিলে। চোর লোকটি সাধু নয়।"

মিম্মি হাসল। "পাঁচিল গলিয়ে ফেলে দিয়ে গেছে। কিন্তু আপনি ভেতরকার চেনটা খুলে দেখুন!" বলে সে নিজেই চেন খুলে একটা ময়লা ভঁজকরা কাগজ বের করে দিল।

কর্নেল সেটা খুলে পড়ার পর আমাকে দিলেন। দেখি, মেয়েলি ছাঁদে লেখা একটা চিঠি। প্রেমপত্র নাকি?

'সমীরদা,

বিপদে পড়ে চিঠিটা লিখছি। প্রশান্ত আমাকে আটকে রেখেছে। ওর পোষা গুণ্ডারা সবসময় আমাকে পাহারা দেয়। তুমি পুলিশকে জানালে এরা টের পাবে। তা হলে আমাকে মেরেই ফেলবে। তুমি গোপনে এসে আমাকে যে-ভাবে পারো, এখান থেকে নিয়ে যাও। তোমারও তো দলবল আছে। তুমি ছাড়া আমাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। আমি যেমন ভুল করেছি, তেমনি তার প্রায়শ্চিত্ত করছি। আমার

শকুনিমামাই ষড়যন্ত্র করে আমাকে প্রশান্তের হাতে তুলে দিয়েছিল। বিশ্বাসী একটা লোকের হাতে চিঠিটা পাঠালাম। সাক্ষাতে সব বলব। ইতি

অনি'

লেখা কোথাও-কালিতে জেবড়ে গেছে। কোথাও অস্পষ্ট। তবে পড়া যায়। চিঠিটা পড়ে কর্নেলকে ফেরত দিলাম। কর্নেল বললেন, "মিম্মি! সত্যিই চোর লোকটা সাধু নয়। তবে সে এই চিঠিটা নেয়নি কেন, সেটাই অদ্ভুত!"

মিম্মি বলল, "চিঠি নিয়ে কী করবে? টাকাগুলো নিয়েছে।"

গৌরীদেবী বললেন, "ওতে সমীর খুচরো টাকাকড়ি রাখত। টেবিলে বা বিছানায় ফেলে রাখত। সেজন্যই আমার ওটার কথা মনে পড়েছিল। থিয়েটার রোডের ফ্ল্যাটে ব্যাগটা দেখিনি। তাই ভেবেছিলাম, বাড়িতে রেখেছে।"

কর্নেল চিঠিটা পকেটে ঢুকিয়ে বললেন, "পুলিশকে এটা জানানো দরকার। আমিই জানাব। শুধু একটা কথা। আপনি এই ঘটনা কাকেও জানাবেন না। মিম্মি! তুমিও কাউকে বলবে না কিন্তু।"

মিম্মি বলল, "আপনি ওটা নিচ্ছেন কেন?"

"তুমি চিঠি পড়েছ?"

মিম্মি মাথা দোলাল। গৌরীদেবী বললেন, "অনির চিঠিটা মিম্মি আমাকে পড়ে শুনিয়েছে। আমার খুব অবাক লেগেছে। সমু ইচ্ছে করলেই ওকে বাঁচাতে পারত। কেন বাঁচায়নি জানি না।"

"আপনার ধারণা অনি বেঁচে নেই?"

একটু দ্বিধার পর গৌরীদেবী বললেন, "সমু একবার বলেছিল যেন—অনিকে কেউ মার্ডার করেছে। প্রশান্ত মার্ডার করেছে বলেনি। প্রশান্তের সঙ্গে ওর শত্রুতা ছিল না। তবে ভেতরকার কথা কে জানে বলুন?"

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "একটু পরেই কলকাতার বাইরে এক জায়গায় যাব। ইতিমধ্যে নতুন কিছু ঘটলে ডি সি ডি ডি লাহিড়িসায়েবকে ফোনে যোগাযোগ করবেন।"

মিম্মি গেট পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে এল। আবার বলল, "কর্নেলদাদু! আপনি চিঠিটা নিলেন কেন?"

কর্নেল আস্তে বললেন, "চোরটাকে ধরতে হবে তো!"

মিম্মি অবাক চোখে তাকিয়ে রইল।...

পথে যেতে যেতে বললাম, "দা মিস্ট্রি ইজ সলভড্। তবু খামোকা ছুটোছুটি করে বেড়ানোর মানে হয় না।"

কর্নেল একটু হাসলেন। "খেলার দ্বিতীয় পর্যায়ে পৌঁছেছি জয়ন্ত! বাই দা বাই, তুমি রিয়ার ভিউ মিররে একটা কালো গাড়ি লক্ষ করেছ কি? গাড়িটা এলিয়ট রোড থেকে আমাদের পিছু নিয়েছিল। এখন আবার পিছু নিয়েছে।"

pathagar.net

চমকে উঠে গাড়িটা দেখতে পেলাম। বিজন সেতু জোরে পেরিয়ে গিয়ে খানিকটা চলার পর স্যুইনহো স্ট্রিটে ঢুকলাম। গাড়িটা তখনও পেছনে। একটা বাঁকের মুখে কর্নেল থামতে বললেন। তারপর নেমে গেলেন।

আমিও নেমে গেলাম। কালো গাড়িটা আমাদের চাপা দেওয়ার ভঙ্গিতে জোরে ছুটে এল। দুজনে সরে দাঁড়ালাম। এক পলকের জন্য দেখলাম, গাড়িটা ড্রাইভ করছে একজন শিখ সর্দারজি। ইন্দরজিৎ সিং?

কর্নেল বললেন, "শিগগির জয়ন্ত! ফলো করো।"

গড়িয়াহাট রোডে পৌঁছে হারিয়ে ফেললাম গাড়িটাকে। কর্নেল নোটবইয়ে নম্বর টুকে নিচ্ছিলেন। বললেন, "নাম্বারটা নিলাম বটে, তবে ফলস্ নাম্বার হওয়াই সম্ভব।"

"কর্নেল! লোকটা শিখ। ইন্দরজিৎ বলেই মনে হল।"

কর্নেল আস্তে বললেন, "আমার এতদিনে সত্যি বাহাত্তুরে ধরেছে, ডার্লিং! গতকাল আমি যেন এই গাড়িটাকে ভবানীপুর থেকে কসবা অব্দি ফলো করতে দেখেছিলাম। গ্রাহ্য করিনি। এতক্ষণে মনে হচ্ছে, আমার ওই থিওরিটা কত নির্ভুল।"

"কোন থিওরিটা?"

"অনেক সময় আমরা জানি না যে, আমরা কী জানি এবং অনেক সময় আমরা দেখি না যে, আমরা কী দেখছি।" বলেই কর্নেল স্টিয়ারিঙে হাত রাখলেন। "বাঁদিকে ঢোকো, জয়ন্ত! কালো গাড়িটা আমাদের ফলো করার জন্য সামনের ক্রসিঙে ঘুরছে।"

খাপ্পা হয়ে বললাম, "দিনদুপুরে এই ভিড়ে এত সাহস!"

"গোঁয়ার্তুমি কোরো না। আজকাল দিনদুপুরে অনেক কিছু ঘটে।"

অগত্যা বাঁদিকে ঢুকে ঘুরতে ঘুরতে শরৎ বোস রোড, তারপর চৌরঙ্গি হয়ে ঘুরে ফ্রিস্কুল স্ট্রিট হয়ে ইলিয়ট রোডে কর্নেলের বাড়িতে পৌঁছুলাম। উত্তেজনায় আমার হাত কাঁপছিল। আমার বৃদ্ধ বন্ধু কিন্তু নির্বিকার।

কর্নেলের ড্রয়িংরুমে ঢুকে ধপাস করে বসে বললাম, "লাহিড়িসায়েবকে ঘটনাটা জানিয়ে দিন।"

কর্নেল হাত তুলে বললেন, "ছেড়ে দাও!"

"ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না, কর্নেল! ইন্দরজিৎ সিং প্রশান্ত সান্যালের লোক। এটা অন্তত জানানো দরকার।"

কর্নেল হাসলেন। "হোক না। ওকে একটু খেলতে দেওয়া উচিত।"

বৈশম্পায়ন রায়

কে তুমি?

অনি।

কেন এলে?

তুমি কী সুখে আছ দেখতে এলাম।

আমি সুখেই আছি অনি! আমার অনেক টাকা। বাড়ি। গাড়ি। মানুষের একরত্তি জীবনে এ সবই তো অনেক বড় সুখ। এই সুখের জন্য সারা পৃথিবীর মানুষ ইঁদুরদৌড়ে নেমেছে।

তুমি সুখে নেই, বাসুদা!

তা-ই বুঝি? কিসে বুঝলে?

এই যে তুমি হঠাৎ-হঠাৎ ঝিম মেরে বসে থাকো। কোনও কাজে মন লাগে না। মধ্যরাতের বাতাস কিংবা বৃষ্টিতে তুমি ভুল শব্দ শোনো। ডোরবেল বাজলে তুমি চমকে ওঠ। সিঁড়িতে শোনো কার পায়ের শব্দ। রাস্তায় যেতে যেতে বারবার পিছু ফিরে দেখে নাও কেউ তোমাকে অনুসরণ করছে কি না। তুমি—

অনি! তুমি আমাকে জ্বালিও না!

যতদিন তুমি বাঁচবে, তোমাকে এমনি করে জ্বালাতে আসব। তোমার সুখে কাঁটা হয়ে বিঁধব।

তুমি চলে যাও!

কী করে যাব? আমি তো তোমার মধ্যেই লুকিয়ে আছি, বাসুদা! মাঝেমাঝে এমনি করে উঠে আসব। তুমি ভয় পাবে। মধ্যরাতের বাতাসের শব্দে—বৃষ্টির শব্দে—সিঁড়িতে পায়ের শব্দে। আমি তোমার পেছনের আততায়ী।

আমি তোমাকে ভুলে গিয়েছিলাম। হতভাগা সমীর—

চুপ! চুপ! দেয়ালের কান আছে।

থাক্। আমি মরিয়া হয়ে উঠেছি, অনি!

বাসুদা! আমি তোমার নিয়তি। সতর্ক হও।...

"স্যার!"

দেখলাম মিসেস অ্যারাথুন টেবিলের ওপাশে বসে আছে। ঘড়ি দেখলাম। "দ্যাটস্ অল, মিসেস অ্যারাথুন।"

"দা সেন্টেন্স্ ইজ নট ইয়েট কমপ্লিট স্যার!"

"ইউ ডু দ্যাট। ইউ কান ডু দ্যাট। ইজন্ট ইট, মিসেস অ্যারাথুন?"

পি এ মিসেস অ্যারাথুন এটা পারে। সে হাসিমুখে টাইপ করতে গেল। একটা সিগারেট ধরিয়ে টেবিলের সুইচ টিপে রাম সিংকে ডাকলাম। রাম সিং সেলাম দিল এসে। বললাম, "রাম সিং! তুম হামকো হাওড়া স্টেশন পঁহুচ দেনা আউর কার লেকে ঘুমনা। মেরা কার কর্তারজি কা গ্যারাজমে রাখ দেনা। ঠিক হ্যায়?"

"জি সাব।"

"কারমে যাকে ব্যইঠো। হাম পাঁচ মিনটকে বাদ যাতা।"

রাম সিং চলে গেল। হেলান দিয়ে চোখ বুজলাম। আবার অনিকে দেখতে পেলাম। পরনে গেরুয়া শাড়ি। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। কপালে লাল তিলক। হাতে ত্রিশূল। ভৈরবী!

বাসুদা!

বলো অনি!

কী দেখছ?

তোমাকে অসাধারণ দেখাচ্ছে। দেবীর মতো!

আমি তো দেবীই। প্রশান্ত ভুল করেছিল। তুমিও, বাসুদা!

হ্যাঁ, তুমি দেবভোগ্যা! কারণ তুমি সত্যিই দেবী। এতদিনে জেনেছি।

দেবী আবার রক্ত চাইতে এসেছে। দাও।

অনি! কেন তোমার এত রক্তের তৃষ্ণা?

আজ আবার সেই অমাবস্যা। যে অমাবস্যার রাতে তুমি—

শাট আপ!

"স্যার!"

চোখ খুলে দেখি মিসেস অ্যারাথুন। বললাম, "থ্যাংকস্!"

"ইওর সিগনেচার, স্যার!"

"সরি!" ওর হাত থেকে চিঠিগুলো নিয়ে সই করে দিলাম। ও চলে গেল। উঠে দাঁড়ালাম। ড্রয়ার থেকে পয়েন্ট আটত্রিশ ক্যালিবার রিভলভার বের করে ব্রিফকেসে ঢোকালাম।

নীচের রাস্তায় এসে মনে হল, ঠিক করছি না। গাড়ির কাছে গিয়ে বললাম, "রাম সিং! আভি পৌনে এগারা বাজ রহা। তুমকো যানে কা কৈ জরুরত নেহি। হামকো ঘর যানা পড়ে। আপিসমে যাও। আপনা কাম করো।"

রাম সিং গাড়ি থেকে বেরিয়ে সেলাম দিয়ে চলে গেল। লেকটাউনে ফিরে গেলাম। এক ঘণ্টা লেগে গেল। দিনে দিনে ট্র্যাফিক জ্যাম বাড়ছে। আমার নিয়তি।

হাওড়া স্টেশনে ফোন করলাম। এই ট্রেনটা ধরা যাবে না। পরের ট্রেন বিকেল চারটে পনের। ঘণ্টা পাঁচেকের জার্নি।

কাজের ছেলেটি আজও ফেরেনি। তাকে আর দরকার নেই। স্নান করে কিচেনে গেলাম। যেমন-তেমন একটা লাঞ্চ যথেষ্ট। কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না।

কে?

অনি।

আবার কী?

কেমন সেজেছি দেখ বাসুদা!

ফিল্মস্টারের মতো। তোমার ভৈরবীসাজ বদলে এলে কেন, অনি?

তোমাকে ছুঁতে পাব বলে।

তুমি আমাকে ঘৃণা করতে!

এখনও করি।

কেন অনি?

প্রথম সমুদ্র দেখার স্মৃতি। তুমি আমাকে ঘৃণা উপহার দিয়েছিলে। আমি দিয়েছিলাম প্রেম। ভেবেছিলাম সমুদ্র থেকে প্রেম নিয়ে ফিরব। ফিরেছিলাম ঘৃণা নিয়ে। সেই থেকে পুরুষ জাতটার ওপর আমার ঘৃণা।

প্রশান্তকে তুমি—

না!

প্রশান্তের সঙ্গে তুমি বিয়ের আগের রাতে—

না!

সতের বছর তুমি প্রশান্তের সঙ্গে—

না! না! না!

তা হলে কি আমি ভুল বুঝেছিলাম?

সে তুমিই জানো!

কিন্তু আবার কেন জ্বালাতে এলে, অনি?

তুমি আমাকে ভোলোনি। ভোলো না। সমস্ত সময় তোমার সব ভাবনার তলা দিয়ে গোপনে আমি বয়ে চলেছি। তোমার ভাবনার তলায় আমার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে, বাসুদা! আমাকে মাথা তুলতে দাও।

এই তো দিয়েছি।

আমাকে দেখ!

এই তো দেখছি।

তা হলে কেন আজ বিকেলের ট্রেনে তুমি—

শাট আপ!

প্রেসারকুকার শিস দিল। চমকে উঠলাম। কিছুক্ষণ শূন্য দৃষ্টে তাকিয়ে থাকলাম জানালার দিকে। তারপর লকেটটা দুহাতে তুলে ধরলাম। ক্ষমা করো প্রভু! তুমি আমাকে এতদিন শক্তি দিয়ে এসেছ। টার্গেটে পৌঁছুনো পর্যন্ত সাহস দাও।

কিছুক্ষণ পরে সামান্য একটু খেয়ে উঠে পড়লাম। খাদ্য এত বিস্বাদ হয়ে যাচ্ছে দিনে-দিনে। আমি সত্যিই সুখে নেই।

দুটোয় কর্নেল নীলাদ্রি সরকারকে ফোন করলাম। ওঁর কাজের লোকটি বলল, "বাবামশাই তো নেই। বাইরে গেছেন। ফিরতে দেরি হবে।"

অরিজিৎকে ফোন করলাম। অরিজিৎ বলল, "ডোন্ট ওয়ারি বাসু! প্রশান্তকে আমরা শিগগির পাকড়াও করে ফেলব। সে এখনও কলকাতা ছেড়ে পালাতে পারেনি। আর শোনো, পুরনো রেকর্ড ঘেঁটে একটা কেস পাওয়া গেল। অনামিকা সেনকে খুনের দায়ে প্রশান্তের নাম ওয়ান্টেড তালিকায় আছে।"

"অনি ওয়জ মার্ডার্ড? অরিজিৎ! কী বলছ তুমি!"

"হ্যাঁ। প্রশান্ত ওকে খুন করে অ্যামেরিকা পালিয়েছিল। কেসটা এখনও ঝুলছে। কাজেই দুটো খুনের অভিযোগ ঝুলছে তার নামে।"

pathagar.net

"থ্যাংকস্ অরিজিৎ। বাই দা বাই, কর্নেল—"

"কর্নেল গেছেন কাঁটালিয়াঘাটে এক সাধুর দর্শনে।"

ফোন রেখে দিলাম।

কর্নেল নীলাদ্রি সরকার

কাঁটালিয়াঘাটে অনেক বছর আগে একবার এসেছিলাম। শ্মশান এলাকায় তখন ঘন জঙ্গল ছিল। জগন্নাথ প্রজাপতির একটা ঝাঁকের খোঁজ পেয়েই আসা। ওড়িশায় এই প্রজাতির প্রজাপতি অনেক দেখেছি। এখন এখানে সেই জঙ্গল নেই। তাই জগন্নাথ প্রজাপতিও হয়তো আর নেই। কাঁটালিয়াঘাট রীতিমতো শহর হয়ে উঠেছে। ট্যুরিস্ট লজ শ্মশানের কাছাকাছি। কিন্তু সেখানে ঠাঁই নেই। অমাবস্যার জাগ্রত কালীদর্শনে সরকারি কর্তাদের বড় ভিড়। অগত্যা হোটেল সম্রাটে গিয়ে ঠাঁই পেলাম।

চারতলা নতুন হোটেল। একেবারে গঙ্গার ধারে। আশ্বস্ত হলাম শুনে যে, হোটেলক্যান্টিনে কফি অঢেল মেলে। চারতলায় উত্তর-পূর্ব কোণের ডাবলবেড স্যুট। এয়ারকন্ডিশনের ব্যবস্থা আছে। ব্যালকনিতে বসে গঙ্গার সৌন্দর্য দেখলাম কিছুক্ষণ। বাইনোকুলারে পাখি খোঁজার ব্যর্থ চেষ্টা করলাম। জয়ন্ত বলল, "হালদারমশাইয়ের খোঁজ করা উচিত ছিল।"

বললাম, "ওঁকে যথাসময়ে পেয়ে যাব। চিন্তা কোরো না।"

উর্দিপরা হোটেলবয় কফি দিয়ে গেল। কফি খেতে খেতে জয়ন্ত বলল, "প্রদীপবাবুর দল কোথায় উঠেছে—"

"ডার্লিং! এখন ওসব কথা নয়। গঙ্গাদর্শনে মন দাও!"

জয়ন্ত হাসল। "আপনি চিন্তা-ভাবনার তালে আছেন। ওকে বস্! চুপ করলাম।"

জয়ন্ত ঠিকই ধরেছে। আমি ভাবতে চাইছিলাম। অনির চিঠিটা আমাকে ধাঁধায় ফেলেছে। চিঠির কাগজ আর কালি দেখে মনে হয় খুব পুরনো। সমীর এই চিঠি ব্যাগে রাখল কেন? আবার চোর সেই ব্যাগ চুরি করে একটা ফালতু কাগজও ফেলে রাখল না, শুধু চিঠিটা রেখে দিল? সমস্ত পরিকল্পনাটা যেভাবে সাজিয়েছি থিওরির আকারে, শুধু এই জায়গাটুকুতে কাঁচা হাতের কাজের ছাপ দেখা যাচ্ছে। এর কারণ কী। 'দ্বিতীয় ব্যক্তি' কি ভয় কিংবা উত্তেজনায় আর মাথার ঠিক রাখতে পারছে না? ভুল করে বসছে? এরপর আরও ভুল করে বসবে?

বরাবর দেখেছি, এটাই হয়। খুনী নিজের অগোচরে নিজের ছাপ রেখে যায়। এই চিঠিটা কি আরেকটা রেড হেরিং? নাহ্? ঝট করে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছুনো ঠিক হবে না।

কফি শেষ করে উঠে পড়লাম। সূর্য ডুবতে চলেছে। বললাম, "চলো জয়ন্ত! বেরিয়ে পড়া যাক।"

একটা সাইকেলরিকশো নিয়ে অবধূতজির আশ্রমে গেলাম। শ্মশান এলাকা থেকে উত্তরে বেশ কিছুটা এগিয়ে সুন্দর আশ্রম। চারিদিকে পাঁচিল এবং তার ওপর কাঁটাতারের বেড়া। ভেতরে ফুলবাগিচা। বড়বড় গাছের গোড়া মসৃণ লাল সিমেন্টে বাঁধানো। ভিড় করে ভক্তরা বসে আছে এখানে-ওখানে। একটা নাটমন্দিরে সংকীর্তন চলেছে। মাইক্রোফোনের আওয়াজে কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছিল।

একজন লোককে জিজ্ঞেস করলে সে অবধূতজির ডেরা দেখিয়ে দিল। ধাপে-ধাপে লাল পাথরের সিঁড়ির ওপর চওড়া বারান্দা। হলঘর। বিশাল দরজা। হলঘরে একদল পুরুষ ও মহিলা করজোড়ে বসে আছে। শেষদিকটায় একটা লাল পাথরের বেদি। এখনই উজ্জ্বল আলো চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। বেদিতে বসে আছেন ধ্যানস্থ এক সন্ন্যাসী। দেখেই চিনতে পারলাম। এঁর ছবি লকেটে এবং সুমিতবাবুর ঘরে দেখেছি।

জয়ন্ত আমার পাঁজরে খোঁচা দিল। তার দিকে তাকালে সে সামনের দিকে চোখের ইশারা করল। দেখলাম, হালদারমাশাই ধুতিপাঞ্জাবি পরে করজোড়ে বসে আছেন।

আমার চেহারায় কী আছে জানি না, অথবা লোকে আমাকে সায়েব ভাবে। একজন লোক এসে চাপাস্বরে বলল, "সামনে গিয়ে বসুন সার! আসুন! আমি নিয়ে যাচ্ছি।"

সামনের সারিতে একজোড়া সায়েব এবং মেমসায়েবও দেখতে পেলাম। যেমন-তেমন পোশাক। আজকাল সায়েবমেমেরা দলেদলে এদেশে এসে সাধুসন্ন্যাসীদের ভক্ত হয়ে যাচ্ছে। সামনে গিয়ে বসে হালদারমশাইয়ের চোখে চোখ পড়তেই উনি একটু হেসে চোখের ইশারায় কী যেন বললেন, বুঝলাম না। বাইরে থেকে মাইক্রোফোনের শব্দ এসে কানে ধাক্কা দিচ্ছে। আমি মাইক্রোফোন একেবারে সহ্য করতে পারি না।

ধ্যানভঙ্গ হল প্রায় আধঘণ্টা পরে। অবধূতজি প্রসন্ন হেসে চোখ খুললেন। তারপর জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বরে সংস্কৃত স্তোত্রপাঠ করলেন। তিনি হাত তুলে আশীর্বাদের ভঙ্গি করার সঙ্গে সঙ্গে হলঘরের সবাই মেঝেয় মাথা ঠেকাল। জয়ন্ত পর্যন্ত।

আমি মাথা নোয়াইনি সেটা অবধূতজির চোখে পড়েছিল। আমার দিকে তাকিয়ে চোখ নাচিয়ে সহাস্যে বললেন, "কী হে বিজ্ঞান প্রচার সমিতির সদস্য! লড়তে এসেছ? এখনও লড়ার সময় হয়নি। অমাবস্যালগ্নে লড়াই হবে। লৌকিক শক্তির সঙ্গে অলৌকিক শক্তির লড়াই।"

আমি করজোড়ে বললাম, "আজ্ঞে না। আমি একজন ট্যুরিস্ট।" বলেই মাথা লুটিয়ে প্রাণাম করলাম।

অবধূতজি খুশি হলেন। বললেন, "লৌকিকের মধ্যেই অলৌকিক লুকিয়ে আছে। একটা বীজ থেকে বিশাল মহীরুহ হয়। একটি ক্ষুদ্র গাছ থেকে সুন্দর

নানা বর্ণের ফুল ফোটে। শূন্য থেকে পূর্ণ। আবার পূর্ণ থেকে শূন্য। সবই শূন্যের খেলা।" অবধূতজি শূন্যে হাত ঘুরিয়ে একটি জবাফুল সৃষ্টি করে আমার দিকে ছুড়ে দিলেন। দুহাতে কুড়িয়ে মাথায় ঠেকালাম।

উনি আবার গম্ভীর স্বরে স্তোত্রপাঠ করলেন। পাঠ শেষ করে বললেন, "এবার সব উঠে পড়ো বাবামায়েরা। আমি নিভৃতে পূজার আয়োজন করব। রাত বারোটায় লৌকিক-অলৌকিকের মহারণ হবে। মিনিস্টার, জজসায়েব, এম পি, এম এল এ, পুলিশ অফিসার সবাই আসবেন। তাঁদের সামনে পরীক্ষা হবে আমার শক্তির। ওঠ, উঠে পড়ো সব।"

প্রণাম করে সবাই উঠে বেরিয়ে গেল। হালদারমশাই আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন। অবধূতজি ধমক দিলেন, "মলোচ্ছাই! এটা দেখছি আঠায় সেঁটে গেছে যে! বেরো বলছি হতচ্ছাড়া!"

হালদারমশাই বেজার মুখে বেরিয়ে গেলেন।

বললাম, "আমার একটা গোপন কথা আছে," বলে জয়ন্তকে চলে যেতে ইশারা করলাম। জয়ন্ত চলে গেল।

অবধূতজি হাসলেন। "তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। ভেবো না।"

"আপনি যে কংকালের মুখে সিগারেট—"

"চুপ! চুপ! অন্য কথা থাকে বলো।"

"আমি একটা সমস্যায় পড়ে আপনার কাছে এসেছি।"

অবধূতজি বিরক্ত হয়ে বললেন, "সমস্যা মিটে যাবে। বলেই তো দিলাম মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।"

"কথাটা আপনি শুনুন! আমি আপনার আশ্রমফান্ডে যথাসাধ্য টাকাকড়ি দেব। আপনার অলৌকিক ক্ষমতা সম্পর্কে আমার আস্থা আছে বলেই—"

"শিগগির বলো!"

"আমার এক ভাগনি বছর আটেক আগে নিখোঁজ হয়ে গেছে। গতরাতে স্বপ্নে আপনার দর্শন পেলাম। আপনি বললেন, আমার আশ্রমে এস। ভাগনির খোঁজ পেয়ে যাবে।"

অবধূতজি ভুরু কুঁচকে বাঁকা চোখে তাকালেন আমার দিকে। "কী নাম তোমার ভাগনির?"

"অনামিকা সেন।"

অবধূতজি চমকে উঠলেন। আস্তে বললেন, "কে আপনি?"

"অধমের নাম কর্নেল নীলাদ্রি সরকার।" বলে পকেট থেকে অনামিকার ছবিটা ওঁকে দেখালাম।

উনি হাত থেকে ছবিটা ছিনিয়ে নিয়ে ফের বললেন, "আপনি কে?"

"কর্নেল নীলাদ্রি সরকার।"

অবধূতজির চোখ দিয়ে জল গড়াতে দেখলাম। ভাঙা গলায় বললেন, "ছবিটা আমার কাছে থাক। আপনি পরে আসুন। রাত সাড়ে এগারোটায়।"

"আপনি কাঁদছেন কেন অবধূতজি?।"

"এই হতভাগিনীর জন্য।"

"অনামিকাকে আপনি চিনতেন?"

অবধূতজি বেদি থেকে নেমে এলেন। আমি উঠে দাঁড়ালাম। উনি বললেন, "গৃহত্যাগ আর সংসারত্যাগ এক কথা নয়। আমি গৃহত্যাগী। কিন্তু সংসারত্যাগী নই। কে সংসারত্যাগী হতে পারে? কেউ না। এই আশ্রম আমার সংসার। আমি মহাশ্মশানে শবসাধনা করেছি। কিন্তু মায়াকে জয় করতে পারিনি। তাই আমার চোখে কান্না দেখছেন আপনি। আর ওই কথাটা বললেন, অনামিকাকে আমি চিনতাম কি না। চিনতাম। একজন তার মাথায় গুলি করে তাকে মেরেছিল। বলুন, আর কী জানতে চান?"

"হেমাঙ্গবাবু! আপনি—"

"চুপ! চুপ! আপনি যে-ই হোন, আমাকে শান্তিতে থাকতে দিন।" অবধূতজি চোখ মুছলেন। "যা অতীত, তা অতীত হয়েই থাক। অতীতকে জাগাতে নেই কর্নেলসায়েব!"

"কিন্তু আপনিই অতীতকে জাগিয়ে রেখেছেন হেমাঙ্গবাবু!"

"অতীত নিজে থেকেই জেগে আছে।"

"একটা কংকালের মধ্যে?"

"একটা কংকালের মধ্যে।" বলে অবধূতজি ছবিটা দেখতে থাকলেন। একটু পরে ফের বললন, "আমি আট বছর ধরে এই দিনটির প্রতীক্ষায় ছিলাম। আমি জানতাম, এইদিন কেউ এসে এই হতভাগিনীর কথা জানতে চাইবে। কর্নেল সরকার! আপনি যে-ই হোন, রাত সাড়ে এগারোটায় আসুন। নিভৃতে কথা হবে।"

"হেমাঙ্গবাবু, কংকালটি কি অনামিকার?"

অবধূতজির চোখ জ্বলে উঠল। "আজ রাতে কংকাল বলবে, সে কে ছিল। তার মুখেই শুনবেন। এখন আপনি চলে যান!"

"আপনি আজ রাতে বিপন্ন!"

অবধূতজি বাঁকা হাসলেন। "অনামিকার আত্মা আমার রক্ষী। আপনি চলে যান। আমার পুজোয় বিঘ্ন ঘটাবেন না।"

পকেট থেকে অনির চিঠিটা বের করে ওঁকে দিলাম। "এটা কি অনির হাতের লেখা?"

চিঠিটা পড়ার পর শ্বাস-প্রশ্বাসে মিশিয়ে অবধূতজি বললেন, "না। অনির হস্তাক্ষর নয়।"

"হেমাঙ্গবাবু! আপনি বিপন্ন।"

"আপনি চলে যান!"

"অনির খুনী বিজ্ঞান প্রচার সমিতিকে আপনার পরিচয় ফাঁস করতে পাঠিয়েছে। সমিতির প্রদীপ মিত্র আপনার পূর্বাশ্রমের সমস্ত কিছু জেনে গেছেন। অনির খুনী তাঁকে এক লক্ষ টাকা দেবে, যদি তিনি আপনার কাছে হেরে যান।"

"জানি, জানি। প্রদীপ দলবল নিয়ে এসেছে। চ্যালেঞ্জ লেটার পাঠিয়েছে। কিন্তু আপনি এতে নাক গলাতে আসবেন না। অনির আত্মা আজ জেগে উঠবে। সে এক ভয়ঙ্কর অলৌকিক শক্তি। সে তার হত্যাকারীকে শাস্তি দেবে।"

"কে সেই হত্যাকারী, হেমাঙ্গবাবু?"

"আপনি স্বচক্ষে সব দেখতে পাবেন। অনির আত্মা তাকে আকর্ষণ করে আনবে।"

"ছবি আর চিঠিটা ফেরত দিন। ওটা আদালতের একজিবিট। কারণ খুনীকে আমি কাঠগড়ায় তুলতে চাই। অনিকে খুনের মামলার মেয়াদ আইনত এখনও শেষ হয়নি।"

ছবি ও চিঠি ফেরত দিয়ে অবধূতজি পেছনের দরজা দিয়ে চলে গেলেন। আমি বেরিয়ে এলাম। জয়ন্ত ও হালদারমশাই একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন। আমাকে দেখে হালদারমাশাই বললেন, "কিছু বুঝলেন কর্নেলস্যার?"

"নাহ্। আপনি কোথায় উঠেছেন?"

"থানার সেকেন্ড অফিসার কেশব আমার রিলেটিভ। তার কোয়ার্টারে আছি।" হাঁটতে হাঁটতে হালদারমশাই বললেন। "সম্পর্কে পিসতুতো ভাই। কথায় কথায় কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে এল আর কী!"

জয়ন্ত বলল, "উপমাটা লাগসই হল না হালদারমশাই!"

"অ্যাঁঃ?" হালদারমশাই অদ্ভুত শব্দে হাসলেন। "ক্যান হইল না?"

"সাপ বেরুনোর কথা বললেন!"

"হঃ। অই হইল আর কি!"

বললাম, "খোঁজখবর কতটা এগোলো বলুন হালদারমশাই?"

হালদারমশাই একটিপ নস্যি নাকে গুঁজে বললেন, "অবধূতজি এখানে এসেছেন বছর আটেক আগে। সঙ্গে ওনার সাধনসঙ্গিনী ছিল।"

"সাধনসঙ্গিনী?"

"তা-ই হবে। মোটকথা একজন স্ত্রীলোক ছিল। খুব সুন্দরী স্ত্রীলোক।" হালদারমশাই আবার অদ্ভুত ফ্যাঁচ শব্দে হাসলেন। "সাধনসঙ্গিনী কার সঙ্গে কাট করেছিল। অবধূতজি তান্ত্রিক শক্তির জোরে আকর্ষণ করেছিলেন। কিন্তু আকর্ষণের ডিগ্রি বড় বেশি হওয়ায় তার বডি ফেরত পান। ডেডবডি কর্নেলস্যার! বুঝলেন তো?"

"বুঝলাম। তারপর?"

"তারপর বড়ির ওপর বসে শবসাধনা করে সিদ্ধিলাভ হল। যে কঙ্কাল সিগারেট টানে, সেটা সেই সাধনসঙ্গিনীর।"

"কিন্তু কংকালের সিগারেট টানা সম্পর্কে স্থানীয় লোকের বক্তব্য কী?"

হালদারমশাই থমকে দাঁড়ালেন। "কথায় বলে স্বভাব যার না মরলে। জীবদ্দশায় স্ত্রীলোকটি নাকি সিগারেট টানত। কেউ-কেউ স্বচক্ষে দেখেছে।" বলে হঠাৎ কণ্ঠস্বর নামিয়ে আনলেন। "হলঘরের পেছনে অবধূতজির ডেরা। কাল রাত্রে হলঘরে উনি যখন ভক্তদের জ্ঞান দিচ্ছেন, আমি ডেরায় ঢুকলাম। খাটের তলায় এটা পুরনো তোরঙ্গ ছিল। তালা ছিল না। সেটার ভেতর স্ত্রীলোকের কাপড়চোপড় দেখলাম। খানকতক লেটার ছিল। লেটারগুলি এনে আপনাকে দেখাচ্ছি। আপনি কোথায় উঠেছেন?"

"হোটেল সম্রাটের চারতলায়। স্যুট নম্বর বাইশ।"

"আপনারা চলুন! আমি আসছি।" বলে হালদারমশাই ডানদিকে একটা পোড়ো জমি দিয়ে শর্টকাট করতে গেলেন। ওদিকটা অন্ধকার। হালদারমশাই টর্চের আলোয় লম্বা পা ফেলে হাঁটছিলেন।

কালীপুজোর রাত্রি। ভিড় এবং প্রচণ্ড মাইক চারদিকে। একটা সাইকেলরিকশো ডেকে হোটেলে ফিরলাম।

কিছুক্ষণ পরে ব্যালকনিতে বসে কফি খেতে খেতে জয়ন্ত জিজ্ঞেস করল, "অবধূতজির সঙ্গে কী কথা হচ্ছিল বলতে আপত্তি আছে?"

বললাম, "অবধূত বলে নিজেকে প্রচার করলেও উনি যথার্থ অর্থে অবধূত নন। এটুকু তোমার বোঝা উচিত।"

"বুঝলাম না!"

"খাঁটি অবধূতের এরকম সভ্যভব্য আশ্রম থাকে না। ইনি মর্ডান গডম্যান।"

জয়ন্ত একটু বিরক্ত হল। "ঠিক আছে। গডম্যানের সঙ্গে কী কথা হল?"

চুরুট ধরিয়ে হাসতে হাসতে বললাম, "সমীরবাবুর ব্যাগে পাওয়া চিঠি আর অ্যালবামে রাখা অনামিকার ফটো দেখিয়ে জানতে চাইছিলাম, এই মেয়েটিই চিঠিটি লিখেছে কি না।"

"কী বললেন, উনি?"

"সরি ডার্লিং। হাতের তাস এখন দেখাব না।"

জয়ন্ত কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর বলল, "তা হলে এই অবধূত—সরি, গডম্যান বুজরুক নন?"

"নাহ্। খাঁটি গডম্যান। তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন।"

জয়ন্ত হেসে ফেলল। "ভ্যাট্! আমি বিশ্বাস করি না। কংকালকে দিয়ে সিগারেট টানানো ম্যাজিক ছাড়া কিছু নয়। গডম্যান প্রদীপবাবুর কাছে হেরে ভুট হবেন।"

একটা চিন্তা আমাকে পেয়ে বসল। চিন্তা অথবা দুর্ভাবনা। হয়তো কোনও

"জয়ন্ত! থিওরি নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। অনেক সময় ধূর্ত খুনী ভুল থিওরি গড়ে তোলার জন্য গোয়েন্দাকে অলক্ষ্যে থেকে সাহায্য করে। ফাঁদ ডার্লিং! ফাঁদ। সেই থিওরি আসলে একটা ফাঁদ।"

"কী সর্বনাশ! আপনি সেই ফাঁদে পা দেননি তো?"

"দিয়েছিলাম। এখন সরে এসেছি।"

"কী করে টের পেলেন আপনি ফাঁদে পা দিয়েছিলেন?"

একটু হেসে বললাম, "টেলিফোন ডাইরেক্টরি আমাকে শেষ মুহূর্তে রক্ষা করেছে। নইলে লাল হেরিং মাছের পেছনে অনর্থক ছুটে বেড়াতাম।"

জয়ন্ত আবার ফ্যালফ্যাল করে তাকাল। "টেলিফোন ডাইয়রেক্টরি?"

আস্তে বললাম, "দ্যাটস্ রাইট, ডার্লিং!"

জয়ন্ত চৌধুরি

'টেলিফোন ডাইরেক্টরি' কথাটি আমার মাথার ভেতর অনেকক্ষণ মাছির মতো ঘুরল। তারপর মগজের কোনও স্নায়ুতে সেঁটে রইল। এ এক জ্বালাতন। সমস্যা হল, আমার প্রাজ্ঞ বন্ধুকে বরাবর এই রকম প্রস্তরমূর্তি হয়ে যেতে দেখেছি—কোনও জটিল রহস্যের পর্দা তোলার পূর্বাভাস এটা। এ সময় প্রশ্ন করেও জবাব পাওয়া যায় না। যদি বা যায়, তা অসংলগ্ন এবং আরও ধাঁধার সৃষ্টি করে।

ঘরে বসেই ডিনার খেলাম আমরা। তখন রাত প্রায় সাড়ে নটা; তারপর ব্যালকনিতে গিয়ে রাতের গঙ্গা দেখতে দেখতে বললাম, "কখন বেরোবেন?"

কর্নেল চোখ বুজে চুরুট টানছিলেন। চোখ খুলে বললেন, "কোথায়?"

"কী আশ্চর্য! কংকালের সিগারেট টানা দেখতে যাবেন না?"

"ও! হ্যাঁ।" অন্যমনস্কভাবে জবাব দিলেন কর্নেল।

হাসতে হাসতে বললাম, "আপনাকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে!"

"নাহ্। তত কিছু না।" কর্নেল যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটু হাসলেন। "আমি অনামিকার কথা ভাবছিলাম। জয়ন্ত! অনামিকা সেনের সম্পর্কে তোমার মনে কোনও ইমেজ ভেসে উঠছে না?"

"উঠছে বৈকি! খেলুড়েটাইপ মেয়ে। পাকা অভিনেত্রী।"

"কেন অভিনেত্রী বলছ?"

"অভিনেত্রী নয়? ভৈরবী সেজেছিল—আপনি ছবি দেখেছেন আশ্রমে।"

"হুঁ। আরও ব্যাখ্যা কর।"

"আপনি আমাকে নিয়ে খেলতে বসেছেন কর্নেল! উদ্দেশ্য কী?"

"অনামিকাকে আরও ভালভাবে জানতে চাই।"

"কিন্তু আমার কাছ থেকে কী করে জানা যাবে? পঁচিশ বছর আগে আমার বয়স ছিল পাঁচ।"

"হোপলেস, ডার্লিং! তুমি কিছু ইনফরমেশন হাতে পেয়েছ। সেই থেকে একটা ইমেজ নিশ্চয় তোমার মনে গড়ে উঠেছে।"

একটু ভেবে নিয়ে বললাম, "অনামিকার ছিল তিন-তিনটে বাঘা প্রেমিক।"

"প্রেমিকদের সম্পর্কে তোমার বিশেষণটা বড্ড বেয়াড়া।"

"বাঘা প্রেমিক বলতে আপত্তি কী? রূপের আগুনে পতঙ্গের ঝাঁপ কথাটা ক্লিশে হয়ে গেছে।"

"হুঁ, বলো।"

বৃদ্ধ ঘুঘুমশাই কি এ ভাবে সময় কাটাতে চাইছেন? বললাম, "আর বেশি কিছু বলার মতো ইনফরমেশন আমার হাতে নেই।"

"কেন? তোমার মনে হয় না, অনামিকা তার মামার কথায় চলত?"

"হ্যাঁ। বুঝতে পারছি, আমাকে দিয়ে আপনি অনামিকাকে গড়ে তুলতে চাইছেন। আমি বোকা হতে পারি। তবে আপনার হয়ে চিন্তা করতে রাজি নই।"

কর্নেল চোখ বুজলেন। একটু পর বললেন, "তান্ত্রিক শক্তি বলে কিছু থাক বা না-ই থাক, অনামিকা তার মামার খুব বশীভূত ছিল। মামাকে কি সে ভয় পেত? এটাই প্রশ্ন।"

"বস্! এটা কতকটা বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলার গল্প হয়ে গেল! অবশ্য মডার্ন কপালকুণ্ডলা এবং মডার্ন তান্ত্রিক।"

কর্নেল একটু হাসলেন। "মডার্ন কপালকুণ্ডলা বলেই অনামিকা সিগারেট টানত।" বলে একরাশ চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে ঘড়ি দেখলেন। "ওঠ! বেরুনো যাক।"

হোটেল থেকে বেরুনোর সময় হালদারমশাইকে আসতে দেখলাম। আমাদের দেখে উনি গেটের কাছে থমকে দাঁড়ালেন। কাছে গেলে চাপাস্বরে বললেন, "প্রদীপ মিত্রের পেছনে কলকাতার এক বিজনেসম্যান আছে। প্রদীপবাবুর ওয়াইফ এসেছেন সঙ্গে। কী যেন নামটা—"

কর্নেল বললেন, "চিত্রা।"

"হঃ! চিত্রা দেবীর লগে পাঁচ কথা কইয়া ভাব জমাইলাম। ওনারে সাপোর্ট করলাম।"

কর্নেল বললেন, "ওঁরা কোথায় উঠেছেন?"

"রানী বরদাসুন্দরী স্কুলে দুইখান ঘর পাইছেন। স্কুলে পূজা ভেকেশন।"

"আপনি আর একবার যান চিত্রাদেবীর কাছে। তাঁকে বলুন আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই। আমাকে উনি চেনেন।"

"হোটেলে ডাকব?"

"না। স্কুলের কাছাকাছি কোথাও। চলুন!"

স্কুলবাড়িটা রেললাইনের কাছাকাছি। নিরিবিলি জায়গা। চারদিকে গাছপালা আর একটা পুকুর। পুকুরের পাড়ে একটা বটতলায় আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম। এখান থেকে স্কুলবাড়িতে আলো ও মানুষজন দেখা যাচ্ছিল।

মিনিট পনের-কুড়ি পরে হালদারমশাই হন্তদন্ত হয়ে ফিরে এসে বললেন, "চিত্রাদেবী আপনারে ডাকলেন। হাজব্যান্ডেরে আপনার কথা কইয়া দিলেন, কী কাণ্ড! প্রদীপবাবু আপনারে চেনেন। উনিও কইলেন, কর্নেলসায়েবরে লইয়া—" বলে হালদারমশাই ঘুরলেন। "ওই দ্যাখেন, প্রদীপবাবু আসছেন!"

আমরা স্কুলের গেটে গেলাম। আমার বয়সী এক ভদ্রলোক কর্নেলকে নমস্কার করলেন। বেশ মারকুট্টে চেহারা। বুদ্ধিদীপ্ত চাউনি। একটু ঔদ্ধত্য আছে ভাবভঙ্গিতে। বললেন, "চিত্রা এইমাত্র আমাকে বলল আপনার কথা। কী আশ্চর্য! একে বলে মশা মারতে কামান দাগা।"

চিত্রাকে আসতে দেখা গেল। এসেই কর্নেলের পায়ের ধুলো নিলেন। কর্নেল বললেন, "আমি আপনার ক্যাম্পে ঢুকব না প্রদীপবাবু! আমি শুধু একটা কথা জানতে চাই। কে আপনাকে এক লাখ টাকার রিস্ক নিতে প্রভোক করেছে?"

প্রদীপবাবুর চোখ দুটো জ্বলে উঠল। "আমাকে প্রোভোক করবে? আমি বিজ্ঞানী। যুক্তিবাদী। আপনাকে কে এমন উদ্ভট কথা বলল?"

চিত্রা বললেন, "আমি বলেছি।"

প্রদীপবাবু হাসলেন। "কর্নেলসায়েব! চিত্রার ধারণা, আমি অন্যের কথায় নাচি। একেবারে ভুল।"

কর্নেল বললেন, "আপনি এক লাখ টাকা বাজি ধরেছেন। যদি হেরে যান?"

"আমি হারব না। ওই ম্যাজিকটা আমি জানি। পুতুলনাচের টেকনিক প্রয়োগ করা হয়। অবধূতের হাতে থাকে কালো সুতোর গোছা। নীল আলোতে কালো সুতো দেখা যায় না। অবধূত স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হাত নাড়েন বা দাড়ি চুলকোন। ওটাই কৌশল।"

"তা হলে আপনি এসে দেখে গেছেন ব্যাপারটা?"

"নিশ্চয়। তা না হলে কোন সাহসে বাজি ধরব?"

আমি বললাম, "কঙ্কাল সিগারেট টানে। এর টেকনিকটা কী?"

"কঙ্কালের দাঁতের ফাঁকে সিগারেট আটকে দেওয়া হয়। ভেতরে সরু নল আছে। সেটা বেদির তলা দিয়ে পেছনের ঘরের মেঝেয় একটা হাপরের মুখে বসানো আছে। ইলেকট্রিক হাপর। তো—"

কর্নেল বললেন, "হ্যাঁ। ম্যাজিক। কিন্তু আপনি তো এসেছেন আরেকটা উদ্দেশ্য নিয়ে। অবধূতজির পূর্বাশ্রমের গোপন তথ্য জনসমক্ষে ফাঁস করবেন।"

"করব। কারণ আমার হাতে ডকুমেন্টারি এভিডেন্স আছে।"

"কী ভাবে তা সংগ্রহ করলেন বলতে আপত্তি আছে?"

প্রদীপবাবু যে সত্যিই অহঙ্কারী মানুষ, তা ওঁর হাসির ভঙ্গিতে বোঝা গেল। বললেন, "আপত্তি থাকবেই। কে বলতে পারে অবধূত আপনার মতো একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভকে আমার পেছনে লাগিয়েছেন কি না? আপনি ডাবল এজেন্ট নন, কে বলতে পারে?"

"আমি প্রাইভেট ডিটেকটিভ নই। আপনার স্ত্রী আমার কাছে গিয়েছিলেন। আপনার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে দিতে বলেছিলেন। কিন্তু আমি ওঁকে বলেছি, স্ত্রীই স্বামীর রক্ষাকবচ।"

"কর্নেলসায়েব! আমি জানি আপনি কে। আমার অন্য সোর্স আছে জানার।"

"সেই সোর্স কি বৈশম্পায়ন রায়?"

আমি চমকে উঠলাম। চিত্রাকেও দেখলাম খুব চঞ্চল এবং উত্তেজিত। চিত্রা কী বলতে যাচ্ছিলেন, তাঁকে থামিয়ে প্রদীপবাবু বললেন, "বলব না।"

"মিঃ রায়কে আপনি নিশ্চয় জানাননি অবধূতজি কে ছিলেন?"

প্রদীপবাবু যেন একটু দমে গেলেন। "এ আমার প্রাইভেট সিক্রেট। কাকেও জানানোর প্রশ্ন ওঠে না।"

"জানিয়ে দিলে এক লাখ টাকার আশ্বাস পেতেন না।" কর্নেল নির্বিকারভাবে বললেন। "বাই দা বাই, আপনি সমীর রুদ্রকে চেনেন?"

চিত্রা বললেন, "আমি চিনতাম। সে তো আপনাকে বলেছি।"

প্রদীপবাবু বললেন, "আজই চিত্রার কাছে তার কথা শুনেছি।"

কর্নেল চিত্রাদেবীকে বললেন, "বাই এনি চান্স, সমীরবাবুর সঙ্গে আপনার ইদানীং কি দেখা হয়েছিল?"

চিত্রা আস্তে বললেন, "আপনাকে বলেছিলাম, কসবার একই বাড়ির ফ্ল্যাটে আমার দিদি থাকেন। তাঁর ঘরে সমীরবাবু আড্ডা দিতে যেতেন। কথায়-কথায় সম্প্রতি এক ভদ্রমহিলার গল্প করছিলেন। তাঁর সঙ্গে সমীরবাবুর নাকি বিয়ের কথা হয়েছিল। সে অনেক বছর আগের কথা।"

"অনামিকা সেন?"

"হ্যাঁ।" চিত্রা শ্বাস ছেড়ে বললেন, "অনামিকার মামা নাকি সাধুবাবা হয়েছেন এবং সেই তান্ত্রিক সাধক কাঁটালিয়াঘাটে থাকেন।"

"সমীরবাবু বলেছিলেন?"

"হ্যাঁ।"

"সে-কথা আপনার স্বামীকে আপনি বলেছিলেন?"

চিত্রা তাঁর স্বামীর দিকে একবার তাকিয়ে মাথা দোলালেন।

প্রদীপবাবু বললেন, "আমার সময় নষ্ট হচ্ছে। এরপর যা বলার, যথাসময়ে যথাস্থানে বলব।"

কর্নেল বললেন, "ডকুমেন্টস্ আপনাকে সমীরবাবু দিয়েছিলেন, তাই না প্রদীপবাবু?"

প্রদীপ মিত্র খেঁকিয়ে ওঠার ভঙ্গিতে বললেন, "বলব না, আই রিপিট ; যথাসময়ে এবং যথাস্থানে মাইক্রোফোনে সব ঘোষণা করব।"

"প্রদীপবাবু, মিঃ রায় আপনাকে এক লাখ টাকার চেক দিয়েছেন কি?"

"বলব না।"

"সেই চেকের তারিখ দেখে নিয়েছেন কি?"

"বলব না।"

"চেকের তারিখ দেখে নেবেন।" বলে কর্নেল চলে এলেন।

আমরা রাস্তায় পৌঁছুলে উত্তেজিত হালদারমশাই বললেন, "রহইস্য! প্রচুর রহইস্য!"

কর্নেল বললেন, "প্রচুর রহস্যই বটে হালদারমশাই!"

হালদারমশাই চাপাস্বরে বললেন, "অবধূতজিই সমীরবাবুকে মার্ডার করেনি তো কর্নেলস্যার?"

কর্নেল হাসলেন। "আপনার সন্দেহের কারণ আছে। এটুকু বলা চলে।"

বললাম, "একটা ব্যাপার বোঝা গেল। অবধূতজির ওপর অনামিকার তিন প্রেমিকেরই খুব রাগ। বলবেন, প্রশান্তবাবুর রাগের প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি। কিন্তু ওটা ধরে নিতেই হবে। অবধূতজি—মানে, হেমাঙ্গবাবু ভাগনিকে কপালকুণ্ডলা করে রাখতে চেয়েছিলেন। সেই নিয়েই প্রশান্তবাবুর সঙ্গে অনামিকার ঝামেলা বেধেছিল সম্ভবত। অনামিকা নিশ্চয় মামার খুব বশীভূত ছিলেন।"

কর্নেল বললেন, "দ্যাটস্ রাইট। তবে এখন ওসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। চলো, অবধূতজির আশ্রমে যাই।"

এবার রাস্তায় প্রচণ্ড ভিড়। মাইক্রোফোন এবং পটকার উপদ্রব। অবধূতজির আশ্রমেও জনারণ্য। আশ্রমের একধারে কালীমন্দির। সেখানে পুজোর প্রস্তুতি চলেছে। কিন্তু অবধূতজিকে দেখতে পেলাম না। আমাকে ও হালদারমশাইকে দাঁড় করিয়ে রেখে কর্নেল "আসছি" বলে ভিড়ে নিখোঁজ হয়ে গেলেন।

হালদারমশাই বললেন, "আইজকাল জনগণের মাথা বেবাক খারাপ হইয়া গেছে।"

"কেন বলুন তো?"

"সি উইদ ইওর আইজ, জয়ন্তবাবু!" বলে নস্যি নিলেন হালদারমশাই। হাঁচবার চেষ্টা করে বললেন, "পূজা দ্যাখতে আই নাই। আইছে ম্যাজিক দেখতে।"

ভিড়ের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। হঠাৎ দেখি, ভিড় ঠেলে এগিয়ে যাচ্ছে সেই ইন্দরজিৎ সিং! চমকে উঠেছিলাম। বললাম, "ওই সর্দারজিকে ফলো করুন হালদারমশাই!"

হালদারমশাই তখনই ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেলেন। কেন ফলো করতে হবে জিজ্ঞেসও করলেন না। আমাকে কিছু বলারও সুযোগ দিলেন না। আসলে এটা ওঁর বাতিক। কর্নেলের পাখি-প্রজাপতির পেছনে ছোটাছুটির বাতিক যেমন।

ভিড় ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছিল। তারপর দেখলাম একদল পুলিশ ঢুকল। গেটের দিকে পুলিশভ্যান দেখা যাচ্ছিল। একের পর এক ভি আই পি-রা আসছেন বোঝা গেল। কিন্তু তার জন্য এত পুলিশ কেন রে বাবা?

এক ভদ্রলোক গাছের গোড়ায় শানবাঁধানো চত্বরে বসেছিলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "হাঙ্গামার ভয় আছে নাকি মশাই? এত পুলিশফোর্স কেন বলুন তো?"

বললাম, "জানি না।"

ভদ্রলোক সন্দিগ্ধ দৃষ্টে চারপাশটা দেখে নিয়ে একটু হাসলেন হঠাৎ। "বিজ্ঞানের সঙ্গে তন্ত্রশক্তির লড়াই। বলা যায় না, দুই ফোর্সের সংঘর্ষে কী ঘটে যায়। তাই থার্ড ফোর্স হিসেবে পুলিশ আমদানি।"

ভদ্রলোক রসিক। বললাম, "আপনি এর আগে কখনও কঙ্কালের সিগারেট খাওয়া দেখেছেন?"

"না মশাই। দেখব বলেই তো এসেছি। তবে বুঝলেন, হাঙ্গামা দেখলেই কেটে পড়ব। চাচা আপন প্রাণ বাঁচা!" ভদ্রলোক একটু রসেবশে আছেন মনে হল। "আজকের রাতে কারণবারি পান না করে থাকা যায় না। কাজেই দোষ নেবেন না মশাই!" বলে করজোড়ে আমাকে নমস্কারও করলেন।

আবার একদল বন্দুকধারী পুলিশ এল। তাদের দেখে ভদ্রলোক গেটের কাছে গিয়ে আরেকটা গাছের তলার বেদিতে বসলেন। বোঝা গেল, একটা কিছু ঘটলেই নিরাপদে পালাতে পারবেন।

কর্নেল কোথায় গেলেন কে জানে। বিরক্তি লাগছিল। হালদারমশাইও গেলেন তো গেলেন। আর আসার নাম করছেন না। কিন্তু ইন্দ্রজিৎ সিং এখানে কেন এল? ফ্রিল্যান্স জার্নালিজমের জন্য? যা ঘটতে চলেছে, অর্থাৎ বিজ্ঞান এবং তন্ত্রশক্তির ডুয়েল, বিদেশি কাগজে ভাল খাবে। কাজেই একজন ফ্রিলান্স জার্নালিস্ট আসতেই পারে। শুধু সুইন্‌হো স্ট্রিটে একই চেহারার একজন শিখ ভদ্রলোকের আচরণ উদ্বেগজনক। তবে এমনও তো হতে পারে, সেই ভদ্রলোক ইন্দরজিৎ সিং নন?

ভিড় সামলাচ্ছে পুলিশ। মন্দিরের হলঘরের সামনে ঘাসের ওপর এবং রাস্তার ওপর যে-যেখানে পারছে বসে পড়ছে। হলঘরের দরজা বিশাল। কাজেই ভেতরের দৃশ্য দেখতে অসুবিধা নেই। চারদিকে আলোর বন্যা। মাইক্রোফোনে শ্যামাসঙ্গীত এবং কখনও স্তোত্রপাঠ জলদগম্ভীর স্বরে।

দাঁড়িয়ে থেকে পায়ে ব্যথা ধরে গেল। না কর্নেল না হালদারমশাই কেউ ফিরে এলেন। সিগারেটের প্যাকেট বের করে ধরাতে যাচ্ছি, একজন গেরুয়াধারী সাধু তেড়ে এলেন। "আশ্রমের ভেতর নো স্মোকিং! ওই দেখুন, আলোর অক্ষরে লেখা আছে।"

এই সাধু নিশ্চয় আশ্রমেরই লোক। তাই ওঁকে বললাম, "সরি সাধুজি! তো এত পুলিশ কেন? হাঙ্গামার আশঙ্কা আছে নাকি?"

"নাহ্!" সাধুজি হাসলেন। "শোনেননি বিজ্ঞান প্রচার সমিতির প্রদীপ মিত্রদের পুলিশ স্টেশনে পাঠিয়ে দিয়েছে? এস পি সায়েব কড়া লোক। আশ্রমের পবিত্রতা রক্ষা করেছেন।"

"কখন ওঁদের ফেরত পাঠিয়েছে পুলিশ।"

"এই তো কিছুক্ষণ আগে।"

হতাশ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। নাটকীয় ঘটনাটা ঘটল না। কোনও মানে হয়?"

কর্নেল নীলাদ্রি সরকার

মন্দিরের পাশ দিয়ে অবধূতজির ঘরে যাচ্ছিলাম। দু'জন সাধু আমাকে বাধা দিলেন। বললাম, "ওঁর সঙ্গে দেখা করার কথা আছে।"

কথাটা একটু চড়া গলায় বলেছিলাম। অবধূতজি ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। ইশারায় চেলাদের চলে যেতে বললেন। তারপর আমাকে ডাকলেন। কাছে গেলে আস্তে বললেন, "আপনার সময়জ্ঞান আছে। আসুন! তবে বেশি সময় দিতে পারব না। মাত্র পনের মিনিট।"

"তা-ই যথেষ্ট হেমাঙ্গবাবু!"

"চুপ! ও নামে ডাকলে আপনার সঙ্গে কথা বলব না। এমন কি—"

"ঠিক আছে।"

ঘরে ঢুকে ধূপ-ধুনোর সুঘ্রাণ পেলাম। একটা খাটে ফোমের গদি। তার ওপর গেরুয়া চাদর। অবধূতজি আসন করে বসলেন। আমি বসলাম একটা মোড়ায়।

অবধূতজি বললেন, "আগে আত্মপরিচয় দিন। কপটতা করবেন না।"

আমার নেমকার্ড দিলাম। উনি খুঁটিয়ে দেখার পর বললেন, "নেচারিস্ট কী?"

"প্রকৃতিপ্রেমিক।"

অবধূতজি একটু হাসলেন। "নারীর মধ্যে প্রকৃতি আছেন। কিন্তু নারীরা তা জানে না। আমার ভাগনি অনি জানত, তার মধ্যে প্রকৃতি আছেন। আমি তাকে জানিয়ে দিয়েছিলাম। আর দেখুন কর্নেল সায়েব, প্রকৃতির ভয়ঙ্করী শক্তি। আপনি প্রকৃতিকে দেখেছেন, চেনেননি।"

দ্রুত বললাম, "সমীরবাবুকে আপনি চিনতেন। যে—"

"কাগজে পড়েছি সে আত্মহত্যা করেছে। অনিকে ছুঁতে গিয়েছিল ওই মস্তান শূকরশাবক। তার শাস্তি পেয়েছে।"

"আপনি কেন প্রশান্ত সান্যালের সঙ্গে অনির গোপনে বিয়ে দিয়েছিলেন?"

"আপনি কেন এসব কথা জানতে চান?"

"অনির হত্যাকারীকে ধরিয়ে দিতে চাই বলে। মামলার মেয়াদ এখনও শেষ হয়নি অবধূতজি!"

অবধূত এক মিনিট তাকিয়ে রইলেন নিষ্পলক চোখে। তারপর শ্বাস ছেড়ে বললেন, "প্রশান্তর কাছ থেকে অনি পালিয়ে এসেছিল আমার এই আশ্রমে। এমনি কালীপুজোর রাতে তাকে কেউ ডেকে নিয়ে যায়। পরদিন মহাশ্মশানে তার মড়া পাওয়া গিয়েছিল। তাকে গুলি করে মেরেছিল প্রশান্ত।"

"প্রশান্ত মেরেছিল আপনি জানেন?"

"ধ্যানবলে জেনেছি।"

"অবধূতজি! আমার ধ্যানবল নেই। তদন্ত করে জেনেছি, প্রশান্ত অনিকে খুন করেনি।"

অবধূত ভুরু কুঁচকে তাকালেন।—"কে খুন করেছিল?"

"যে সমীর রুদ্রকে খুন করেছে।"

"কে সে?"

"বলব। তার আগে আপনি বলুন কেন প্রশান্তর সঙ্গে অনির বিয়ে দিয়েছিলেন?"

অবধূত চুপ করে রইলেন।

বললাম, "আমি বলছি। প্রশান্ত আপনাকে অনেক টাকা দিয়েছিল। আপনি আশ্রমের জমি কিনেছিলেন সেই টাকায়। অনির মায়ের বাড়ি বিক্রির টাকায় আপনার ওই মন্দির।"

অবধূতের চোখ জ্বলে উঠল। কিন্তু আত্মসংবরণ করে বললেন, "আপনি অনেক কিছু জানেন তা হলে।"

"জানি। এ-ও জানি, সেই অমাবস্যার রাতে সমীর এসে ডেকে নিয়ে যায় অনিকে। আপনি আমাকে মিথ্যা বলেছেন, চিঠিটা অনির লেখা নয়। অবধূতজি, চিঠিটা অনিরই লেখা। সমীর সম্ভবত ঠিক সময়ে বহরমপুর পৌঁছুতে পারেনি। তাই আপনার আশ্রমে এসেছিল অনির খোঁজে। আপনি তাকে শূকরশাবক বলছেন। কিন্তু সে আপনার আতিথ্যেই ছিল।"

অবধূতজির চোখে জল দেখতে পেলাম। আস্তে বললেন, "সমীর এসেছিল কালীপুজো দেখতে।"

"ওটা নিতান্ত ছল, অবধূতজি! তবে সমীর জানত না, যাকে সঙ্গে নিয়ে অনির খোঁজে এসেছে, সে আসলে অনিকে খুন করার উদ্দেশ্যে সমীরকে ব্যবহার করছে। শ্মশানের ওখানে যেতেই সে অনিকে গুলি করে পালিয়ে যায়। সমীরও পালাতে বাধ্য হয়। আপনি জানেন এসব কথা। সমীর আপনাকে চিঠি লিখে জানিয়েছিল। সে-চিঠি আমার হাতে এসেছিল।"

অবধূতজি খাট থেকে নেমে তলায় হাত ভরে তোরঙ্গ টেনে বের করলেন। তখন বললাম, "থাক্ অবধূতজি! আমার কথা শুনুন। তোরঙ্গ যেমন আছে থাক্।"

তোরঙ্গ খুললেন অবধূত। গেরুয়া শাড়ি জামা দেখিয়ে বললেন, "এতে রক্ত লেগে আছে অনির। কিন্তু চিঠি আপনার হাতে গেল কী করে?"

"যে-ভাবে হোক, গেছে। আপনি দয়া করে বসুন।"

অবধূত বসলেন। বললেন, "আমি কিছু বুঝতে পারছি না। সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।"

"আপনি সমীরের চিঠিতে আপনার ভাগনির খুনীর নাম জেনেও কেন পুলিশকে তা বলেননি?"

অবধূত তাকালেন। নিষ্পলক চাহনি।

বললাম, "খুনী আপনাকে মাসোহারা দিতে চেয়েছিল। তার বদলে প্রশান্তের কাঁধে দায় চাপাতে বলেছিল। আপনি বুদ্ধিমান মানুষ। প্রশান্তকেও দোহনের সুযোগ পেয়েছিলেন। তার ঠিকানা যোগাড় করতে দেরি হয়েছিল অবশ্য। প্রশান্তও এরপর আপনাকে টাকা দিতে আসত। হয়তো এবারও এসে দিয়ে গেছে। সে ২৩ সেপ্টেম্বর এসেছিল। হ্যাঁ, সমীর আপনাকে সাহায্য করেছিল প্রশান্তের ঠিকানা দিয়ে। সে-চিঠিও আমার হাতে এসে গেছে।"

অবধূত চোখ মুছে বললেন, "এত যদি জানেন, খুনীর নাম বলছেন না কেন?"

"আপনি মর্ডান গডম্যান। আপনার তাই দামী বিদেশী গাড়ি আছে। আপনি রাজসিক সুখ ভোগ করেন। এই সুখের জন্য আপনার সুন্দরী ভাগনিকে টোপ হিসেবেই ব্যবহার করেছেন।"

অবধূত চাপা গর্জন করলেন, "বেরিয়ে যান। বেরিয়ে যান!"

এইসময় কেউ এসে দাঁড়াল দরজার বাইরে। এদিকটায় তত আলো নেই। দেশি-বিদেশি ফুলের ঝোপ, পাতাবাহার গাছ। ঘুরেই দেখলাম ইন্দরজিৎ সিং এসে দাঁড়িয়েছে। তার হাতে ফায়ারআর্মস্। মাত্র কয়েকটি সেকেন্ড। সে অবধূতের দিকে নয়, আমার দিকেই ফায়ারআর্মসের নল তাক করেছে। এক লাফে সরে গেলাম। গুলি গিয়ে লাগল দেয়ালে।

তারপর দেখলাম হালদারমশাই তার ওপর ঝাঁপ দিয়েছেন। ইন্দরজিৎ ধরাশায়ী হল। তার হাতের অস্ত্র ছিটকে পড়ল চৌকাঠের এধারে। অবধূত পাথরের মূর্তির মতো তখনও বসে আছেন। অস্ত্রটা কুড়িয়ে নিয়ে দরজার কাছে গেলাম। ইন্দরজিতের পিঠে বসে হাত দুটো মোচড় দিলেন হালদারমশাই। "হালার পো হালা! ঘুঘু দ্যাখছে, ফান্দ্ দ্যাখে নাই।"

বেরিয়ে গিয়ে একটানে ইন্দরজিৎ সিংয়ের পাগড়ি খুলে ফেললাম। বললাম, "বৈশম্পায়ন রায়কে ছেড়ে দিন, হালদারমশাই!"

হালদারমশাই পিঠ থেকে নেমে তার জামার কলার ধরে ওঠালেন। কৃপাণটা খুলে নিতে ভুললেন না। "কী আশ্চইর্য!" বলে তার মুখের দিকে তাকালেন হালদারমশাই।

ততক্ষণে কয়েকজন সাধু এবং পুলিশ দৌড়ে এসেছে। বাজি-পটকার শব্দ এই আশ্রমে নেই। তাই গুলির শব্দ শোনা স্বাভাবিক। একজন পুলিশ অফিসারও দৌড়ে এলেন। বললাম, "এই ভদ্রলোকের নাম বৈশম্পায়ন রায়। একে অ্যারেস্ট করুন। এস পি সায়েবকে ফোনে বলে রেখেছি। ইনি দুটো মার্ডার করেছেন। আর একটা মার্ডারের অ্যাটেম্প্ট্ করেছেন।"

পুলিশ ঘিরে ফেলল বৈশম্পায়ন রায়কে। একটু পরে খবর পেয়ে এস পি বরেন্দ্র সোম এসে পড়লেন। চারদিকে উত্তেজনা। ভিড় হটাতে পুলিশকে মৃদু লাঠি চার্জও করতে হল।

হালদারমশাই বললেন, "জয়ন্তবাবু খাড়াইয়া আছেন। যাই গিয়া—"

বললাম, "চলুন, আমিও যাচ্ছি।"

জয়ন্ত ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসছিল। পুলিশ তাকে বাধা দিচ্ছিল। আমি গিয়ে বললাম, "চলো জয়ন্ত! হোটেলে ফেরা যাক্।"

জয়ন্ত উত্তেজিতভাবে বলল, "কে একজন পাঞ্জাবি এক্সট্রিমিস্টি নাকি অবধূতজিকে গুলি করেছে?"

হাসতে হাসতে বললাম, "না ডার্লিং! এক্সট্রিমিস্ট বা টেররিস্ট নয়। নেহাত এক ভেতো বাঙালি। অবধূতজিকে সে গুলি করেনি। ওত পেতে আমাদের কথা শুনছিল ঝোপের আড়ালে।"

হালদারমশাই বললেন, "আমি জয়ন্তবাবুর কথায় হালারে ফলো করছিলাম। সময়মতো না ধরলে কর্নেলস্যারের বডি পড়ে যেত।"

জয়ন্ত চমকে উঠল। "সর্বনাশ! কে লোকটা?"

বললাম, "বৈশম্পায়ন রায়।"

"অ্যাঁ?"

"হ্যাঁ।" ওর কাঁধে হাত রেখে বললাম, "গোড়া থেকেই তার প্রতি আমার সন্দেহ ছিল। আমাকে দিয়ে সে বুঝে নিতে চেয়েছিল, অনামিকা সেনকে খুন করার মোডাস অপারেন্ডিতে কোনও ত্রুটি আছে কি না, যা তাকে ধরিয়ে দেবে। দৈবাৎ সমীর রুদ্রের মুখোমুখি না হলে সে আমার কাছে আসত না। আসার পরে সে সমীরকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করেছে। তার প্রথম টার্গেট ছিল প্রশান্ত সান্যাল। তাই সে একই বাড়িতে ছদ্মনামে ছদ্মবেশে ফ্ল্যাট কিনেছিল। তার পক্ষে শিখ সাজা সোজা। মুখে দাড়ি তো আছেই। তবে ভি রায়ের ওপর আমার প্রথমদিনই সন্দেহ হওয়ার কারণ টেলিফোন ডাইরেক্টরি।"

জয়ন্ত বলল, "হ্যাঁ। বলছিলেন বটে।"

"চলো। হোটেলে ফিরে কফি খেতে খেতে বলব।"

হোটেলে ফিরে ব্যালকনিতে বসলাম। সারা কাঁটালিয়াঘাটে কোলাহল। মাইক্রোফোন। বাজি-পটকার আলো ও শব্দ। এই তুমুল কোলাহলের আড়ালে একটা আশ্চর্য নাটক ঘটে গেল।

কফি খেতে খেতে জয়ন্ত মনে করিয়ে দিল—"টেলিফোন ডাইরেক্টরি!"

বললাম, 'হ্যাঁ। সমীরকে ভি রায়ের নাকি দরকার। অথচ পাচ্ছে না। বিজ্ঞাপন দিতে চাইছে। কেন? টেলিফোন ডাইরেক্টরিতে সমীর রুদ্রের ঠিকানা সে সহজেই পেতে পারত। আজ সকালে মিম্মি আমার ফোন নাম্বার পেল কী করে? কারুর ঠিকানা খুঁজতে হলে—যদি সে মোটামুটি সচ্ছল লোক হয়, টেলিফোন ডাইরেক্টরিই আগে খুঁজবে।"

জয়ন্ত বলল, "বাপ্স্! মাথা ভোঁ ভোঁ করছে!"

হালদারমশাই হাসলেন। "মাথা ক্লিয়ার করনের জন্য নস্য লন।" বলে নস্যির কৌটো দিলেন। জয়ন্ত নিল না।

বললাম, "প্রশান্তর ওপর দায় চাপানোর জন্য বৈশম্পায়ন কত কৌশল করেছিল। ধুরন্ধর লোক। পয়সাখরচ করে প্লেনের টিকিট কিনেছিল পর্যন্ত। অনামিকা সেনের চিঠি হাতিয়েছিল সমীরের কাছে। সম্ভবত যে-রাতে সমীরকে খুন করে, সেই রাতেই। কনফেস করলে জানা যাবে। আশ্চর্য ক্ষুরধার বুদ্ধি ভদ্রলোকের! জনি ওয়াকার মদের বোতল সাজিয়ে রাখা থেকে শুরু করে সবটাই রেড হেরিং সাজানো। সমীরের মায়ের সঙ্গে কসবা গিয়ে ফ্ল্যাট থেকে সমীরের হ্যান্ডব্যাগ চুরি! সেই হ্যান্ডব্যাগে অনির চিঠি প্ল্যান্টেড! এমন কি ফোন করে আমাকে তার তৈরি রেড হেরিংয়ের দিকে ছোটাতেও চেয়েছিল। স্বীকার করছি, আমি কিছুদূর ছুটেছিলামও বটে। ছ'খানা লাল চিঠির হুমকি তার নিজেরই লেখা। বলতে পারো অপারেশন রেড হেরিং। সমীর রুদ্রকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করে সে আমার কাছে এসেছিল। অরিজিতের কাছেও গিয়েছিল।"

জয়ন্ত বলল, "তা হলে সমীরের সঙ্গে দৈবাৎ দেখা না হলে সে তাকে খুন করত না বলছেন?"

"করত না, যদি সমীর তাকে চিনতে না পারত। সমীর তার অনিকে খুনের প্রত্যক্ষদর্শী।"

"অনিকে খুনের মোটিভ কী?"

"প্রতিহিংসা চরিতার্থ। মুখে যাই বলুক, বাসু অনির প্রেমে পড়েছিল।"

হালদারমশাই অদ্ভুত শব্দে হাসলেন। "প্র্যাম—সরি! প্রেম কী ডেঞ্জারাস!"

"হ্যাঁ হালদারমশাই! প্রেম বড্ড ডেঞ্জারাস। তবে সত্যিকার প্রেম, খাঁটি প্রেম কোটিকে গুটিক দেখা যায়। এক্ষেত্রে প্রেম এবং প্র্যাম দুই-ই মিলেমিশে আছে।"

জয়ন্ত বলল, "বোগাস!"

"ডার্লিং! বৈশম্পায়নের মধ্যে খুনের ইচ্ছে জাগানোর প্রধান ফ্যাক্টর প্রশান্ত। সে সচ্ছল পরিবারের ছেলে। সে অনিকে পেয়েছে। এতে তার মতো নিম্নবিত্ত ঘরের ছেলের আঁতে প্রচণ্ড লেগেছিল। মানুষের মন ছকে ফেলে বিচার করা যায় না। অনিকে খুন করার পর সে প্রশান্তকে টার্গেট করেছিল। সুযোগ পাচ্ছিল না। গত ২৩ সেপ্টেম্বর প্রশান্ত হোটেলে উঠেছিল। তাই সে সুযোগ পায়নি। আমি গতরাতে ওয়াশিংটনে ট্রাঙ্ককল করে সব জেনেছি ওর কাছে। প্রশান্ত শিগগির এসে পড়ছে।"

হালদারমশাই বললেন, "ভি রায় এত উইপন পাইল কোথায়?"

"বিদেশঘোরা লোক সে। এ দেশে যে-সব অস্ত্রপাচারকারী আছে, তাদের সঙ্গে তার ট্রেডিং কনসাল্ট্যান্সি ফার্মের যোগাযোগ থাকা স্বাভাবিক। ফিরে গিয়ে অরিজিৎকে লড়িয়ে দেব। আমার বিশ্বাস কেঁচো খুঁড়তে এবার সত্যি সাপ বেরুবে।"

pathagar.net

জয়ন্ত বলল, "অনির ছবিটা বাসু ইচ্ছে করেই নষ্ট অবস্থায় দিয়েছিল। তাই না?"

চুরুট ধরিয়ে বললাম, "আসলে অরিজিৎ ওকে অনির একটা ছবি দিতে বলেছিল। তাই ছবিটা দেওয়া। কিন্তু সে চায়নি ছবিটা আমি কাজে লাগাই। জয়ন্ত, ওর কালো অ্যাম্বাসাডার সারাক্ষণ আমাকে ফলো করেছে। সুমিতবাবুর বাড়ি পর্যন্ত ফলো করেছিল। সেদিন অতটা নজর দিইনি। পরে দিতে বাধ্য হয়েছিলাম। যাই হোক, আর এসব কথা নয়।"

বলে গঙ্গাদর্শনের জন্য উঠে দাঁড়ালাম। গঙ্গায় আলো পড়ে ঝলমল করছে; বড় রহস্যময়ী এই নদী। অনামিকা সেনের মতো গভীরগোপন রহস্যে পূর্ণ। এ মুহূর্তে গঙ্গার মধ্যে কেন যেন তাকেই দেখতে পেলাম। মন খারাপ হয়ে গেল।....

বৈশম্পায়ন রায়

কে?

আমি অনি।

কেন এলে?

তুমি কী সুখে আছ দেখতে এলাম।

আমি সুখেই আছি অনি! কারণ আমি এবার মরতে পারব। নিজে নিজেকে মেরে ফেলতে কষ্ট হত। জীবনের বড় মায়া। এখন আমাকে মেরে ফেলা হবে। সেই মৃত্যুর কোনও বাধা নেই আর। হাইকোর্ট আমার মৃত্যুদণ্ডের রায় দিয়েছে। না দিলে এ জীবন খুব কষ্টকর হত।

বাসুদা!

বলো!

আমাকে কেন তুমি গুলি করে মেরেছিলে? আমি তো সমীরদার ডাকে আশ্রম ছেড়ে বাইরে যাইনি। তুমি ডেকেছ বলে গিয়েছিলাম। তুমি আমার কথা শোনার আগেই—

চুপ করো অনি!

না। বলো!

আমি কুৎসিত সন্দেহ করেছিলাম। ভেবেছিলাম, তুমি তোমার মামার সাধনসঙ্গিনী!

ছিঃ বাসুদা! তুমি এত নীচ!

হয়তো প্রেম মানুষকে এত নীচমনা করে।

প্রেম নয়, কুৎসিত কামনা।

তবে তা-ই। তুমি চলে যাও অনি! আমাকে সুখে মরতে দাও।...

ভালবাসার অন্ধকারে

জীবনে কোন মুহূর্তে হঠাৎ কী যে ঘটে যায়, আগে থেকে আঁচ করা কঠিন হয়ে পড়ে। মানুষ যেন আজীবন অন্ধকারে পথ হাঁটছে। আশপাশের অস্পষ্টতা থেকে তবু তো কিছু আন্দাজ করে নেওয়া যায় এবং সেইমতো জীবনটাকে গুছিয়ে নেওয়া চলে। কিন্তু সামনে অদূরে কী কাছে, কিছুই জানা নেই। হঠাৎ হয়তো খাদে পড়ে সে তলিয়ে যায় চিরকালের মতো।

গার্গীর জীবনে এক শরৎকালের দুপুরবেলায় সেই রকম একটা পতন ঘটে গেল। এই হঠকারিতার জন্য সে এতটুকু প্রস্তুত ছিল না। তই আত্মরক্ষার সহজাত বোধকে সে কাজে লাগাতে পারল না। নিঃসহায় আত্মসমর্পণ করতে হলো তাকে একটা অনিবার্যতার কাছে।

অনিবার্যতা? পরে অবশ্য তাই মনে হয়েছিল গার্গীর। আরও অনেক কিছু মনে হয়েছিল। চোর পালালে গেরস্থের বুদ্ধি বাড়ে বলে একটা কথা আছে। কিন্তু তখন আর পস্তানিতে লাভ নেই। শুধু নিজের ওপর রাগে জ্বলে মরা ছাড়া কিছু করার নেই। অথচ ভালবাসার পথ এমনি পিছল যে আছাড় না খেয়েও নিস্তার নেই যেন।

নতুন টাউনশিপের শেষদিকটায় গঙ্গার ধারে ছড়ানো-ছিটোনো সব সরকারি কোয়ার্টার। নিচু বাঁধের ওপর গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যানের সূত্রে বনদফতর থেকে লাগানো গাছপালা জঙ্গল হয়ে আছে। খানিকটা দূরে পুরনো শিবমন্দির আর শ্মশান। গার্গীদের কোয়ার্টারটা বাঁধের কাছাকাছি। পেছনে এলোপাতাড়ি ঝোপঝাড়ের মধ্যে একটা ছাতিম গাছ দাঁড়িয়ে আছে। জানালা থেকে ছাতিম গাছটা দেখা যায়। সেই গাছের তলায় একা গৌতমকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে গার্গী একটু অবাক হয়েছিল।

এখানে আসার পর থেকে গার্গী গাছটার অনেক বদনাম শুনেছে। কোন এক পানু চক্কোত্তির বউ কবে ওই গাছে ঝুলে প্রাণ দিয়েছিল। রাতবিরেতে প্রেতিনী ঠাকরুনকে নাকি মাঝেমাঝে দেখা যায়। চাঁদতারণ সিঙ্গির মেয়ে বিনু নাকি দিনদুপুরেই তাকে দেখে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। তারপর থেকে ঠাকরুনের ভূত তাকে পেয়ে বসেছে। অনেক ওঝা-হোমিওপ্যাথি করে শেষে গার্গীর স্বামী ঘনশ্যামের তাগিদে তাকে মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘনশ্যাম এই

কাঁটালিয়াঘাটে নতুন মানসিক হাসপাতালের ওয়েলফেয়ার অফিসার! বহরমপুর থেকে মাস তিনেক আগে এখানে বদলি হয়ে এসেছে সে। গার্গীকে সে পইপই করে সাইকোলজি বোঝায়। ভূতপ্রেত বলে কিছু থাকতে পারে না। এই রোগকে বলে হিস্টিরিয়া।

ঘনশ্যাম একটু গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। শ্যামবর্ণ মাঝারি গড়নের সাধারণ চেহারা। রোগা দেখালেও হাড়ের কাঠামো শক্ত। পঁয়ত্রিশ বছর বয়স। গার্গীর চেয়ে প্রায় বছর দশেকের বড়। গার্গী ছিপছিপে গড়নের যুবতী। গায়ের রঙ ফর্সা। চোখে পড়ার মতো লালিত্য তাকে ঘিরে আছে। সে উত্তর কলকাতায় বড় হয়েছে। বারাসাতের ঘনশ্যামের মতো একজন সাধারণ মানুষের সঙ্গে বিয়ে এবং এই মফস্বলী জীবনযাত্রা তার স্বপ্নে ছিল না! কিন্তু গরিব স্কুলশিক্ষকের মেয়ের এটাই ভাগ্য। এই ভাগ্যকে সে কালক্রমে মেনে নিয়েছে। বিয়ের পর বহরমপুরে গিয়ে বছরখানেক মোটামুটি মন্দ লাগেনি। শহরের পরিবেশ ছিল। কিন্তু কাঁটালিয়াঘাট নতুন টাউনশিপ। এখনও এর গা থেকে গ্রামের গন্ধ ঘোচেনি। আর এই নিরিবিলি প্রত্যন্ত এলাকা। সরকারি কোয়ার্টারের বাসিন্দাদের মধ্যে পরস্পর কেমন যেন ঈর্ষা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতার মানসিকতা থাকে। ঘনশ্যামের ডেজিগনেশনে 'অফিসার' শব্দটা থাকলেও সে এত সাদাসিধে আর অতিসাধারণ মানুষ, দরকার ছাড়া তাকে কেউ পাত্তা দেয় না বিশেষ। আর গার্গী যে মন খুলে কারও সঙ্গে মিশবে, তাতে বাধা তার নিজেরই স্বভাব। প্রতিবেশিনীদের কথাবার্তা চালচলন তার একটুও পছন্দ হয় না। সবাই টিভি, ফ্রিজ, শাড়ি, গয়না এবং স্বামীদের সরকারি গাড়ির গৌরবে আটখানা। গার্গীর গোপন দুঃখ এখানেই। ঘনশ্যাম একটু কিপটে স্বভাবের লোক। কিস্তিতেও অন্তত একটা টিভি কিনতে পারত। সে সারাদিন হাসপাতাল অফিসে থাকবে এবং তার বউ কেমন করে সময় কাটাবে, এ নিয়ে তার চিন্তাভাবনা আছে বলে মনে হয় না। ওই একটা ট্রানজিস্টার কবে কিনেছিল। সেটাই জানালার ধারে বসে বাজায় গার্গী। এতোল-বেতোল ভাবনা ভাবে।

এদিন দুপুরে ছাতিমতলায় গৌতমকে দেখে সে ট্রানজিস্টারের শব্দ কমাল। গৌতম অন্যদিকে ঘুরে সিগারেট টানছে। গৌতমকে এতদিন ধরে দেখে আসছে গার্গী, অথচ যেভাবে দেখল, এটা যেন একটা আবিষ্কার। ফিল্মের হিরোরা ঠিক ওই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে—কিন্তু ঠিক এই বোধটা নয়, হঠাৎ মনে হলো গার্গী একটা অপার্থিব সৌন্দর্য দেখছে। প্রকৃতি মানুষকে কাছে পেলে কি এমনি করে বদলে দেয়? গার্গীর মনে একটা চাপা ছটফটানি জাগল। কেন এদিকে তাকাচ্ছে না গৌতম?

গৌতমের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল ঘনশ্যামই। তার হাসপাতালের বস সাইকিয়াট্রিস্ট ডাক্তারের একমাত্র ছেলে। কলকাতায় ডাক্তারি পড়ে। এটা তার

শেষ বছর। পুজোর ছুটিতে এখানে এসেছে মাত্র দিন পনের আগে। সে এখানে এলেই টো টো করে ঘুরে বেড়ায়। এদিকটা নিরিবিলি এলাকা। কোয়ার্টারের পেছনদিকটায় দৈবাৎ তাকে দেখতে পেয়ে ঘনশ্যাম ডেকেছিল। গৌতম আলাপী স্বভাবের ছেলে। ঘনশ্যাম ভেতরে না ডাকলেও সে সটান ঢুকে পড়েছিল। অগত্যা ঘনশ্যাম বসের ছেলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয় গার্গীর। আর সেই আলাপ থেকেই প্রায়ই গৌতম ঘনশ্যাম থাক বা না থাক কোয়ার্টারে, সোজা চলে আসে। সে প্রথম প্রথম বৌদি বলে ডাকত ঘনশ্যামের অনুপস্থিতিতে। হঠাৎ একদিন একটু হেসে বলে উঠেছিল, "বৌদি বলার মানে হয় না আপনাকে! বয়সে আমার সমান বলেও তো মনেই হয় না। আপনি এইটুকু মেয়ে। আপনি-টাপনিটা বড্ড বাজে। দূরত্বের সৃষ্টি করে। তুমি বলব—আপত্তি আছে?"

গার্গী আস্তে বলেছিল, "নাহ্।"

"এবং শ্যামদার অ্যাবসেন্সে নাম ধরেই ডাকব।"

গার্গী মুখ তুলে তার দিকে তাকিয়ে একটু পরে বলেছিল, "ডাকবেন।"

"গার্গী! ডাকবেনটা উইথড্র করো।"

গার্গীর বুকটা ধড়াস করে উঠেছিল। তারপর সে সামলে নিয়েছিল একটু নার্ভাস হেসে বলেছিল, "করলুম।"

এমনি করেই গার্গীর জীবনে একটা ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল সেদিন। ঘনশ্যাম কোনও-কোনও দিন দুপুরে খেতে এসে দেখত গৌতম ও গার্গী গল্প করছে। কিন্তু তার হাবভাবে বোঝা যেত না সে কিছু সন্দেহ করছে। কোনওদিন বিকেলে অফিস থেকে ফিরেও দেখত গৌতম ও গার্গী কোয়ার্টারের পেছনে ঘাসে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। গৌতম বলত, "চলুন শ্যামদা, বৌদিকে নিয়ে তিনজনে গঙ্গার ধারে বেড়িয়ে আসি।"

ঘনশ্যাম বলত, "বড্ড টায়ার্ড ভাই। বরং তোমরা যাও। ঘুরে এস। তোমার বৌদির তো ঘরে বসে থেকে দম আটকে যায়। একটু ঘোরাঘুরি করলে রিলিফ পাবে।"

এভাবে একদিন ঘনশ্যাম তাদের সিনেমা দেখতে যেতেও তাগিদ দিয়েছিল। গার্গী স্বামীর মধ্যে কোনও ভাবান্তর টের পায় না। রাতের শয্যায় একই আদর-ভালবাসার তাল কাটে না। অথচ মাঝেমাঝে গার্গীর মনে হয়েছে, কেন তার স্বামী তাকে সন্দেহ করছে না? কেন এমন অবাধ মেলামেশায় বাধা দিচ্ছে না? এ কি চাকরির স্বার্থে বসকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য বসের ছেলেকে এমন প্রশ্রয় দেওয়া? গার্গীর গৌতমকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হতো, তার বাবার কাছে ঘনশ্যাম গৌতমকে কোনও সুপারিশ করতে বলেছে কি না? কিন্তু মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করতে বেধেছে।

pathagar.net

তবে এতগুলো দিন অবাধ মেলামেশা সত্ত্বেও গৌতম গার্গীকে ছোঁয়নি বা কোনও ভালবাসার সংলাপও উচ্চারণ করেনি। শুধু দু'দিন আগে সন্ধ্যায় গঙ্গার ধার থেকে ফেরার সময় গৌতম আলতোভাবে তার একটা হাত হাতে নিয়েই ছেড়ে দিয়েছিল। গার্গীর বুকটা ধড়াস করে উঠেছিল। তারপর কতক্ষণ ধরে সঙ্গীতের সুরের মতো একটা সূক্ষ্ম অনুরণন স্নায়ুকোষে ধীরে মিলিয়ে গিয়েছিল। সে রাতে ঘনশ্যাম গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, গার্গী জেগেই ছিল। হঠাৎ মুহূর্তের জন্য মনে হয়েছিল গৌতম তত সাহসী নয় কেন? অথবা এ তার একটা নিছক খেলা! নাকি সে চাইছে গার্গী তার কাছে আত্মসমর্পণ করবে? নাহ্, গার্গী অত সস্তা নয়। মনে মনে রাগে জ্বলে উঠেছিল গার্গী।

এদিন দুপুরে একটু আগে ঘনশ্যাম খেয়ে অফিসে ফিরে গেছে। গার্গী খাওয়ার পর ফ্যানের নিচে ভিজে চুল শুকিয়ে কপালে একটা টিপ পরেছে। সিঁথিতে একচিলতে সিঁদুর দিয়ে আয়নায় নিজেকে দেখতে দেখতে তার বুকের ভেতর একটা চাপা যন্ত্রণা টের পেয়েছে। কী নিঃসঙ্গ এই জীবন! এই প্রায়-গ্রাম্য জঙ্গুলে পরিবেশে তাকে কাটাতে হচ্ছে। গৌতম না থাকলে তার জীবনে বেঁচে থাকার মানেটাই হারিয়ে যেত।

pathagar.net

কিন্তু গৌতমের ছুটি ফুরিয়ে এলে সে তো কলকাতা চলে যাবে। তারপর? আবার সেই একলা হয়ে থাকা কষ্টকর দিন ও রাতের একঘেঁয়েমি! ওই ছাতিম গাছে ঝুলে মরতে ইচ্ছে করে গার্গীর পানু চক্কোত্তির সেই বউটার মতো!

জানলার ধারে বসে গৌতমকে দেখে গার্গী নিজের অজ্ঞাতসারে একটা হঠকারিতায় আক্রান্ত হয়েছিল। ট্রানজিস্টারের শব্দ হঠাৎ সে খুব বাড়িয়ে দিল গৌতমের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই।

তখন গৌতম এদিকে তাকাল। তারপর সোজা আগাছার জঙ্গলের ভেতর দিয়ে জানালার ধারে চলে এল। গার্গী ট্রানজিস্টার বন্ধ করে দিল। সে মুখ টিপে হেসে বললস "ওখানে কী করছিলে? কোনও হিরোইনের জন্য ওয়েট করছিলে বুঝি?"

গৌতম হাসল, "আমার হিরোইন তো তুমি!"

'বাজে কথা বলো না!" গার্গী কপট রাগ দেখাল। "নিশ্চয় কারও জন্য ওয়েট করছিলে!"

"করছিলুম সেটা ঠিক। দরজা খোলো বলছি।"

গার্গী বসার ঘরের দরজা খুলে দিলে গৌতম শোবার ঘরে চলে গেল। খাটে বসে রুমালে মুখের ঘাম মুছল। গার্গী দরজা বন্ধ করে এ ঘরে এল। গৌতম বলল, "এক গ্লাস জল দাও।"

গর্গী বাঁকা হাসল। "দিচ্ছি। আগে বলো কার জন্য—"

গৌতম তার কথার ওপর বলল, "তোমাকে আজ এত সেক্সি দেখাচ্ছে কেন গার্গী?"

"কী দেখাচ্ছে!"

"অসাধারণ সুন্দরী।"

"শাট আপ্!"

"কী আশ্চর্য! সত্যি কথাটা বললুম, অমনি শাট আপ্? যাও, তেষ্টায় গলা শুকিয়ে গেছে। তপুর জন্য একঘণ্টা দাঁড়িয়ে আছি। ওর পাত্তা নেই। কে জানে পুলিশের পাল্লায় পড়ল নাকি!"

গার্গী একটু অবাক হয়ে বলল, "তপু কে?"

"আহ্! আগে জল দাও।"

গার্গী রান্নাঘরে যখন জল আনতে গেল, তার শরীর জুড়ে একটা অস্থিরতা। গৌতমের 'তোমাকে আজ এত সেক্সি দেখাচ্ছে কেন' এই কথাটা তানপুরার মতো ঝংকৃত হচ্ছিল মনে। কুঁজো থেকে জল ঢালবার সময় তার হাত কাঁপছিল। খানিকটা জল মেঝেয় ছলকে পড়ল। সে ঠোঁট কামড়ে ধরল। কী এক সাংঘাতিক ঘটনার দিকে যেন তার নিয়তি তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সে রুখে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছিল।

pathagar.net

তার হাত থেকে জলের গ্লাস নিয়ে গৌতম বলল, "তোমাকে অমন দেখাচ্ছে কেন?"

গার্গী কোন জবাব দিল না।

গৌতম জল খেয়ে গ্লাসটা হাত বাড়িয়ে ড্রেসিং টেবিলে রাখল। তারপর গার্গীর হাত ধরে টেনে তাকে খাটে বসিয়ে দিল। আস্তে বলল, "তোমাকে বলা উচিত।" একটু হাসল সে। "আমার ধারণা, তোমার পেটে কথা থাকে। না, না—রাগ কোরো না। বলতে চাইছি, তোমাকে বিশ্বাস করা যায়।"

গার্গী বাঁকা হাসল। "এত ভূমিকার দরকার কী? আমি শুনতে চাইনে।"

"একটু আগে শুনতে চাইছিলে।" গৌতম চাপা স্বরে বলল, "শুনতে না চাইলেও হঠাৎ মনে হলো, তোমাকে বলা উচিত। কারণ তোমার সাহায্য দরকার।"

এবার গার্গী একটু আগ্রহ দেখিয়ে ভুরু কুঁচকে বলল, "কী ব্যাপার?"

"তুমি তপনকে চেনো না বললে, শুনে অবাক লাগছিল। এখানে ওকে সবাই চেনে। এক সময় পলিটিক্স করত। এখন ভোটের পলিটিক্সে মার্সেনারি যোগান দেয়।"

"মার্সেনারি মানে" বলে গার্গী একটু হাসল। "ও! তুমি ওই গুণ্ডাটার কথা বলছ? তোমার শ্যামদার কাছে শুনেছি, ওদের কাছে হসপিট্যালের দামি-দামি

ওষুধ পাচার করে স্টাফরা। ভয়ে কেউ কিছু বলতে পারে না। পুলিশ নাকি ওদের হাতে।"

গৌতম গম্ভীর হয়ে বলল, "আমি প্রব্লেমে পড়ে গেছি। তপু শত খারাপ ছেলে হোক, খুব আলাপি। ওর মধ্যে বন্ধুত্ব করার মতো অনেক গুণ আছে। তা ছাড়া শিক্ষিত ছেলে। গ্র্যাজুয়েট। বাবা এখানে ট্রান্সফার হয়ে আসার পর তপুর সঙ্গে আমার আলাপ। এখন মনে হচ্ছে আলাপ না হলেই ভাল ছিল।"

গার্গী অস্থির হয়ে বলল, "আহ্! আসল কথাটা বলবে তো?"

গৌতম আস্তে বলল, "কোন সোর্সে তপু খবর পেয়েছে, ওদের বাড়িতে পুলিশ রেড হবে শিগগির যে-কোনও সময়ে। আসলে ওর কোনো রাজনৈতিক দাদা কী কারণে চটে গেছে! পুলিশকে প্রেশার দিচ্ছেন ভদ্রলোক। তপুর একটা বিদেশী রিভলভার আছে। ক'দিনের জন্য ওটা সে আমার কাছে লুকিয়ে রাখতে চায়। এখন প্রব্লেম হলো, আমি ওকে না করতে পারিনি। আজ দুপুর বারোটা একটার মধ্যে ওটা তার আমাকে ওই ছাতিম গাছটার ওখানে দিয়ে যাবার কথা। একটা বেজে গেছে। তবু এল না। হয় তো কোনও কারণে দেরি করছে। আমি যাই।" গৌতম উঠে দাঁড়াল। "গার্গী, যদি তপু ওটা আমাকে দেয়, আমি তোমার কাছে বরং লুকিয়ে রাখতে চাইছি। রাখবে লক্ষ্মীটি? আমাদের বাড়ির ব্যাপার তো জানো!"

গার্গী ওর হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিল খাটে। "ছাড়ো! একটা অব্দি ওয়েট করতে বলেছিল। তুমি করেছ। তোমাকে ও তো আর দোষ দিতে পারবে না।"

"কিন্তু—"।

বাধা দিয়ে গার্গী বলল, "কিন্তু কিসের? ওসব বাজে ঝামেলায় পড়তে যেও না আর।"

গৌতম হাসল। "বাজে ঝামেলা তোমার এখানেও কম নয়!"

"তার মানে?"

"তোমাকে দেখে ভীষণ লোভ হচ্ছে।"

"একদম অসভ্যতা করবে না বলে দিচ্ছি।"

"গার্গী, তুমি জানো না তুমি কত সুন্দর।"

"হুঁ, আমি ডানাকাটা পরী!"

গৌতম হঠাৎ তার দু'কাঁধ ধরে তাকে কাছে টানল। গার্গী মুখ ঘুরিয়ে নেওয়ার আগেই সে তাকে চুমু খেল। কয়ে মুহূর্তের আচ্ছন্নতা। গার্গী তারপর আত্মরক্ষার চেষ্টা করল। কিন্তু সেই মুহূর্তে তার আর শরীর যেন আলাদা হয়ে গিয়েছিল। নিবিড় চুম্বনের এই অমর্ত্য স্বাদ তার জীবনে প্রথম। পুরুষের বুকের এই উত্তাপও কখনও এমন করে সে টের পায়নি। এই চুম্বনের উন্মাদনা তাকে

pathagar.net

অবশ করে দিচ্ছিল। একটু পরে সে জড়ানো গলায় কোনও ক্রমে উচ্চারণ করতে পারল "আহ্! জানলা-দরজা খোলা!"

গৌতম উঠে গিয়ে উত্তরের খোলা জানলাটা বন্ধ করে দিলো। তারপর দরজা বন্ধ করতে গিয়ে শুনল, গার্গী চাপা আর্তস্বরে বলছে, "আহ্! ও কী করছ তুমি?"

দরজা বন্ধ করে গৌতম গার্গীর ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল।

এক শরৎকালের উজ্জ্বল দুপুরে এভাবে যে আকস্মিকতা ঘটে গেল, কিছুক্ষণ গার্গীর কাছে তা পতন বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু মানুষের শরীরে প্রকৃতি কী ঐশ্বর্য থরেবিথরে সাজিয়ে রেখেছে, এই পঁচিশ বছর বয়সে তার প্রথম অনুভূতি গার্গীকে আবিষ্ট করেছিল। সে বুঝতে পারছিল, স্বামীর কাছে এভাবে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে পারেনি। এমন নিঃশেষে চরম আত্মসমর্পণের মধ্যেই যেন নারীর যৌবনের সার্থকতা।

শেষ মুহূর্তে গভীর আশ্লেষে আর দুরন্ত আবেগের ঘোরে সহসা গার্গী অনুভব করল, তার মধ্যে এতদিন ধরে মাতৃত্বের গোপন কাকুতি ছিল। সেই কাকুতিই কি তাকে এই হঠকারিতায় পৌঁছে দিল?

ঘরের ভেতর আবছা আঁধার। গার্গীর নগ্ন শরীরের সবখানে গৌতমের উষ্ণ ঠোঁটের স্পর্শ। জড়ানো গলায় গার্গী স্খলিত ও আর্তস্বরে অতিকষ্টে উচ্চারণ করল, "আমি মরে যাব গৌতম! এবার ছাড়ো!"

কিছুক্ষণ পরে গৌতম বেরিয়ে গেল।

গার্গী বন্ধ জানলাটা খুলতে সাহস পেল না। সে কাঁপা-কাঁপা হাতে চুল আঁচড়ে ঘষে যাওয়া টিপটা মুছে আবার পরল। ফ্যানের স্পিড বাড়িয়ে শরীর শুকিয়ে নিল। তারপর ট্রানজিস্টারটা আস্তে চালিয়ে বারান্দায় গেল। কেউ লক্ষ্য করেনি তো? একটু দ্বিধার সঙ্গে সে বাথরুমে ঢুকল।

গার্গীর মনে হচ্ছিল একটা নতুন শরীর সে পেয়েছে, যার সঙ্গে আগেরটার কোনও মিল নেই। সেই নতুন শরীরের সঙ্গে পুরনো মনকে মেলানো যাচ্ছে না। পুরনো মন বারবার বলছে, গার্গী! এ তুই কী করলি? তার নতুন মন এসে বলছে, বেশ করেছি। আমার খুশি।

ঘরে ঢুকে সে খাটের বেডকভার নতুন করে পাতল। তারপর শুয়ে পড়বে ভাবল। সেই সময় উত্তরের জানালায় খট্‌খট্ শব্দ হলো। গার্গী বলল, "কে?"

গৌতমের সাড়া এল। "শিগগির খোলো!"

গার্গী উঠে গিয়ে জানালা খুলে দেখল, গৌতম একটা জুতোর বাক্স হাতে দাঁড়িয়ে আছে। সে বাক্সটা জানালা গলিয়ে ভেতরে ঢোকাল। বলল, "এটা খাটের তলা-টলায় লুকিয়ে রাখো। তপু এসেছিল।"

বলেই সে চলে গেল। গার্গী দড়িবাঁধা বাক্সটা খুলতে গিয়ে খুলল না। খাটের তলায় ঢুকিয়ে রাখল। আজ থেকে নিজেকে তার মরিয়া ও সাহসী লাগছিল। এতক্ষণে সে খেতে গেল কিচেনে।...

॥ দুই ॥

ঘনশ্যাম কোনও-কোনও দিন দেরি করে বাড়ি ফেরে। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে সে ইঞ্জেকশন দেওয়ার কল অ্যাটেন্ড করতে যায় এবাড়ি ও-বাড়ি। সে ডাক্তার নয়। কিন্তু ডাক্তার-হাসপাতালের সংসর্গে ওষুধপত্র এবং ইঞ্জেকশনের অভিজ্ঞতা আছে তার। গার্গী বোঝে ঘনশ্যাম বাড়তি রোজাগারের ধান্দায় থাকে। কখনও তার এমন সন্দেহও হয়েছে, তার স্বামী হাসপাতালের ওষুধ-পাচার চক্রের সঙ্গে জড়িত কি না। কিন্তু ঘনশ্যাম এমন সিরিয়াস প্রকৃতির মানুষ তাকে জিজ্ঞেস করতেই বাধে গার্গীর। তা ছাড়া ঘনশ্যামের হাবভাব বা কথাবার্তায় কোনও লুকোচুরির ছাপ সে এ পর্যন্ত লক্ষ্য করেনি।

এদিন বিকেলে গার্গী মনে মনে গৌতমের প্রতীক্ষা করছিল। জীবনে প্রথম ভালবাসা তীব্র মাদকতাময় প্রতীক্ষা। কিন্তু বিকেল গড়িয়ে গেল, গৌতম এল না। হঠকারিতার জন্য সেকি লজ্জা পেয়েছে? গার্গী অস্থির হয়ে ঘর-বার করছিল। সন্ধ্যার মুখে ঘনশ্যাম বাড়ি ফিরল। বলল, "ভেবেছিলুম, আমার দেরি দেখে বেড়াতে বেরিয়েছ। গৌতম আসেনি?"

গার্গী ঝাঁঝালো স্বরে বলল, "না। সবসময় খালি গৌতম-গৌতম কোরো না তো!"

"কী আশ্চর্য!" ঘনশ্যাম একটু হাসল। মুখে ক্লান্তির ছাপ। "ইয়ে—এক কাপ চা পেলে ভাল হতো।"

"এমন করে বলছ কেন? কোনও দিন আমি চা করে খাওয়াই না?" গার্গী চটে গেল।

ঘনশ্যাম বারান্দায় একটা চেয়ার এনে বসে বলল, "আজ বড্ড ঝামেলা গেল। গ্রাম থেকে একটা মেন্টাল পেশেন্ট এসেছিল। সে এমন ভাঙচুর শুরু করল, আটকানো কঠিন! আমাকে বোতল ছুঁড়েছিল। একটুর জন্য বেঁচে গেছি। সেই নিয়ে—তারপর এদিকে এক কাণ্ড। হরবাবুর ইনসমনিয়া। ঠিক ঘুমের ওষুধ নয়, নার্ভ ঠাণ্ডা রাখার জন্য ট্র্যাংকুলাইজার দিতুম। কাল দিয়েছিলুম নাইট্রাজেপাম। ১০ মিলিগ্রাম। ভদ্রলোক দুটো ট্যাবলেট খেয়ে কেলেংকারি করে বসেছিলেন। আসলে আনঅফিসিয়াল ডাক্তারি করার বিপদ আছে।"

গার্গী কিচেনের বারান্দায় একটা টেবিলে কুকার জ্বেলে কেটলি চাপাচ্ছিল। কথাগুলো শুনে বলল, "কী হয়েছে হরুবাবুর?"

"হয়নি, হতে পারত। খামোকা হরুবাবুর ভাইপো তপু আমাকে গালমন্দ করল।"

"তপু?" গার্গী চমকে উঠেছিল। "সেই গুণ্ডাটা?"

ঘনশ্যাম শ্বাস ছেড়ে বলল, "হ্যাঁ! ছেড়ে দাও। দেশে আইন-কানুন বলে তো আজকাল কিছু নেই। আমার চৌদ্দপুরুষের ভাগ্য, গায়ে হাত তোলেনি।"

গার্গী ফুঁসে উঠল। "তপুকে ইচ্ছে করলে পুলিশে ধরিয়ে দিতে পারি জানো?"

ঘনশ্যাম তাকাল।

গার্গী চাপা স্বরে বলল, "চা খেয়ে নাও, সব বলছি।"

ঘনশ্যামের যেন কোন ব্যাপারে কৌতূহল নেই, গার্গী বরাবর দেখে আসছে! ওর কেঠো নীরস চেহারার মতো যেন ওর মন। তবে নিজের কথাটা বেশি করেই বলার স্বভাব আছে। অন্যর কথায় তত কান করে না।

একটু পরে চায়ের কাপ ওর হাতে তুলে দিয়ে গার্গী আস্তে বলল, "তুমি এত গৌতম গৌতম করো। গৌতমের খাতিরেই জিনিসটা নিতে হলো। কী জিনিস জানো?"

ঘনশ্যাম আবার নিষ্পলক চোখে তাকাল শুধু।

গার্গী ফিসফিস করে বলল, "তপুর রিভলভার। একটা জুতোর বাক্সয় ভরে গৌতম দিয়ে গেল। খাটের তলায় লুকিয়ে রেখেছি।"

"রিভলভার।"

"তাই বলল গৌতম। তপুদের বাড়িতে নাকি পুলিশ-রেড হবে।" গার্গী দম নিয়ে বলল, "আমি সাহস পাইনি খুলে দেখতে। তুমি দেখবে তো দেখ গিয়ে। আর শোন! গৌতমকে বলে দিও, এভাবে যেন কক্ষণো—"

ঘনশ্যাম কেমন হাসল। "ছেড়ে দাও। গৌতম ভাল ছেলে। রেখে গেছে। নিয়ে যাবে'খন।"

বাড়িতে বেআইনি সাংঘাতিক একটা চোরাই জিনিস থাকলে সব নিরীহ মানুষের মনে একটা দুরুদুরু ভয় আর উৎকণ্ঠা থাকা স্বাভাবিক। গার্গীর মনে সেটা ছিল না, তা নয়। কিন্তু গৌতমের কাছে নিঃশেষে আত্মসমর্পণে আর নিষিদ্ধ ভালবাসার গোপন সুখ সেটা চাপা দিয়ে রেখেছিল। ঘটনাটা ঘনশ্যামকে ঝোঁকের বশে বলে ফেলে সে গৌতমের ওপর রাগ দেখিয়ে আসলে কৈফিয়ত দিতেই চেয়েছিল। কিন্তু ঘনশ্যামের এই নির্বিকার ভাব তাকে আশ্বস্ত করল।

তবু গার্গী না বলে পারল না, "গৌতম যদি এত ভাল, তা হলে গুণ্ডাদের সঙ্গে মেশে কেন? আমার কিন্তু বড্ড ভয় করছে।"

ঘনশ্যাম চায়ে চুমুক দিয়ে ফের সেইরকম কেঠো হাসি হাসল। "যখন ওটা নিয়েই ফেলেছ, তখন আর ভয় কিসের? জেনেশুনেই তো নিয়েছ।"

"কী করব?" গার্গী আবার ঝাঁঝালো স্বরে বলল, "তোমার খাতিরের লোক।

তুমি ওকে পাত্তা দাও বলেই—এখন তো বেশ বলছ! যদি ওকে না করে দিতুম, তুমি বলতে—"

ঘনশ্যাম বলল, "ছেড়ে দাও।"

গার্গী স্বামীর এতখানি নির্বিকার আচরণ আজ সহ্য করতে পারছিল না। "না। তুমি শোনো, ওকে ডেকে নিয়ে এস। ওটা নিয়ে যেতে বলো। যদি কোনভাবে পুলিশ জেনে যায়, কী হবে বুঝতে পারছ? সেই দুপুর থেকে আমি তোমার পথ তাকাচ্ছি তুমি এলে আপদটা বিদায় করব ভেবে। না, না! তুমি এক্ষুণি যাও। ওকে বুঝিয়ে বলো, অন্যকে খামোকা বিপদের মুখে ফেলে দেওয়া কি ভাল?"

ঘনশ্যাম গা করল না। আস্তেসুস্থে চা খেয়ে সিগারেট ধরাল। তারপর একটু হাসল। "কই, চলো তো জিনিসটা দেখি।"

গার্গী দ্রুত ঘরে ঢুকে খাটের তলা থেকে জুতোর বাক্সটা বের করল। মশার উৎপাতের জন্য সব জানলা বন্ধ। ঘনশ্যাম ঘরে ঢুকলে সে দরজাটাও বন্ধ করে ফ্যান চালিয়ে দিল। ঘরে ষাট ওয়াট বাল্বের আলো। বলল, "তুমি খুলে দেখ। আমার ভয় করছে। সাবধানে খুলবে কিন্তু! যদি গুলি বেরিয়ে যায়, কেলেংকারি হবে।"

ঘনশ্যাম দড়িটা সাবধানেই খুলল। তারপর বাক্সটা খুলতেই দেখা গেল, ভেতরে দুটো বুট জুতো ঠাসাঠাসি করে রাখা।

গার্গী একটু অবাক হয়ে বলল, "জুতো! তবে যে গৌতম বলল—" বলেই সে হেসে ফেলল। "গৌতমের চালাকি! কোনও মানে হয়? মিছিমিছি ভয় দেখিয়ে গেল। সবসময় স্টান্ট, আর দুষ্টুমি।"

ঘনশ্যাম একটা জুতো বের করে ভেতরে হাত ভরল। তারপর একটা রুপোলি ছোট্ট আগ্নেয়াস্ত্র বের করল। গার্গী চমকে উঠে তাকিয়ে রইল। ঘনশ্যাম খুঁটিয়ে অস্ত্রটা দেখে আস্তে বলল, "চীনা রিভলভার।"

শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে গার্গী বলল, "কী করে বুঝলে?"

"এই যে চীনা ভাষায় কী সব লেখা আছে। হ্যামার নেই। কাজেই অটোমেটিক।" বলে সে গুলির কেসটা অনেক টেপাটেপি করে খুলল। কেসে গুলি ভরা নেই। কেসটা বন্ধ করে সে অন্য জুতোয় হাত ভরে কাগজের একটা মোড়ক বের করল। মোড়কের ভেতর অনেকগুলো খুদে গুলি। নেলপালিশের শিশির গড়ন। মাথায় সুঁচালো কালো একচিলতে জিনিস দেখিয়ে সে বলল, "এই কালচে অংশটা দেখছ, এটাই আসল গুলি। সিসের টুকরো। ট্রিগার টানলে এইটে বেরিয়ে যায়। মানুষের গায়ে লাগলে কী হয় জানো? মাংসের ভেতর ঢুকে চক্কর মেরে বেড়ায়। স্পিড শেষ হলে একখানে আটকে থাকে।"

গার্গী রুদ্ধশ্বাসে শুনছিল। বলল, "তুমি কী করে জানলে গো?"

তার কণ্ঠস্বরে ছটফটানি ছিল। ঘনশ্যাম একটু হাসল। "আমার এক ক্লাসফ্রেন্ড শ্যামল বউবাজার থানায় পুলিশ ইন্সপেক্টর ছিল। আমার তো জানো সবতাতে আগ্রহ আছে। পিস্তল কাকে বলে, রিভলভারই বা কাকে বলে, সব বুঝিয়ে দিয়েছিল। পিস্তলে আঠারোটা পর্যন্ত গুলি থাকে। কিন্তু পিস্তলের গুলি বডিতে সোজা ঢুকে যায়। আর রিভলভারের নলের ভেতরটা ঘোরানো স্ক্রুর প্যাঁচের মতো। তাই গুলি ঘুরতে ঘুরতে বেরিয়ে গিয়ে বডিতে ঢোকে। ঢুকেও কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ায়।'

"চুপ করো! আমার ভয় করছে।" গার্গী ব্যস্তভাবে বলল।

"যেমন ছিল, তেমনি রেখে দাও। আর শোনো, এক্ষুণি গিয়ে গৌতমকে ডেকে আনো।"

ঘনশ্যাম বাক্সটা আগের মতো দড়ি দিয়ে বেঁধে বলল, "গৌতম কি আমাকে কিছু বলতে বারণ করেছিল?"

"না। জানালা দিয়ে বাক্সটা ঢুকিয়ে রাখতে বলল। তোমার কথা কিছু বলেনি।"

"থাক। রেখে দাও। ঝামেলা বাড়িয়ে লাভ নেই। নিয়ে যাবে'খন।"

গার্গী বাক্সটা খাটের তলায় লুকিয়ে রেখে দরজা খুলে দিল। ঘনশ্যাম খাটে বসে সিগারেট টানতে থাকল। মুখে একই নির্বিকার উদাসীন ভাব।

গার্গী তাকে লক্ষ্য করছিল। একটু পরে বলল, "তুমি এখন কিছু খাবে?"

"নাহ্। ঘাটবাজারে নরেনের পাল্লায় পড়ে দুটো সিঙ্গাড়া খেয়েছি।" ঘনশ্যাম হাত বাড়িয়ে ড্রেসিং টেবিলে রাখা অ্যাশট্রেতে সিগারেটটা গুঁজে দিল। বলল, "নরেনেরও একই প্রব্লেম। এখান থেকে ট্রান্সফার হতে পারলে বেঁচে যায়। ওদের হেলেথ সেন্টারে ইউনিয়নবাজি। তার ওপর মস্তানদের গ্যাংয়ের হামলা। পরশু একটা ইনজুরি কেসের পেশেন্ট মারা গেল। তাই নিয়ে ভাঙচুর মারধর। আজকাল ল অ্যান্ড অর্ডার বলে কিছু নেই।"

ঘনশ্যাম হাসপাতালের গল্প করতে লাগল। রোজ তা-ই করে। গার্গীর মনে হয়, একটা রোবোটের সঙ্গে সে সংসার করছে। কোনও আবেগ নেই। জীবনের উত্তাপ নেই। এমন কি, রাতের শয্যায় শরীরে শরীর মেলানোর যে জৈব উন্মাদনা, তাও ঘনশ্যামের মধ্যে যেন নেই। খাওয়া-দাওয়া, অফিস যাওয়া ও ফিরে আসা বা জীবনযাপনের আরও অনেক রীতির মধ্যে তার যে রুটিনবাঁধা আচরণ, দাম্পত্য জীবনেও তা-ই। এ-রাতে স্বামীর পাশে শুয়ে সহসা গার্গীর মনে পতনের পাপবোধ জেগে উঠেছিল এবং অনুশোচনায় আক্রান্ত গার্গী মনেপ্রাণে চাইছিল, তার স্বামী তাকে বাঁচাক পাল্টা তীব্র ভালবাসা দিয়ে। সে

তার বুকে হাত রেখে গালে ঠোঁট ঠেকাল। কিন্তু ঘনশ্যাম সাড়া দিল না। একটু পরে তার নাক ডাকতে থাকল। তখন গার্গী ঘুরে শুল।

সকালে ঘনশ্যাম রোজকার মতো বাজারে গিয়েছিল।

গার্গী গৌতমের প্রতীক্ষা করছিল। একটু পরে সে নিজের আচরণে নিজেই অবাক হয়েছিল। এমন করে সে তো এতদিন কারও প্রতীক্ষা করেনি! ছটফটানি ভরা এই পথ চেয়ে থাকা তার জীবনে একেবারে নতুন। আগে গৌতম এলে তার ভাল লেগেছে। কিন্তু তার পথ তাকিয়ে থাকেনি। গার্গীর মনে হচ্ছিল, হঠাৎ সে নিজে নতুন হয়ে উঠেছে, তেমনি গৌতমও তার কাছে নতুন হয়ে উঠেছে।

আর এই ছটফটানির মধ্যে আনন্দভরা আবেগ আছে। নিষিদ্ধ সৌন্দর্যে সাজানো যৌবনপূর্ণ পৌরুষের প্রতি আহ্বান আছে।

গার্গীর মধ্যে সেই আবেগ ছিল, যে আবেগে বৃক্ষেরা ফুলবতী হয়। নদী হয় স্রোতবতী। আকাশ ভরে মেঘ জমে ওঠে। বৃষ্টির ধারা ভাসিয়ে দেয় ধুলোমাটির জগৎটাকে। এ আবেগ প্রকৃতির খুব গভীর গোপন আবেগ। দিন মাস ঋতু বর্ষচক্র বহমান সেই টানে। রোদ-জ্যোৎস্না-অন্ধকারের খেলা চলে জীবজগৎকে ঘিরে।

গার্গী আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখছিল। গৌতম তাকে অসাধারণ সুন্দরী বলেছিল। সত্যি কি সে তা-ই?

"ওদিকে এক কাণ্ড!" ঘনশ্যামের সাড়া পেয়ে সে বেরুল। ঘনশ্যাম সাইকেল উঠোনে রেখে বাজারের থলে হাতে বারান্দায় উঠল। মুখটা গম্ভীর।

গার্গী বলল, "কী?"

"কাল রাত্তিরে আবার বেধেছিল দুই গ্যাংয়ে। খুব বোমাবাজি হয়েছে।"

গার্গী দ্রুত বলল, "হ্যাঁ। অনেক রাত্রে শব্দ শুনেছিলুম যেন।"

ঘনশ্যাম থলেটা তার হাতে গুঁজে দিয়ে একটু হাসল। "তপু হারামজাদা খুব বেড়েছিল। গেল!"

গার্গী চমকে উঠল। "গেল মানে?"

"ডেড। বডি ঝাঁঝরা।" ঘনশ্যাম চেয়ারে বসে সিগারেট ধরাল। "ক্লাব থেকে বাড়ি ফিরছিল। এদিকে কেলোরা ওত পেতে ছিল। বুড়ো শিবতলার ওখানে এসেছে, অমনি বোম চার্জ করেছে। তপুর সঙ্গেও কয়েকজন ছিল। থাকলে কী হবে? আনএক্সপেক্টেড অ্যাটাক। পরে বোমাটোমা এনে খুব ফাটিয়েছে। ততক্ষণে কেলোরা ভ্যানিশ। পুলিশের যা নিয়ম—তিনঘণ্টা পরে এসে নিরীহ লোকদের ধরে হম্বিতম্বি—"

"গৌতম?" গলা কেঁপে গেল গার্গীর। "গৌতমকে ধরেনি তো?"

ঘনশ্যাম আবার হাসল। "গৌতমের কী? সে তো আউট সাইডার। রাস্তায় দেখা হলো। বলল, যাচ্ছি। কথা আছে। আমি কিছু বললাম না অবিশ্যি।"

গার্গী শুকনো মুখে বলল, "তপু মরে গেছে?"

শুনছ কি? বডি প্রায় টুকরো টুকরো। একসঙ্গে কয়েকটা বোমার এক্সপ্লোশন!" ঘনশ্যাম ধোঁয়ার রিঙ পাকানোর ব্যর্থ চেষ্টা করে বলল, "একেই বলে নিয়তি। কাল বিকেলে আমাকে শাসাচ্ছিল ব্যাটাচ্ছেলে। একবার ভাবলুম, যাব নাকি গোপেশ্বরবাবুর কাছে। ওঁরই চেলা ছিল শুওরের বাচ্চা। পরে ব্রতীনবাবার পার্টিতে ঢোকে। পারল ব্রতীনবাবু বাঁচাতে? ওর নাম গলাকাটা কালী। মোটরসাইকেল হাঁকিয়ে ব্রতীনবাবুর সঙ্গে ঘোরে বডিগার্ড হয়ে। তবে জানো? কাঁটালিয়াঘাটে আবার অশান্তি শুরু হলো। বহরমপুরে থাকতেই শুনেছিলুম ডেঞ্জারাস জায়গা। অনেক চেষ্টা করেও ট্রান্সফার ঠেকাতে পারলুম না।"

গার্গী আস্তে বলল, "তোমার কী? তুমি তো কোনও পার্টিতে নেই।"

"নেই। তবে কথা কী জানো—"

"না। এখানকার কোনও ব্যাপারে তুমি নাক গলাবে না।"

ঘনশ্যাম একটু চুপ করে থেকে বলল, "আজকাল প্রব্লেম হলো, কোনও একটা পক্ষে না ঢুকলে মাথা বাঁচানো কঠিন। রাম মারবে, নয়তো রাবণ মারবে। হাসপিট্যাল কমপ্লেক্সে তিনটে ইউনিয়ন। তিনটের সঙ্গে লোক্যাল লিডারদের কানেকশান আছে। আমাদের মতো নিরীহ লোকেদের হয়েছে জ্বালা।"

সদর দরজা খোলা ছিল। গৌতম ঢুকেই দরজা বন্ধ করল।

গার্গী কিচেনের সামনে মেঝেয় থলে থেকে তরিতরকারি ঢালছিল। একটা আধকেজিটাক পোনা এনেছে ঘনশ্যাম। সেটা নড়ছে। গার্গী গৌতমের দিকে তাকাল।

গৌতমের মুখ গম্ভীর। বারান্দায় উঠে বলল, "পুরো ছুটিটা আর কাটানো হলো না হয়তো।"

ঘনশ্যাম বলল, "কেন?"

গৌতম গার্গীর দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে চাপা স্বরে বলল, "আমি একটা অপকর্ম করে ফেলেছি। অবশ্য বৌদির কোনও দোষ নেই। তা হলেও শ্যামদাকে বলা উচিত ছিল। কাল বিকেলে একটা কাজে জড়িয়ে গেলুম। আসা হলো না। তো—"

গার্গী আস্তে বলল, "তোমার দাদাকে বলে দিয়েছি। আমার ভয় করছিল।"

গৌতম ঘনশ্যামের দিকে তাকাল। ঘনশ্যাম একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল, "তপুটা বোকা। উইপনটা সঙ্গে থাকলে বেঁচে যেত হয় তো।"

গৌতম বলল, "আসলে পুলিশ-রেডের ভয়ে—আপনি শুনে থাকবেন, গোপেশ্বরবাবু তপুকে শায়েস্তা করতে উঠে-পড়ে লেগেছেন। রুলিং পার্টির এম এল এ-কে পুলিশ খাতির করতে বাধ্য। এনিওয়ে, এখন আমার প্রব্লেম হলো, আমি জানি না তপু কাকেও জানিয়ে গেছে কি না যে, ওটা আমাকে রাখতে দিয়েছিল।"

গার্গী বলল, "কাকেও বলে গেলে সে তোমাকে চাইবে। তখন দিয়ে দেবে।"

ঘনশ্যামও সায় দিল। "হ্যাঃ! ফেরত দেবে।" বলে সে গার্গীর দিকে ঘুরল। "চা করো। বেচারাকে বড্ড নার্ভাস দেখাচ্ছে।" সে খিক্‌খিক্ শব্দে অদ্ভুত হাসল। তারপর উঠে দাঁড়াল। বসার ঘরে চলে গেল।

গার্গীর চোখে এই মুহূর্তে ভালবাসা ঝিকমিক করে উঠল। মুখ টিপে হেসে সে কুকার ধরাতে উঠে দাঁড়াল।

গৌতম জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল গার্গী হাসল কেন। কিন্তু ঘনশ্যাম এসে গেল একটা চেয়ার নিয়ে। চেয়ারটা রেখে বলল, "বসো। বি কাম অ্যান্ড কোয়ায়েট। একটা ট্রাংকুলাইজার দেব'খন। রাত্তিরে খেয়ে শোবে।"

গৌতম বসে বলল, "সত্যি শ্যামদা, বড্ড আনইজি ফিল করছি। এখানে এসে এভাবে অ্যান্টিসোস্যালদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ব চিন্তাও করিনি। আসলে তরুণ সংঘ ক্লাবে তপুর সঙ্গে আলাপ। তখনও জানতুম না ও একটা ক্রিমিন্যাল!"

ঘনশ্যাম বলল, "চেহারা হাবভাব দেখে মানুষ চেনা যায় না। মেন্টাল হসপিট্যালে তুমি তো গেছ। দেখেছ তো অত্যন্ত সুস্থ স্বাভাবিক দেখাচ্ছে যাকে, সে ভেতরে একজন মেন্টাল পেশেন্ট। তুমি অবিশ্যি পিডিয়াট্রিকের ডাক্তার হতে চলেছ।" আবার অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসল সে। "তোমার মধ্যে শিশু-শিশু ভাব আছে। শিশু চিকিৎসায় এটা কাজ দেবে। কিন্তু সেজন্য শিশু সাইকোলজিও তো পড়তে হয়েছে। মূল কথাটা হলো, সাইকোলজি! তোমার বাবা বলেন—"

গৌতম তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "প্লিজ শ্যামদা! বরং এই নিন, সিগারেট খান।"

"দাও। তবে জাস্ট আ মিনিট। চা খেয়ে ধরাব।"

গার্গী চুপচাপ চা করছিল। দু'পেয়ালা চা এনে দিয়ে আস্তে বলল, "তুমি ওটা বরং নিয়ে যাও গৌতম। আমার বড্ড ভয় করছে।"

গৌতম বলল, "এখন নিয়ে যাওয়া তো রিস্কি। তাছাড়া রাখব কোথায়?"

"ওটা তো জুতোর বাক্স। জুতো বলেই বাড়িতে কোথাও রাখবে।"

"মাথা খারাপ? ওটা নিয়ে ঢুকলেই জুতো দেখতে চাইবে বাড়িসুদ্ধু।"

ঘনশ্যাম বলল, "হ্যাঁ। রিস্ক আছে। বরং দেখ কয়েকটা দিন। যদি তপু কাকেও জানিয়ে গিয়ে থাকে, সে চাইলে গোপনে ফেরত দেবে। ব্যস্! ল্যাঠা চুকে গেল।"

গৌতম বলল, "যদি কাকেও না জানিয়ে থাকে, আমি ওটা নিয়ে কী করব?"

গার্গী শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, "কাছেই গঙ্গা। গঙ্গায় ফেলে দেবে।"

ঘনশ্যাম মাথা নেড়ে সায় দিল। "ঠিক। ঠিক বলেছ। কাছেই মা গঙ্গা। সব পাপ বুকের তলায় লুকিয়ে ফেলবেন।" বলে সে সেইরকম অদ্ভুত শব্দে খিক্‌খিক্ করে হাসতে লাগল।...

॥ তিন ॥

দুপুরে খেতে এসে ঘনশ্যাম বলল, "আজ ফিরতে দেরি হবে। আর্জেন্ট ব্যাপার। বহরমপুর যেতে হবে। ডি এম ও অফিস থেকে খবর এসেছে। আগামী পরশু থেকে পুজোর জন্য চারদিন ডি এম ও অফিস বন্ধ। ওদিকে ট্রেজারি ব্যাংক সবই বন্ধ। রিকুইজিশন ফাইল আর পে-বিল আজই চারটের মধ্যে সাবমিট করে আসতে হবে। নইলে কাল মাইনে-টাইনে হবে না। এদিকে আমাদের অফিস শুধু বিসর্জনের দিনটা বন্ধ।" সে হাতমুখ সাবান দিয়ে রগড়ে ধুয়ে এল অন্যদিনের মতো। স্নান করল না। খেতে বসে অভ্যাসমতো বকবক করতে লাগল। "ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো পেয়েছে আমাকে। ক্ল্যারিক্যাল কাজকর্মও করিয়ে ছাড়ে। কি না আমার সঙ্গে ডি এম ও অফিসের খুব খাতির! যখন ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ে ছিলুম, বেশ ছিলুম। ওয়েলফেয়ার অফিসার করে আমার বারোটা বাজালে। যত রাজ্যের পাগল নিয়ে কারবার। আজকাল ভয় করে, আমিও না পাগল হয়ে যাই।" হাসতে গিয়ে তার মুখের ভাত ছিটকে পড়ল।

গার্গী চুপচাপ শুনছিল। কোনও কথা বলল না।

খাওয়া শেষ হলে ঘনশ্যাম বাথরুমে আঁচাতে গেল। গার্গী এঁটো কুড়িয়ে থালা বাটি গেলাস সংলগ্ন কিচেনের ছোট্ট বারান্দায় রাখল। ঘনশ্যাম তোয়ালেতে হাত-মুখ মুছে সিগারেট ধরিয়ে বলল, "দুটো পাঁচে ট্রেন। কিন্তু এ লাইনের কোনও টাইমের বালাই নেই। ট্রেনে গেলে একটু আরামে যাওয়া যেত। বাসেই যাই। বড্ড্ ঝুলো-ঝুলি ভিড়। দেখি।"

গার্গী এতক্ষণে বলল, "কখন ফিরবে?"

"ট্রেনে ফিরলে সাড়ে আটটা-নটা হয়ে যাবে। লাস্ট বাস অবিশ্যি ছটায়। পৌঁছুতে পঁয়তাল্লিশ মিনিট।" বলে সে ঘরে ঢুকে পোশাক বদলাতে গেল।

গার্গী স্বামীকে দেখছিল। ঘরে ভেতর শুধু আন্ডারওয়্যার পরা ঘনশ্যামের শরীর যেন মানুষের নয়। পুরুষ অবয়বেরই একটা বিকৃতি। পরমুহূর্তে গার্গীর মনে হলো, শরীর সম্পর্কে তার এই অনুভূতি নতুন আর আকস্মিক। এতদিন তো সে তার স্বামীর শরীর সম্পর্কে এমন সচেতন ছিল না! পলকের জন্য

গৌতমের সুঠাম শরীরের লাবণ্য তার চেতনায় এসে আছড়ে পড়ল। একটু বিব্রত বোধ করল সে।

প্যান্টশার্ট পরে সভ্যভব্য হয়ে ঘনশ্যাম বেরিয়ে এল। বলল, 'তোমাকে অমন দেখাচ্ছে কেন? শরীর খারাপ নাকি? খেয়ে নাও।"

গার্গী বলল, "খাচ্ছি।"

ঘনশ্যাম সাইকেলটা বারান্দায় নিয়ে এল। ব্যাকসিট থেকে ব্রিফকেসটা খুলে নিয়ে একটু ইতস্তত করে বলল, "জুতোর বাক্সটা আছে, না গৌতম নিয়ে গেছে?"

"আছে।"

"থাক। ও নিয়ে ভেবো না। গৌতম যা করার করবে। তুমি খেয়ে নাও।" বলে ঘড়ি দেখে ঘনশ্যাম তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

গার্গী ছোট্ট উঠোনটুকু পেরিয়ে আজ স্বামীকে বিদায় দেওয়ার ভঙ্গিতে সদর দরজায় গেল। ঘনশ্যাম পিছু ফিরল না। সংকীর্ণ পিচ রাস্তা ধরে হনহন করে হাঁটছিল সে। একটু দূরে পার্ক। পার্কের পাশ দিয়ে বড় রাস্তায় অদৃশ্য হলে শ্বাস ছেড়ে গার্গী দরজা বন্ধ করল।

তারপর তার বুক ধড়াস করে উঠল। শরীর ভারী বোধ হলো। আজ দুপুরে যদি গৌতম আসে?

ভাল করে খেতে পারল না গার্গী। এঁটো থালাবাসন রোজকার মতো ধুয়ে রাখল না। ঘনশ্যাম মুখে অবশ্য একটা কাজের মেয়ে রাখতে চেয়েছিল। গার্গীই রাখতে দেয়নি। ছোট্ট একটা সংসারে কী এমন কাজ? বহরমপুরে থাকার সময়ও কাজের মেয়ে ছিল না। গার্গী বারান্দায় কিছুক্ষণ আনমনে দাঁড়িয়ে থাকার পর ঘরে ঢুকল। আয়নার সামনে নিজেকে দেখতে গেল। আর সহসা তাকে একটা উন্মাদনা ভর করল। সে মুখে একটু স্নো ঘষল। কপালে নতুন করে টিপ পরল। তারপর কবে বহরমপুরে কেনা সেন্টের শিশি খুলে গলায় বুকে কাঁধে ছড়াল। তার হাত কাঁপছিল।

সে বিছানায় বসে বালিশে হেলান দিয়ে একটা পুরনো সিনেমা পত্রিকা পড়ার চেষ্টা করল। মন বসল না। সেই দুরুদুরু বুকের প্রতীক্ষা তাকে অস্থির করছিল। ট্রানজিস্টারটা আস্তে বাজছিল। সে মাঝে মাঝে জানলায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছিল। ভয়াল ছাতিম গাছটা আজ জৈব হয়ে উঠেছে এবং তার দিকে কেমন চোখে তাকাচ্ছে। আজ বাতাস বন্ধ। গঙ্গার ধারের বনভূমি শ্বাস বন্ধ করে কী যেন ঘটবার প্রতীক্ষা করছে। আকাশ গনগনে নীল। আর সেই ব্যাপক শূন্যতা বেয়ে কী একটা পাখি ওঠানামা করছে। গার্গীর মতো—ঠিক যেন গার্গীর মতোই কোথাও পৌঁছুনোর ব্যাকুলতা।

গৌতম এল যখন, তখন প্রায় সাড়ে তিনটে বাজে। বলল, "ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। শোনো, শ্যামদা ফিরলে নৌকো করে পঞ্চমুখী শিবের মন্দিরে

বেড়াতে যাব। দারুণ লাগবে। মাত্র মাইল তিনেকের নৌকোযাত্রা। ফেরার সময় কারেন্টের টানে পনের মিনিটের বেশি লাগবে না।"

গার্গী আস্তে বলল, "আমি যাব না।"

গৌতম তার গাল টিপে দিয়ে বলল, "ব্যাপার কী? শ্যামদার সঙ্গে ঝামেলা হয়ে গেছে নাকি?" বলেই সে হাসল। "সেন্টের গন্ধে জ্বালিয়ে দিলে যে! তার মানে, হাজব্যান্ডের সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করেছ।"

গার্গী চোখ পাকিয়ে বলল, "শট আপ! বাজে কথা বোলো না।"

"মাই গুডনেস!" গৌতম নড়ে বসল। "বারান্দায় সাইকেলও দেখলুম। নাহ্, কেটে পড়ি। শ্যামদা কোথাও সুঁই ফোটাতে গেছে নিশ্চয়।"

গার্গী তার হাত ধরে টেনে বসাল। তারপর স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে বলল, "ও অফিসের আর্জেন্ট কাজে বহরমপুর গেল। ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে।"

গৌতম মিটিমিটি হেসে বলল, "বাহ্! তাহলে তো আমরা অনায়াসে নৌকোভ্রমণ করে আসতে পারি। নৌকো বলা আছে। বিলিভ মি, পাঁচটাকা অ্যাডভান্সও করেছি। ওই ছাতিমতলার ঘাটে চারটেয় অপেক্ষা করবে ঝাব্বুলাল। ছই দেওয়া নৌকো। রোদ লাগলে ভেতরে বসব।" সে গার্গীকে দু'হাতে টেনে চুমু খেল। গার্গী বাধা দেওয়ার ভান করল মাত্র। গৌতম বলল, "নাও! ঝটপট শাড়ি বদলে নাও। আর শোনো, কক্ষণো ওসব সেন্টফেন্ট মাখবে না। তোমার শরীরের একটা আশ্চর্য সুন্দর গন্ধ আছে। তুমি জানো না।

গার্গীর মনে একটা আবেগ এসেছিল। যৌবন যখন যৌবনকে ছোঁয়, তখন এই আবেগটা আসে একটা বিস্ফোরণের মতো। সে বলল, "তুমি বাইরে যাও।"

"কেন? আমার সামনে শাড়ি বদলাতে লজ্জা! ঠিক আছে। আমি চোখ বন্ধ করছি।"

"না।"

গৌতম হাসল। "কিন্তু জানালা খোলা। অন্য কেউ দেখে ফেলতে পারে।"

গার্গী উঠে গিয়ে জানলাটা বন্ধ করল। বলল, "যাও! বেরোও!"

গৌতম প্রেমিকের গলায় বলল, "না। প্লিজ গার্গী! আমাকে দেখতে দাও।"

"কী দেখবে?"

"তোমাকে।"

"শুধু অসভ্যতা!"

"না গার্গী! তোমার শরীর—ডোন্ট ফরগেট, আমি হাফ ডাক্তার—তোমার মতো এমন মিনিংফুল বডি আমি আর দেখিনি। তুমি তো জানো, আমাকে কত ডেডবডি ঘাঁটতে হয়েছে—ইভন, তোমার বয়সী কত সুন্দর মেয়ের বডি! সব বডিই নিছক বডি।"

গার্গী চোখে হেসে বলল, "আমার ডেডবডি দেখো!"

গৌতম উঠে গিয়ে তার মুখ চেপে ধরল। "না! ও কথা বোলো না!" তারপর বারবার চুমুতে তার সারা মুখ, গলা, কাঁধ ভরিয়ে দিল। গার্গী জড়ানো গলায় বলল, "আহ্! কী করছ? দরজা খোলা।"

গৌতম দরজা বন্ধ করল। তারপর কালকের মতোই সে ঝাঁপিয়ে পড়ল গার্গীর ওপর। দু'হাতে তাকে তুলে নিয়ে খাটে শুইয়ে দিল। গার্গী বাধা দিতে পারল না। যৌবন যৌবনের মধ্যে ডুবে যাচ্ছিল।

কিছুক্ষণ পরে গৌতম আস্তে বলল, "নৌকো ওয়েট করছে। ছাড়ো!"

গার্গী অস্ফুটস্বরে বলল, "করুক।"

"প্লিজ! ছাড়ো!"

"না। তোমাকে ছাড়তে ইচ্ছে করছে না।"

গৌতম তার কপালে চুমু দিয়ে বলল, "হঠাৎ কেউ এসে পড়তে পারে। ছাড়ো লক্ষ্মীটি!"

"আমার ঘুম পাচ্ছে।"

গৌতম হাসল। "সর্বনাশ! এই অবস্থায় ঘুমোবে নাকি?"

"হুঁউ।"

"আয়নায় দেখ, আমরা কী অবস্থায় আছি।"

pathagar.net

গার্গী মুখটা একটু ঘুরিয়ে আয়নার প্রতিবিম্বিত দুটি নগ্ন শরীর দেখেই প্রচণ্ড লজ্জায় গৌতমকে ঠেলে দিল। তারপর হাত বাড়িয়ে সায়া কুড়িয়ে নিজেকে ঢাকল।...

ছাতিমতলার ঘাটে ঝাব্বুলাল মাঝি নৌকো বেঁধে বিড়ি টানছিল। এখানটা পুরনো দহ। তাই স্রোত নেই। গৌতম নৌকোয় উঠে হাত বাড়িয়ে গার্গীকে উঠতে সাহায্য করল। নৌকো চলতে থাকল তীর ঘেঁষে। স্রোতের উজানে হলেও তীরের কাছে স্রোতের গতি মন্থর। বিকেলেও শরৎকালের রোদটা চড়া। কিন্তু গার্গী ছইয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এতদিনের আনন্দহীন একঘেয়ে জীবন এমন করে স্বর্গের দরজা খুলে যাবে সে কল্পনা করেনি। সে মুগ্ধ চোখে আর আবিষ্ট মনে নিসর্গ দেখছিল।

গৌতম পাশে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিল। চাপা স্বরে বলল, 'ভাবতে খারাপ লাগছে, আবার কলকাতা ফিরে যেতে হবে। আবার সেই ন্যাস্টি পরিবেশ, রোগীর ভিড়, যত রকমের কদর্য সব অসুখ। নেচার মানুষকে একটা বডি দিয়েছে। অথচ সেই বডির মধ্যেই যেন হেল অ্যান্ড হেভেন। আনন্দ আর যন্ত্রণা।"

গার্গী বলল, "তোমাকেও দেখছি ওর স্বভাব পেয়েছে। খালি বকবক।"

"তুমিই হয়তো শ্যামদার মতো আমাকেও ফিলোজফার বানিয়ে ছেড়েছ!"

"তার মানে?"

"তোমাকে লক্ষ্য করে বড্ড কথা বলতে ইচ্ছে করে। নাকি তুমি প্রতিবাদ করো না বলে?"

"আমি ওসব বুঝি না।"

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর গৌতম বলল, "তখন একটা কথা ভাবছিলাম।"

"কী?"

"আমার ভবিষ্যৎ পেশা ডাক্তারি। আমি মানুষের বডি সম্পর্কে পড়াশুনা করছি ছ'বছর ধরে। এটা শেষ বছর। কিন্তু মানুষের বডির একটা মিনিংফুল সাইড আছে—তখন যা বলছিলুম, এটা এমন করে বুঝিনি। তুমি আমাকে এই জ্ঞানটা দিয়েছ।"

সে হাসতে লাগল। গার্গী বলল, "চুপ! লোকটা ওভারহিয়ার করছে।"

"নাহ্। ও এসব বোঝে না।"

"বোঝে না। তোমার মত ন্যাকা।"

"দারুণ বলেছ, আমি এতদিন সত্যি ন্যাকা ছিলুম।"

"হুঁ, গাল টিপলে দুধ বেরুত। ওসব চালাকি ছাড়ো তো।"

"কেন চালাকি বলছ?"

গার্গী মুখ ঘুরিয়ে খুব আস্তে এবং চোখে হেসে বলল, "তুমি ওসব ব্যাপারে এত এক্সপার্ট হলে কী করে? নিশ্চয় এক্সপিরিয়েন্স আছে।"

গৌতম দ্রুত বলল, "বিলিভ মি। থিওরিটিক্যাল নলেজ। তাছাড়া ডাক্তারদের সেক্সোলজি পড়তে হয়। পুরো সিস্টেমটা জানা হয়ে যায় কম বয়সেই। তাছাড়া আমাদের কাজটা তো পোশাকের ভেতরকার হিউম্যান বডি নিয়েই। সার্জারির প্রোফেসর চন্দ বলতেন মানুষের সঙ্গে অন্য প্রাণীর প্রথম তফাতটা হলো পোশাকের। এটাই কিন্তু ফান্ডামেন্টাল ডিফারেন্স বিটুইন ম্যান অ্যান্ড অ্যানিম্যাল।"

"আহ্! আবার বকবক?"

"না গার্গী! ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা কর। নেচারে সব কিছু নেকেড। ওই গাছগুলো দেখ।"

"এদিকটা এত জঙ্গল কেন?"

"গভর্মেন্টি প্রজেক্ট। ফরেস্ট ডিপার্টের কীর্তি আর কী?"

"ওটা কি লেক নাকি?"

গৌতম হাসল। "বলতে পারো। লোক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজে বিল বলে। প্রচুর বুনোহাঁস আসে শীতের সময়।"

ঝাব্বুলাল বলল, "এখোনো কুছু কুছু হাঁস দেখতে পাবেন বাবু। সরকার কানুন করল কী, উও হাঁস মারলে জেল হোবে। লেকিন বন্দুকবাজি কৌন রোখেগা? শিকারিলোক দুড়ুম উড়ুম করে বন্দুক মারে।"

গার্গী বলল, "সিনেমায় ঠিক এমনি সিনারি দেখেছি। আচ্ছা, এখানে শুটিং করে না?"

গৌতম হাসতে হাসতে বলল, "তোমার নায়িকা হতে ইচ্ছা করছে বুঝি? ঠিক আছে। আমি নায়ক হব। গান গাইব, আ যা আ যা—"

গান থামিয়ে দিয়ে গার্গী বলল, "ওখানে নৌকো যায় না?"

"কেন? ওই তো পঞ্চমুখী শিবের মন্দির দেখা যাচ্ছে। অসাধারণ সাজানো বিউটিস্পট!"

গার্গী গম্ভীর হয়ে বলল, "নাহ্। বরং লেকে চলো!"

"কী আশ্চর্য! ওটা লেক নয়।"

"আমি মন্দিরে যাব না।"

"কেন?"

গার্গী আস্তে এবং ঝাঁঝাল স্বরে বলল, "ন্যাকামি কোরো না। স্নান না করে—"

"আই সি!" গৌতম ওর চোখে চোখ রেখে বলল, "ওসব সুপারস্টিশন ছাড়ো তো! পাপ-টাপ বোগাস ব্যাপার। আমরা তো ধম্ম করতে যাচ্ছি না। জাস্ট্ সাইটসিইং!"

"না।" গার্গী গোঁ ধরে বলল। "আমি নৌকো থেকে মন্দিরে উঠব না। তুমি একা যেও।"

গৌতম মনে মনে চটে গিয়ে বলল, "সেটা আগে ভাবনি। এতদূর এসে—ঠিক আছে ঝাব্বুলাল! বিলে ঢোকা যায় না নৌকো নিয়ে?"

ঝাব্বুলাল বলল, "নেহি বাবু। সুলুইস্ গেটের তলায় নাও ঢুকতে তকলিফ হবে। আউর বহত দাম-উম আছে পানির তলায়। পানিকি জঙ্গল।"

"তাহলে এক কাজ করো। ওখানে ভেড়াও। আমরা বরং ফরেস্টের কাছে একটু বেড়িয়ে আসি।"

ঝাব্বুলাল অবশ্য খাটুনি থেকে রেহাই পেল। সামনের উজানে আধ মাইল প্রচণ্ড স্রোত। সে বাঁ-দিকে ঘাসে ঢাকা জমিতে নৌকো ভেড়াল! জমিটা ঢালু। ওপরে বাঁধ। বাঁধ থেকে বন দফতরের জঙ্গল বিলের সমান্তরালে এগিয়ে গেছে রেল লাইন অব্দি। রেললাইনের ব্রিজটা শেষ বিকেলের গোলাপি রোদে ঝকমক করছিল।

জঙ্গলের ভেতরটা ফাঁকা। কোনও ঝোপঝাড় নেই। বাঁধ থেকে দুজনে হাত ধরাধরি করে নেমে গেল। জঙ্গলের ভেতর হাঁটতে হাঁটতে গৌতম চাপা হেসে বলল, "তোমাকে আবার যদি অশুচি করে দিই?"

pathagar.net

গার্গী চমকে উঠে বিষণ্ণমুখে বলল, "না গৌতম! প্লিজ। আর ওসব কথা নয়।"

এখানে প্রকৃতি। নগ্ন নির্জন নিসর্গভূমি। এখানে যৌবন যৌবনকে কাছে পেলে সময়ের চেতনা মুছে যায়। গার্গী তার পরিবার, তার ছোটবেলা, দুঃখদুর্দশায় বেড়ে ওঠা জীবন আর তার সব গোপন আশা-আকাঙ্ক্ষার ব্যর্থতার কাহিনী মন থেকে উজাড় করে শোনাচ্ছিল গৌতমকে। এতদিন পরে মনকেও প্রকৃতিক নগ্নতার মতো অবাধে নগ্ন করে দিয়ে গার্গী তৃপ্তি পাচ্ছিল।

আর এই ভাবেই কখন পঞ্চমীর চাঁদের ফালি আকাশে আঁকা হলো। ঝাব্বুলালের ডাক শুনে দুজনে নৌকোয় ফিরল। গৌতমের সঙ্গে টর্চ ছিল।

ছাতিমতলায় তাদের নামিয়ে দিয়ে বখসিস নিয়ে ঝাব্বুলাল সদরঘাটের দিকে চলে গেল।

পৌনে সাতটা বাজে। এখনও ঘনশ্যামের ফেরার সময় হয়নি। সরকারি কোয়ার্টার এলাকা নির্জন। শুধু টিভি-র চাপা শব্দ শোনা যাচ্ছে। তিনদিক থেকে আবছা আলো পড়েছে ঘনশ্যামের এল টাইপ একতলা কোয়ার্টারের ওপর। নীচের অংশটা অন্ধকার। প্রত্যেকটা কোয়ার্টারের চারপাশে খানিকটা করে ফাঁকা জমি। কোথাও কিছু গাছ। সদর দরজার ওপর টর্চের আলো ফেলেই গৌতম চমকে উঠল। "এ কী! তালাটা—"

গার্গী দেখল, তালাটা খুলে একটা কড়ায় ঝুলছে। গৌতম ঠেলে ভেতরে ঢুকে গেল। তারপর টর্চের আলো ফেলে চমকানো গলায় বলল, "সর্বনাশ হয়েছে গার্গী!"

শোবার ঘরের দরজার তালা খোলা এবং ঝুলছে। গার্গী মাথা ঠাণ্ডা রেখে ঘরে ঢুকে সুইচ টিপে আলো জ্বালতে গেল। আলো জ্বলল না। গৌতম টর্চের আলো ফেলে বলল, "এক মিনিট। মেন সুইচ অফ করে গেছে চোর!" সে মেন সুইচ অন করে দিলে আলো জ্বলল। বারান্দায় সাইকেলটা নেই। গৌতম বলল, "আহা! হাঁ করে দাঁড়িয়ে কী দেখছো? আর কী চুরি গেছে দেখবে তো?"

কমদামি স্টিলের আলমারির তালার কাছে কয়েকটা আঁচড়। চোর আলমারিটা খোলার চেষ্টা করেছে। পারেনি। গার্গী কোণে রাখা বাক্স আর সুটকেসের কাছে গিয়ে ভাঙা গলায় বলল, "আমার সুটকেসটা নেই।"

"দামি কিছু ছিল?"

"না।"

"আর কিছু নিয়েছে নাকি দেখ।"

গার্গী খাটের তলায় উঁকি দিল। গৌতম টর্চ জ্বালল। সেই জুতোর বাক্সটা নেই।...

॥ চার ॥

ঘনশ্যাম বাড়ি ফিরেছিল সওয়া সাতটা নাগাদ। তাকে দেখেই গার্গী কান্না-জড়ান গলায় বলেছিল, "সব দোষ আমার। পঞ্চমুখী শিবের মন্দির দর্শনে গিয়ে—"

তাকে থামিয়ে গৌতম সংক্ষেপে ঘটনাটা বলেছিল ঘনশ্যামকে। ঘনশ্যাম ঠাণ্ডা মাথার মানুষ। কিন্তু সাইকেল হারানোর কথা শুনে সে একটু চ্যাঁচামেচি করেছিল। "মন্দির দর্শনের যাবার আর দিন পেলে না? দেখ তো এবার আমি রোজ কী করে অফিসে যাব? পাক্কা এক কিমি রাস্তা! একটা নতুন সাইকেলের যা দাম হয়েছে। নাহ্, তোমার আর বুদ্ধিসুদ্ধি হলো না এ বয়সেও। একটেরে এই বাড়ি, পেছনে জঙ্গল। কতদিন পইপই করে বলেছি, চোর ডাকাতের জায়গা। মেরে ফেললেও একটা লোক এসে জিজ্ঞেস করবে না কী হয়েছে।"

সেটা ঠিক। তাছাড়া টিভিতে এই সময় কী একটা দারুণ সিরিয়াল চলছে। আশেপাশের কোয়ার্টার থেকে জনপ্রাণীটি বেরুনোর আশা নেই। গার্গীও ততটা মিশুকে স্বভাবের মেয়ে নয়।

গৌতম বলছিল, "থানায় খবর দেওয়া দরকার, শ্যামদা। আমি বৌদিকে একা ফেলে যেতে পারছিলুম না।"

ঘনশ্যাম বাঁকা মুখে বলেছিল, "পুলিশ কিছু করবে না। তবে সাইকেলটা যদি দয়া করে উদ্ধার করে দেয়। দেখি বড়বাবুকে বলে।"

গার্গী ভাঙাগলায় বলেছিল, "সেই জুতোর বাক্সটা নিয়ে গেছে!"

ঘনশ্যাম চমকে উঠেছিল প্রথমে। পরে বলেছিল, "নতুন জুতো দেখে নিয়ে গেছে। তবে বোঝা যাচ্ছে চোর একা ছিল না। গৌতম তুমি আছ যখন, আরও কিছুক্ষণ থাকো। আমি থানায় যাই।"

ঘনশ্যাম তক্ষুণি টর্চ হাতে বেরিয়ে গিয়েছিল। গৌতম বলেছিল "মাঝখান থেকে আমারই সর্বনাশ হলো হয়তো। তপু যদি কাকেও বলে গিয়ে থাকে, আমার কাছে ওর ফায়ারআর্মস আছে, আমার প্রব্লেম হবে। ওর গ্যাংয়ের ছেলেগুলো ডেঞ্জারাস।"

গার্গী ঝাঁঝালো কান্নাজড়ানো গলায় বলেছিল, "তোমার পাপেই তো—"

"ভ্যাট! কী পাপ? অ্যাকসিডেন্ট ইজ অ্যাকসিডেন্ট।"

একটু পরে গার্গী বলেছিল, "সুটকেসটায় আমার অনেক পুরনো জিনিস ছিল। ছোটবেলার কত সব স্মৃতি। সাইকেল-ফাইকেল নিল, নিল। ওটা কেন নিল?"

কত নির্জন নিরিবিলি সময়ে গার্গী সুটকেসটা খুলে স্মৃতিকে সামনে সাজিয়ে বসে থাকত। পুরনো গন্ধ তাকে আবিষ্ট করত। সে আবার হু হু করে কেঁদে

pathagar.net

উঠেছিল। গৌতম তার পিঠে হাত রেখে সান্ত্বনা দিচ্ছিল। "চোরেদের স্বভাব হলো, যা হাতের কাছে পাবে নেবে।"

পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর রঞ্জিত মিত্র আর দুজন কনস্টেবলকে নিয়ে ঘনশ্যাম এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে এসেছিল। রঞ্জিতবাবু তালাগুলো পরীক্ষা করে বলেছিলেন, "এসব কমন তালা সহজেই খোলা যায়। ঘরের দরজার তালাটা নামী কোম্পানির। কিন্তু এ পর্যন্ত চারটে বার্গলারি কেসে দেখলুম, এই তালাও চোরেরা সহজে খুলে ফেলছে।"

সাইকেলটা অনেক বছরের পুরনো। মোটামুটি একটা বর্ণনা দিয়েছিল ঘনশ্যাম। রঞ্জিতবাবু খুব আশ্বাস আর পরামর্শ দিয়ে গেলেন। কেসডায়েরি থানায় লিখিয়ে এসেছিল ঘনশ্যাম।

সে রাতে গার্গী কিছু খেল না। ঘনশ্যাম তাকে খাওয়াতে পারল না। শেষে রাগ করে নিজেও খেল না। সে নরম স্বভাবের মানুষ, তাতে রাগ করে উপোস থাকার পাত্র নয়। কিন্তু আসার পথে যেটুকু খাওয়া হয়েছে, তাই যথেষ্ট যতক্ষণ সে জেগে থাকল, সাইকেলটা নিয়ে আপন মনে বকবক করছিল। সাইকেলটা তার জীবনের অনেক সুখদুঃখের স্মৃতি।

গার্গীরও ইচ্ছে করছিল, বলে যে, স্যুটকেসটাও তার কাছে তাই। কিন্তু চুপচাপ পাশ ফিরে শুয়ে রইল।

ভোরবেলা গৌতমের ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙল ওদের। গৌতম পেছনের জানলা দিয়ে ডাকছিল। এ রাতে ওই জানলাটা বন্ধ ছিল। ঘনশ্যাম মশারি থেকে বেরিয়ে গিয়ে জানালা খুলল। দেখল, গৌতম একটা স্যুটকেস আর সেই জুতোর বাক্সটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চাপাস্বরে সে বলল, "ঝোপের মধ্যে পড়েছিল। শিগগির দরজা খুলুন।"

ঘনশ্যাম সদর দরজা খুলে দিলে গৌতম ঢুকল। একটু গলা চড়িয়ে বলল সে, "বৌদি! তোমার সুটকেস! দেখ কিছু চুরি গেছে নাকি।"

গার্গী ছটফটিয়ে বেরিয়ে এল। ঘনশ্যাম গুম হয়ে বলল, "উইপনটা আছে তো?"

গার্গীর হাতে সুটকেসটা দিয়ে গৌতম বিষণ্ণ হাসল। "নাহ্! জুতোসুদ্ধু মেরে দিয়েছে চোরেরা। খালি বাক্সটা পড়েছিল। আসলে আমি সারারাত ঘুমোতে পারিনি। খালি মনে হচ্ছিল, এমন কিছু ঘটবে। বিশেষ করে বৌদির স্যুটকেসটা—"

গার্গী স্যুটকেস খুলে দেখছিল। একটু খুশিমাখা মুখে বলল, "সব আছে। নোবার মতো কিছু তো নেই এর মধ্যে।"

গৌতম বলল, "সাইকেলে নিশ্চয় তালা দেওয়া ছিল না শ্যামদা?"

ঘনশ্যাম আস্তে বলল, "নাহ্।"

pathagar.net

"কাজেই সাইকেলে চেপে পালিয়ে যাওয়া সোজা।" গৌতম হাসবার চেষ্টা করল। "আপনার সাইকেলটার যা অবস্থা ছিল দেখেছি। এবার বরং নতুন একটা কেনা হয়ে যাবে।"

কথাটা বলেই সে জুতোর বাক্সটা নিয়ে চলে গেল। গার্গীর মধ্যে এতক্ষণে স্বাভাবিকতা ফিরে এসেছিল। ডালাভাঙা স্যুটকেসটা ঘরে রেখে এসে সে বলল, "নাও যা হবার হয়ে গেছে। সব আমারই দোয। আমাকে ইচ্ছে হলে মারো।" বলে সে বাথরুমে ঢুকল।

বেরিয়ে আসার পরও দেখল, ঘনশ্যাম উঠোনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

গার্গী বলল, "আশ্চর্য মানুষ তুমি! সারারাত কিছু খাওনি। মুখ ধুয়ে এসো। লুচি করে দিচ্ছি। আর সাইকেল গেছে—বেশ তো! আমার কাঁকন দুটো বেচে আমিই তোমাকে নতুন সাইকেল কিনে দেব। রাগ করে বলছি না। আমার মায়ের দেওয়া গয়না। আমার গয়না পরতে ভাল লাগে না।"

ঘনশ্যাম গলার ভেতর বলল, "নাহ্। ও সব কথা আমি ভাবছি না। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, তপু হারামজাদার গ্যাংয়ের কেউ গোপনে আড়ি পেতে ব্যাপারটা সম্ভবত দেখেছিল। সে-ই এ কাজ করেছে। সাইকেল চুরি বা তোমার স্যুটকেস চুরিটা একটা চালাকি। কে জানে, সাইকেলটা গঙ্গায় ফেলে দিয়েছে কিনা। হুঁ, শুধু জুতোর বাক্স নিয়ে গেলে তার একটা রিস্ক ছিল। ভেবেছিল গৌতম তপুর চেলাদের জানিয়ে দেবে। গৌতম কথাটা জানালে ওদের মধ্যে পরস্পর সন্দেহ ঝগড়াঝাঁটি বেধে যাবে। কে জিনিসটা হাতাল?" শ্বাস ছাড়ল ঘনশ্যাম। "ক্রিমিন্যালদের স্বভাব আমি জানি। স্বার্থের জন্য ওরা জোট বাঁধে। কিন্তু প্রত্যেকে ওরা আলাদা করে নিজের-নিজের ফিকির মাথায় নিয়ে ঘোরে। দরকার হলে একজন আরেকজনকে ল্যাং মারতে দেরি করে না।"

"আহ্! আবার বুকনি ঝাড়তে শুরু করলে বাসিমুখে!"

ঘনশ্যাম গম্ভীর মুখে বাথরুমে ঢুকল।...

এদিন সাইকেল নেই বলে ঘনশ্যাম একটু আগেই অফিসের জন্য বেরুচ্ছিল। গার্গী ইতস্তত করে বলল, "আমার একা থাকতে ভয় করবে, জানো? এরপর কখন ডাকাত বদমাশ এসে আমাকে মেরে রেখে গেলেই হলো।"

ঘনশ্যাম বলল, "গৌতমকে বলে যাচ্ছি বরং।"

"খালি গৌতম আর গৌতম!" গার্গী ঝেঁঝে উঠল। "একে তো সবার আমাকে দেখে চোখ টাটায়, তারপর—কিছু স্ক্যান্ডাল রটিয়ে ফেললেই হলো। তুমি কোয়ার্টার বদলানোর চেষ্টা করো বরং।"

ঘনশ্যাম হাসল। "কোথায় কোয়ার্টার? মেন্টাল স্টাফের জন্য কোয়ার্টারই নেই। এটা জেনারেল স্টাফের জন্য। লাকিলি খালি ছিল বলে ম্যানেজ করেছি।

তা-ও আনঅফিসিয়ালি। যে কোনও দিন জেনারেল স্টাফের কেউ বদলি হয়ে এলে পাত্তাড়ি গুটোতে হবে।"

গার্গী অবাক হয়ে বলল, "সে কী! বহরমপুরে থাকার সময় যে বলেছিল কাঁটালিয়াঘাটে কোয়ার্টার অ্যালট করা আছে?"

"তখন আমিও কি জানতুম? তবে বাসার খোঁজ করছি। দেখা যাক্।" বলে সে পা বাড়াল। "গৌতমকে বলে যাচ্ছি। যদি না থাকে বাড়িতে, কী আর করা যাবে? তুমি দরজা ভাল করে এঁটে দিও। অচেনা কাকেও ভেতরে বসতে ডেকো না।"

সে চলে যাওয়ার পর গার্গী আস্তে শ্বাস ছাড়ল। মুহূর্তের জন্য তার মনে একটা পাপবোধ স্ফুলিঙ্গের মতো জ্বালা দিল। একজন সাদাসিধে ভালোমানুষ তার স্বামী। আজ অব্দি তেমন কোনও খারাপ ব্যবহার করেনি তার সঙ্গে। বাচ্চাকাচ্চা না হওয়ার জন্য নিজেকেই দায়ী করেছে। একবার হাসতে হাসতে বলেছিল, "বাবা-টাবা হওয়ার জন্য যে রকম পুরুষত্ব থাকা উচিত, আমার তা হয়তো নেই।"পুরনো কিছু কথা আলতো ভেসে এল মনে। ঘনশ্যাম মাঝে মাঝে শারীরিকভাবে অপটু হয়ে পড়ে। আপনমনে বলে, "তোমার শরীরে কী যেন আছে। আমাকে নার্ভাস করে ফেলে।" এ মুহূর্তে কিছুক্ষণ লোকটার জন্য গার্গী দুঃখবোধ করল। একটু অনুতাপও জাগল। মনে হলো, সে বিশ্বাসভঙ্গ করছে। একটা চরম সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথাও সে ভাবল। গৌতমকে এবার থেকে এড়িয়ে চলবে।

কিন্তু আরও কিছুক্ষণ পরে সেই অসহ্য একাকিত্ব গার্গীকে ঘিরে ধরল। তরপর সে অনুভব করল, দুটি দুপুরের নিষিদ্ধ গোপন শারীরিক সুখের স্মৃতি তাকে নাড়া দিচ্ছে। বাঘিনী মানুষের রক্তের স্বাদ পেলে যেমন হিংস্র আর ধূর্ত হয়ে ওঠে, তেমনি ক্রূর আর লোভী হঠকারিতার বোধ তরঙ্গের মতো তার ওপর আছড়ে পড়েছিল।

কতক্ষণ পরে গৌতমের সাড়া পেয়ে গার্গী ঠোঁট কামড়ে ধরল। তারপর একটু দেরি করেই সদর দরজা খুলে দিল। গৌতমকে গম্ভীর দেখাচ্ছিল। বলল, "বসব না। একটা কথা বলতে এলুম। তোমার বরের সাইকেলটা পাওয়া গেছে।"

গার্গী ব্যস্তভাবে বলল, "কোথায়? কার কাছে?"

"সাউথে কোদালিয়া বলে একটা গ্রাম আছে। বেশি দূরে নয়। ওখানে জেলেদের জালে আটকে ছিল। ওরা থানায় জমা দিয়ে এসেছে শুনলুম।"

"ওকে খবর দেওয়া দরকার। সাইকেল-সাইকেল করে পাগল হয়ে গেছে।"

"খবর পেয়ে যাবে।"

"তুমি বসবে না?"

গৌতম একটু হাসল। "বসতুম! কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

"কিছু না। আমি একটু ভাবনায় পড়ে গেছি। মন ভালো নেই।"

"জুতোর বাক্সটা কী করলে?"

"ছিঁড়ে গঙ্গায় ফেলে দিয়েছি।"

"তাহলে ভাবনা কিসের?"

"চোর সাইকেলটা নিল না কেন? রিভলভারটা চুরিই কি কারও মোটিভ ছিল?"

গার্গী আঁচলে মুখের ঘাম মুছে বলল, "আমার বরও ঠিক এই কথাটা বলছিল, জানো? কেউ নিশ্চয় জানত ব্যাপারটা। আড়ি পেতে দেখেছিল সম্ভবত। তপুরই গ্যাংয়ের কেউ হবে।"

গৌতম চিন্তিত মুখে বলল, "আমারও তা-ই মনে হয়েছে। এখন কথা হচ্ছে, তপুর গ্যাংয়ের অন্য কেউ জানতে পারলে, কিংবা ধরো, তপু কাউকে জানিয়ে থাকলে সে আমাকে চার্জ করতে পারে।"

গার্গী বলল, "কিছ্ছু হবে না। এত ভেবো না তো। তপু কাকেও জানিয়ে গিয়ে থাকলে এতক্ষণ সে তোমাকে চাইত। তা ছাড়া যে ওটা চুরি করেছে, সে লুকিয়ে রাখবে। কাকেও জানতেই দেবে না। এস, বড্ড রোদ।"

গৌতম বলল, "পরে আসব'খন। আমি তপুর গ্যাংয়ের ছেলেদের নার্ভ ফিল করে বেড়াচ্ছি।"

"আসবে না?"

"দুটোয় আসব।"

এখন আসবে না?

"কী আশ্চর্য! বলছি তো—"

"বুঝেছি। আমাকে ঘেন্না ধরে গেছে!"

গৌতম উঠোনেই ওকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে বলল, "তুমি আমার স্বর্গ!"

গার্গী নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, "সব সময় অসভ্যতা! কে দেখে ফেলবে—হুঁ, বেরোও! তোমাকে আর আসতে হবে না।"

সে ঠেলে ওকে বের করে দিল। গৌতম হাসতে হাসতে চলে গেল। দরজা বন্ধ করে গার্গী বারান্দায় ফিরল। উঠোনঘেরা পাঁচিল যথেষ্ট উঁচু নেই। বারান্দায় দাঁড়ালে বাইরেটা দেখা যায়। কেউ কোথাও নেই দেখে সে আশ্বস্ত হলো। অন্যদিনের মতো স্নান করে এসে রান্নায় বসল সে।

আজ একটু দেরি করে খেতে এল ঘনশ্যাম। গার্গী তাকে সাইকেলটার কথা বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই ঘনশ্যাম উজ্জ্বল মুখে বলল, "আমার থিওরি! সাইকেলটা পাওয়া গেছে। থানা থেকে হসপিট্যালে ফোন করেছিল আমাকে। গিয়ে আইডেন্টিফাই করলুম। ওবেলা ডেলিভারি পাব। পুলিশের হাতে কিছু

পড়লে বের করা প্রব্লেম। গৌতমের বাবাকে বলায় ফোন করে বড়বাবুকে বলে দিয়েছেন।"

গার্গী একটু কৌতুক করে বলল, "সাইকেল চুরি গিয়ে না হয় ফেরত পেতে। আমি যদি চুরি যেতাম?"

ঘনশ্যাম কৌতুকটা নিল না। সিরিয়াস ভঙ্গিতে বলল, "তুমি ইচ্ছে না করলে কেউ তোমাকে চুরি করবে না। হুঁ, রেপ অ্যান্ড মার্ডারের কথা আলাদা।"

গার্গী হঠাৎ চটে গেল। "ছাড়ো তো। হাত-মুখ ধুয়ে এস। ভাত বাড়ছি।"

ঘনশ্যাম একটু হাসল। "তুমি বলেছিলে পুজোর সময় ছুটি নিয়ে বাইরে যেতে। আসতে আসতে কথাটা ভাবছিলাম। বাইরে গেলে এই ঝামেলাটা হতো না। আমারও বড্ড হাঁপ ধরে গেছে। তো দেখি, পুজোটা যাক্।"

বসে সে বাথরুমে গিয়ে অন্যদিনের মতো সাবান দিয়ে রগড়ে হাত দুটো ধুল। পা ধুল। মুখে জল ছিটিয়ে মুখ ধুল। তোয়ালেতে হাত-মুখ মুছতে মুছতে ফের বলল, "সাইকেলটা জলে নাকানিচুবোনি খেয়ে কী অবস্থা হয়েছে দেখলে খারাপ লাগে। পার্ট বাই পার্ট খুলে অয়েলিং করাতে হবে। খামোকা একগাদা খরচা করাবে ব্যাটাচ্ছেলেরা। যা নেবার, তা তো নিলি। খামোকা এত ছলচাতুরীর কী দরকার ছিল? ঠিক আছে। একটা অজুহাত না হয় সাজালি। তো সাইকেলটা খামোকা গঙ্গায় ফেলতে গেলি কেন? স্রেফ বদমাইশি। থানায় রঞ্জিতবাবু—কাল যে এস আই ভদ্রলোক এসেছিলেন, বললে, শ্যামবাবু! আপনার সাইকেলটা বদলান। চোরও এই বাতিল মাল পছন্দ করেনি। রাগ করে গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে গেছে!" অদ্ভুত ফিক ফিক শব্দে হাসতে লাগল ঘনশ্যাম।

ভাত-তরকারি বেড়ে আসন পেতে দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল গার্গী। বলল, "আচ্ছা, তুমি যে বলছ, শুধু জুতোর বাক্স চুরি করতে ঢুকেছিল—তা হলে আলমারির তালা ভাঙার চেষ্টা করল কেন?"

ঘনশ্যাম পাতে বসে বলল, "ওটা অবিশ্যি সিরিয়াস একটা অ্যাটেম্পট্। ক্রিমিন্যালদের সাইকোলজি। যা নেবার, তা নিয়ে ভেবেছিল, কিছু মালকড়ি গয়নাগাঁটি যদি পেয়ে যায়, সেটা উপরি লাভ। রঞ্জিতবাবু কারেক্ট। ব্যাটাচ্ছেলের ওই পুরনো সাইকেল মনে ধরেনি। রাগ করে ফেলে দিয়েছে।" ডাল ঢেলে মাখিয়ে একগ্রাস ভাত তুলে সে ফের বলল, "কে জানে, আমার ওপর রাগ ছিল কি না। হাসপাতালে চাকরির এই এক প্রবলেম আজকাল।"

"খুব হয়েছে। এবার চুপচাপ খেয়ে নাও তো।"

ঘনশ্যাম তার দিকে তাকিয়ে ভাত মুখে দিল। বলল, "বেলা হয়েছে। তুমিও খেয়ে নিলে পারতে।"

"খাচ্ছি। আর বকবক কোরো না। গলায় ভাত আটকে যাবে।"

ঘনশ্যাম বেরিয়ে যাওয়ার পর অন্যমনস্কভাবে খেতে বসল গার্গী। ঘনশ্যামের বেড়াতে যাওয়ার কথাটা তার বুকে ধাক্কা দিয়েছিল। বিয়ের পর সেই একবার ক'দিনের জন্য দীঘায় হনিমুনের নাম করে বেড়াতে গিয়েছিল দুজনে। তখন কত স্বপ্নসাধ জেগে উঠেছিল গার্গীর জীবনে। পরে দিন-দিনে দেখল সে একটা ভুল লোকের সহগামিনী হয়েছে, যে সৌন্দর্য বোঝে না, আনন্দের স্বাদ নিতে জানে না। শুধু এলেবেলে কথার বুকনি ঝাড়ে। পাইপয়সা হিসেব করে সংসার চালায়। কিছু কেনার ইচ্ছে হলে গার্গীকে মুখ ফুটে টাকা চেয়ে নিতে হয়। এ ভাবে বেঁচে থাকার কী মানে হয়?

খাওয়ার পর উত্তরের জানলার ধারে বসে গার্গীর মনে হলো, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কী একটা সর্বনাশা শক্তি তাকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে এবং তাকে যে রক্ষা করতে পারত, সেই মানুষটা বড় বেশি নির্বিকার।

ছাতিম গাছটার দিকে চোখ পড়তেই গার্গীর বুকের ভেতর একটা ঠাণ্ডা হিম ঢিল গড়িয়ে গেল। উজ্জ্বল আশ্বিনের রোদে গাছটাকে ভয়াল আর জৈব দেখাচ্ছে। গাছটা যেন তাকে আকর্ষণ করছে। চোখ ফিরিয়ে নিল গার্গী। ট্রানজিস্টারের নব ঘোরাল। চটুল হিন্দি গানের সুর।

দরজায় আস্তে কড়ানাড়ার শব্দ কানে এল। গার্গী বেরিয়ে গিয়ে বলল, "কে?"

গৌতম।

যৌবন যৌবনকে দরজা খুলে দিল।...

pathagar.net

॥ পাঁচ ॥

পুজোর চারটে দিনে আনন্দে কাটাল গার্গী। কাঁটালিয়াঘাটে বারোখানা ঠাকুর হয়। টাউনশিপ এলাকাতেই তিনখানা। সবচেয়ে বেশি জাঁকজমক হয় ঘাটবাজারের ব্যবসায়ী সমিতির পুজোয়। বাজারের পেছনদিকটায় পুরনো স্কুলের খেলার মাঠে কলকাতার যাত্রা সপ্তমী অষ্টমী নবমী তিনটে রাত। গৌতমের সঙ্গে যাত্রা দেখতে পাঠিয়েছিল ঘনশ্যাম। সে বাড়ি পাহারা দেবে। দশমীর দিন তার ছুটি। কিন্তু চুপচাপ বসে থাকা তার ধাতে নেই। কোথায় কোথায় ইঞ্জেকশন দেওয়া আর ছোটখাটো ডাক্তারির করে বেড়াল। বিকেলে গার্গীর টানে সে ঘাটে বিসর্জন দেখতে গেল। গৌতম ক্যামেরায় বিসর্জনের অনেক ছবি তুলল। ঘনশ্যাম আর গার্গীরও কয়েকটা ছবি নিল। ঘনশ্যাম বিব্রত মুখে বলছিল, "আরে! আমার এই কুচ্ছিত চেহারার ছবি তুলে কী হবে?"

পরদিন থেকে আবার অফিস। আবার সেই রুটিনবাঁধা জীবন ঘনশ্যামের। গার্গী আগেভাগে বলে রাখে বিকেলে বেড়াতে যাওয়ার কথা। সে একটু করে সাহসী হয়ে উঠেছে। পঞ্চমুখী শিবের মন্দিরেও ঘুরে এল একদিন গৌতমের সঙ্গে। বাকি ফিল্মগুলো সেখানেই শেষ করে দিল গৌতম।

ছবিগুলো প্রিন্ট করে এনে গার্গীকে দিয়েছিল। গার্গী নিঃসংকোচে স্বামীকে দেখিয়েছিল। দেখে খুব প্রশংসা করেছিল ঘনশ্যাম। একটা ছবি সে বাঁধিয়ে এনে দেবে বলেছিল।

আবার একদিন বিলের ধারে সরকারি জঙ্গলটায় একটা বিকেল কাটাল গার্গী ও গৌতম। সেই সময় জঙ্গলের ভিতরে কিংবা বিলের পশ্চিমে রেলব্রিজের কাছে আবছা গুলির শব্দ শুনতে পেল ওরা। গার্গী বলল, "পাখি মারতে বেরিয়েছে কেউ। কোনও মানে হয়? পাখিগুলো—"

তাকে থামিয়ে গৌতম বলল, "বন্দুকের শব্দ বলে মনে হলো না!"

"তা হলে কেউ পটকা ফাটালো।"

"নাহ্। কলকাতায় আমি একবার দুদলের বোমাবাজির মধ্যে পড়ে গিয়েছিলুম। তারপর পুলিশের গাড়ি এল। এক অফিসার রিভলভার থেকে ফায়ার করল। ঠিক সেই রকম শব্দ। ওঠ! এখানে থাকা ঠিক নয়।"

দুজনে বাঁধ ধরে ফিরে এল। তখনও ঘনশ্যাম ফেরেনি। পৌনে ছটায় আজকাল আবছা আঁধার হয়ে যায়। তাতে পুজোর পর আবার লোডশেডিং বেড়ে গেছে। গার্গী হেরিকেন জ্বেলেছে সবে, ঘনশ্যাম সাইকেলের বেল বাজিয়ে ফিরল। গৌতমকে দেখে সে হাসল। "থ্যাঙ্ক্ গে! আমি ভেবেছিলাম, তোমার বৌদি একা থাকবে। লোডশেডিং। তাছাড়া ওই ছাতিম গাছটার পেত্নির ভয়।"

গার্গী বলল, "আমার ভয়টয় নেই।"

সে হেরিকেনটা কিচেনের সামনে টেবিলে রেখে কুকার জ্বালাল। গৌতমকে গম্ভীর দেখাচ্ছিল। ঘনশ্যাম বলল, "কী গৌতম? বৌদির সঙ্গে ঝগড়া করেছ নাকি?"

গৌতম আস্তে বলল, "বিকেলে জঙ্গলের ওদিকে রিভলভারের গুলির শব্দ শুনলুম শ্যামদা! কী ব্যাপার কে জানে! আমরা বেড়াতে যাচ্ছিলুম। পালিয়ে এলুম তক্ষুণি।"

ঘনশ্যাম চমকানো স্বরে বলল, "বলো কী? কাকেও দেখতে পাওনি?"

"নাহ্। শব্দটা ঠিক ট্রেস করতে পারিনি।"

"দেখ আবার কোনও খুনজখম হলো নাকি।" ঘনশ্যাম সিগারেট ধরিয়ে বলল। "তপুকে মার্ডারের রিভেঞ্জ ব্রতীনবাবুরা নেবে, সে তো জানা। কেলো কতদিন গা ঢাকা দিয়ে বেড়াবে? তবে এখানে পিস্তল-রিভলভার দুই দলেরই আছে শুনেছি। দেখলুমও তো স্বচক্ষে।"

গার্গী একটু হেসে বলল, "গৌতম এত ভীতু জানতুম না। কচি ছেলের মতো ভয়ে সারা!"

গৌতম চুপ করে রইল। ঘনশ্যাম বলল, "তোমার এত ভয়ের কী। তুমি তো কোনও দলে নেই—আউটসাইডার। তাছাড়া এতদিন যখন কেউ তোমাকে

জিনিসটা চায়নি, তখন এটা সিওর যে, তপু কাকেও বলে যায়নি। তবে সাবধানে থাকা ভাল। বনবাদাড়ের দিকে যেও-টেও না। বেড়াতে গেলে ঘাটবাজারের ওদিকে যেও। বিউটিফুল স্পট আছে। গঙ্গার নর্থের দিকটা বাজে। সাউথে বরং নিট অ্যান্ড ক্লিন। কেন? গঙ্গার ধারে এত সুন্দর পার্ক করে দিয়েছে মিউনিসিপ্যালিটি। সে কাদের জন্য?"

সে অভ্যাসমতো বকবক করতে লাগল। একটু পরে গার্গী দু'কাপ চা এনে দিল। হেরিকেনটা ঘরের দরজার সামনে রেখে নিজের কাপটা নিয়ে মেঝেয় বসল। গৌতম উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "ও কী! তুমি মেঝেয় বসবে আর আমি চেয়ারে বসে থাকব—"

ঘনশ্যাম তার হাত ধরে টেনে চেয়ারে বসাল। "ও সব ফর্মালিটি রাখো তো! তোমার বৌদির মেঝেয় বসা অভ্যাস আছে।"

গার্গী বাঁকা হেসে বলল, "অভ্যাস আছে বৈকি। ছোটবেলা থেকে মেঝেয় বসে খেয়ে বড় হয়েছি। আমার বাবা চেয়ারটেবিলে বসে খাওয়া পছন্দ করতেন না। করলেই বা ডাইনিং চেয়ারটেবিল কেনার পয়সা পাবেন কোথায়?"

"কী কথায় কী?" ঘনশ্যাম খিকখিক করে হাসল। "ব্যাপারটা খুলেই বলি গৌতম। আসলে এই কোয়ার্টারটা পরস্মৈপদী। আজ আছি, কাল নেই। তাই সাজানোর জন্য ফার্নিচার কিনিনি। ঠাকুরের কৃপায় বারাসাতে একটুখানি জায়গা কিনে রেখেছি। সেখানেও তো ভাড়াবাড়িতে মানুষ হয়েছিলুম। ইচ্ছে আছে, সামনের বছর থেকে বাড়িটা শুরু করব। মেন্টাল হসপিট্যালের স্টাফ-কোয়ার্টার নেই। তো কী করব বলো? তোমার বৌদির নিজের ঘরবাড়ি হবে। সেখানেই থাকবে। চেষ্টাচরিত্র করে যদি কলকাতায় কোনও হসপিট্যালে ট্রান্সফার হতে পারি, আর অসুবিধে কিসের? ডেলিপ্যাসেঞ্জারি করব। মোট কথা, এই হচ্ছে আমার ফিউচার প্ল্যান!" চায়ে চুমুক দিল ঘনশ্যাম। "ভাই গৌতম! এই পৃথিবীতে যার পায়ের তলায় নিজের মাটি নেই, তার কিছু নেই।"

গৌতম বলল, "ঠিক বলেছেন শ্যামদা।"

গার্গী বলল, "বাড়ি হতে হতে আমি বুড়ি হয়ে গঙ্গাযাত্রা করব। হুঁ, বাড়ির কথা শুধু কানেই শুনি!"

আলো এসে গেল। গৌতম চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে উঠল। "চলি শ্যামদা! চলি গার্গী—" বলেই সেই জিভ কাটল। "সরি! মাঝেমাঝে গার্গীবৌদি বলে ফেলি।" আসলে সে সামলে নিল।

ঘনশ্যাম বলল, "কী আশ্চর্য! আমাকে শ্যামদা বললে ওকেই বা গার্গীবৌদি বলবে না কেন? শুধু গার্গী বললেও কোনও দোষ দেখি না। আজকাল নাম ধরে ডাকার ফ্যাশান হয়েছে সমবয়সী ছেলেমেয়েদের। দেখ ভাই, আমাকে চেহারা হাবভাবে সেকালে দেখালেও আমি মডার্ন মাইন্ডেড।"

গৌতম সিরিয়াস হয়ে বলল, "হ্যাঁ। সেটা বোঝা যায় তা না হলে—"

তাকে থামিয়ে ঘনশ্যামও সিরিয়াস হয়ে বলল, "তুমি আমার ভাইয়ের মতো। তা ছাড়া তোমরা সমবয়সী। পরস্পর ফ্রিলি মিশবে। এতে দোষটা কোথায়?"

গার্গী তার স্বামীর দিকে তাকিয়ে ছিল। কথাটা এতদিনের অভিজ্ঞতায় বিশ্বাস করা চলে। ঘনশ্যামের নির্বিকার মুখ দেখে অবশ্য মনের কথা বোঝা কঠিন। কিন্তু এখনও এমন কোন আচরণ চোখে পড়েনি, যাতে গার্গী ভাবতে পারে, তার স্বামী তার চরিত্র সম্পর্কে সন্দিগ্ধ।

তবু একবার যাচাই করার ইচ্ছে পেয়ে বসল গার্গীকে। গৌতম চলে যাওয়ার পর সে বলল, "শোনো! কাল থেকে আমি আর গৌতমের সঙ্গে মিশব না।"

ঘনশ্যাম তাকাল। "কেন মিশবে না?"

"এমনি।"

একটু পরে ঘনশ্যাম আস্তে বলল, "ও কোনও খারাপ ব্যবহার করেছে?"

গার্গী ঝাঁঝাল স্বরে বলল, "না।"

"তা হলে?"

একটু চুপ করে থাকার পর গার্গী বলল, "কবে লোকে কী বলবে-টলবে। আমার ভাবতে খারাপ লাগে।"

ঘনশ্যাম সিগারেট ধরাল। ধোঁয়ার সঙ্গে বলল, "লোকের কথার ধার আমি ধারি না। যে যা খুশি বলুক। এই যে তুমি একা থাকো, কে তোমাকে গার্ড দেবে? গৌতম অনেস্ট ছেলে। আমি ওকে স্টাডি করেই তোমার সঙ্গে মিশতে দিয়েছি।"

গার্গী চোখে হেসে বলল, "আমি খারাপ হতে পারি তো?"

ঘনশ্যাম হাসল। "কেউ খারাপ হলে আমার সাধ্য কী ঠেকাই। তবে লোককে স্টাডি করা আমার স্বভাব। ইচ্ছে থাকলেও অনেকে খারাপ হতে পারে না। বিশেষ করে মেয়েরা। কেন জানো? খারাপ হতে গেলে সাহসের দরকার হয়। ভাল হবার জন্য কোনও সাহস লাগে না।"

গার্গী মনে মনে বলল, শালুক চিনেছে গোপালঠাকুর!...

সকালে ঘনশ্যাম বাজার থেকে ফিরে বলল, "যা বলেছিলুম! দুই গ্যাংয়ে বেধে গেল বলে! ঘাটের ওদিকে কারা এক পোস্টার সেঁটেছে। সাংঘাতিক সব কথা লেখা।"

গার্গী বাজারের থলে নিয়ে বলল, "কী লেখা?"

ঘনশ্যাম বারান্দায় চেয়ারে বসে মুখে রহস্য ফুটিয়ে বলল, "লাল কালিতে লিখেছে—তপুকে আমরা ভুলছি না। ভুলব না। তারপর লিখেছে—"আমাদের হিটলিস্ট ক খ গ ঘ।"

pathagar.net

"তার মানে?"

"কিছু বোঝা গেল না। ভিড় করে সবাই দেখছে। কেউ কেউ বলল, ক-তে কালিচরণ, তার মানে কেলো। খ-তে খোকা। ওর আসল নাম জানি না। গ-তে গোপেশ্বরবাবু এম এল এ, সেটা বোঝাই যায়। ঘ-তে হয়তো আমি!" ঘনশ্যাম হেসে ফেলল।

গার্গী বলল, "বাজে কথা বোল না তো!"

"দাশু হাজরা ঠাট্টা করে বলল, শ্যামবাবু! সাবধান!" ঘনশ্যাম হাসতে গিয়ে গম্ভীর হলো। "অদ্ভুত জায়গা বটে! যা শুনে এসেছিলুম, তার একশো গুণ সাংঘাতিক। হুঁ, ঘ-তে নাকি ঘোঁতন। কে ঘোঁতন জানি না। সবাই বলছে কেলোর ডানহাত।"

"পুলিশকে খবর দেয়নি কেউ?"

"কে জানে! মরুক ব্যাটারা খুনোখুনি করে। আমাদের কী?"

কিছুক্ষণ পরে ঘনশ্যাম অফিসে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে, গৌতম এল। তার মুখে ছায়া ছমছম করছে। বারান্দার চেয়ারে ধপ্ করে বসে বলল, "শ্যামদা! সাংঘাতিক সিচুয়েশন। শুনেছেন? ঘাটের ওখানে মন্দিরের গায়ে পোস্টার পড়েছে।"

ঘনশ্যাম বলল, "দেখেছি। হিট্‌লিস্ট দিয়েছে। ক খ গ ঘ কে কে হতে পারে বলো তো? কতজন তো কতরকম বলছে। তোমার আইডিয়াটা শুনি।"

গৌতম বলল, "ক কেলো, এটা সিওর। বাকিগুলো বুঝতে পারছি না।"

"কেন? খ-তে খোকা। খোকাকে তুমি চিনবে সম্ভবত। ওদের ক্লাবে তো যেতে-টেতে তুমি।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। খোকা। মানে শ্যামল। ঠিক বলেছেন।" গৌতম একটু নার্ভাস হাসল। "গ আমি নই তো?"

গার্গী বলল, "নাহ্! আমি।"

সে চোখে হাসছিল। ঘনশ্যাম রসিকতা করে বলল, "বলা যায় না। তপুর চোরাই উইপন লুকিয়ে রেখেছিলে তুমি!"

"বেশ করেছি।" বলে গার্গী গৌতমের দিকে তাকাল। "তুমি কি কেলোর গ্যাংয়ের গুণ্ডা যে ভয় পাচ্ছ?"

ঘনশ্যাম একই রসিকতার সুরে বলল, "গৌতমের গ-ও হতে পারে। গৌতমও তপুর উইপন লুকোতে এনেছিল?"

গার্গী চোখ পাকিয়ে বলল, "বাজে জোক কোরো না তো। কে আড়ি পেতে শুনবে।"

ঘনশ্যাম বলল, "গৌতম এখনও বড্ড ছেলেমানুষ। গ-তে গোপেশ্বরবাবু, তা-

ও বুঝতে এত দেরি হচ্ছে? ঘ-তে ঘোঁতন। আমি চিনি-টিনি না। লোকে বলছে।”

“হ্যাঁ, হ্যাঁ। ঘোঁতন।” গৌতম বলল। “লাল্টুদার ছোটভাই মৃণাল। সাংঘাতিক ছেলে। খোকা আর ঘোঁতন দুজনেই আগে তপুর গ্যাংয়ে ছিল। ক্লাবে যেতে দেখেছি।”

ঘনশ্যাম বেরিয়ে গেল। সাইকেলটা সবুজ রঙ করে নিয়েছে। নতুন দেখাচ্ছে।

গার্গী চৌকাঠে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। বলল, “কিন্তু তুমি ঘন-ঘন এমন করে আসবে না তো! যখন-তখন এসে খালি—”

গৌতম একটু হাসল। “কী খালি? কথাটা পুরো বলো!”

“ন্যাকা! বোঝ না?”

“একটা পদ্যে আছে, রূপসাগরে ডুব দিয়েছি অরূপরতন আশা করি—না কী যেন! সম্ভবত রবিঠাকুরের। অবশ্য সিচুয়েশন খারাপ। কালীপুজো অব্দি কাটিয়ে যাব ভেবেছিলুম। কী করব কে জানে।”

“তুমি যাবে না।”

“আঁচলে বেঁধে রাখবে? শ্যামদা টের পেলে তোমাকে ডিভোর্স করবে।”

“যদি তা-ই করে, আমাকে তুমি—”

গৌতম দ্রুত বলল, “কী বলছ? সবসময় আজকাল তুমি কেন যেন বড্ড সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছ গার্গী।”

গার্গী শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, “হ্যাঁ, আমি সিরিয়াস। আবার মাঝেমাঝে ভয় হয়, দৈবাৎ ও টের পেলে কী হবে? যদি সত্যি আমাকে তাড়িয়ে দেয়, কোথায় যাব আমি? কার কাছে যাব?”

গার্গীর চোখে জল দেখে গৌতম বলল, “তুমি কেন ওসব ভাবছ? আমি তো আছি?”

“এখন বলছ। তখন—” গার্গী হঠাৎ দু’হাতে মুখ ঢেকে ঘরে ঢুকে গেল। খাটে বসে বালিশে মুখ গুঁজল।

গৌতম গিয়ে তার পিঠে হাত রেখে বলল, “গার্গী! শোনো! প্লিজ—কাঁদে না! আহ্! আমার কথাটা তো শোনো!”

গার্গী সোজা হয়ে বসল। চোখ মুছে বলল, “আমার ভীষণ ভয় করে, গৌতম! একজনের কাছে বিশ্বাস হারানো পাপ মনে হয়। যদি সত্যি জানাজানি হয়, আমার ওই ছাতিম গাছে ঝুলে মরা ছাড়া উপায় থাকবে না।”

গৌতম তার ঠোঁটে চুমু খেয়ে হাসতে হাসতে বলল, “পাগলী কোথাকার! মরতে হলে ঝুলে মরবে কেন? আমি পটাসিয়াম সায়ানাইড এনে দেব। মরছ তা জানতেও পারবে না?”

pathagar.net

"তুমি ব্যাপারটা লাইটলি নিও না গৌতম! আমার মনে হয়, এবার আমাদের পরস্পর দূরে যাওয়া ভালো।"

গৌতম ভুরু কুঁচকে তাকাল! "আমাকে আর সহ্য হচ্ছে না এই তো?"

"আহ্। তুমি একটু বুঝতে চেষ্টা করো।"

"দেখ গার্গী। তুমি আর আমি বাচ্চা নই। তুমি আমি দু'জনে জেনেশুনেই একটা খেলা খেলে চলেছি।"

"খেলা? তুমি একে খেলা বলছ?"

"ওক্কে! জীবন-মরণ খেলা বলা যাক্। তো হ্যাঁ—একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে, আই এগ্রি। আমরা বড় বেশি শরীর নিয়ে খেলছি। এখানেই কি তোমার ভয়? দেখ গার্গী, হিউম্যান বডিকে কেন্দ্র করেই মানুষের সবকিছু। কাজেই এতে ওখান ও পাপ-টাপ নেই। আসল কথাটা হলো, আমরা পরস্পরকে ভালবাসি কি না। যদি আমার কথা বলো, আমি তোমাকে ভীষণ ভী-ষ-ণ ভালোবাসি, গার্গী! হিউম্যান বডি ঘেঁটে ছ'টা বছর আমার কাটছে। হিউম্যান বডির মধ্যে কী সব হেভেনলি চার্ম আছে, সেটা তুমিই আমাকে জানিয়ে দিয়েছ।"

গার্গী বাধা দিয়ে বলল, "ফিলসফি ছেড়ে একটু প্রাকটিক্যাল হও। রিস্কটা তুমি বুঝতে চেষ্টা করো আমার দিক থেকে।"

"ঠিক আছে। আমি আর আসব না।"

"আহ্, আমি তা বলিনি। তুমি বড় অবুঝ গৌতম! আমাদের সাবধান হওয়া দরকার।"

গৌতম হাসল। "ওক্কে! শরীরের খেলাটা কমিয়ে দেব। বডি-গার্ডের চাকরিই করব।"

গার্গী উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "তুমি বসো। আমি স্নান করে নিই। রান্না চাপাতে হবে।"

এদিনও সন্ধ্যায় লোডশেডিং। গৌতম কিছুক্ষণ ঘনশ্যামের অপেক্ষা করে চলে গেল। বলে গেল, "ভয় পেয়ো না। টর্চটা হাতের রাছে রাখো। শ্যামদা এখনই এসে যাবে। আমার একটা কাজ আছে। না হলে থাকতুম।"

চারদিক জুড়ে আঁধার। গুমোট গরম। হেরিকেনের আলো বারান্দায় রেখে দাঁড়িয়ে রইল গার্গী। তার গা ছমছম করছিল। এত দেরি করছে কেন লোকটা?

কিছুক্ষণ পরে ঘনশ্যাম ফিরল। বলল, "ডেঞ্জারাস ব্যাপার! কিছুক্ষণ আগে করালী কবরেজমশাইকে কে গুলি করে মার্ডার করেছে। পয়েন্ট-ব্ল্যাংক রেঞ্জে। একা বসেছিলেন গঙ্গার ধারের পার্কে। দেখ তো কী সাংঘাতিক কাণ্ড! বুড়ো মানুষ। দূরসম্পর্কে গোপেশ্বরবাবুর কাকা। এই অপরাধ।" সে শ্বাস ছেড়ে ফের বলল, "তবে এই কাঁটালিয়াঘাটে কে কেমন লোক, বলা কঠিন। নিশ্চয় কোনও

সিক্রেট ব্যাপার আছে। তা না হলে বুড়ো মানুষকে মারবে কেন? মাথার পেছনে গুলি। বুঝলে? দেখতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল। পুলিশ এসে গেছে।”

গার্গী চা করতে গেল। সেই সময় আলো এল...

॥ ছয় ॥

কাঁটালিয়াঘাটে মারামারি খুনোখুনি লোকের গা-সওয়া। ভোটের রাজনীতির হাওয়া উঠলে এটা বেড়ে যায়। কিন্তু এই শরতে ভোটের হাওয়া নেই। তপু খুন হওয়ার পর চাপা উত্তেজনা থাকলেও লোকে আশঙ্কা করেছিল, যে-কোনও সময় মুখোমুখি সংঘর্ষ বাধতে পারে বড়জোর। কিন্তু এমন করে পাঞ্জাবের সন্ত্রাসবাদী রীতিতে খুনোখুনি হওয়ার কথা কেউ কল্পনাও করেনি। পদ্ধতিটা একেবারে নতুন। তাই সন্ত্রাসের শিহরন ছড়িয়ে পড়েছিল প্রতিটি মানুষের মনে। সন্ধ্যার আগেই ঘাটবাজার খাঁ খাঁ হয়ে যাচ্ছিল। রাস্তাঘাটে কদাচিৎ মানুষজন দেখা যাচ্ছিল। এম এল এ বাবুর আত্মীয় ছিলেন করালী কবিরাজ। সত্তরের ওপর বয়স। লাঠি হাতে চলাফেরা করেন। তাঁকে খুন করার একটা কারণ অবশ্য আঁচ করেছিল লোকে। তাঁর ছোটছেলে গোপাল কেলোর দলে ভিড়েছিল। তপু খুন হওয়ার পর সে গা ঢাকা দিয়েছে। পুলিশের খাতায় সে অন্যতম আসামী। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সব দিক বজায় রেখে চলতে হয়। কাঁটালিয়াঘাটে পরদিনই বাইরে থেকে আরও পুলিশ এনে মোতায়েন করা হয়েছে। গঙ্গার ধারে নেতাজি পার্কে পুলিশ রাইফেল হাতে টহল দিচ্ছে। গলিঘুঁজির মোড়েমোড়ে সশস্ত্র পুলিশ। তবু লোকের স্বস্তি নেই। হিট্‌লিস্টের ক যে কবরেজমশাই, কেউ কল্পনাও করেনি। এবার দ্বিতীয় নামের আদ্যক্ষর খ। যাদের নামের গোড়ায় খ আছে, তারা আতঙ্কে কাঠ হয়ে গেছে। যারা নির্দল নির্বিরোধী খ, তারাও খুঁটিয়ে চিন্তাভাবনা করছে, কোনও সূত্রে দুই শিবিরের সঙ্গে অতীতেও দৈবাৎ কোনও সম্পর্ক ছিল কি না।

দিনের বেলায় ততকিছু আতঙ্ক নেই অবশ্য। কিন্তু সন্ধ্যার মুখে ওই লোডশেডিং বড় বিপত্তিকর। বিদ্যুৎ সাবস্টেশনে গোপেশ্বরবাবু এবং পুলিশ অফিসাররা এ নিয়ে কথা বলতে গিয়েছিলেন। কিন্তু বিদ্যুৎ অফিসাররা জানিয়েছেন, তাঁদের কিছু করার নেই। কখন কোন ট্রান্সমিশন লাইন ট্রিপ করবে, আগে থেকে বলা কঠিন তবু তাঁরা চেষ্টা করবেন, যাতে লোডশেডিং যতটা সম্ভব কমানো যায়।

কবরেজমশাই খুন হওয়ার পর তিনটে দিন আর কিছু ঘটল না। ঘনশ্যাম বিকেলে বেড়াতে যেতে নিষেধ করেছিল গার্গীকে। একটা লুডো কিনে এনে দিয়েছিল। বলেছিল, “বরং ঘরে বসে লুডো খেলবে। গৌতম না এলে একা-একা খেলবে। সময় কেটে যাবে। আমি সকাল-সকাল ফিরতে চেষ্টা করব।”

গৌতম এই তিনটে দিন কম এসেছে। গার্গী অভিমান দেখিয়েছে। অভিমান ভাঙাতে অনেক আদর করেছে গৌতম। বলেছে, “আসলে মা বড্ড কড়াকড়ি

শুরু করেছেন। সবেধন নীলমণি আমি। এনিওয়ে, রাগটাগ ছেড়ে লুডো বের করো। খেলি।”

লুডো খেলতে খেলতে হঠাৎ একসময়—

যৌবন যৌবনের কাছাকাছি হলে হয়তো এটাই অনিবার্য। শরীরে-শরীরে সাপলুডো খেলা।

সেদিন বিকেলে গার্গী জেদ ধরল, “চলো কিছুক্ষণ ঘুরে আসি। বাড়িতে থেকে হাঁপ ধরে গেল। এখানে আসার পর কী যে হয়েছে, বিকেলটা বাইরে ছুটোছুটি করে বেড়াতে ইচ্ছে করে।”

গৌতম বলল, “আমারও। কলকাতায় থাকলে একরকম। এখানে এলে অন্যরকম। খালি টো টো ঘুরতে ইচ্ছে করে। কিন্তু তোমার বর জানতে পারলে চটে যাবে যে।”

“বেশি দূর যাব না। বাঁধের ওপর কিছুক্ষণ ঘুরব।”

দুজনে বেরুল। ছাতিম গাছটার পাশ দিয়ে গিয়ে বাঁধে উঠল। তারপর হাঁটতে হাঁটতে কী এক নেশায় পেয়ে গেল গার্গীকে। বলল, “চলো, স্লুইস গেটে গিয়ে কিছুক্ষণ বসি।”

ডাইনে গঙ্গা, গাছপালার ফাঁকে। বাঁ-দিকে পোড়ো ইঁটভাটার খাল আর ঝোপঝাড়। একটা জলনিকাশী নালা এসে গঙ্গায় মিশেছে। সেখানে স্লুইস গেট। ছোট্ট ব্রিজ। ব্রিজের কালভার্টে পাশাপাশি দু’জনে বসল।

ওরা কথা বলছিল। নির্জন প্রকৃতিতে প্রেমিক-প্রেমিকারা যে-সব কথা বলে, চপল মাদকতাময় সেইসব কথা। হাতে সঙ্গে হাতের খেলা। প্রকৃতিতে সে স্বাধীনতা ছড়িয়ে আছে, সেই স্বাধীনতা ভূতের মতো পেয়ে বসেছিল।

একবার বাঁ-দিকে, যে পথে এসেছে ওরা, ঘুরে গার্গী দেখেছিল, দূরে বাঁধের নিচে একটুকরো ঘাসের জমিতে মাথায় টুপিপরা একটা লোক দু’ হাঁটুতে হাত রেখে ঝুঁকল। তারপর সোজা হলো এবং হঠাৎ মাটিতে মাথা ঠেকাল। বাঁধের ওপর একটা সাইকেল দাঁড়িয়ে আছে। গার্গী বলল, “ও কী করছে লোকটা?”

গৌতম হাসল। “নামাজ পড়ছে। তুমি মুসলমানদের নামাজ পড়া দেখনি?”

“হ্যাঁ, হ্যাঁ। দেখেছি।”

“আমার বেশ লাগে এই ব্যাপারটা। নির্জনে কারও কাছে সারেন্ডার করা।”

“আমরা প্রণাম করি। সে-ও সারেন্ডার।”

“আমি করি একমাত্র তোমার কাছে।”

“ছি! ও কী কথা!”

“সত্যি গার্গী! ওসই ঈশ্বর-টিশ্বরে আমার বিশ্বাস নেই। তবে হ্যাঁ, একটা ন্যাচারাল ব্লাইন্ড ফোর্স আছে ফিল করি।”

“ব্লাইন্ড বলছ কেন?”

pathagar.net

"অব কোর্স ব্লাইন্ড! তা না হলে মানুষ যা খুশি করতে পারছে কেন? তুমি ভেবে দেখ, এত খুনোখুনি এত সব যুদ্ধ—একেকটা যুদ্ধ কী সাংঘাতিক ব্যাপার কল্পনা করো। তারপর ফ্লাড। আমি মেডিকেল টিমে কতবার কত জায়গায় ফ্লাডের সময় গেছি। ওঃ! হরিফাইং! ব্লাইন্ড ফোর্স ছাড়া কী?"

আজ এলোমেলো বাতাস বইছিল। দিনশেষের ধূসরতা ঘনিয়ে এসেছে কখন, কথায় কথায় দু'জনেরই খেয়াল হয়নি। গৌতম বলল, "এই! এবার উঠে পড়ো।"

দুজন বাঁধের উপর দিয়ে ফিরে আসছিল। গার্গী গুন গুন করে কি গান গাইছিল। গৌতম বলল, "বাহ্! তুমি এত ভালো গাইতে পারো, অথচ চেপে রেখেছ? গলা ছেড়ে গাও!"

গার্গী বলল, "ভ্যাট! ও কিছু না।"

বাঁ-দিকে গঙ্গার ধারে গাছপালায় পাখিরা তুমুল চ্যাঁচামেচি করছে। দূরে রেল লাইনে একটা মালগাড়ির শব্দ কতক্ষণ। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে কাঁটালিয়াঘাট টাউনশিপে আলো জ্বলে উঠেছে এখনই। আজ হয়তো লোডশেডিং হবে না। বাঁক ঘুরে ধূসর আলোয় সেই সাইকেলটা দেখা গেল। একই ভাবে বাঁধের উপর দাঁড় করানো আছে।

কিছুটা এগিয়ে যাবার পর গৌতম থমকে দাঁড়াল। গার্গী বলল, "কি ব্যাপার?"

গৌতম বলল, "লোকটা—এসো তো দেখি।"

সে চলার গতি বাড়াল। গার্গী একটু পিছিয়ে পড়ল। গৌতম সাইকেলটার কাছে গিয়ে আবার থমকে দাঁড়িয়েছে। তারপর গার্গী দেখল, সে নীচের ঘাস জমিতে নামল।

গার্গী তখনও বুঝতে পারেনি, কী হয়েছে।

কাছাকাছি গিয়ে সে থমকে দাঁড়াল। সেই নামাজপড়া লোকটা উপুড় হয়ে পড়ে আছে ঘাসে। দুটো হাত সামনে ছড়ানো। তার টুপিটা খসে পড়েছে। মাথার একটা পাশ থেকে টাটকা রক্ত গড়িয়ে তার কাঁধ এবং পিঠ অব্দি জামাকে রাঙিয়ে দিয়েছে। গার্গী মুখ ফিরিয়ে নিল।

গৌতম কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, "মার্ডার! এখানে থাকা উচিত নয় আর। চলো!"

দু'জনে হন্তদন্ত হাঁটতে থাকল। গার্গী হাঁটতে পারছিল না। আতঙ্কে তার গলা শুকিয়ে গেছে। কোনও কথা বলতে পারছিল না সে।

ছাতিমতলায় পৌঁছে গৌতম বলল, "কী করা উচিত, বুঝতে পারছি না। পুলিশকে খবর দিতে গেলে জেরার চোটে অস্থির করবে। এস তো!"

ঘনশ্যাম বাড়িতে ছিল। গৌতম ও গার্গীর মুখের দিকে তাকিয়ে সে হাসল। "পেত্নীটা তাড়া করেছে নাকি?"

pathagar.net

গৌতম ব্যস্তভাবে বলল, "আবার মার্ডার। এক মুসলমান ভদ্রলোককে নামাজ পড়তে দেখেছিলুম। ফেরার সময় দেখি, মাডার্ড হয়ে পড়ে আছেন। একটা সাইকেল—"

ঘনশ্যাম চমকে উঠেছিল। দ্রুত বলল, "সর্বনাশ! খয়রুল হাজি নয় তো? ফেরার সময় দেখা হয়েছিল। বলল, মাঠে ধান দেখতে যাচ্ছি।"

গৌতম বলল, "কী করা উচিত বলুন তো শ্যামদা।"

ঘনশ্যাম একটু ভেবে নিয়ে বলল, "পুলিশ—নাহ্! ওদিকটা লোকজন ছিল না?"

"নাহ্। কাকেও তো দেখলুম না।"

"মুসলমানপাড়ায় খবর না হয় দিলে। কিন্তু ওরা পুলিশকে তোমার কথা বলবে। সে-ও এক বিপদ। পুলিশ জেরা করবে, ওদিকে কেন গিয়েছিলে।"

"আমিও ঠিক তা-ই ভেবেছি।"

ঘনশ্যাম গম্ভীরমুখে বলল, "তোমার বৌদি সঙ্গে ছিল। কাজেই স্ক্যান্ডালেরও রিস্ক আছে। বরং চেপে যাও। কেউ না কেউ বডি দেখতে পাবে।"

গার্গী দরজার কাছে মেঝেয় বসে পড়েছিল। ঘনশ্যাম তাকে বলল, "তোমাদের বলেছিলুম, বাইরে যেও-টেও না। বড্ড জেদ তোমার। আর গেলে গেলে, ওই নিরিবিলি শ্মশানমশান জঙ্গল এলাকায়! যাও, হাতেমুখে জল দাও। ঘাড়ে জল দিও। নার্ভাসনেস কেটে যাবে। একটা ট্যাবলেট দিচ্ছি। খেয়ে নিও। মার্ডার-ফার্ডার দেখলে প্রচণ্ড শক লাগে নার্ভে। বিশেষ করে মেয়েদের। ওঠ আমি চা করে দিচ্ছি। গরম-গরম চায়ের সঙ্গে ট্যাবলেটটা খেয়ে নেবে।"

গৌতম বলল, "আমি যাচ্ছি শ্যামদা।"

"নো, নো! ঘনশ্যাম হাত নাড়ল। "আগে ব্রেন ঠাণ্ডা করে নাও। হাতমুখ ধোও। চা খাও। কিছুক্ষণ বসো।"

সে কিচেনের সামনে গেল চা করতে। কুকার জ্বেলে কেটলি চাপিয়ে এসে দেখল, গার্গী বাথরুমে ঢুকেছে। সে গৌতমকে কিছু বলতে যাচ্ছিল, বন্ধ বাথরুমের ভেতর গার্গীর ওয়াক তোলার শব্দ শোনা গেল। বাথরুমের দরজায় গিয়ে সে বলল, "বমি হচ্ছে নাকি? নিজের জেদে খালি কষ্ট পাবে। মার্ডার্ড বডি দেখলে আমারও ভীষণ গা ঘুলোয়।"

একটু পরে গার্গী বেরিয়ে ঘরে ঢুকল। তারপর বিছানায় শুয়ে পড়ল। ঘনশ্যাম দরজার কাছ থেকে বলল, "বমি বন্ধের ট্যাবলেট দেব?"

গার্গী আস্তে বলল, "না।"

বমিভাবটা নতুন নয়। ক'দিন থেকে এটা হচ্ছে। সে একটা কিছু আঁচ করেছে, শরীরে যেন কী একটা পরিবর্তন ঘটেছে। মুখ ফুটে বলতে বেধেছে স্বামীকে। গৌতমকেও বলেনি। শরীর জুড়ে কী এক নতুন অনুভূতি।

গৌতম হাতমুখ ধুয়ে এসে চেয়ারে বসল। ঘনশ্যাম চা করে আনল। গৌতমকে দিয়ে সে ঘরে গেল গার্গীকে চা দিতে। গার্গী হাত নেড়ে বলল, "নাহ্। বমি হয়ে যাবে।"

"কিচ্ছু হবে না। ওটা নার্ভাসনেস। একটা ট্যাবলেট দিচ্ছি।"

"আহ্ চা খাব না।" গার্গী পাশ ফিরে শুল।

ঘনশ্যাম বাইরের চেয়ারে বসে বলল, "খয়রুল হাজিকে কী ভাবে মেরেছে দেখলে।" গৌতম চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, "মাথার বাঁ-দিকে গুলি করেছে মনে হলো।"

"গুলি? তার মানে কবরেজমশাইয়ের মতো?"

"হ্যাঁ। সম্ভবত মাটিতে মাথা লুটিয়ে নামাজ পড়ার সময় গুলি করেছে। বাঁ-দিকে ঝোপের আড়াল দিয়ে মার্ডারার এসে গুলি করেছে। পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জেও হতে পারে।"

"তোমরা কোথায় ছিলে? কত দূরে?"

"স্লুইস গেটে বসেছিলুম।"

"গুলির শব্দ শুনতে পাওনি?"

"নাহ্। উল্টোদিকে বাতাস। তাছাড়া মালগাড়ির শব্দ হচ্ছিল।"

ঘনশ্যাম একটা সিগারেট ধরিয়ে চুপচাপ টানতে থাকল। তারপর বলল, "তা হলে খ-তে খয়রুল হাজি। হাজিসায়েবও গোপেশ্বরবাবুর পার্টির লোক কিন্তু আমার ভাবনা হচ্ছে, এই থেকে না কমিউন্যাল কিছু বেধে যায়।"

গার্গী দ্রুত বেরিয়ে এসে বাথরুমে ঢুকল। আবার বমির শব্দ। ঘনশ্যাম হন্তদন্ত গিয়ে বলল, "ধরব? দেখো, মাথা ঘুরে পড়ে যেও না।"

গৌতম চায়ের কাপ রেখে উঠে দাঁড়াল। শ্যামদা! আমি চলি।" বলে সে বেরিয়ে গেল।

সে রাতে বিছানায় শুয়ে হঠাৎ ঘনশ্যাম সন্দিগ্ধস্বরে বলল, "এ মাসে তোমার পিরিয়ড হয়নি?"

গার্গী আস্তে বলল, "না।"

"তাই বলো!" ঘনশ্যাম খিকখিক করে হাসল অন্ধকারে। তারপর দু'হাতে গার্গীকে বুকে টেনে বলল, "বোকা মেয়ে! বুঝতে পারছ না তুমি এতদিনে মা হতে চলেছ?"

গার্গী কোনও সাড়া দিল না।...

অনেকদিন বৃষ্টি হয়নি। ধানক্ষেতে জল শুকিয়ে গেছে। খয়রুল হাজি বিকেলে সাইকেলে চেপে উত্তরের মাঠে জমি দেখতে বেরিয়েছিলেন। পরদিন পাম্পসেট বসিয়ে পোড়ো ইঁটভাটার খাল থেকে জলসেচের ব্যবস্থা করার ইচ্ছা

ছিল। সন্ধ্যা গড়িয়ে গেল, তখনও ফিরলেন না। দিনকাল খারাপ। তাঁর ছেলেরা লোকজন নিয়ে অস্ত্রশস্ত্র আর টর্চ নিয়ে খুঁজতে বেরিয়েছিল তাঁকে। বাঁধে সাইকেল দাঁড় করানো দেখে তারা ছুটে যায়। মাথায় রক্ত মেখে হাজি সাহেবকে উপুড় হয়ে পড়ে থাকতে দেখে।

আবার কাঁটালিয়াঘাটে ঝিমিয়ে পড়া সন্ত্রাস ফিরে এল। হিট্ লিস্টে খ ছিল। খয়রুল হাজির বডি বড়ল। লোকেরা তাঁর ছেলেদের বকাবকি করল। নামে খ আছে, অথচ বাবাকে তারা সাবধান করে দেয়নি কেন? তারা আসলে ভেবেছিল এটা হিন্দুপাড়ার বাবুদের দলাদলি।

আজকাল সব দলাদলিই রাজনীতির। রাজনীতিতে হিন্দুমুসলমান নেই। আর রাজনীতিরই চাপে ই এফ আর পর্যন্ত এসে গেল। দৈবাৎ না হিন্দু-মুসলমান বেধে যায়। কাঁটালিয়াঘাট পুলিশে-বন্দুকে আবার ছয়লাপ। সন্ধের পর টহলদারি। ১৪৪ ধারা জারি। ঘাটবাজার খাঁ খাঁ করে।

কিন্তু কালীপুজোর দিন এসে গেল। কোনও গ-এর মৃত্যু হলো না। কাঁটালিয়াঘাটে কালীপুজোরই ধুমটা বেশি। লক্ষ টাকার বাজি পোড়ে। বাইশখানা ঠাকুর হয়। শ্মশানকালীর পোড়ো মন্দিরের ভোল ফেরানো হয়। ততদিনে সন্ত্রাস কিছুটা থিতিয়ে এলেও এবার তত বেশি ধুম হলো না। গঙ্গার ধারে বাজি অবশ্য পুড়ল। শ্মশনকালীতলায় তান্ত্রিক মোনাখ্যাপা মড়ার খুলিও নাচাল। পুলিশের নির্দেশে যাত্রার আসর বন্ধ।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন সকালে গৌতম এল। "শ্যামদা! আমার ছুটি ফুরুল। আগামীকাল মর্নিংয়ে কলকাতা যাচ্ছি। এবার সামনে একজামিনেশন। কোনও দিকে মন দেবার উপায় থাকবে না।"

ঘনশ্যাম বলল। "এঃ হে! বড্ড ভুল হয়ে গেছে। তুমি কাল যাবে জানলে একসঙ্গেই যেতুম।"

"কলকাতা যাবেন নাকি?"

"যাব কী! এক্ষুণি খেয়েই ট্রেন ধরতে যাব। আজ বারাসাতে পিসেমশাইয়ের বাড়িতে থাকব। কাল মর্নিংয়ে কলকাতা যাব। রাইটার্সে জরুরী কাজ। খুলেই বলি, তোমার বাবার চিঠি নিয়ে যাচ্ছি ট্রান্সফারের তদ্বিরে।"

"বৌদি যাচ্ছে তো সঙ্গে?"

ঘনশ্যাম একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "ওর শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। এই অবস্থায় ট্রেনজার্নির ধকল—রিস্ক নেওয়া উচিত হবে না। তাছাড়া পিসেমশাইয়ের বাড়ি তোমার বৌদি যেতে চায় না।"

গার্গী রান্না করছিল। গৌতম তার দিকে তাকিয়ে বলল, "বৌদি রাত্রে একা থাকতে পারবে? পাড়ার কাকেও—"

গার্গী বলল, "না। আমার জন্য পাহারার দরকার নেই।"

pathagar.net

ঘনশ্যাম বলল, "জাস্ট একটা রাত। তোমাকে থাকতে বলতুম। কিন্তু তোমার বাড়িতে কী ভাববে? বরং একটু রাত অব্দি তুমি থেকো। ভোরে এসে খোঁজ নিও।"

গার্গী ঝাঁঝালো স্বরে বলল, "আমার পাহারার দরকার নেই।"

"আহা! দিনকাল খারাপ। যা চলছে এখানে!"

গৌতম কৌতুকে বলল, "এবার হিটলিস্টে গ। সাবধান!"

গার্গী হেসে ফেলল, "তুমিও গ। তুমি সাবধান।"

ঘনশ্যাম খিকখিক করে খুব হাসল। "তারপর ঘ-তে আমি। পরপারে গিয়ে তিনজনের দেখা হবে।" বলে সে বাথরুমে স্নান করতে ঢুকল।...

সারা দুপুর গার্গী ও গৌতম লুডো খেলে আর কথা বলে কাটাল। গৌতম আজ শেষদিন শরীরের খেলা খেলতে চাইছিল। গার্গী তার চোখে চোখ রেখে বলল, "তুমি জানো? আমি মা হতে চলেছি।"

"মাই গুডনেস!" গৌতম চটাস করে একটা চুমু খেল। "অ্যাদ্দিন বলোনি?"

"তুমি তো ডাক্তারি পড়ছ। তোমার বোঝা উচিত ছিল।"

গৌতম একটু চুপ করে থেকে বলল, "ক্রেডিটটা কার? তোমার বরের, না আমার, এটাই প্রশ্ন।"

"শাট আপ! খালি অসভ্যতা!" বলে গার্গী উঠে দাঁড়াল। "এই! চলো না আজ শেষদিনের বেড়ানোটা বেড়িয়ে নিই। বেশি দূর যেতে পারব না। কাছাকাছি গঙ্গার ধারে বসে থাকব।"

গৌতম একটু দ্বিধার সঙ্গে বলল, "বেশ তো! চলো!"

দরজায় তালা এঁটে দু'জনে বেরুল। ছাতিমতলা পেরিয়ে বাঁধে উঠে গার্গী বলল, "ওখানটা ফাঁকা জায়গা। চলো, ওখানে গিয়ে বসি।"

গঙ্গার ধরে এখানে কারা অনেকগুলো গাছ কেটে নিয়ে গেছে। গোড়াগুলো খোঁচার মতো দেখাচ্ছে। ঘন দূর্বাঘাসে দু'জনে বসল। একটু পরে গৌতম বলল, "তোমার মায়ের রূপটা মনে ভেসে আসছে। ফিরে এসে দেখব—"

গার্গী তার হাতটা নিয়ে বলল, "ওসব কথা থাক। গিয়েই তো তুমি গার্লফ্রেন্ডের পাল্লায় পড়ে আমাকে ভুলে যাবে।"

গৌতম কী বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ একটা তীব্র তীক্ষ্ণ শব্দ, বারুদের গন্ধ। সে পড়ে গেল। গার্গী মুখ ঘুরিয়েছিল সহজাত বোধে। আবার তেমনি একটা শব্দ। তার কপালে কী ঢুকে গেল। সে-ও গড়িয়ে পড়ল।...

॥ সাত ॥

কর্নেল নীলাদ্রি সরকার বাইনোকুলারে বুনোহাঁসের একটা ঝাঁক দেখছিলেন। মরসুমী পরিযায়ী পাখিদেরও এই স্বভাব আছে। যুদ্ধে অগ্রগামী রক্ষীদের ছোট্ট

দল শত্রুপক্ষের অবস্থান বুঝে নিতে গোপনে এগিয়ে যায়। বুঝে নিতে চায় পরিবেশের হালচাল। পরিযায়ী পাখিদেরও তাই। অক্টোবর শেষ হয়ে এসেছে। এখনই হিমালয় ডিঙিয়ে গাঙ্গেয় অববাহিকায় বিক্ষিপ্ত কিছু ঝাঁক আগাম এসে পড়েছে।

কয়েক মাইল জুড়ে বিশাল এই জলা পশ্চিমে রেলব্রিজের কাছে কিছুটা অপরিসর। তারপর গঙ্গা অব্দি ছড়িয়ে গেছে চওড়া হয়ে। জলজ দামের আড়ালে হাঁসের ঝাঁকটা লুকোচুরি খেলছে। মাঝে মাঝে উড়ে গিয়ে অন্যখানে বসছে। হাঁসগুলোকে অনুসরণ করতে গিয়ে দক্ষিণের জঙ্গলটা বাইনোকুলারে ধরা দিল। জলার ধারে গাছপালা থাকলে সারসজাতীয় পাখিদের আড্ডা থাকা স্বাভাবিক। সাদা একঝাঁক বক একটা ঝুঁকেপড়া গাছে ফুলের মতো ফুটে আছে। আর একটা গাছের ওপর একলা শামুকখোল ধ্যানে বসেছে। হঠাৎ একটা উডডাক দেখতে পেলেন। অত্যন্ত বিরল প্রজাতির এই পাখি। দেখতে অবিকল ছোট্ট হাঁসের মতো। কিন্তু এরা স্থলচর। কর্নেল জলার উত্তর দিকে ধানক্ষেত আর ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গঙ্গার ধারে বাঁধে পৌঁছুলেন।

বিকেলের নরম গোলাপী আলো ছড়িয়ে আছে সবখানে। বাঁধে হন্তদন্ত হাঁটছিলেন কর্নেল। উডডাকটার ছবি তুললেন। স্লুইস গেটের কাছে পৌঁছে টেলিলেন্স পরালেন ক্যামেরায়। স্লুইস গেটটা খোলা আছে। তলা দিয়ে জেলেদের নৌকো যাতায়াত করে। জলাটা ফিসারিজ কো-অপারেটিভের।

কর্নেল দুপুরের ট্রেনে কাঁটালিয়াঘাটে এসেছেন আজ। রেললাইনের কাছাকাছি ফরেস্ট বাংলোয় উঠেছেন। একসময় কাঁটালিয়াঘাটের উত্তরে ওই জঙ্গলটা সত্যিকার জঙ্গল ছিল। বাঘের উপদ্রবও ছিল। এখন আর বাঘের নামগন্ধ নেই। সরকারের বনদফতর ছিন্নভিন্ন পুরনো জঙ্গল নতুন করে গাছ লাগিয়ে জমজমাট করেছেন। রেললাইনের দিকটায় পিকনিক স্পট। কিন্তু এদিকটায় অবাধ নির্জনতা।

একটু অস্বাভাবিক মনে হলো এই নির্জনতাকে। কোথাও কোনও লোক নেই। হঠাৎ মনে পড়ে গেল বাংলোর চৌকিদার হারাধন তাঁকে সকাল সকাল ফিরতে বলছিল। সন্ধ্যার পর নাকি চোরাগোপ্তা খুনখারাপি শুরু হয়েছে কাঁটালিয়াঘাটে। প্রচণ্ড সন্ত্রাস চলেছে। সন্ধ্যার আগেই লোকেরা বাড়ি ঢুকে পড়ে।

তবে খুনোখুনিটা দুই দলের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব থেকে। চৌকিদার হারাধন আরও একটা অদ্ভুত কথা বলছিল। প্রকাশ্যে নাকি পোস্টার লটকে দিয়েছিল কোনও এক ব্রতীনবাবুদের দল। হিটলিস্ট কথাটাও বলছিল স্বল্পশিক্ষিত চৌকিদার "ক খ গ ঘ দিয়ে চারটে নাম স্যার।" রসিক হারাধন হাসতে হাসতে বলছিল, "ও-তে নাম হয় না বলেই হয়তো হিটলিস্টে নেই। তবে ক খ ফিনিশ হয়েছে। ক-য়ে করালী কবরেজ। খ-য়ে খয়রুল হাজি। এবার গ-য়ে কে ফিনিশ হয় দেখা যাক।

উড়ডাকটা হঠাৎ উড়ল। কর্নেল বাইনোকুলারে তাকে অনুসরণ করলেন। পুবদিকে সোজা উড়ে গিয়ে গঙ্গার ধারে একটা তরুণ আকাশিয়া গাছের ডালে বসল। কিন্তু তাকে আর দেখতে পেলেন না। বেলা পড়ে আসছে। মিনিট কুড়ি-পঁচিশের মধ্যে সূর্য ডুবে যাবে এবং টেলিলেন্সে ছবি আসবে না। বাঁধটা গঙ্গার সমান্তরালে বাঁক নিয়েছে। এখান থেকে বাইনোকুলারে আকাশিয়া গাছটা দেখা যাচ্ছে না। বাঁক পেরিয়ে চোখে পড়ল ডানদিকে একটা পোড়ো ইঁটভাটা। এক মুহূর্তের জন্য কাকে ঝোপের আড়ালে বসে পড়তে দেখলেন কর্নেল। ভাবলেন, মফস্বলি গ্রাম্য স্বভাব। কেউ জৈবকর্মে বসল নিশ্চয়।

মন পড়ে আছে পাখিটার দিকে। আকাশিয়া গাছটা আর চিনতে পারলেন না কর্নেল। আরও অনেক ছোট-বড় আকাশিয়া অসংখ্য গাছের ভিড়ে মিশে আছে। গঙ্গাতীরের ভূমিক্ষয়বোধে ঘন করে গাছ লাগানো হয়েছে। ডাইনে এবার বসতি এলাকা শুরু। সরকারি একতলা স্টাফ কোয়ার্টার বলে মনে হলো। একটু এগিয়ে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন কর্নেল। চমকে উঠলেন।

একজন মানুষ আরেকজন মানুষের ওপর পড়ে আছে।

তলার জন যুবক। সে একপাশে কাত হয়ে আছে ওপরের জন যুবতী। সে যুবকটির পেটের ওপর চিত হয়ে পড়ে আছে। মুখটা রক্তাক্ত।

কর্নেল বাঁধ থেমে নেমে গেলেন। একটু ঝুঁকে দেখেই সোজা হলেন। দুজনেরই কপালে বুলেটের ক্ষত। এখনও রক্ত জমাট বাঁধেনি। তিনি এসে পড়ার বেশ কিছুক্ষণ আগেই কেউ এদের গুলি করেছে।

হারাধন চৌকিদারের কথা যদি সত্যি হয়, এদের একজন সম্ভবত গ।

কর্নেলের মস্তিষ্ক দ্রুত কাজ করে। যুবকটির নামের আদ্যক্ষর গ হওয়া সম্ভব। যুবতীটি নিশ্চয় ঘাতককে দেখেছিল, তাই তাকেও মরতে হয়েছে। যুবতীর সিঁথিতে সিঁদুর—নাকি রক্ত? আবার একটু ঝুঁকে দেখে নিলেন, সিঁদুরই বটে। এরা স্বামী-স্ত্রী হওয়াই সম্ভব। চেহারায় মফস্বলী ছাপ নেই। এরা কি এখানে নবাগত?

কর্নেল চারদিকে ঘুরে দেখলেন, কোথাও কোনও লোক নেই। বাঁধে গিয়ে উঠলেন। মুহূর্তের জন্য নিজের নিয়তির প্রতি ক্ষুব্ধ হলেন কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। বরাবর এমনটা হয়ে আছে। তিনি যেখানেই যান, কোন অদৃশ্য প্রতিপক্ষ তাঁর সামনে রক্তাক্ত মৃতদেহ ছুঁড়ে দিয়ে তাঁকে যেন চ্যালেঞ্জ করে। সেই চ্যালেঞ্জ তাঁকে নিতে হয়।

আগাছার জঙ্গলের ভেতরে সংকীর্ণ পায়ে চলা পথ দিয়ে হন্তদন্ত এগিয়ে গেলেন কর্নেল। সামনে প্রথমে যে বাড়িটা পড়ল, সেটার দরজা-জানালা বন্ধ। বাড়িটা ঘুরে গিয়ে পিচের একফালি পথ। দুধারে সারবন্দি একতলা কোয়ার্টার।

একটা বারান্দার গ্রিলের ভিতর এক প্রৌঢ় ভদ্রলোককে দেখতে পেলেন। বললেন, "শুনুন—প্লিজ একটু বাইরে আসবেন?"

ভদ্রলোক ভুরু কুঁচকে কর্নেলকে দেখছিলেন। বললেন, "আপনি কাকে চান?"

"আপাতত আপনাকে। একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটেছে।"

"ঘটনা? সাংঘাতিক? মানে মা-মা-মার্ডার নাকি?"

"হ্যাঁ। ওখানে দুটো ডেডবডি পড়ে থাকতে দেখলুম। আপনি অন্যদের ডেকে নিয়ে—"

"ওরে বাবা! আমি ওতে নেই মশাই। আপনি কে? কোথায় থাকেন?"

কর্নেল বিরক্ত হয়ে বললেন, "আমি কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। কলকাতায় থাকি। প্লিজ আপনি—"

"চেপে যান মশাই! কার ডেডবডি কোথায় পড়ে আছে, ওসব নিয়ে মাথা ঘামাতে যাবেন না। এ সব এখানে হরদম হচ্ছে।"

এক ভদ্রমহিলা আর দুটি মেয়ে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। ভদ্রলোক বললেন, "শুনছ? আবার বডি পড়েছে। এই ভদ্রলোক দেখেছেন।"

কর্নেল বললেন, "একটা নয়, দুটো। দুজন যুবক-যুবতী!"

একটি মেয়ে চমকে উঠে বলল, "তাহলে ঘনাবাবুর বউ আর মেন্টাল হসপিটালের অরু ডাক্তারের ছেলে। কী যেন নাম, মা?"

ভদ্রমহিলা নাকমুখ কুঁচকে বললেন, "গৌতম। জানতুম—"

ভদ্রলোক বাধা দিয়ে বললেন, "ছাড়ো তো! আমাদের পাঁচকথায় কাজ কী? আপনি মশাই থানায় খবর দিন গে। এসব ঝামেলায় আমাদের জড়াবেন না!"

সাইকেলে এক ভদ্রলোক আসছিলেন। কর্নেল তাঁকে ডাকলেন। প্রৌঢ় ভদ্রলোক চেঁচিয়ে বললেন, "সন্টুবাবু! আবার বডি পড়েছে। এবার কে জানো? গ-য়ে গৌতম। অরু ডাক্তারের ছেলে। সেইসঙ্গে ঘনাবাবুর ব্যাডক্যারেক্টার বউটাও—"

সাইকেলের ভদ্রলোক বললেন, "ওরে বাবা!" বলেই ওপাশের কোয়ার্টারে ঢুকে গেলেন।

প্রৌঢ় ভদ্রলোকের সেই কন্যাটি বলল, "ও মা! গ-য়ে গার্গী। দুজনেই গ!"

আশেপাশের কোয়ার্টারের বারান্দায় ইতিমধ্যে পুরুষ ও মেয়েরা বেরিয়েছে। কেউ বাইরে বেরুতে রাজি নয় যেন। কর্নেল হন্তদন্ত এগিয়ে গেলেন সামনে চওড়া রাস্তাটার দিকে।

দিনশেষের ধূসরতা চারদিকে। সব আলো জ্বলে উঠল। চওড়া রাস্তা ধরে কিছু দূর চলার পর টাউনশিপের ছড়ানো-ছিটানো বাজার এলাকা। বাঁ-দিকে

পুরনো বসতি। সেখানে একটা সাইকেল রিকশো পেলেন কর্নেল। সে কিছুতেই যাবে না। দশ টাকা ভাড়ার লোভে এবং গন্তব্য থানা শুনে সে শেষপর্যন্ত রাজি হলো।...

রাত নটার ঘণ্টা বাজল থানার ঘড়িতে। অফিসার-ইনচার্জ তারক মুখার্জির ঘরে বসেছিলেন কর্নেল। দাঁতে কামড়ানো চুরুট। সামনে কফির পেয়ালা। একপাশে ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর তাপস রুদ্র, অন্যপাশে সাব-ইন্সপেক্টর রঞ্জিত মিত্র। দুটো বডি মর্গে চলে গেছে। গৌতমের বাবা ডাঃ অরিন্দম চৌধুরী একটু আগে চলে গেছেন। তাঁর কাছে জানা গেছে, ওয়েলফেয়ার অফিসার ঘনশ্যাম রায় সকালের ট্রেনে কলকাতা গেছেন। তিনি বারাসাতের লোক। ওখানে এক আত্মীয়ের বাড়ি আজকের দিনটা কাটিয়ে আগামীকাল রাইটার্সে যাবেন। ফেরার কথা সন্ধ্যা নাগাদ। অরিন্দমবাবু বলেছেন, গৌতম ছুটিতে এসেছিল। তপনদের তরুণ সংঘ ক্লাবে যাতায়াত করত। এই মাত্র। তাকে কে মারতে পারে, তাঁর মাথায় আসছে না। হ্যাঁ, ঘনশ্যামের স্ত্রীর সঙ্গে তার মেলামেশার কথা কানে এসেছে তাঁর। কিন্তু নিজের ছেলেকে তিনি চেনেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, ভুল করে গৌতমকে মারা হয়েছে এবং দৈবাৎ একটা গুলি ঘনশ্যামের স্ত্রীকে লেগে সে-ও মারা পড়েছে! কিংবা ঘনশ্যামের স্ত্রী হয়তো খুনীকে চিনতে পেরেছিল বা চিনে রাখবে ভেবেও তাকে খুন করা হতেও পারে।

কর্নেল কফিতে চুমুক দিয়ে হেলান দিলেন। অভ্যাসমতো চোখ বুজে সাদা দাড়িতে হাত বুলোতে থাকলেন। টুপিটি টেবিলে রাখা। টাকে আলো পড়ে চকচক করছিল।

ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর তাপস রুদ্র একটু হেসে বললে, "আমার ঘোরতর সন্দেহ, গোপেশ্বরবাবু কর্নেল সায়েবকে এখানে ডেকে এনেছেন।"

কর্নেল চোখ খুলে মাথা নাড়লেন। "নাহ্ মিঃ রুদ্র! আমি কাঁটালিয়াঘাটে এমনি এসে পড়েছি। ট্রেনে যেতে যেতে ওই জলা আর জঙ্গলটা একবার চোখে পড়েছিল। তা ছাড়া ফরেস্ট বাংলোটাও অসাধারণ সুন্দর।"

ও সি তারক মুখার্জি বললেন, "যাই হোক, এতদিন বড়কর্তাদের মুখে আপনার অনেক নাম শুনেছি। কাগজেও কত খবর পড়েছি। আমার সৌভাগ্য, আপনার সঙ্গে মুখোমুখি আলাপ হলো।"

তাপসবাবু বললেন, "আমরা একটা অ্যাঙ্গল থেকে দেখছিলুম ব্যাপারটা। এবার সব ঘুলিয়ে গেল। অবকোর্স, ডাঃ চৌধুরী মে বি কারেক্ট। আই মিন, ঘনশ্যামবাবুর স্ত্রীর মৃত্যুটা দুটি কারণেই হতে পারে। স্পটে যা দেখলুম, উত্তরের ঝোপের আড়াল থেকে গুলি করেছে! দূরত্ব প্রায় কুড়ি ফুট। আগের দুটো ছিল পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জে গুলি। এ ক্ষেত্রে কুড়ি ফুট দূর থেকে গৌতমবাবুর কপালে

গুলি ছোঁড়ায় বোঝা যাচ্ছে, খুনীর হাতের টিপ চমৎকার। পজিশন দেখে মনে হলো, ভদ্রমহিলা মুখ ঘুরিয়ে ছিলেন গৌতমবাবুকে গুলি করার সঙ্গে সঙ্গে।"

কর্নেল বললেন, "দ্যাটস রাইট।"

"তার মানে এ-ও হতে পারে কিলারকে উনি দেখতে পেয়েছিলেন।"

তারক মুখার্জি বললেন, "কেন? পরপর গুলি ছুঁড়ে থাকবে কিলার। কারণ, কুড়ি ফুট দূর থেকে গুলি করলে একটা গুলিতে ভিকটিম না মরতেও পারে। আমার ধারণা, ঘনশ্যামবাবুর স্ত্রীকে গুলিটা লেগেছে দৈবাৎ।"

কর্নেল বললেন, "আগের দুটো ভিকটিমের মাথায় পয়েন্ট ২২ রিভলভারের গুলি পাওয়া গেছে?"

"হ্যাঁ।" তারক মুখার্জি জোর দিয়ে বললেন, "সেজন্যই মনে হচ্ছে পর-পর দুবার গুলি করে নিশ্চিত হতে চেয়েছে কিলার। পয়েন্ট ৩৮ রিভলভার হলে ওই ডিসট্যান্সে একটা বুলেটই এনাফ। পয়েন্ট থ্রি-নট-থ্রি বুলেট।"

তাপস রুদ্র বললেন, "ডাঃ চৌধুরী ছেলের সম্পর্কে ক্লিন সার্টিফিকেট দিলেন বটে, আমার ধারণা ওঁর ছেলে দলাদলিতে জড়িয়ে পড়েছিল। কাজেই গৌতমবাবুর ব্যাকগ্রাউন্ড তদন্ত করা জরুরি।"

"কারেক্ট।" কর্নেল বললেন। "কিন্তু নেক্সট টার্গেট ঘ। ঘ দিয়ে কতগুলো নাম আছে এখানে, খোঁজ নেওয়া দরকার।"

এস আই রঞ্জিতবাবু হাসলেন। "একজন ঘ-এর স্ত্রী মারা পড়ল। ঘনশ্যাম রায়। কিছু বলা যায় না, ভদ্রলোকও ভেতর ভেতর ইনভলভ্‌ড কি না। কিছুদিন আগে ওঁর বাড়িতে একটা অদ্ভুত চুরি হয়েছিল।"

কর্নেল বললেন, "অদ্ভুত চুরি মানে?"

"স্ট্রেঞ্জ! কোয়ার্টারটা শেষদিকে। সে তো দেখলেন স্যার!" রঞ্জিতবাবু বললেন, "ঘনশ্যামবাবু সেদিন বাড়ি ফিরতে দেরি করেছিলেন। ওদিকে তাঁর স্ত্রী আর গৌতমবাবু বেড়াতে গিয়েছিলেন। সন্ধ্যায় লোডশেডিং। সেই ফাঁকে চোর তালা ভেঙে ঢুকেছিল। ঘরের তালাও ভাঙা। একটা সুটকেস আর বারান্দায় রাখা সাইকেলটা নিয়ে যায় চোর। আলমারির তালা ভাঙতে চেষ্টা করে পারেনি। আমিই গিয়েছিলাম ইনভেস্টিগেশনে। আশ্চর্য ব্যাপার, স্যুটকেসে তেমন কিছু ছিল না। কাজেই সেটা বাড়ির পেছনে ঝোপের ভেতর না হয় ফেলে পালায় চোর। কিন্তু সাইকেলটা গঙ্গায় ফেলে দিয়েছিল। মাইলদেড়েক দূরে জেলেদের জালে আটকে যায়। সাইকেলটা অবশ্য পুরনো। প্রথমে ভেবেছিলেন, ঘনশ্যামবাবুর খনখনে বাজে সাইকেলটা রাগ করে ফেলে দিয়েছে। পরে মনে হয়েছিল, ঘনশ্যামবাবুর ওপর কারও রাগ-টাগ আছে।"

তাপস রুদ্র বললেন, "দ্যাটস আ পয়েন্ট। ঘনশ্যামবাবুর ওপর কারও রাগ আছে।"

সায় দিয়ে তারক মুখার্জি বললেন, "ভদ্রলোককে সাবধান করে দেওয়া উচিত। সেই সঙ্গে তাপসবাবু ওকে আচ্ছাসে জেরা করে দেখুন, কিছু বেরোয় নাকি। লেট হিম কাম ব্যাক। আমার মনে হয়, স্ত্রীর মৃত্যুর দরুন ভদ্রলোক শকড অ্যান্ড নার্ভাস হয়ে কিছু কবুল করে ফেলবেন।"

"সেই পোস্টারটা!" কর্নেল বললেন। "সেটা একটু দেখতে চাই।"

"দেখাচ্ছি।" বলে ওসি তারক মুখার্জি ওয়াল-চেস্টের তালা খুললেন। "আমরা পৌঁছুনোর আগে কারা ওটা ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টা করেছিল। একটু অংশ জল দিয়ে ভিজিয়ে তুলে এনেছিলুম।"

ছেঁড়া পোস্টারের একটা টুকরো টেবিলে রাখলেন তিনি। ওপরে 'ভুলব না' এবং তলার দিকে ক খ গ ঘ চারটে অক্ষরের অর্ধেকটা টিকে আছে। কর্নেল বললেন, "কত বড় পোস্টার আন্দাজ করেছিলেন?"

"ছোট। এক ফুট চওড়া, ফুট দেড়েক লম্বা হবে।"

তাপস রুদ্র বললেন, "না মিঃ মুখার্জি! আরও একটু বড় হবে মনে হচ্ছে। কারণ এটা লোকাল বাংলা উইকলি কোনও কাগজেরই একটা পাতা।"

তারক মুখার্জি বললেন, "এনিওয়ে, ছোট পোস্টার। লেটারগুলো দেখুন, বেশ বড়। লাল কালিতে লেখা। তুলি দিয়ে লেখা মনে হয় না। শক্ত কাঠি-ফাটি দিয়ে লেখা।"

কর্নেল বললেন, "দু একদিনের জন্য এটা রাখতে পারি? ইফ য়ু প্লিজ—"

"অবশ্যই। আপনার কো-অপারেশন আমরা চাই।"

কর্নেল ভাঁজ করে জ্যাকেটের ভেতর চালান করে বললেন, "উঠি এবার। বাংলোয় ফিরতে হবে।"

"জিপে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করছি! হাইওয়ে দিয়ে ঘুরে একটু দূর হবে। সো হোয়াট?"

একজন কনস্টেবল ঢুকে সেলাম টুকে বলল, "উও ডাক্তরবাবু আয়া স্যার!"

"ডঃ চৌধুরী?"

"জি।"

"নিয়ে এস।"

ডাঃ অরিন্দম চৌধুরী হন্তদন্ত ঘরে ঢুকলেন। পকেট থেকে একটা খাম বের করে বললেন, "এটা দিনে কখন লেটার বক্সে কে ফেলে গিয়েছিল। গৌতমের পার্সোনাল চিঠি ভেবে খোলেনি ওর মা! এইমাত্র শুনে খামটা খুললাম। বাই পোস্টে আসেনি, এই দেখুন।"

তারক মুখার্জি চিঠিটা পড়ে কর্নেলকে দিলেন। তাপর রুদ্র ঝুঁকে গেলেন কর্নেলের দিকে। আঁকাবাঁকা জড়ানো হরফে লেখা আছে

"জুতোর বাক্স শীঘ্র ফেরত দাও। শ্মশানকালীর মন্দিরের পেছনে কল্কেফুলের ঝোপে ইঁটচাপা দিয়ে রেখে আসবে।"

তাপস রুদ্র বললেন, "জুতোর বাক্স! হোয়াট ডাজ ইট মিন?"

ডাঃ চৌধুরী বললেন, "আমি তো এর মাথামুণ্ডু কিচ্ছু বুঝতে পারছি না।"

তারক মুখার্জি গম্ভীরমুখে বললেন, "বোঝা খুব সহজ ডাঃ চৌধুরী! আপনার ছেলে কেলোর গ্যাংয়ের সঙ্গে ইনভল্‌ভড ছিল। জুতোর বাক্স ওদেরই কোনও সিম্বলিক টার্ম। একালের ছেলেদের চেনা কঠিন।"

"ইম্‌পসিবল!" বলে ডাঃ চৌধুরী রাগ করে বেরিয়ে গেলেন।...

সেদিনই সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার ট্রেন বহরমপুর থেকে ফিরছিলেন ঘটহরি ভটচার্য। হাঁপকাশের রুগী। কাঁটালিয়াঘাটের সরকারি হাসপাতালে অনেকদিন চিকিৎসা করিয়েও সারেনি। বহরমপুরে প্রাইভেট ক্লিনিকে দেখাতে গিয়েছিলেন। তিনটে থেকে বসে থেকে নাম লিখিয়ে ডাক পড়ল পাঁচটার সময় । বেরিয়ে ওষুধপত্তর কিনে বাসে চাপতে গিয়ে ভয় পেলেন। আগাপাছতলা ভিড় লাস্ট বাসে। হাঁপের রুগীর পক্ষে বাসে ঢোকা অসম্ভব। অগত্যা ট্রেন।

তা-ও ভাগ্যিস ডাউন ট্রেন লেট করেছিল। লোকাল ট্রেন কাটোয়া অব্দি যাবে। তত ভিড় নেই। কাঁটালিয়াঘাট রোড স্টেশনে নেমে দেখলেন প্লাটফর্ম প্রায় খাঁ খাঁ। দুর্গাপুজোর আগে থেকে এই অবস্থা চলেছে। জনাকতক যাত্রী অবশ্য নেমেছিল। তারা দল বেঁধে লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেল। নাগাল পেলেন না ভট্‌চাযমশাই।

সেই যাত্রীরা সাইকেল রিকশাগুলোয় চেপে ঝাঁক বেঁধে চলে গেল। একটা রিকশা দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু রিকশাওয়ালাকে দেখতে পেলেন না। স্টেশনের পেছনে দোকানপাট খাঁ খাঁ করছে। হরেনের দোকানে বসে মাটির ভাঁড়ে চা খেলেন ভট্‌চাযমশাই। হরেন বলল, "ভট্‌চাযমশাই যাবেন কী করে?"

ভট্‌চায ক্লান্তভাবে হাসলেন। "কষ্ট করে হেঁটেই যাই। পথে যদি রিকশা পাই—"

"পাবেন বলে মনে হয় না।" হরেন বলল। "সাংঘাতিক অবস্থা। আজও দুটো বডি পড়েছে।"

"বলো কী!"

হরেন ঘটনাটা বলল। ভট্‌চায মনে মনে সন্ত্রস্ত, কিন্তু মুখে বললেন, "কর্মফল! আমি কারও সাতে-পাঁচে থাকি না। আমার আর কী? যাই।"

স্টেশনরোড জনহীন। দু'ধারে উঁচু সারিবদ্ধ গাছ। ল্যাম্পপোস্টের আলো চকরা-বকরা হয়ে পড়েছে। কিছুদূর এগিয়ে দম নেওয়ার জন্য দাঁড়ালেন। সেই সময় মনে হলো, কে পেছনে আসছে। ঘুরে বললেন, "কে গো?"

লোকটা কাছাকাছি এল। মুখটা চেনা লাগছিল ভট্চাযের। কিন্তু আর কিছু বলার সুযোগই পেলেন না। তীক্ষ্ণ তীব্র একটা শব্দ এবং মাথার ভেতরটা জ্বলে গেল ঘটহরি ভট্চাযের। টলতে টলতে উপুড় হয়ে পড়ে গেলেন পিচের ওপর। তখন আততায়ী তাঁকে টানতে টানতে পাশের খালে ফেলে দিল।

॥ আট ॥

বাইরে গেলে কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের চিরাচরিত অভ্যাস ঘণ্টা দুই প্রাতঃভ্রমণ। ভোর ছটায় বেরিয়ে পড়েছিলেন। মনে সেই উভডাক পাখিটার ছবি আঁকা হয়ে গেছে। জলার ধারে ঘাসে ঝোপেঝাড়ে চকচকে শিশির। পায়ে হাঁটু অব্দি হান্টিং বুট জুতো। গঙ্গার ধারে বাঁধ ধরে চলতে চলতে স্লুইস গেটে পৌঁছুলেন। তখনও দক্ষিণের জঙ্গলে কুয়াশা জড়ানো। আসন্ন হেমন্তের পূর্বাভাস। একটু পরে রোদ সেই কুয়াশাকে ক্রমশ ছিঁড়ে ফেলছিল। বাইনোকুলারে উভডাকটাকে খুঁজছিলেন কর্নেল। এই পাখিগুলোর স্বভাব, ঘন জঙ্গলে আত্মগোপন। এরা কিছুতেই বসতি এলাকার কাছাকাছি যেতে চায় না।

জঙ্গলে ঢুকে সাবধানে পা ফেলছিলেন কর্নেল। কিছুক্ষণ অন্তর থমকে দাঁড়াচ্ছিলেন উভডাকের ডাক শোনার জন্য। অদ্ভুত চাপা শব্দে এরা ডাকে।

কিছুদূর ঘন গাছপালার তলা পরিষ্কার হয়ে আছে। শাল, শিশু, আকাশিয়া। কোনও ঝোপঝাড় নেই। তারপর জঙ্গল আরও জটিল হল। বৃক্ষলতাগুল্ম জমাট বেঁধে আছে। সেখানে সবই স্থানীয় উদ্ভিদ। বনদফতরের লাগানো। আউটসাইডারদের ভিড় নেই। সবে টুই টুই করে কী পাখি ডেকে উঠল পেছনের কোনও গাছের ডগায়। কর্নেল তাকে খুঁজে বের করার জন্য ঘুরে দাঁড়াতে গিয়ে দেখলেন একটা খালি চারমিনার সিগারেটের প্যাকেট পড়ে আছে। ঘাসে ও শুকনো পাতায় কয়েকটা পোড়া সিগারেটের টুকরোও।

এখানে কে সিগারেট খেতে এসেছিল? খালি প্যাকেটটা কুড়িয়ে নিলেন কর্নেল—নেহাত খেয়ালবশে। তারপর দৃষ্টি গেল সামনে প্রকাণ্ড এবং বেঁটে হিজল গাছের গুঁড়ির দিকে। ফুট পাঁচ-ছয় উঁচুতে কয়েক টুকরো কাদা সাঁটা আছে। গোলাকার কাদার খুদে ঢিবি। কোনও-কোনওটার কিছু অংশ খসে গেছে। কাদাগুলো শুকনো এবং ফাটলধরা। অনেকদিন আগে কেউ সেঁটেছিল বোঝা যায়।

নাকি উই ধরেছে গাছটায়? অসম্ভব। হিজল গাছে উই ধরে না—অন্তত অতটা উঁচুতে। পিছিয়ে এসে বাইনোকুলারে সেগুলো লক্ষ করেই চমকে উঠলেন কর্নেল। তখনই গাছটার কাছে গিয়ে জ্যাকেটের পকেট থেকে ছুরি বের করে একটা শুকনো কাদার টুকরো সরালেন। গাছের গায়ে ফুটো। পোড়া দাগ আবছা হয়ে আছে। ছুরির ডগা দিয়ে গুঁড়ি খোদাই করার পর ইঞ্চিটাক ভেতরে খুদে একটা কালো শক্ত জিনিস দেখতে পেলেন।

রিভলভারের গুলি!

কেউ এখানে এসে গোপনে টার্গেট প্র্যাকটিস করেছে। অনেকটা সময় ধরে অনেক পরিশ্রমে মোট ছটা গুলি বের করলেন কর্নেল।

আটটা বেজে গেছে। পশ্চিমে রেললাইনের দিকে এগিয়ে দেখলেন, গভীর খাল জলে ভর্তি। অগত্যা যে পথে এসেছিলেন, সেইপথে ফিরে চললেন। পাখিটার পুনরাবিষ্কার করার মতো সময় পরে পাওয়া যাবে। আপাতত এই আবিষ্কারটা চমকপ্রদ।

গত রাতে আতস কাঁচ দিয়ে ছেঁড়া পোস্টারের হরফ আর বেনামী চিঠির হরফ পরীক্ষার পর সিদ্ধান্তে এসেছেন, হাতের লেখা একই লোকের—যদিও চিঠিতে হাতের লেখায় ইচ্ছে করেই বিকৃতি ঘটানোর চেষ্টা আছে। অন্তত দুটো হরফ 'না এবং 'খ'-এর মধ্যে একটা মিল স্পষ্ট। 'না'-এর পর আ-কারের মাথাটা ডাইনে একটু বাঁকানো এবং বেড়ে আছে। 'খ' হরফেও তা-ই। মোট কথা, যে এর লেখক, তার অভ্যাস প্রতি শব্দের শেষে মাত্রা দেওয়ার মতো একটা বাঁকা টান দেওয়া।

বাংলোয় ফিরে দেখলেন জিপ নিয়ে ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর তাপস রুদ্র হাজির। কর্নেল সহাস্যে সম্ভাষণ করলেন, "গুড মর্নিং মিঃ রুদ্র!"

তাপসবাবু বিষণ্ণ হাসলেন। "ব্যাড মর্নিং, কর্নেলসাহেব—সরি! মাথার ঠিক নেই।"

"আশা করি, নাও দা ভিকটিম ইস সাম ঘ?"

"হ্যাঁ! কিলারের সাহস আর স্পর্ধা আমাকে খেপিয়ে দিয়েছে। স্টেশন রোডের ধারে খালে কিছুক্ষণ আগে একটা বডি পাওয়া গেছে। দা সেইম কেস। মাথায় গুলি। কিন্তু অদ্ভুত লাগছে, ভট্চার্য মশাই নিরীহ মানুষ। শুনলুম, হাঁপানির অসুখ ছিল। বহরমপুরে ডাক্তার দেখাতে গিয়েছিলেন। স্টেশনবাজারের চায়ের দোকানের হরেন বলল, গতরাত্রে সাড়ে সাতটার ডাউন লোকালে নেমে তার দোকানে চা খান। তারপর একা পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরছিলেন। প্রায় দেড়শো গজ দূরে বডি পড়ে ছিল রাস্তার ধারে খালের জলে। হরেন কোনও গুলির শব্দ শোনেনি। অবশ্য রেলইয়ার্ডে শান্টিং ইঞ্জিনের শব্দ সব সময়। তো মর্নিংয়ে রেলের সুইপারের বউ শুয়োর ডাকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। সে দেখতে পায়।"

বারান্দায় বেতের চেয়ার-টেবিল। কর্নেল বললেন, "বসুন মিঃ রুদ্র!" তারপর হারাধনকে ব্রেকফাস্ট আনতে বললেন এবং এক পট কফিও হারাধন অপেক্ষা করছিল ট্রে সাজিয়ে। নিয়ে এল।

তাপস রুদ্র কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন, "দেয়ার ইজ সামথিং অড।"

"হ্যাঁ। ভট্চাযমশায়ের নামে যদি ঘ থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই অড।"

"আছে। ওঁর নাম ঘটহরি ভটচায। ওঁর দাদার নাম পটহরি। তিনি গতবছর মারা গেছেন। দু'ভায়ে দেবোত্তর সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলা এখনও চলছে। পটহরিবাবুর তিন ছেলে। বড় দুজন বাইরে চাকরি করে। ছোট ছেলের নাম কীর্তিহরি—" তাপসবাবু হাসলেন। হরিবংশ বলা চলে। এখানকার রায়রাজাদের মন্দিরের বংশানুক্রম সেবাইত। মন্দিরের বিগ্রহ রাধাবল্লভ। তো জাস্ট একটু লিংক আছে গোপেশ্বরবাবুর দলের সঙ্গে। কীর্তিহরির ডাকনাম ঘোঁতন। নাম্বার ওয়ান ক্রিমিন্যাল। প্রব্লেম হলো, উই আর হেল্পলেস। গোপেশ্বরবাবু রুলিং পার্টির লোকাল লিডার।"

'বুঝেছি।" কর্নেল ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে বললেন। "আপাতদৃষ্টে মনে হচ্ছে, ছেলে টার্গেট ছিল। এ ক্ষেত্রেও কবরেজমশাইয়ের মতো ছেলেকে না পেয়ে বাবাকে মেরেছে। বাই দা বাই, এরা তো এফ আই আর-এর আসামী?"

"হ্যাঁ। তপনের মার্ডারকেসে এক ডজন আসামী। তাদের মধ্যে ক খ গ ঘ আছে। কিন্তু সবাই ফেরার।"

"ডাক্তারবাবুর ছেলের ব্যাপারটা খোঁজ নিন।"

তাপস রুদ্র একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, "এস আই রঞ্জিত মিত্রের হাতে একটা ইনফরমেশন আছে। গৌতমের সঙ্গে তপনের ঘনিষ্ঠতা ছিল।"

"আর কিছু?"

তাপসবাবু আবার একটু হাসলেন। "যে ভদ্রমহিলা ওর সঙ্গে মারা পড়েছেন, তাঁর সঙ্গে চোখে পড়ার মতো মাখামাখি ছিল। মেন্টাল হসপিট্যালের ওয়েলফেয়ার অফিসার ভদ্রলোকের বয়স স্ত্রীর চেয়ে অনেক বেশি। কাচ্চাবাচ্চা নেই। নাচার‍্যালি একটু মাখামাখি থাকতেই পারে। রঞ্জিতবাবুর মতে, ঘনশ্যামবাবুর এতে কোনও আপত্তি ছিল না। কারণ ওঁর বাড়িতে চুরির তদন্তে গিয়ে স্ত্রীকে বকাবকি করতে দেখেননি। ভদ্রমহিলা নাকি একটু তেজী প্রকৃতির ছিলেন। পাড়ার কারও সঙ্গে মিশতেন না। মোদ্দা কথা, রঞ্জিতবাবুর বক্তব্য, ঘনশ্যামবাবু স্ত্রৈণটাইপ লোক।"

"উনি কি ফিরেছেন?"

"নাহ্। ফেরার কথা ওবেলায়। আমরা ট্রাংককলে লালবাজারকে জানিয়েছি। রাইটার্স হেলথ ডিপার্টে একটা মেসেজ দিতে বলেছি। ঘনশ্যামবাবুর ওখানে যাওয়ার কথা। দেখা যাক্।"

একটু পরে কর্নেল বললেন, "গৌতম এবং গার্গী দেবীর পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পেয়েছেন?"

"কিছুক্ষণ আগে মর্গে গিয়েছিলাম।" তপনবাবু হঠাৎ আস্তে বললেন, "ভেরি স্যাড। শি ওয়াজ পসিবলি প্রেগন্যান্ট। অবশ্য মর্গের ডাক্তার সিওর নন এখনও। তবে ওঁর সন্দেহ তা-ই।"

ব্রেকফাস্ট দ্রুত শেষ করে কর্নেল কফিতে চুমুক দিলেন। চুরুটও ধরালেন। হেলান দিয়ে বললেন, "জুতোর বাক্স ব্যাপারটা সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?"

"আমার ধারণা, ওটা চোরা ড্রাগ-ফাগের ব্যাপার। এর পেছনে যুক্তি আছে, কর্নেল সরকার। মেন্টাল হসপিট্যালে মাদকজাতীয় ওষুধ প্রচুর ব্যবহার করা হয়। মানসিক রোগীকে অনেক সময় ঘুম পাড়িয়ে রাখতে হয়। যেমন ধরুন, নাইট্রোজেনাস জাতীয় ওষুধ কিংবা মরফিয়া। এ ছাড়া আমাদের হাতে সলিড ইনফরমেশন আছে, জেনারেল হসপিট্যালে দামী ওষুধ পাচারের একটা চক্র আছে। কাজেই হসপিট্যালের একজন ডাক্তারের ছেলের পক্ষে দৈবাৎ তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়া অসম্ভব নয়।"

কর্নেল সায় দিলেন, "দ্যাটস রাইট।"

"এইসব মার্ডার তপনের গ্যাংয়ের কাজ তো বটেই। তবে কিলার একজন। তার একটা পয়েন্ট টোয়েন্টি টু ক্যালিবারের ছোট্ট রিভলভার আছে। এ সব রিভলভার সিক্সরাউন্ডার। ছটা গুলি থাকে। অটোমেটিক উইপন। একটা ফায়ার করলে নেক্সট গুলিটা অটোমেটিক প্রসেসে হ্যামারের সামনে এসে যায়।" বলে তাপসবাবু হাসলেন। "কাকে কী বোঝাচ্ছি! আপনি রিটায়ার্ড মিলিটারি অফিসার। য়ু নো মোর দ্যান মি।"

"তপন এবং—হুঁ, কেলো এদের মধ্যে ঝগড়াটা কিসের ছিল? রাজনৈতিক?"

"নাহ্। রাজনীতি-ফিতি নয়। তবে পলিটিক্যাল পার্টি ওদের সাহায্য নিয়ে থাকে। দু'জনের একসময় খুব ভাব ছিল। ঘাটবাজার এরিয়ায় ব্যবসায়ীদের কাছে সিকিউরিটি মানির বখরা নিয়ে প্রথম ঝগড়া বাধে। সো মাচ ইনফরমেশন আই বি সোর্সে আমাদের জানা। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, ড্রাগস এবং দামী ওষুধপত্র চোরাচালানের সূত্রেই সম্ভবত বেধেছিল দু'জনে। জুতোর বাক্স! নাও ইটস্ অ্যান ইমপর্ট্যান্ট ফ্যাক্টর ইন দিস কেস।"

"আপনি বলতে চাইছেন তপু দামী ড্রাগস লুকিয়ে রাখতে দিয়েছিল গৌতমকে এবং কেলোকে ঠকিয়ে একা আত্মসাৎ করতে চেয়েছিল?"

"হ্যাঃ। দ্যাটস মাই থিওরি।"

"তাহলে ক খ গ ঘ টার্গেট করল কেন? আইদার তপনের গ্যাংয়ের কেউ—ধর কেলো, ওসব পোস্টারের ঝামেলায় যাবে কেন? মিঃ রুদ্র, সাধারণ ক্রিমিন্যাল এ সব ঘোরপ্যাঁচে আজকাল যায় না। য়ু নো দ্যাট ওয়েল। তপুকে তারা বোমা মেরে খতম করেছে। ওদের কাজ ওইরকম বেপরোয়া এবং মোটা দাগের।"

তাপসবাবু কর্নেলের দিকে তাকিয়েছিলেন। বললেন, "হ্যাঁ। দ্যাটস আ পয়েন্ট।"

"আপনি বলছিলেন, দেয়ার ইজ সামথিং অড! হেয়ার ইজ য়া থিং—ভেরি পিকিউলার।"

pathagar.net

"কী?"

"প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে একই মোডাস অপারেন্ডি—একই পদ্ধতিতে খুন এবং একই মার্ডার উইপন ব্যবহার।"

"নিশ্চয় বাইরে থেকে ভাড়াটে খুনী আনিয়েছে তপনের গ্যাং—যাতে তাদের গায়ে আঁচড় না নাগে।"

কর্নেল হাসলেন। "সেটা অবশ্য সম্ভব। তবে—"

"তবে কী?"

"খুনী যে-ই হোক, সে একটু বেশি বুদ্ধিমান।"

তাপস রুদ্র হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ালেন। কর্নেলও উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন "জাস্ট আ মিনিট, মিঃ রুদ্র!" তিনি ঘরে ঢুকে গেলেন। নোটবইয়ের একটা পাতা ছিঁড়ে কিছু লিখলেন। তারপর বেরিয়ে এসে বললেন, "খুব গোপনীয়। আপনি ছাড়া কেউ জানবে না। এতে কয়েকটা প্রশ্ন আছে। সেগুলো অবিলম্বে তদন্ত করে লিখিতভাবে আমাকে গোপনে দেবেন। ইটস এ জেন্টলম্যানস এগ্রিমেন্ট বিটুইন য়ু অ্যান্ড মি, মিঃ রুদ্র।"

তাপস রুদ্র একবার চোখ বুলিয়ে গম্ভীর মুখে বললেন, "ওক্কে!"

রাইটার্স বিল্ডিংসের স্বাস্থ্যদফতরের অফিসে পৌঁছেই ঘনশ্যাম খবরটা পেয়েছিল। সে তখনই পাগলের মতো বিকট আর্তনাদ করে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল! জ্ঞান হওয়ার পরও সে অসম্বন্ধ প্রলাপ বকছিল। "এ হতে পারে না! মিথ্যা! এ অসম্ভব!" তার মাথায় জল ঢেলে অনেক চেষ্টায় শান্ত করার পর দুজন কর্মী ট্যাক্সি করে তাকে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে দিয়েছিলেন। সাড়ে বারোটায় ট্রেন। ততক্ষণে ঘনশ্যাম কিছুটা শান্ত হয়েছিল। ট্রেনে তাকে তুলে দিয়ে ওঁরা বলেছিলেন, "দেখুন, সঙ্গে আমরা যাব নাকি।"

ঘনশ্যাম আস্তে বলেছিল, "না। পারব যেতে।" তারপর আবার কেঁদে উঠেছিল। কামরাভর্তি যাত্রীরা জানতে চাইছিল, কী হয়েছে। ঘনশ্যাম কোনও জবাব দেয়নি। তারপর ট্রেন যত এগোচ্ছিল, তত সে নিঃসাড় হয়ে যাচ্ছিল। তার কেঠো চেহারা অপটু হাতে আঁকা ছবির মতো দেখাচ্ছিল।

কাঁটালিয়াঘাট পৌঁছুতে অসম্ভব সময় নিল ট্রেন। সাড়ে ছটায় প্ল্যাটফর্মে সে নেমেই দেখল হাসপাতালের কয়েকজন কর্মী তার জন্য অপেক্ষা করছে। সে ভাবতে পারেনি, তার মতো একলা স্বভাবের মানুষের বিপদে এত সব মানুষ সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে। সে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। "আমি আর কেমন করে বেঁচে থাকব? আমার জীবন শ্মশান হয়ে গেল!"

সবাই তাকে সান্ত্বনা দিতে দিতে সাইকেলরিকশায় চাপাল। তার পাশে

pathagar.net

একজন রসল। অন্যেরা সাইকেলে এসেছিল। প্রথমে থানায় যেতে হবে। মর্গ থেকে বডি ডেলিভারির পারমিশন নিতে হবে। তারপর শ্মশানযাত্রা।

ও সি তারক মুখার্জি ছিলেন না। ডিউটি অফিসারের কাছে বডি ডেলিভারির পারমিশন নিয়ে মর্গে গেল ঘনশ্যাম। সঙ্গে এস আই রঞ্জিত মিত্রও গেলেন। রঞ্জিতবাবুর এক আত্মীয়া মানসিক হাসপাতালে আছেন। সেই সূত্রে চেনাজানা দু'জনের। তাঁর সাহায্যে বডি ডেলিভারি নিতে দেরি হলো না। নইলে ডোমদের টাকাকড়ি দিতে হতো। নানা ছলছুতোয় দেরি করিয়ে দিত। রঞ্জিতবাবু বললেন, "আজ রাত্তিরে আর দরকার নেই। কাল সকালে অবশ্য করে থানায় আসবেন। বড়বাবুকে সব খুলে বলবেন—যদি কিছু প্রাইভেট কথাবার্তা বলার থাকে, হেজিটেট করবেন না।"

ঘনশ্যাম ভাঙা গলায় বলল, "বলব। সব বলব।"

দাহকর্ম শেষ হতে রাত দশটা বেজে গেল। শ্মশানে ডাঃ চৌধুরীও গিয়েছিলেন। ঘনশ্যাম গঙ্গাস্নান করে দেখল, তখনও তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। বললেন, "চলো! তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি। একটু কথাও আছে।"

বাড়ি ঢুকে আলো জ্বেলে ঘনশ্যাম দেখল, খাটের উপর গার্গীর সায়া, ব্লাউজ আর একটা শাড়ি পড়ে আছে। বেড়াতে যাওয়ার আগে পোশাক বদলেছিল। সে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইলো সেগুলোর দিকে। সবটাই অবাস্তব অবিশ্বাস্য লাগছে।

ডাক্তার চৌধুরী বারান্দায় চেয়ারে বসে ডাকলেন, "শোন ঘনশ্যাম! যা হবার হয়ে গেছে। তোমার আর কত কী—আমারটা দেখ, একমাত্র সন্তান! তুমি আবার বিয়ে করবে। স্ত্রী পাবে, সন্তান পাবে। আমি—"

ঘনশ্যাম বলল, "অদৃষ্ট স্যার! কী আর বলব!"

"তুমি যদি একটু কঠোর হতে ঘনশ্যাম!"

"কেন স্যার?"

"গৌতমকে তুমি বড্ড বেশি প্রশ্রয় দিয়েছিলে!"

ঘনশ্যাম চুপ করে থাকল। ডাক্তার চৌধুরী একটু কেসে বললেন, "গতকাল একটা বেনামী চিঠি এসেছিল গৌতমের নামে। কেউ লেটারবক্সে ফেলে গিয়েছিল। তাতে লেখা জুতোর বাক্স ফেরত না দিলে—"

ঘনশ্যাম শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, "জুতোর বাক্স?"

"হ্যাঁ। তুমি কি জানো—আই মিন, গৌতম তো প্রায় সবসময় তোমার বাড়ি আসত—সে কিংবা তোমার স্ত্রী কি এমন কিছু আভাস দিয়েছিল—"

ঘনশ্যাম তাঁর কথার ওপর চাপা স্বরে বলল, "বুঝেছি। ব্যাপারটা আমি, গৌতম আর গার্গী তিনজনে জানতুম। এসব ব্যাপার কাকেও বলা চলে না স্যার! শুনলেই বুঝতে পারবেন।"

সে পুরো ঘটনাটা বলল। তপু গৌতমকে জুতোর বাক্সে জুতোর ভেতর লুকিয়ে রাখা রিভলভার রাখতে দিয়েছিল। গৌতম সেটা গার্গীকে রাখতে দেয়। তারপর সাইকেল আর স্যুটকেসের সঙ্গে ওটাও চুরি যায়। ওটা আর ফেরত পায়নি। পুলিশকে শুধু এই কথাটিই বলেনি ঘনশ্যাম।

ডাঃ চৌধুরী শ্বাস ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, "তুমি এবার পুলিশকে এটা জানাও ঘনশ্যাম! এখন প্রায় পৌনে এগারোটা। এখন তোমার বিশ্রাম দরকার। ট্রাংকুলাইজার খেয়ে নাও। কাল মর্নিংয়ে তুমি থানায় গিয়ে সব বলবে। তুমি যদি না বলো, আমাকে বলতেই হবে।"

ডাঃ চৌধুরী চলে গেলেন। ঘনশ্যাম দরজা বন্ধ করে উঠোনে দাঁড়িয়ে রইল। সে আকাশ দেখছিল। নক্ষত্রলোকে দুটি মানুষের আভাস—গৌতম আর গার্গী! ঘনশ্যাম দু'হাতে মুখ ঢেকে চাপা আর্তনাদ করল, "না, না, না!"

"জুতোর বাক্স? সত্যিকার জুতোর বাক্স?"

"হ্যাঁ স্যার! ভেতরে নতুন দুটো বুটজুতো ছিল। একটা জুতোর ভেতর ছোট্ট একটা রিভলভার। অন্যটার ভেতর কাগজে মোড়া বারোটা গুলি। দেখতে ছোট্ট লিপস্টিকের মতো।" ঘনশ্যাম রুমালে নাক ঝেড়ে চোখ মুছে বলল।

"আপনি কী করে জানলেন ওটা রিভলভার—পিস্তল নয়?"

"আমার এক ক্লাসফ্রেন্ড ক্যালকাটা পুলিশের অফিসার। তার কাছে একবার কথায় কথায়—"

ও সি তারক মুখার্জি প্রশ্ন করছিলেন। এস আই রঞ্জিত মিত্র রেকর্ড করছিলেন। তারকবাবু বললেন, "হ্যাঁ, তো আপনি সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জানাননি কেন?"

"গৌতম আমার বসের ছেলে। তা ছাড়া তাকে আমি স্নেহ করতাম। বুঝতেই পারছেন স্যার, এটা এমন একটা ডেলিকেট ব্যাপার—আমি আসলে ভেবেছিলুম, গৌতম ওটা নিয়ে যাবে। কিন্তু হঠাৎ বাড়িতে চুরি হয়ে গেল। রঞ্জিতবাবু সব জানেন স্যার!"

"আপনি তখনও কথাটা জানাননি আমাদের!"

"ঝামেলার ভয়ে স্যার! আমি নিরীহ মানুষ! কোনও সাতে-পাঁচে থাকি না।"

একটু চুপ করে থেকে তারক মুখার্জি বললেন, "দেখুন ঘনশ্যামবাবু: আপনার স্ত্রী এবং গৌতমবাবু এখন বেঁচে নেই। কাজেই প্রশ্নের সত্যি জবাব দিতে অসুবিধা নেই। বলুন, আপনার স্ত্রীর সঙ্গে গৌতমবাবুর কি কোনও গোপন সম্পর্ক ছিল বলে মনে হয়েছে আপনার?"

ঘনশ্যাম জোরে মাথা নেড়ে বলল, "অ্যাবসার্ড! সন্দেহ করার মতো কিছু চোখে পড়েনি।"

"তাহলে আপনার স্ত্রীও কেন খুন হলেন বলে আপনার ধারণা?"

"কিছু বুঝতে পারছি না। তবে আমার মনে হয়— ঘনশ্যাম একটু ইতস্তত করে বলল, "গৌতমকে মারার সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছিল মার্ডারার। হয়তো পাচ্ছিল না। তারপর পেয়ে গেল—মানে, জায়গাটা নিরিবিলি।"

"কিন্তু আপনার স্ত্রীকে মারার কারণ কী মনে করেন?"

ঘনশ্যাম একটু ভেবে নিয়ে বলল, "মার্ডারার সাক্ষী রাখতে চায়নি হয়তো। কিংবা—কিংবা দৈবাৎ একটা গুলি ওর মাথায় লেগেছিল।"

তারক মুখার্জি বললেন, "ঠিক আছে। দরকার হলে আবার ডাকব আপনাকে।"

রঞ্জিতবাবু বললেন, "এটা পড়ে নিয়ে তলায় সই করুন।"

ঘনশ্যাম স্টেটমেন্ট পড়ল। তলায় ইংরেজিতে নাম সই করে দিল। তারিখও লিখল।...

॥ নয় ॥

কর্নেল নীলাদ্রি সরকার আজ পঞ্চমুখী শিবের মন্দির অব্দি প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। ওদিকে একটা আশ্রম আছে। নিসর্গ দৃশ্যও অসাধারণ। ভাবছিলেন, পশ্চিমবঙ্গেই এত সুন্দর সুন্দর জায়গা থাকতে কেন যে লোকে পুজোর সময় বাইরে ছোটে? শরৎকালের বাংলার নিসর্গের কোনও তুলনা হয় না। হয়তো সমতলবাসী বাঙালির সমতলের প্রতি একঘেঁয়েমি আছে, তা সমতলে যত সুন্দর করে স্বর্গোদ্যান প্রকৃতি সাজাক না কেন! উঁচু জায়গা অর্থাৎ পাহাড়-পর্বত দর্শন একটা বিস্ময়কর বৈচিত্র্যও বটে সমতলবাসীর কাছে।

একটু সকাল-সকাল বাংলোয় ফিরলেন আজ। তাঁর কথামতো ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর তাপস রুদ্র বাইরে গেছেন গতকাল। রাত্রে ফিরে থাকলে সকালেই কর্নেলের কাছে চলে আসবেন।

কারও জন্য প্রতীক্ষা মানুষের জীবনে একটা অসহ্য সময়—তা, যার জন্যই প্রতীক্ষা হোক কিংবা যে কারণেই প্রতীক্ষা হোক। নটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে ব্রেকফাস্ট খেলেন কর্নেল। তখনও তাপস রুদ্রের পাত্তা নেই। একটু উদ্বিগ্ন হলেন কর্নেল। অতি উৎসাহে কোনও হঠাকারিতা করে বসেননি তো ডিটেকটিভ অফিসার? খুনী যে-ই হোক, তার বুদ্ধিশুদ্ধি আছে এবং অতিশয় ধূর্ত। যদিও এই কেসে তার কিছু বুদ্ধির বাড়াবাড়ি ঘটে গেছে, এখন সে তা দৈবাৎ আঁচ করতে পারলে সতর্ক হয়ে যাবে। গা ঢাকা দেওয়াও অসম্ভব নয়। তা ছাড়া তাপস রুদ্রকে যে-সব তথ্য সংগ্রহের দায়িত্ব দিয়েছেন কর্নেল, সেগুলো এই কেসে ভাইটাল সাক্ষ্যপ্রমাণ নয়। তা শুধু সহায়ক বা সেকেন্ডারি এভিডেন্স মাত্র।

বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ মনে হলো, ছটা বুলেট-নেল পেয়েছেন জঙ্গলের হিজল গাছটার গুঁড়িতে। তার মানে সিক্স রাউন্ডার রিভলভারের ছটা খালি

কার্তুজ ফেলে দিতে হয়েছে খুনীকে। কোথায় ফেলেছে এটা খুঁজে দেখা উচিত ছিল। কাল ব্যাপারটা খেয়াল হয়নি। এখন মনে হলো, এ-ও একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। পাঁচজনকে খুন করা হয়েছে পাঁচটা গুলিতে। তাহলে তার কাছে সম্ভবত বারোটা গুলি ছিল। এখনও একটা রয়ে গেছে। তাপসবাবুকে সতর্ক করে দেওয়া উচিত চিল। অবশ্য একজন ডিটেকটিভ অফিসারের পেশাগত অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধিশুদ্ধির ওপর নির্ভর করা চলে। তবু সব মানুষের মধ্যে কোনও-কোনও মুহূর্তে হঠকারিতার ঝোঁক এসে যায়—আকস্মিক উত্তেজনাবশেও।

সাড়ে নটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে পড়লেন কর্নেল। হারাধনকে বললেন, "কেউ আমার খোঁজে এলে বলবে, লাঞ্চের সময় ফিরব।"

হারাধন বলল, "স্যার, বুনো হাঁসের মাংস খান তো?"

"খেতে আপত্তি নেই।" কর্নেল একটু অবাক হয়ে বললেন, "কোথায় পাবে বুনো হাঁস?"

হারাধন হাসল। "কেন স্যার? ওই জলার জলে ফাঁদ পেতে লোকে হাঁস ধরে। ওই যে দেখছেন পঞ্চমুখী শিবের মন্দিরের কাছে একটা গ্রাম। ওখানে গেলে পাওয়া যায়। রাত্তিরে জালের মতো ফাঁদ পেতে রেখে যায় স্যার।"

"নাহ্‌। তুমি বরং কালকের মতো জেলেপাড়া থেকে মাছ এনো।" কর্নেল তাকে টাকা দিয়ে বেরুলেন।

আজ আকাশে টুকরো-টুকরো মেঘ। রোদ-ছায়ার মধ্যে জলার ধার দিয়ে হাঁটতে থাকলেন কর্নেল। মাঝেমাঝে বাইনোকুলারে উডডাক পাখিটাকে খুঁজছিলেন। পাখিটা নিপাত্তা হয়ে গেল কেন?

দক্ষিণের জঙ্গলে ঢুকে এগিয়ে গেলেন সেই হিজল গাছটার খোঁজে।

গাছটা থেকে প্রায় কুড়ি ফুট দূরে জলা। চারদিক তন্নতন্ন খুঁজে জলার ধারে গেলেন কর্নেল। জলটা খুব স্বচ্ছ। ঢালু হয়ে নেমে গেছে মাটি। হঠাৎ চোখে পড়ল সোনালি রঙের কী একটা ছোট্ট জিনিস চকচক করছে জলের তলায়। পিঠের কিটব্যাগ থেকে প্রজাপতি ধরা জালের নেট-স্টিকটা বের করলেন। জল হাত দুয়েক গভীর। জিনিসটা টেনে কাছাকাছি এনে আস্তিন গুটিয়ে তুলে নিলেন। যা খুঁজছিলেন, তার একটা পাওয়া গেল।

ছোট্ট বুলেটের নীচের ফাঁপা অংশ। জলে ছুঁড়ে ফেলেছিল লোকটা। দৈবাৎ একটা ধারে পড়ে গিয়েছিল। জাল ফেলার ব্যবস্থা করলে বাকি পাঁচটাও নিশ্চয় পাওয়া যাবে।

সতর্কভাবে বাইনোকুলারে চারদিকে জঙ্গলের ভেতরটা দেখে নিলেন কর্নেল। কেউ লক্ষ্য রাখেনি তাঁর দিকে। এতে খুনী সম্পর্কে একা ধারণা পোক্ত হলো বলা চলে। সে নিজের বুদ্ধিশুদ্ধি সম্পর্কে নিশ্চিন্ত আর আত্মবিশ্বাসী। শুধু তাই নয়, সে জানে, তার পরিকল্পনা নিখুঁত নিশ্ছিদ্র।

pathagar.net

অথচ বরাবর দেখে আসছেন কর্নেল, সব খুনীই নিজের অজ্ঞাতসারে কোনও-না কোনও একটা ভাইটাল সূত্র রেখে দেয়—একচক্ষু হরিণের গল্পটা সব রহস্যময় হত্যাকাণ্ডের হত্যাকারীর ক্ষেত্রে সত্য। এই কেসে কি তেমন সূত্র আছে?

হুঁ, গৌতমকে লেখা বেনামী চিঠিটা।

একটু চমকে উঠলেন কর্নেল। চুরুট ধরালেন। প্রত্যেকটি খুন একই লোক একই অস্ত্রে করেছে। অথচ চিঠিটা পাওয়া গেছে, যেদিন গৌতম খুন হয়, সেদিনই। কেন তার আগে নয়?

অবশ্য 'জুতোর বাক্স' বলতে কী বুঝিয়েছে, এটা জানার ওপর নির্ভর করছে এই সূত্রটা সত্যি ভাইটাল কি না।

জঙ্গল পেরিয়ে গিয়ে ধানক্ষেত। তারপর বিদ্যুৎকেন্দ্র। কর্নেল বিদ্যুৎকেন্দ্রের পাশের রাস্তা ধরে হাঁটছিলেন। তাপস রুদ্রকে যে-সব তথ্য সম্পর্কে খোঁজ নিতে বলেছেন, তার মধ্যে একটা হলো কলকাতায় গার্গীর বিয়ের সময় কোনও প্রেমিক ছিল কি না। না থাকলে কাঁটালিয়াঘাটেও তেমন কেউ ছিল কি না, খুঁজে দেখা দরকার। একটা চমৎকার পরিকল্পনা আপাতদৃষ্টে লক্ষ্য করা যাচ্ছে বলেই এই তথ্যটা জানা জরুরি। গার্গীর কোনও প্রেমিক স্থানীয় হাঙ্গামার সুযোগ নিতে পারে।

আবার কথাটা মাথায় ভেসে এল কর্নেলের হত্যার অস্ত্র এক। মোডাস অপারেন্ডি এক। হত্যাকারী ছয় রাউন্ড গুলি ফায়ার করে টার্গেটে হাত পাকিয়েছে। তারপর কাজে নেমেছে। নাহ্, ভাড়াটে খুনীর থিওরি টিকছে না। সে এমন লোক, যে এই প্রথম রিভলভার ব্যবহার করেছে এবং তার হত্যার মোটিভ প্রতিহিংসা চরিতার্থ।

গার্গীর কোনও প্রেমিক হওয়াই সম্ভব। তার আসল লক্ষ্য ছিল গার্গী ও গৌতম। দুটোই গ। তার ক্ষুরধার বুদ্ধির প্রশংসা করতে হয়। দুই গ-কে হত্যার জন্য সে হিট্‌লিস্টে ক খ গ ঘ সাজিয়েছে। ঘ-কেও মেরেছে। ক খ ঘ তিনজনই বয়স্ক অসুস্থ মানুষ। প্রতিরোধের ক্ষমতা ছিল না। এই তিনটি হত্যার জন্য সে এদের বেছে নিয়েছে যাতে হত্যার কাজটা খুব সহজ হয়। গ-য়ের ক্ষেত্রে সে একটু ঝুঁকি নিয়েছে অবশ্য। কুড়ি ফুট দূর থেকে গুলি করেছে। যদি মোট গুলি বারোটা হয়, তখন তার রিভলভারে চারটে গুলি ছিল। কাজেই ঝুঁকিটা তত কিছু না। কাছে এসে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জেও গুলি করতে পারত—যদি প্রথম দুটো গুলি দৈবাৎ ফস্কে যেত। নির্জন জায়গা। সন্ত্রাসের আবহাওয়ায় এই নির্জনতা স্বাভাবিক।

টাউনশিপের মোড়ে কর্নেল একটা রিকশা নিলেন। বললেন, "থানায় যাব।"

থানায় ও সি নেই। রঞ্জিত মিত্রও নেই। ডিউটি অফিসার জামাল আমেদ কর্নেলকে দেখে অভ্যর্থনা করে ও সির ঘরে বসালেন। বললেন, "জুতোর বাক্সের ব্যাপারটা জানা গেছে কর্নেল সরকার! ঘনশ্যামবাবু সকালে এসে স্টেটমেন্ট দিয়ে গেছেন। দেখাচ্ছি।"

কর্নেল দ্রুত পড়ে নিয়ে একটু হাসলেন। "মিঃ রুদ্রের খবর জানেন?"

"উনি আউট অব স্টেশন। এখনও ফেরেননি।"

"আমি উঠি।"

জামালসাহেব তাঁকে গেট অব্দি বিদায় দিতে এলেন। বললেন, "আজ আবার ঘাটবাজারে হাঙ্গামা। ও সি সায়েব ফোর্স নিয়ে গেছেন। এখানে যা অবস্থা চলছে, কহতব্য নয়। কথায়-কথায় বোমাবাজি আর খুনজখম!"

ঘনশ্যাম অফিস যায়নি। যাবে ভেবেছিল, কারণ এই শূন্য ঘরে কাটানো তার পক্ষে কষ্টকর। কিন্তু ডাঃ চৌধুরী এসে তাকে নিষেধ করে গেলেন। এই মানসিক অবস্থায় তার অফিস যাওয়া উচিত নয়। কাজপাগল মানুষ ঘনশ্যাম। এতদিন ধরে তাকে দেখেছেন ডাঃ চৌধুরী। হাসপাতালে সবসময় ছুটোছুটি, রোগীদের খোঁজখবর করা, প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাজ—একটুও ফাঁকি দেয় না সে। এবার তার কয়েকটা দিন বিশ্রাম দরকার। তা না হলে এই সাংঘাতিক মেন্টাল শকে সে নিজেই মানসিক রোগী হয়ে পড়বে।

তাকে রান্না করতেও বারণ করে গেছেন ডাঃ চৌধুরী। বরং ঘাটবাজারের হোটেলে গিয়ে খাবে। নার্ভ শান্ত রাখার জন্য কিছু ট্যাবলেট দিয়ে গেছেন। ঘনশ্যাম খায়নি। চুপচাপ শুয়ে ছিল। দেয়ালে বিয়ের ছবির দিকে তাকাচ্ছিল মাঝেমাঝে। অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল সবকিছু। এখান থেকে চলে যেতে পারলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচত। কিন্তু যাওয়ার উপায় নেই। পুলিশের তদন্ত শেষ না হওয়া অবধি তাকে থাকতে হবে, ও সি বলে দিয়েছেন।

এতক্ষণে অস্থিরতা তীব্র হলে সে একটা ট্যাবলেট খেল। তার কিছুক্ষণ পরে কেউ বাইরের দরজায় কড়া নাড়ল। ঘনশ্যাম চমকে উঠেছিল। একটু পরে বেরিয়ে সে সাড়া দিল, "কে?"

"আমি ঘনশ্যামবাবুর সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই।"

ঘনশ্যাম উঠোনে নেমে গেল। দরজা খুলে একটু অবাক হলো সে। খ্রিস্টান ফাদারের মতো চেহারা, মুখে সাদা দাড়ি, মাথায় টুপি, বুকের ওপর ক্যামেরা আর কী একটা ঝুলছে এবং পিঠে একটা কিটব্যাগ। ঘনশ্যাম বলল, "আপনি কোত্থেকে আসছেন স্যার?"

"কলকাতা। আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে।"

"আপনাকে তো চিনতে পারলুম না—"

"আমার নাম কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। এখানে বেড়াতে এসেছি।"

"আপনি ট্যুরিস্ট?"

"বলতে পারেন।" বলে কর্নেল তার পাশ দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলেন। "ভয় পাওয়ার কিছু নেই ঘনশ্যামবাবু! আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলেই চলে যাব।"

ঘনশ্যাম খুব অবাক হয়ে তাকিয়েছিল। কর্নেল বারান্দার চেয়ারে বসে বললেন, "আসুন? আপনাকে সব বলছি। আমি একজন নেচারিস্ট। পাখি দেখা, প্রজাপতি ধরা, কিংবা জঙ্গল খুঁজে অর্কিড কালেকশন আমার হবি। তবে কোথাও কোনও রহস্যময় খুনখারাপি ঘটলে আমি তাতে নাক গলাই। এ-ও হবি বলতে পারেন। এখানে এসে শুনলাম, পর-পর কয়েকটা রহস্যজনক মার্ডার ঘটেছে এবং আপনার স্ত্রীও—যাই হোক, আমি আপনাকে সাহায্য করতে চাই। আপনি নিশ্চয় চান আপনার স্ত্রীর খুনী ধরা পড়ুক?"

ঘনশ্যাম বারান্দায় উঠে দাঁড়িয়ে রইল। কর্নেলকে দেখতে দেখতে বলল, "কিন্তু পুলিশ—"

কর্নেল হাত তুলে বললে, "পুলিশের ব্যাপার তো আজকাল জানেন! আমার মনে হয়েছে, সমস্ত ব্যাপারটা রহস্যময়। পুলিশের তদন্ত দায়সারা এবং মোটা দাগের। আমি আপনাকে সাহায্য করতে চাই।"

ঘনশ্যাম তাঁর দিকে তাকাল। তারপর পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে সিগারেট ধরাল। একটু পরে সে সন্দিগ্ধভাবে বলল, "আপনি আউটসাইটডার। আপনি কী করে—আপনি কি ডিটেকটিভ অফিসার?"

কর্নেল হাসতে হাসতে তার হাতে নিজের নেমকার্ড দিয়ে বললেন, "এই বয়সে আমি অফিসার হব কোন দুঃখে ঘনশ্যামবাবু? তা ছাড়া আমি রিটায়ার্ড কর্নেল।"

"কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না আপনি কী করে—"

"ঘনশ্যামবাবু, আপনি চান না আপনার স্ত্রীর খুনী ধরা পড়ুক?"

"দেখুন স্যার! আমার স্ত্রী দৈবাৎ মারা পড়েছে বলেই আমার ধারণা। এখন কথা হলো, যে যাবার সে চলে গেছে। আর তো তাকে ফিরে পাব না। মাঝখান থেকে গুণ্ডাগুলো আমাকে ফিনিশ করবে। আপনি আউটসাইডার। কে সারাক্ষণ আমার বডিগার্ড হয়ে আমাকে রক্ষা করবে? ভেবে দেখুন, আমাকে তো বেঁচেবর্তে থাকতে হবে। এ বাজারে এই চাকরি খোয়ালে আর পাওয়াও অসম্ভব।" ঘনশ্যাম হাত জোড় করল। "আপনি যেই হোন স্যার! খামোকা আমাকে বিপদে ফেলবেন না! আমি যা বলার সব পুলিশকে বলেছি। কিচ্ছু গোপন করিনি। পুলিশ যা করার করুক। আমি এখান থেকে ট্রান্সফারের চেষ্টা করছি।"

"একটা প্রশ্ন ঘনশ্যামবাবু! শুধু একটা প্রশ্নের জবাব দিন।"

"কী?"

গৌতম ছাড়া এখানে আর কারও সঙ্গে আপনার স্ত্রীর কোনও সম্পর্ক ছিল কিনা?"

ঘনশ্যাম ক্ষুব্ধভাবে বলল, "না! এ সব পার্সোনাল স্ক্যান্ডাল লোকে রটাচ্ছে!"

"আপনার স্ত্রীর নামে আসা চিঠিপত্র এখন খুঁজে দেখতে আপত্তি কী ঘনশ্যামবাবু? খুঁজে দেখলে—"

"অ্যাবসার্ড। কী সব বলছেন আপনি?"

"প্লিজ ঘনশ্যামবাবু! উত্তেজিত হবেন না। এমন তো হতে পারে, আপনার বিয়ের আগে আপনার স্ত্রীর কোনও সম্পর্ক ছিল কারও সঙ্গে। প্রতিহিংসাবশে সে এতদিনে তাঁকে খুন করেছে!"

ঘনশ্যাম বিরক্ত হয়ে বলল, "আবার একই কথা! আমার স্ত্রী দৈবাৎ মারা পড়েছে। ডাক্তারবাবুর ছেলের সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে পাশাপাশি বসেছিল, কাজেই একটা গুলি তার গায়েও লেগেছে!"

"শুনলুম কপালে লেগেছিল।"

"একই কথা। আমি ট্রাংকুলাইজার খেয়েছি। ঘুম পাচ্ছে। আপনি আসুন স্যার!"

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "ঘনশ্যামবাবু! খুনীর রিভলভারে এখনও একটা গুলি আছে।"

ঘনশ্যাম চমকে উঠে বলল, "সো হোয়াট?"

"একটু সাবধানে থাকা উচিত আপনার। কারণ আপনার নামেও ঘ আছে।"

"আই ডোন্ট কেয়ার ফর এনিথিং! মারলে মারবে।" বলে সে রাগ করে সিগারেটের জ্বলন্ত টুকরো ছুঁড়ে ফেলল উঠোনে।

"কিন্তু আপনি একটু আগে বলছিলেন, আপনি বেঁচেবর্তে থাকতে চান।"

"কে না চায়?"

"আপনি বুদ্ধিমান, ঘনশ্যামবাবু! আসি। থ্যাংকস!"

কর্নেল বেরিয়ে গেলেন। দরজা বন্ধ করে ঘরে ফিরল ঘনশ্যাম। ওপরের জানলা দিয়ে দেখল বৃদ্ধ ভদ্রলোক ছাতিমগাছটার কাছে গিয়ে চোখে দূরবীন রেখে কী দেখছেন। পাগল নয় তো? মানসিক রোগী অনেক রকম আছে। এই ভদ্রলোকের ব্যাপার দেখে তা-ই মনে হচ্ছে। লোকের কাছে শুনে হুট করে তার বাড়িতে এসে ঢুকে পড়লেন! যেচে পড়ে নাক গলানো আর থ্রেটন করা। ঘনশ্যাম দেখল, কর্নেল বাঁধে গিয়ে উঠলেন। তারপর হঠাৎ চলার গতি বাড়িয়ে দিলেন। নির্ঘাত মানসিক রোগী। বুড়ো বয়েসে নানাধরনের উৎকট বাতিক অনেকের মাথায় চাগিয়ে ওঠে। ঠিক সময়ে চিকিৎসা না হলে বৃদ্ধ পাগল হয়ে যায়।...

কর্নেল বাইনোকুলারে দেখতে পেয়েছিলেন বাংলোর সামনে একটা জিপগাড়ি।

স্লুইস গেটের কাছে গিয়ে আবার দেখলেন, বারান্দায় ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর তাপস রুদ্র বসে আছেন।

মিনিট কুড়ি লাগল বাংলোয় পৌঁছুতে। তাপস রুদ্রকে ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। কর্নেলকে দেখে একটু হেসে বললেন, "ট্রেন লেট করছিল। পৌঁছে স্নানাহার সেরে নিতেও খানিকটা দেরি হলো। এসে শুনলাম, আপনি লাঞ্চের সময় ফিরবেন।"

কর্নেলকে একটা ভাঁজ করা কাগজ এগিয়ে দিলেন তাপসবাবু। কর্নেল কাগজটা খুলে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, "খুব ছোটাছুটি করেছেন দেখা যাচ্ছে। থ্যাংকস মিঃ রুদ্র।"

তাপসবাবু বললেন, "কিন্তু সত্যি বলতে কি, আমার নিজের কাছেও ইনফরমেশনগুলো ভাইটাল মনে হচ্ছে না। যেমন ধরুন, গার্গীদেবীর বাবা-মা দুর্গাপুরে বড় মেয়ের বাড়িতে চলে গেছেন। বাড়িতে নতুন ভাড়াটে। লোকাল থানা যথেষ্ট হেল্প করল। পাড়ার পুরনো বাসিন্দাদের কাছে গার্গীদের সম্পর্কে তেমন কোনও স্ক্যান্ডালের কথা জানা গেল না। বারাসাতে বিয়ের কথা অবশ্য অনেকে জানে। কিন্তু বারাসাতেও একই ব্যাপার। একটা ভাড়াবাড়িতে থাকতেন ঘনশ্যামবাবু। তাঁর স্ত্রীর নামে সেখানেও কোনও স্ক্যান্ডালের খবর নেই। ঘনশ্যামবাবুর দু'কাঠা জমি কেনা আছে ওখানে।"

কর্নেল কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে রেখে বললে, "ইনফরমেশনগুলো সত্যি ভাইটাল, মিঃ রুদ্র!"

"বলেন কী!"

"হ্যাঁ। আমার থিওরি আরও স্ট্রং হলো এবার। কর্নেল চোখ বুজে দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন। "মিঃ রুদ্র, আমার ধারণা, এবার খুনী নিজেই ধরা দেবে।"

তাপসবাবু অবাক হয়ে বললেন, "নিজে ধরা দেবে! কেন?"

"রিভলভারের শেষ গুলিটা—"

"প্লিজ কর্নেল সরকার! আমার কার্ড শো করেছি। আপনারটা এবার শো করুন।"

কর্নেল জঙ্গলের ভেতর টার্গেট প্র্যাকটিসের ঘটনা বর্ণনা করে ছটা গুলির টুকরো এবং একটা ফাঁপা গুলির খোল দেখালেন। জুতোর বাক্স'র ঘটনাও শোনালেন। তাপস রুদ্র বললেন, "আমি থানায় এখনও যাইনি। কাজেই এই এপিসোডটার কথা জানতুম না। যাই হোক, বোঝা যাচ্ছে কিলার তাহলে স্থানীয় লোক। কিন্তু সে নিজে ধরা দেবে কেন বলছেন?"

"শেষ গুলিটা সে নিজের জন্য রেখেছে।"

"ও মাই গড! স্যুইসাইড করবে নাকি?"

কর্নেল হাসলেন। "যে স্যুইসাউড করবে, সে পোস্টার সেঁটে ক খ গ ঘ হিট্‌লিস্ট সাজাতে যাবে কেন মিঃ রুদ্র? অপেক্ষা করুন। আমার মনে হচ্ছে, আজ সন্ধ্যার পর যে-কোনও সময় খুনী ধরা দেবে। কোয়ার্টারে ফিরে বিশ্রাম নিন আপনি। যথেষ্ট ছোটাছুটি করেছেন। সন্ধ্যা ছটা নাগাদ থানায় আমার জন্য অপেক্ষা করবেন।"

থানায় ও সি তারক মুখার্জির ঘরে কর্নেল, তাপসবাবু, রঞ্জিত মিত্র ছাড়াও আরও দু'জন অফিসার আড্ডা দেওয়ার মতো বসেছিলেন। আজ আবার ঘাটবাজারে বোমাবাজি হয়েছে। দশ-বারো জনকে গ্রেপ্তার করাও হয়েছে। কুখ্যাত কেলো ধরা পড়েছে। ঘোঁতন একটুর জন্য হাত ফস্কে পালিয়ে গেছে। গল্পে-গল্পে সন্ধ্যা সাতটা বেজে গেল। অনেক চা-কফি-স্ন্যাক্স খাওয়া হলো। তাপস রুদ্র বারবার কর্নেলের দিকে তাকাচ্ছিলেন। সাড়ে সাতটায় তিনি অধৈর্য হয়ে বললেন, "কর্নেল সরকার! আমার মনে হচ্ছে, আপনি—"

তাঁর কথায় বাধা পড়ল। কেউ আচমকা ঘরে ঢুকে ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠল, "স্যার! স্যার! আমাকে কে গুলি করেছিল! একটুর জন্য বেঁচে গেছি স্যার! জানালা দিয়ে গুলি ছুঁড়েছিল।"

রঞ্জিত মিত্র বললেন, "ঘনশ্যামবাবু! আপনাকে সাবধান করে দিয়েছিলুম?"

ঘনশ্যাম হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, "লোডশেডিং বলে জানালা খুলে রেখেছিলুম। হঠাৎ গুলির শব্দ! দেয়ালের একটা ছবিতে গুলি লেগেছে। আবছা দেখলুম স্যার, একটা বেঁটে রোগামতো কে পালিয়ে যাচ্ছে। পরনে গেঞ্জি আর প্যান্ট!"

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "চলুন ঘনশ্যামবাবু! গিয়ে ব্যাপারটা দেখি।"

ঘনশ্যাম কর্নেলকে দেখে অবাক হয়ে গেল। তারপর বলল, "আপনি তখন ঠিকই বলেছিলেন, আমি আপনাকে চিনতে পারিনি স্যার!"

"চলুন মিঃ রুদ্র! আসুন। মিঃ মুখার্জি! আর য়ু ইন্টারেস্টেড?"

"নিশ্চয়!" তারক মুখার্জি উঠলেন।

পাঁচ জন অফিসার আর জনা চারেক আর্মড কনস্টেবল বেরুলেন। পুলিশ ভ্যান আর একটা জিপে সবাই ব্যস্তভাবে উঠলেন। কর্নেল জিপের সামনে। পাশে ঘনশ্যামকে নিলেন। ঘনশ্যাম বারবার বলছিল, "আপনাকে চিনতে ভুল হয়েছিল স্যার! আপনি ঠিকই বলেছিলেন। তা ছাড়া দেখুন, আমার নামেও ঘ আছে।"

ঘনশ্যামের কোয়ার্টারের কাছাকাছি গিয়ে জিপ থামল। আশেপাশের কোয়ার্টারের বারান্দায় হেরিকেনের আলো আর ভিড় দেখা যাচ্ছিল। সবাই ঘনশ্যামের চ্যাঁচামেচি শুনেছে। কেউ কেউ গুলির শব্দও শুনেছে। কিন্তু বেরুতে সাহস পায়নি।

ঘরের তালা খুলল ঘনশ্যাম। ভেতরে একটা দম কমানো হেরিকেন জ্বলছিল। দম বাড়িয়ে দিল সে। বলল, "আমি এখানে দাঁড়িয়ে হেরিকেন ধরাচ্ছিলুম। হঠাৎ গুলি। ওই দেখুন, ছবি ভেঙে কাঁচ গুঁড়িয়ে গেছে!"

কর্নেল টর্চের আলোয় দেখে নিয়ে একটু হাসলেন। "আপনাদের বিয়ের পর ছবিটা তোলা হয়েছিল। তাই না ঘনশ্যামবাবু?"

"হ্যাঁ, স্যার!"

"আপনার স্ত্রীর দুর্ভাগ্য! গুলিটা এবার তার ছবির কপাল ফুঁড়ে দেয়ালে ঢুকেছে।" কর্নেল তার চোখে চোখ রেখে বললেন, "রিভলভারটি কি গঙ্গায় ফেলে দিলে ঘনশ্যামবাবু?"

ঘনশ্যাম তাকাল। "আজ্ঞে?"

"রিভলভারটা গঙ্গায় ফেলে দিয়েছেন। তাই না?" বলে কর্নেল তাপস রুদ্রের দিকে ঘুরলেন।

তাপস রুদ্র ঘনশ্যামের শার্টের কলার ধরে বললে, "পাঁচটা মার্ডারের জন্য আপনাকে গ্রেফতার করা হলো ঘনশ্যামবাবু!"

ঘনশ্যাম শক্ত হয়ে গেল। মেঝের দিকে দৃষ্টি। কর্নেল পকেট থেকে একটা চারমিনারের খালি প্যাকেট বের করে বললেন, "খুব সংসারী মানুষ আমাদের এই ঘনশ্যাম রায়। সিগারেটের প্যাকেটে বাজারের হিসেব লেখার অভ্যাস আছে। নিজের বাড়িতে নিজেই চুরি করে চমৎকার অ্যালিবাই সাজিয়েছিলেন। জঙ্গলে টার্গেট প্র্যাকটিস করার সময় অন্যমনস্কতার দরুন এই প্যাকেটটা ফেলে আসাই আপনার কাল হয়েছিল। ঘুড়ির সুতো ছেড়ে দেওয়ার মতো স্ত্রীকে গৌতমবাবুর সঙ্গে মিশতে দিয়ে আড়ালে লক্ষ্য রাখতেন। হ্যাঁ, অন্তত বিশ্বাসঘাতিনী স্ত্রীকে খুন করতেনই। দৈবাৎ রিভলভারটা হাতে এসে গিয়ে নিরাপদে খুন করার প্ল্যান ছকেছিলেন। ব্যাকগ্রাউন্ড চমৎকার। দুই গ্যাংয়ের বিবাদ খুনজখম। কাজেই পোস্টারে হিটলিস্ট মানিয়ে যায়। আপনার টার্গেট ছিলো গার্গীদেবী এবং গৌতম চৌধুরী। কিন্তু পুলিশকে ভুলপথে চালাতে নিরীহ বৃদ্ধ ক খ এবং ঘ-কে মারলেন। সকাল সওয়া দশটার ট্রেনের টিকিট কেটে ট্রেনে চাপলেন না। সারাদিন কোথাও গা-ঢাকা দিয়ে থেকে তিনটে খুন করে ট্রেনে চাপলেন রাত দশটার ডাউনে। অনবদ্য আপনার ঠাণ্ডা মাথার প্ল্যানিং। আমি জানতুম, শেষ গুলিটা খরচ করে নিজেকে একেবারে নির্দোষ প্রমাণ করতেই হবে আপনাকে। কারণ আপনার নামেও ঘ আছে। তাই মিঃ রুদ্রকে বলেছিলুম, খুনী নিজেই ধরা দেবে।"

এইসময় বিদ্যুৎ ফিরে এল। দু'জন কনস্টেবল হ্যান্ডকাপ পরিয়ে দিল ঘনশ্যামের হাতে।...

স্টোনম্যান

ধারিয়া ফলসের মাথায় কয়েকটা পাথরের ওপর ওরা বসেছিল। দীপিতা, বিনীতা, রোমেনা এই তিন যুবতী। কিংশুক, রাতুল, সুপর্ণ এই তিন যুবক। আর ছিলেন তাদের কমন মামাবাবু চন্দ্রকান্ত। এই প্রমোদভ্রমণে তিনিই তাদের গার্জেন।

হুল্লোড়বাজ আমুদে মানুষ চন্দ্রকান্ত। বয়স ষাটের কাছাকাছি। কিন্তু প্রাণচাঞ্চল্যে এই যুবক-যুবতীদের চেয়ে কোনও অংশে কম নন।

'ধারিয়া ফলস্' নামের জলপ্রপাতটি তত কিছু বিখ্যাত নয়। ধারিয়ার ধারা ক্ষীণ বলা চলে। কিন্তু সত্তর ফুট ওপর থেকে নীচের পাথরে আছড়ে পড়ার সময় সেই ক্ষীণতা গুঁড়ো-গুঁড়ো ছড়িয়ে শেষবেলার রোদে বর্ণাঢ্য রামধনু এঁকেছে। দুধারে শরৎকালের সবুজের ঘোরলাগা বৃক্ষলতাগুল্ম স্তরে স্তরে সাজানো। তার ওপর কোথাও কোথাও ফুল ফুটে অমর্ত্যমায়া ছড়িয়ে রেখেছে।

রোমেনা পাথরের ফাঁকে গজিয়ে ওঠা ঝোপের দিকে এগিয়ে গেল হঠাৎ। সাদা ফুলের ঝাঁক ঝোপটার মাথায়। কেউ তাকে লক্ষ্য না করার কারণ চন্দ্রকান্তের একটা বাঘ শিকারের রোমাঞ্চকর গল্প। চন্দ্রকান্ত রাঁচি জেলার নামকরা শিকারি ছিলেন। তাঁর গল্পের বাঘটা ছিল এই ধারিয়া এলাকার সাংঘাতিক এক মানুষখেকো।

রোমেনা কয়েকটা ফুল তুলে চুলে গুঁজল। তারপর ফুলপরী হওয়ার আকস্মিক নেশার মতোই তাকে পেয়ে বসল হারিয়ে যাওয়ার নেশা।

সে পাথরগুলোর আড়ালে গিয়ে বসে পড়ল। নিঝুম পরিবেশে শুধু জলপ্রপাতের শব্দ ছাপিয়ে চন্দ্রকান্তের চড়া গলায় গল্প বলার শব্দ ভেসে আসছিল। রোমেনা মুখ টিপে হাসছিল। যখন ওরা দেখবে রোমেনা নেই, ওরা নিশ্চয় ভাববে রোমেনাকে বাঘে তুলে নিয়ে গেছে! কী দারুণ হইচই না হবে!

চন্দ্রকান্ত বলছিলেন, "এলাকায় আর বাঘ নেই। তবে কিছু বলা যায় না।"

রোমেনা ভাবছিল. আচ্ছা, সত্যি যদি তাকে এখন বাঘে তুলে নিয়ে যায়, সুপর্ণ কী করবে? সুপর্ণের প্রতিক্রিয়া যাচাই করার এমন সুযোগ রোমেনা আর পাবে না। দেখা যাক না সুপর্ণ কী করে। রাতুল, কিংশুক, দীপিতা, বিনীতা সবাই জানে রোমেনার সঙ্গে সুপর্ণর একটা গোপন সম্পর্ক আছে। চন্দ্রকান্তও

টের পেয়েছেন। উনি খোলা মনের মানুষ। চলাবলায় নাগরিকতার পালিশ কম। হাসতে হাসতে বলেছিলেন, "কলকাতা যাওয়া হয়নি অনেকদিন। এবার যাওয়ার একটা চান্স পাব মনে হচ্ছে। সুপু আর রুমুর ঘটকালি না হয় আমিই করলুম।

সবাই হেসে অস্থির। সুপর্ণ ও রোমেনাও। দীপিতা বলছিল, "ভেতরে-ভেতরে রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেছে মামাবাবু। আপনার ঘটকালির নো হোপ নো চান্স! তবে ইনফরম্যালি এখনই ওদের মালাবদল ঘটিয়ে দিতে পারেন।"

চন্দ্রকান্ত বলেছিলেন, "ওক্কে! ওক্কে! চলো, আজই বিকেলে ধারিয়া ফলসে গিয়ে বনদেবীকে সাক্ষী রেখে বুনো ফুলের মালা ফালা গেঁথে—হুঁ, তোমরা ঝিম চাক ঝিম চাক নাচবে। ব্রেক ড্যান্স!"

ধারিয়া ফলসের দিকটা পশ্চিম। ওদিকে অনেকদূর পাহাড় নেই। জঙ্গল আছে। তাই বিকেলের আলো এসে সরাসরি পড়ছে প্রপাতের ওপর। কিন্তু উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্বে টিলাপাহাড় উঁচু-নিচু হয়ে ঢেউয়ের মতো চলে গেছে অনেকদূর। উত্তর দিকটায় খোয়া বিছানো রাস্তা। সেখানে সাদা অ্যাম্বাসাডার দাঁড়িয়ে আছে। গাড়িটা চন্দ্রকান্তের।

চন্দ্রকান্তের গল্পটা হঠাৎ থেমে গেল। "আরে! রুমুটা গেল কোথা?" বলে হাঁক দিলেন, "রুমু! রুমু! বাঘ আছে। চলে এসো!"

রাতুল বলল, "সুপু! খুঁজে আন ওকে। রুমু তোরই লায়েবিলিটি কিন্তু!"

সুপর্ণ গম্ভীর হয়ে গেল। "ওই সব ফানি কথাবার্তা বন্ধ কর তো তোরা।"

"যা বাবা!" দীপিতা বলল। "ফানি ব্যাপারটা এখানেই তো অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা! সুপুদা! ডোন্ট ফরগেট দ্যাট। মামাবাবু দেখুন সুপু কেমন তুম্বো মুখে তাকাচ্ছে!"

চন্দ্রকান্ত আবার ডাকলেন, "রুমু! রুমু! চলে এস, জঙ্গল জায়গা। পোকামাকড় থাকবে।"

বিনীতা, দীপিতার ছোট বোন। সে হাসতে হাসতে বলল, "ভূত আছে বলুন মামাবাবু! রুমু ভূতকে ভীষণ ভয় পায়।"

কিংশুক উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "সুপু! তোর হয়ে আমি খুঁজে নিয়ে আসছি। হারিয়ে গেলে আমি বা রাতুল পস্তাব না। তুই পস্তাবি!"

সুপর্ণ বলল, "সব কিছুর একটা সীমা আছে। তোরা বড্ড বাড়াবাড়ি করছিস!"

কিংশুক লম্বা পা ফেলে সেই ঝোপটার কাছে গেল। রোমেনাকে দেখতে পেল। রোমেনা সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁটে আঙুল রেখে চুপ করতে ইশারা করল ওকে। কিংশুক এক লাফে পাথরে উঠে কপট গাম্ভীর্যে ডাকল, "রুমু! ফিরে এসো। সুপু তোমার জন্য কাঁদছে!"

রাতুল কিন্তু লক্ষ্য রেখেছিল কিংশুকের দিকে। সে একটা কিছু আঁচ করে উঠে গেল ওর কাছে। তারপর রোমেনাকে দেখতে পেল। রাতুলও কপট গাম্ভীর্যে ডাকল, "রোমেনা! তুমি যেখানে থাকো, ফিরে এস। সুপর্ণ শয্যাশায়ী।

চন্দ্রকান্ত বুদ্ধিমান মানুষ। হন্তদন্ত হয়ে এসে রোমেনার দিকে আঙুল তুলে বললেন, "পাষাণী অহল্যা হয়ে পড়ে আছিস দেখছি। রামচন্দ্র তো তুম্বো মুখে বসে আছে। কিন্তু ব্যাপারটা হল, পাথরের ফাটলে শঙ্খচূড় সাপ থাকতে পারে জানিস?"

রোমেনা তক্ষুণি লাফ দিয়ে উঠে সরে এল। "যান্! খালি মিথ্যা ভয় দেখাচ্ছেন।" বলে সে হেসে ফেলল।

দীপিতা বলল, "রুমু! সুপু কী স্বার্থপর তাহলে বোঝ। চুপচাপ বসে আছে।"

বিনীতা বলল, "সুপুদা নিশ্চয় দেখেছিল রুমুকে ওখানে যেতে।"

কিংশুক চলে এল। বলল, "মোটে সাড়ে চারটে বাজে। চুপচাপ বসে গেঁজানোর মানে হয় না। আয় সুপু, মাউন্টেনিয়ারিং করি। ফলসের পাশ দিয়ে পাথর বেয়ে নীচে নামি আয়। রাতুল! কাম অন্।"

রাতুল বলল,"নাহ্। বরং চোর-পুলিশ খেলা যাক। রুমু আইডিয়াটা আমার মাথায় এনে দিয়েছে।"

রোমেনা বলল, "হাইড অ্যান্ড সিক গেম, রাতুলদা। পাঁচ মিনিটের মধ্যে খুঁজে বের কর না করতে পারলে ফাইন। ফাইনের রেট ঠিক করে দিন মামাবাবু!"

চন্দ্রকান্ত বললেন, "হাইড অ্যান্ড সিক তো খেলবে! জঙ্গল জায়গা।"

দীপিতা উঠে দাঁড়াল। বলল, "অসাধারণ খেলা হবে। মামাবাবু, দেখেই বুঝেছি স্রেফ নিরিমিষ জঙ্গল। ফাইনের রেট ঠিক করে দিন!"

চন্দ্রকান্ত একটু দ্বিধা দেখিয়ে বললেন, "কিন্তু—আচ্ছা, বেশিক্ষণ নয়। তিনবার খেলবে। পাঁচ মিনিটে চোর খুঁজে না পেলে পাঁচ টাকা ফাইন প্রত্যেকের। আর চোর খুঁজে পেলে চোরের ফাইনও পাঁচ টাকা।"

রাতুল বলল, "আমি চোর হই।"

রোমেনা বলল, "না আমি।"

চন্দ্রকান্ত বললেন, "টস করি। আর কেউ চোর হতে চাও?"

রাতুল ও রোমেনা ছাড়া সবাই 'পুলিশ' হতে চায়। চন্দ্রকান্ত টস করলেন। রাতুল চোর হল। তারপর শুরু হল এক অদ্ভুত লুকোচুরি খেলা।

রাতুল হনহন করে এগিয়ে একটা পাথরের আড়ালে চলে গেল। চন্দ্রকান্ত বিচারক। পুলিশ হল কিংশুক, সুপর্ণ, দীপিতা, বিনীতা ও রোমেনা। চন্দ্রকান্ত ঘড়ি দেখে পাঁচ মিনিট পরে ঘোষণা করলেন, "সিক অ্যান্ড ক্যাচ হিম!"

pathagar.net

'পাঁচ পুলিশ' এদিকে-ওদিকে চোর খুঁজতে ছুটে গেল।

ধারিয়া নদী ও প্রপাত পশ্চিম দিকে। ছোট্ট নদী এবং তার বুকে অজস্র পাথর পড়ে আছে। পাথরগুলো পিচ্ছিল। কাজেই নদী পেরিয়ে ওপারের ঘন জঙ্গলে রাতুলের লুকিয়ে থাকার সম্ভাবনা নেই। বাকি তিন দিকে উঁচু-নিচু টিলা। সমতলে নানা সাইজের পাথর আর ঘন জঙ্গল। পূর্বের জঙ্গল ও পাহাড় ভেদ করে একফালি খোয়া বিছানো রাস্তা প্রপাতের শ'দুই গজ দূরে বাঁক নিয়ে চলে গেছে দক্ষিণে। রোমেনা গেল রাস্তাটার দিকে। সে ভেবেছিল, রাতুল গাড়ির আড়ালে গিয়ে লুকিয়েছে।

দীপিতা গেল উত্তরে ঢালু টিলার দিকে। টিলাটা শালবন এবং গুল্মলতায় ঢাকা। গুল্মলতাগুলো পাথরের চাঁই ঢেকে সবুজ স্তূপের মতো দেখাচ্ছে। সে ভেবেছিল, এই সব স্তূপের আড়ালে রাতুল লুকিয়ে আছে।

বিনীতা গেল উত্তর-পূর্বে দুই টিলার মাঝখানে শুকনো গিরিখাতের দিকে।

কিংশুক উত্তর-পশ্চিমে নদীর ধারে ঝোপঝাড় খুঁজতে গেল।

সুপর্ণের এই খেলার ইচ্ছে তত ছিল না। সে নেহাত দায়সারাভাবে দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রপাতের কিনারা ধরে এগিয়ে গিয়ে একটা পাথরের ওপর উঠল। অনিচ্ছার দৃষ্টিতে 'চোর' খুঁজতে থাকল।

সুপর্ণের মনে গত রাত থেকে একটা দ্বিধা এসে ঢুকেছে। রোমেনার সঙ্গে তার অনেক দিনের সম্পর্ক ঠিকই। কিন্তু রোমেনাকে সে কখনই বিয়ে করার কথা ভাবেনি। রোমেনাও ভেবেছে কি না সে টের পায় না। একথা ঠিক, সে একবার রোমেনাকে চুমু খেয়েছিল। রোমেনা তার চুমুতে সাড়া দিয়েছিল। কিন্তু আজীবন সঙ্গিনী হিসেবে সুপর্ণ তাকে কল্পনা করতে পারে না। রোমেনার মধ্যে কী একটা দূরত্ব আছে বলে তার ধারণা। রোমেনা যেন একটা অদ্ভুত উঁচু বাড়ির মতো, যে-বাড়ির উঁচুতলায় ওঠার কোন সিঁড়ি নেই। সেন্ট পলস কলেজে পড়ার সময় দুজনের মধ্যে ওই সম্পর্কটা গড়ে উঠেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে সেটা ঘনিষ্ঠতর হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে সুপর্ণ একটা কোম্পানির পারচেজ অফিসার হয়েছে এবং রোমেনা হয়েছে একটা খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন বিভাগের সহকারী ম্যানেজার। দুজনেই মোটামুটি সচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। সুপর্ণের বাবা-মা বেঁচে নেই। দাদার সঙ্গে থাকে। রোমেনার বাবা-মা বেঁচে আছেন। তবে রোমেনার বাবা রিটায়ার্ড আইনজীবী এবং মা চিরগৃহিণী। তাঁদের একমাত্র সন্তান রোমেনা।

গত রাতে দীপিতা হঠাৎ সুপর্ণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছে। চন্দ্রকান্তের এক বোনের দুই মেয়ে দীপিতা আর বিনীতা। চন্দ্রকান্তের বাড়ির বিশাল লনে কিছু উঁচু বিদেশী গাছ আছে। সুপর্ণ মাঝে মাঝে কেন যেন বিষণ্ণ বোধ করে। সে জ্যোৎস্নায় একটা গাছের ছায়ায় একা দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ দীপিতা পেছন থেকে

পা টিপে পা টিপে এগিয়ে তার দুচোখ চেপে ধরেছিল। নিছক কৌতুক? কিন্তু দীপিতার মধ্যে কী একটা টান অনুভব করেছিল সুপর্ণ। দীপিতা যেন রোমেনার কাছ থেকে তাকে কেড়ে নিতে চাইছে!

নাকি মনের ভুল? দীপিতা অবশ্য একটু গায়েপড়া স্বভাবের মেয়ে।

কিংশুক ও দীপিতার মধ্যে আবেগময় সম্পর্ক ছিল বলে সুপর্ণের ধারণা। কিংশুককে আজ সকাল থেকে যেন এড়িয়ে থাকতে চেষ্টা করছে দীপিতা। কিংশুক বিনীতার সঙ্গে বেশি কথা বলছে। কিছু কি ঘটেছে?

এদিকে রাতুল চন্দ্রকান্তের দূর সম্পর্কের এক বোনের ছেলে এবং সেই হিসেবে চন্দ্রকান্তের ভাগনে। রাতুল কাল থেকে রোমেনার সঙ্গে যেন ভাব জমানোর চেষ্টা করছে। অথচ তাতে সুপর্ণের আর ঈর্ষা হচ্ছে না। নিজের এই আকস্মিক পরিবর্তনে সুপর্ণ নিজেই বিস্মিত।

সে পাথরে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরাল। ঠিক এই সময় উত্তরে রোমেনার চিৎকার শোনা গেল, "পেয়েছি! পেয়েছি! রেডহ্যান্ডেড কট।"

সুপর্ণ দেখল, রাতুলের শার্টের কলার ধরে নিয়ে আসছে রোমেনা। দুজনের মুখে উজ্জ্বল হাসি। চন্দ্রকান্ত ঘোষণা করলেন, "রাতুলের পাঁচ টাকা ফাইন!"

সবাই চন্দ্রকান্তের কাছে দৌড়ে গেল। এবার রোমেনা আর কিংশুক চোর হতে চায়। কিন্তু টসে জিতল কিংশুক। রোমেনা বাঁকা মুখে বলল, "ভ্যাট। আমার লাকটাই বাজে।"

কিংশুক দৌড়ে গিয়ে উত্তর-পূর্বের টিলার জঙ্গলে গা ঢাকা দিল। পাঁচ মিনিট লুকোনোর সময় চন্দ্রকান্ত আগের মতো হাঁকলেন, "হাইড অ্যান্ড সিক!" রোমেনা, দীপিতা, বিনীতা, সুপর্ণ ও রাতুল খুঁজতে দৌড়ুল।

রাতুল দক্ষিণ-পশ্চিমে কিছু দূর এগিয়ে একটা গাছের তলায় দাঁড়াল। একটা আশ্চর্য শিহরন খেলে গেল তার শরীরে। রোমেনা একটা ঝোপের আড়ালে গুঁড়ি মেরে এগোচ্ছিল। তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল রাতুল। তারপর কী এক হঠকারিতায় রোমেনার মুখটা দুহাতে ধরে সে চুমু খেয়ে ফেলল। আশ্চর্য ব্যাপার! রোমেনা সাড়া দিল। মাত্র আধ মিনিট। অথচ কী দীর্ঘ সময় ধরে যেন ওই চুম্বন। রোমেনার শরীরের সুঘ্রাণ এখনও রাতুল টের পাচ্ছে। শরীর কাঁপছে।

দীপিতার চিৎকার শোনা গেল গাড়িটার কাছে। "পেয়েছি! পেয়েছি!"

দীপিতা কিংশুকের হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে এল চন্দ্রকান্তের কাছে। চন্দ্রকান্ত ঘোষণা করলেন, "পাঁচ টাকা ফাইন কিংশুকের।"

এবার শেষ খেলা। সুপর্ণ 'চোর' হতে চাইল। সবাই কিছুটা ক্লান্ত। রোমেনা এবার 'চোর' হতে চাইল না। একটু অবাক হল সুপর্ণ। কিংশুক বলল, "চোর হওয়ার চাইতে পুলিশ হওয়াই ভাল। অসাধারণ অ্যাডভেঞ্চার হয়।"

pathagar.net

রোমেনা সাড়া দিয়ে বলল, "ঠিক বলেছ কিংশুকদা। ডিসকভারের আনন্দ অনেক বেশি।"

আগের মতো খেলা শুরু হল। সুপর্ণ দক্ষিণে ছুটে গিয়ে অদৃশ্য হল। পাঁচ মিনিট পরে চন্দ্রকান্ত ঘোষণা করলেন, "হাইড অ্যান্ড সিক!" সবাই দৌড়ে গিয়ে ছড়িয়ে পড়ল জঙ্গল আর পাথরের আড়ালে।

দিনের আলো কমে আসছে। জঙ্গলে পাখিদের ডাক শোনা যাচ্ছে এবার। একটা হাওয়া উঠেছে এতক্ষণে। বৃক্ষলতাগুল্মে আলোড়ন শুরু হয়েছে। প্রপাতের শব্দ অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

পাঁচ মিনিট পর চন্দ্রকান্তের চিৎকার শোনা গেল, "কাম ব্যাক! কাম ব্যাক অল দ্য পোলিস ফোর্স। তোমরা হেরে গেছো।"

একে একে এল রাতুল, কিংশুক, দীপিতা, বিনীতা ও রোমেনা। প্রত্যেকটি মুখে ব্যর্থতার কাঁচুমাচু হাসি। চন্দ্রকান্ত হাঁক দিলেন, "সুপু! কাম ব্যাক! তুমি খেলা জিতেছ!"

দীপিতা বলল, "রুমু! রেডি হও। বিজয়ীকে বরমাল্য দিয়ে রিসিভ করবে তুমি!" তারপর সে ঝোপটার কাছে গিয়ে উৎসাহে সাদা বুনো ফুল ছিঁড়তে গেল।

pathagar.net

কিন্তু সুপর্ণের সাড়া নেই।

চন্দ্রকান্ত চিৎকার করে ডাকলেন, "কী হচ্ছে সুপু, এবার আমরা বাড়ি ফিরব। কাম ব্যাক!"

কোনও সাড়া এল না।

রোমেনা ভুরু কুঁচকে বলল, "কোনও মানে হয়?"

দীপিতা বলল, "নিশ্চয় সুপুদা গাড়িতে বসে আছে। চলুন মামাবাবু, গাড়ির কাছে যাই।"

সবাই গাড়ির কাছে গেল। সেখানে সুপর্ণ নেই। এতক্ষণে মুখগুলি একটু গম্ভীর হল। রোমেনা খাপ্পা হয়ে বলল, "ও বরাবর এমনি। সবটাতে বাড়াবাড়ি করা চাই।"

বিনীতা আস্তে বলল, "সুপুদাকে রাস্তায় পেয়ে যাব। নিশ্চয় রাস্তার ধারে কোথাও বসে আছে।"

চন্দ্রকান্ত গাড়িতে উঠে বললেন, "এস তো দেখি।" সবাই গাড়িতে উঠে বসল। কিংশুক, বিনীতা, দীপিতা ব্যাক সিটে। সামনে রাতুল, রোমেনা এবং চালক চন্দ্রকান্ত। শ' চারেক গজ এগিয়ে রাস্তার বাঁ পাশে আদিবাসীদের একটা থান। পাথরের সমতল চৌকো ও চওড়া বেদি। তার ওপর একগাদা ছাই। নীচে কবেকার পশুপাখি বলির রক্ত শুকিয়ে কালচে হয়ে আছে।

গাড়ি থামিয়ে চন্দ্রকান্ত বললেন, "আমি থানটা একবার দেখে আসি। তোমরা বসো।"

চন্দ্রকান্ত জঙ্গলের একফালি পায়ে চলা রাস্তা ধরে থানে গেলেন। গাড়ি থেকে রোমেনা বেরুল। থানটা দেখা যাচ্ছে এখান থেকে।

হঠাৎ চন্দ্রকান্ত থানের উল্টোদিকে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। তারপর চেঁচিয়ে উঠলেন, "কিংশুক! রাতুল! তোমরা এস তো শিগগির!"

কিংশুক ও রাতুল ছুটে গেল। তিন যুবতীও তাদের পিছনে হন্তদন্ত ছুটে গেল।

থানের উল্টোদিকে ঝোপের ধারে উপুড় হয়ে পড়ে আছে সুপর্ণ। মাথাটা রক্তাক্ত এবং থ্যাঁতলানো। পাশে এক টুকরো রক্তমাখা কালো পাথর পড়ে আছে। কেউ ওই পাথরটা দিয়ে সুপর্ণের মাথাটা তেঁতলে দিয়েছে। তিন যুবতীই আর্তনাদ করে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

চন্দ্রকান্ত সুপর্ণকে চিত করে শোয়ালেন। দুটি চোখ বিস্ফারিত। মুখ রক্তে লাল হয়ে আছে। চন্দ্রকান্ত পরীক্ষা করে দেখে আস্তে বললেন, "হি ইজ ডেড। বাট হু ডিড ইট!"

কিংশুক চেঁচিয়ে উঠল, "স্টোনম্যান! স্টোনম্যান!"

রাতুলও শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, "স্টোনম্যান!"

চন্দ্রকান্ত ব্যস্তভাবে বললেন, "তোমরা ধরো। গাড়িতে নিয়ে যাই।"

সেই সময় সামনের টিলা থেকে ঝোপ ঠেলে বেরিয়ে এলেন এক টুরিস্ট বেশী ভদ্রলোক। মুখে সাদা দাড়ি। মাথায় টুপি। গলায় ঝুলন্ত বাইনোকুলার ও ক্যামেরা। গম্ভীর স্বরে বললেন, "জাস্ট আ মিনিট।"

॥ দুই ॥

চন্দ্রকান্ত আগন্তুককে দেখে ভাঙা গলায় বলে উঠলেন, "কর্নেল সরকার আপনি এখানে?"

কর্নেল নীলাদ্রি সরকার থানের পিছনে ঢালু হয়ে উঠে যাওয়া কতকটা ত্রিভুজাকৃতি টিলার মাথায় দাঁড়িয়ে বাইনোকুলারে একটা পাখি খুঁজছিলেন। সেই সময় ধারিয়া ফল্‌সে দলটি তাঁর চোখে পড়েছিল। চন্দ্রকান্ত রায় তার পুরনো বন্ধু। রাঁচি এলাকায় এলে তাঁর বাড়িতেই উঠতেন। এবার উঠেছিলেন গালা গবেষণাকেন্দ্রের সরকারি গেস্ট হাউসে। অভ্যাসমতো বিকেলে বেড়াতে এসে প্রায় চার কি মি পাহাড়-জঙ্গল ভেঙে নাকবরাবর হেঁটে এই টিলার কাছে আসতেই একটা বিরল প্রজাতির পাখির ডাক শুনতে পেয়েছিলেন। পাখিটির ছবি তোলার চেষ্টায় ব্যস্ত থাকায় প্রপাতের মাথায় চন্দ্রকান্ত এবং এই যুবকযুবতীদের দিকে তত লক্ষ্য রাখেননি। একটু পরে চন্দ্রকান্তের গাড়ি আসতে দেখে কর্নেল

টিলা থেকে নেমে আসছিলেন। তারপর হঠাৎ আদিবাসীদের থানের দিকে চোখ পড়ে চমকে উঠেছিলেন।

চন্দ্রকান্তের কথার জবাবে কর্নেল বললেন, "হাউ ইট হ্যাপন্ড মিঃ রায়?"

চন্দ্রকান্ত বললেন, "চলুন। যেতে যেতে বলছি। এখনই একে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার।"

"হি ইজ স্টোনডেড মিঃ রায়!" কর্নেল সুপর্ণকে পরীক্ষা করে দেখে বললেন। "হাসপাতালে অবশ্য নিয়ে যেতে হবে। তবে পুলিশকে আগে খবর দেওয়া দরকার। বডি এখানেই থাক। পুলিশ এসে নিয়ে যাক। তা না হলে আপনাদের ঝামেলায় পড়ার চান্স আছে। মিঃ রায়! এঁরা থাকুন এখানে। আপনি এখনই গাড়ি নিয়ে থানায় খবর দিন।"

চন্দ্রকান্ত তখনই গাড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন।

কিংশুক বলল, "এ নিশ্চয় স্টোনম্যানের কাজ।"

দীপিতা কান্না-জড়ানো গলায় বলল, "কলকাতা থেকে স্টোনম্যান এখানে এসেছে আই ডোন্ট বিলিভ দ্যাট।"

রাতুল কর্নেলের দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি মামাবাবুর পরিচিত। কে আপনি জানতে পারি?"

"আমার নাম কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। আপনাদের মামাবাবু আমার বন্ধু।"

রোমেনা একটা পাথরে বসে দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছিল। দীপিতা তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল।

"এমন সাংঘাতিক ঘটনা কীভাবে ঘটল বুঝতে পারছি না!" কিংশুক একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, "তবে এটা ঠিক, কলকাতার স্টোনম্যানের সঙ্গে অদ্ভুত মিল দেখছি। এই দেখুন, পাথরটার ওজন অন্তত পনের-কুড়ি কেজির কম নয়।"

কর্নেল একটা চুরুট ধরিয়ে বললেন, "আগে বলুন ইনি কে? তারপর আপনাদের পরিচয় দিন প্লিজ!"

দীপিতা কান্না দমন করে সংক্ষেপে সব কথা বলল। তারা পরস্পর বন্ধু। কলকাতা থেকে তারা গতকাল মামাবাবু চন্দ্রকান্তের বাড়িতে বেড়াতে এসেছে। তারপর ধারিয়া ফল্‌সে এসে চোরপুলিশ বা হাইড অ্যান্ড সিক গেম খেলার থার্ড রাউন্ডে এই সাংঘাতিক ঘটনা ঘটেছে।

রাতুল শ্বাস ছেড়ে বলল, "আমার ধারণা আদিবাসী কোনও উইচ আচমকা পেছন থেকে সুপর্ণের মাথায় এই পাথরটা ছুঁড়ে মেরেছে। সুপর্ণ উপুড় হয়ে পড়ে ছিল। মামাবাবু ওকে চিত করেছেন। তার মানে পা টিপে টিপে এসে কোনও আদিবাসী ওঝা ওর মাথায় পাথরটা মেরে সেই রক্ত—মাই গড! ওই দেখুন থানের বেদিতে টাটকা রক্ত মাখানো!"

pathagar.net

কর্নেল দেখে এসে বললন, "হ্যাঁ। মার্ডারার রক্ত মাখিয়েছে বটে!" তারপর একটু হাসলেনও। "রাতুলবাবু আর কিংশুকবাবুর হাতের রক্ত দেখছি। আপনারা সুপর্ণবাবুর বডি তুলতে হাত লাগিয়েছিলেন বোঝা যাচ্ছে!"

কিংশুক বলল, "হোয়াট ডু য়ু মিন বাই দ্যাট!"

রাতুলও বলল, "ইওর রিমার্ক হিন্টস সামথিং অড কর্নেল সরকার!"

"ও নো নো মাইডিয়ার ইয়ং মেন!" কর্নল বললেন। আপনারা দুজনেই বডি ওঠাতে সাহায্য করেছিলেন, সেটাই বলছি।"

রোমেনা ততক্ষণে একটু শান্ত হয়েছে। সে উঠে দাঁড়িয়ে ধরাগলায় বলল, "কর্নেল সরকার! আমি যদি ভুল না করি, আপনি কি সেই গোয়েন্দা কর্নেল—দ্য ফেমাস প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর? আপনার কথা কাগজে পড়েছি।"

কর্নেল জিভ কেটে সাদা দাড়ি থেকে চুরুটের ছাই ঝেড়ে বললেন, "নাহ্। আমি গোয়েন্দা নই। আমি একজন নেচারিস্ট। প্রকৃতিপ্রেমিক মাত্র। প্রকৃতির রহস্যভেদে আমার আগ্রহ আছে। তবে যেহেতু মানুষও প্রকৃতির অংশ, তাই মানুষের মধ্যেও প্রাকৃতিক রহস্য আছে। মাঝে মাঝে সেই রহস্য ভেদ করতে নাক গলাই এই যা।"

রোমেনা বলল, "আমার অনুরোধ কর্নেল সরকার! সুপর্ণকে কেন মরতে হল—"

রাতুল বাধা দিয়ে বলল, "রুমু! তুমি কী বলতে চাও?"

রোমেনা জবাব দিল না। কিংশুক বলল, "মাথা খারাপ কোরো না কেউ। ব্যাপারটা ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করো।"

বিনীতা বলল, রাতুলদা! তুমিই চোর-পুলিশ খেলার প্রোপোজ্যাল দিয়েছিলে। না—না। আমি খারাপ কিছু মিন করছি না। বলতে চাইছি, এই খেলাই সুপুদার মৃত্যুর কারণ।"

রাতুল খাপ্পা হয়ে বলল, "আমি কেমন করে জানব, কে সুপুকে মার্ডার করবে? আমিও চোর হয়েছিলুম। আমাকেও তো মার্ডার করতে পারত মার্ডারার। পারেনি। কারণ আমি এত দূরে থানের কাছে লুকোতে আসিনি।"

রোমেনা বলল, কর্নেল সরকার! মার্ডার কেসে প্রত্যেককে সন্দেহ করার নিয়ম। য়ু আস্ক্ কোশ্চেনস টু এভরিবডি!"

কর্নেল আস্তে বললেন, "পুলিশ আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত মিস রোমেনা—"

"রোমেনা চৌধুরি!"

"থ্যাংকস! তো আপাতত একটা প্রশ্ন শুধু করতে চাই। একে একে বলুন। আগে বলুন কিংশুকবাবু! আপনিও চোর হয়েছিলেন। এত দূর পর্যন্ত লুকোতে এসেছিলেন কি?"

pathagar.net

কিশুক বলল, "নাহ্।"

"রাতুলবাবু?"

"নাহ্।"

"কিংশুকবাবু পুলিশ হওয়ার সময় কি এর কাছাকাছি এসেছিলেন?"

"নাহ্।"

"রাতুলবাবু, আপনি?"

'নাহ্।"

"দীপিতা?"

"না।"

"বিনীতা?"

"না।"

"রোমেনা?"

রোমেনা একটু চুপ করে থেকে বলল, যে পর্যন্ত এসেছিলুম, সেখান থেকে এই থানটা দেখা যায়।"

"থানের কথা বলেছিলেন কাউকে?"

রোমেনা আবার একটু চুপ করে থেকে বলল, "মনে পড়ছে না। তবে আসার পথে মামাবাবু এই থানটার কথা বলেছিলেন।"

দীপিতা বলল, "হ্যাঁ। বলেছিলেন।"

রাতুল বলল, "আমি শুনিনি। খেয়াল করিনি।"

কিংশুক বলল, "কী জানি! আমি সুপর্ণের সঙ্গে ফিল্ম নিয়ে আলোচনা করছিলুম। ডক্যু ম্যুভি তোলার নেশা আছে আমার।"

বিনীতা বলল, "আমি মামাবাবুর কথা শুনিনি। ফিল্ম নিয়ে ওদের আলোচনা শুনছিলুম। তবে আমি জানতুম, ফল্‌সের এদিকে আদিবাসীদের থান আছে। জেলা গেজেটিয়ারে পড়েছি, মাঝে মাঝে নাকি নরবলি দেওয়া হত এক সময়।"

"আপনি কি ছাত্রী এখনও?"

"হ্যাঁ। অ্যানথ্রোপলজির ছাত্রী।"

"দীপিতা কি ছাত্রী?"

"দীপিতা বলল, "নাহ্। আপনি স্বচ্ছন্দে আমাদের তুমি বলতে পারেন।"

কিংশুক বলল, "অবশ্যই পারেন।"

রাতুল সিগারেট ধরাল। বলল, "আমিও আপত্তি করব না। কিন্তু এখানে থাকতে আমার অসহ্য লাগছে। আমি রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছি।"

সে চলে গেল রাস্তার দিকে। কিংশুক বলল, অসহ্য আমারও লাগছে। বাট আই মাস্ট ফেস ইট!"

রোমেনা বলল, "হ্যাঁ—এটা একটা চ্যালেঞ্জ।"

দীপিতা কেঁদে উঠল। "কিন্তু আমি পারছি না। গা ঘুলোচ্ছে।" বলে সে রাতুলের মতো চলে গেল রাস্তার দিকে।

বিনীতা কান্না চেপে বলল, "ইটস আ রিচুয়াল কিলিং। নৃবিজ্ঞানে এমন অনেক কেস স্টাডি করেছি। আদিবাসীদের মধ্যে এই কাস্টম আছে কোথাও-কোথাও! আমার ধারণা, রাতুলদা ইজ কারেক্ট। ওদের কোনও ওঝা এখানে ওত পেতেছিল।"

রোমেনা বলল, "অ্যাবসার্ড! এই পাথরটা মেয়েরাও আচমকা কারও মাথায় এই টিলার ওপর থেকে ফেললে যত শক্তিমান লোক হোক, মারা পড়তে পারে। আমাদের যে-কেউই এটা করতে পারে।"

কিংশুক হাসবার চেষ্টা করে বলল, "হোয়াটস দ্য মোটিভ? ভুলে যেও না, সব কিলিংয়ের একটা মোটিভ থাকে।"

রোমেনা গলার ভেতর বলল, "মোটিভ একটা থাকা কি অসম্ভব?"

"কী মোটিভ?"

"কিংশুকদা, আই মাস্ট বি ফ্র্যাংক নাও।" রোমেনা শক্ত মুখে বলল। "আমাদের মধ্যে পরস্পরের একটা এমোশন্যাল সম্পর্ক আছে। আমি ও সুপর্ণ, রাতুল ও দীপিতা, তুমি ও বিনীতা—"

বিনীতা বলে উঠল বিকৃত স্বরে, "স্টপ ইট! অল দ্য ন্যাস্টি থিংস।"

সে হন হন করে চলে গেল রাস্তার দিকে। কিংশুক আস্তে বলল, "য়ু আর ম্যাড রুমু!"

রোমেনা বলল, "নাহ্। আমার মাথা খারাপ হয়নি। একটু আগে তুমি বলেছিলে, আই মাস্ট ফেস ইট। নাও ফেস ইট কিংশুকদা! এমোশন্যাল সম্পর্ক কখনও এক জায়গায় থাকে না। এমন তো হতেই পারে আমি ও রাতুল, সুপর্ণ ও দীপিতা, রাতুল ও বিনীতা, তুমি ও দীপিতা—এভাবে এমোশনের চাকা ঘুরপাক খেতে খেতে প্রত্যেকে প্রত্যেকের শত্রু হয়ে উঠতে পারি? পারি না?"

কিংশুক জবাব দিল না। রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইল।

কর্নেল চুপচাপ শুনছিলেন। বললেন, "রোমেনা, তুমি এক্সেপশন্যালি ইনটেলিজেন্ট। আই এগ্রি উইদ ইওর পয়েন্ট। দ্য হুইল অব লাভ। পরশুরাম — রাজশেখর বসুর গল্পটা আশা করি পড়েছ। সেটা এক হাসির গল্প অবশ্য। কিন্তু — হ্যাঁ ডার্লিং দিস ইজ আ পাবলিসিটি।"

কিংশুক কর্নেলের দিকে তাকাল।

কর্নেল তাকে বললেন, "রোমেনার বক্তব্য সম্পর্কে তোমার কী মত কিংশুক?"

Pathagar.net

"অ্যাবসার্ড। শি ইজ ম্যাড। এটা কোনও আদিবাসী স্টোনম্যানের কাজ। রিচুয়্যাল কিলিং।"

কর্নেল হাসলেন। "জানো? কলকাতার স্টোনম্যান সম্পর্কে আমার মত জানতে চাওয়া হয়েছিল। আমি বলেছি, রিচুয়্যাল কিলিংস। হত্যাকারীকে সম্ভবত কোনও তান্ত্রিক বলেছে, অন্তত তেরোটি নরহত্যা করতে পারলে মনোবাসনা পূর্ণ হবে। কিন্তু হত্যা তো সহজ কাজ নয়। সবার পক্ষে সম্ভবও নয়। কিন্তু একটা পদ্ধতিতে সহজে সম্ভব। ফুটপাতে ঘুমন্ত কোনও নিরীহ লোককে হত্যা করলে তদন্ত এগোবে না। কারণ সে তো ভবঘুরে, অজ্ঞাত পরিচয় কোনও ভিখারি-ভিখারিনী, পঙ্গু কিংবা রুগ্‌ণ লোক। ধারালো অস্ত্র—ধরা যাক, ভোজালির এক কোপে হত্যা করা সম্ভব না হতেও পারে। এ ক্ষেত্রে ভারী পাথর খুব সহজ মার্ডার উইপন। আমি এ-ও বলেছি, হত্যাকারী স্টোনম্যানের নিশ্চয়ই গাড়ি আছে।"

রোমেনা বলল, "বুঝেছি। এক্সট্রিমলি রিচুয়্যাল কিলিংস। নিরাপদে নরহত্যা।"

"এ ক্ষেত্রেও স্টোনম্যান পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে, আপাতদৃষ্ট মনে হচ্ছে।

কিংশুক বলল, "আপনার এই ডার্লিং বলাটা অদ্ভুত!"

রোমেনা বলল, "কাগজে পড়েছি উনি ম্যান-উওম্যান নির্বিশেষে যাকে স্নেহ করেন, তাকে ডার্লিং বলেন।"

"তুমি—" কিংশুক একটু অবাক হয়ে বলল, "য়ু আর সো কোল্ড রুমু! তুমি এত শিগগির সামলে উঠেছ!"

"কী বলতে চাও?"

কিংশুক হঠাৎ ফেটে পড়ল। "আমার ধারণা, তুমিই সুপুকে মার্ডার করিয়েছ।" বলেই সে হন হন করে রাস্তার দিকে চলে গেল।

রোমেনা রুষ্ট চোখে সেদিকে তাকিয়ে রইল।

কর্নেল ডাকলেন, "রোমেনা!"

রোমেনা কেঁদে ফেলল। বিকৃতস্বরে বলল, "উই আর অল ম্যাড, কর্নেল সরকার। আমরা স্কিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত। আমরা কী বলছি, কী করছি, আমরা নিজেরাই জানি না। রিয়েল-আনরিয়েল ঘুলিয়ে গেছে আমাদের কাছে।"

"ফরগেট ইট, ডার্লিং!" বলে কর্নেল সুপর্ণের ডেডবডির কাছে গেলেন। একটু পিছিয়ে এলেন আবার। বললেন, "আবার প্রশ্নটা করছি। রাতুল চোর-পুলিশ খেলার প্রোপোজাল দিয়েছিল?"

"হ্যাঁ। কিন্তু আমিই প্রথমে লুকিয়ে থেকে হারিয়ে যাওয়ার ভান করেছিলুম।" রোমেনা আস্তে বলল, "আসলে আমি সুপর্ণের রিঅ্যাকশন দেখতে চেয়েছিলুম।"

কী রিঅ্যাকশন দেখেছিলে?"

"নাথিং! ও নির্বিকার ছিল।" রোমেনা একটু থেমে আবার বলল, "এখানে গতকাল আসার পর সুপর্ণের মুডে কেমন একটা চেঞ্জ লক্ষ্য করেছিলুম। গতরাতে লনে আড্ডা দেওয়ার সময় ওকে অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। একবার হঠাৎ উঠে চলে গেল গাছপালার আড়ালে। জ্যোৎস্নার মধ্যে একবার—"

রোমেনা থেমে গেল। কর্নেল বললেন, "ফ্র্যাংকলি বলো রোমেনা!"

"মনে হল—আমার ভুল হতেও পারে—ওর সঙ্গে সম্ভবত দীপুকে দেখেছিলাম।"

"দীপিতাকে?"

"হ্যাঁ। দীপুও উঠে গেল, বলল আসছি। কিন্তু সে বাড়ির দিকেই গিয়েছিল। তারপর অন্য পথে—জানি না কর্নেল! আমি সত্যিই বুঝতে পারছি না এমন কিছু কী ভাবে সম্ভব? সুপর্ণ জানত, দীপুর কিংশুকের সঙ্গে সম্পর্ক আছে।" রোমেনা রুমালে চোখ মুছে বলল, "আজ সারা দিন সুপর্ণকে অন্যমনস্ক দেখেছি।"

কর্নেল থানটার চারপাশে ঘুরে এলেন। তারপর বাইনোকুলারে চারদিক খুঁটিয়ে দেখলেন। বললেন, "এখানে সুপর্ণকে খুঁজতে আসার কথা কে প্রথম বলল?"

"প্রথমে বিনীতা বলল রাস্তায় ওকে পেয়ে যাব। পরে মামাবাবু বললেন—"

"চন্দ্রকান্ত রায় কি তোমার আত্মীয়?"

"নাহ্। উনি দীপিতা-বিনীতার মামা। রাতুলেরও দূর সম্পর্কের মামা।"

"এখানে বেড়াতে আসার প্রপোজাল কার?"

"ধারিয়া ফল্‌সে? দীপিতার।"

"রাঁচি আসার প্রোপোজ্যাল?"

"রাতুলের।"

"রাতুল কী করে?"

"স্মলস্কেল ইন্ডাস্ট্রি। ওর একটা ছোট কারখানা আছে।"

রাস্তার জিপের হর্ন শোনা গেল। পুলিশের গাড়ি এসে গেছে। চন্দ্রকান্তের গাড়ির পেছনে একটা অ্যাম্বুল্যান্স। পুলিশ অফিসার এবং কনস্টেবলরা আগে দৌড়ে এল। পুলিশ ইন্সপেক্টর হরিশ পাণ্ডে কর্নেলকে দেখে বললেন, "হাই ওল্ড বস! যেখানে আপনি, সেখানেই ডেডবডি — দ্যাট ইজ দ্য প্রোভার্ব।"

কর্নেল একটু হেসে বললেন, "আই কান্ট হেল্প ইট মিঃ পাণ্ডে! হয়তো এটাই আমার নিয়তি।...."

॥ তিন ॥

যে কোনও খুনের ঘটনায় পুলিশের কিছু ধরাবাঁধা ছক আছে, যেগুলি আইনের সূত্র ধরে তৈরি। পুলিশ দলটির সঙ্গে একজন ডাক্তার এবং একজন ফোটোগ্রাফার ছিলেন। ডাক্তার বাঙালি। রণধীর অধিকারি নাম। সুপর্ণের বডি পরীক্ষা করে তাকে মৃত ঘোষণা করলেন তিনি। ফোটোগ্রাফার সুরেন্দ্র সিং নানা অ্যাংগেলে কয়েকটি ছবি তুললেন ক্যামেরায়। সেই ফাঁকে কর্নেলও ছবি তুললেন। পুলিশ ইনসপেক্টর হরিশ পাণ্ডে চটপটে মানুষ। বেলা পড়ে এসেছিল। অ্যাম্বুলেন্সের সঙ্গে দুজন ডোম এসেছিল। তাদের বডি উঠিয়ে নিয়ে যেতে হুকুম দিলেন। বললেন, "বডি রেখে এসে এই পাথরটাও নিয়ে যাও।"

চন্দ্রকান্ত, রাতুল, কিংশুক, দীপিতা, বিনীতা পুলিশের সঙ্গে রাস্তা থেকে আবার ঘটনাস্থলে এসেছিল। হরিশ পাণ্ডে পুলিশি হাসি হেসে বললেন, "রায় সায়েব! এঁদের স্টেটমেন্ট নিতে হবে। সেটা এখানে সম্ভব নয়। থানায় যেতে হবে।"

চন্দ্রকান্ত গম্ভীর মুখে বললেন, "হ্যাঁ। চলো সব! কর্নেল সরকার! আপনি কি আমাদের গাড়িতে আসবেন?"

কর্নেল একটু হেসে বললেন, "জায়গা হবে না মিঃ রায়। আমি একা দুজনের জায়গা নেব।"

মিঃ পাণ্ডে বললেন, "কর্নেল সরকার আমার জিপে যাবেন। আপনারা চলুন।

"থ্যাংকস্ মিঃ পাণ্ডে!" কর্নেল বললেন। "ধারিয়া ফল্‌সের ধারে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত না দেখে আমি যাচ্ছি না। আপনারা চলুন!"

রোমেনা বলল, "আমি কর্নেল সায়েবের সঙ্গে গেলে আপত্তি আছে মিঃ পাণ্ডে?"

চন্দ্রকান্ত বললেন, "তোমার থাকার কি কোনও বিশেষ কারণ আছে রুমু?"

"কর্নেল সায়েবের সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।"

চন্দ্রকান্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, "কথা পরে বললেও চলবে। থানায় যাওয়াটা আগে দরকার।"

রাতুল বলল, "শি ইজ ম্যাড।"

"শাট আপ!" রোমেনা প্রায় চেঁচিয়ে উঠল।

দীপিতা এসে ওর হাত ধরল। "প্লিজ রুমু! মাথা ঠাণ্ডা রাখো! সিন ক্রিয়েট করো না!"

মিঃ পাণ্ডে বাঁকা হেসে বললেন, "আপনারা সবাই আন্ডার সাসপিসন। চলুন! রায়সায়েব! প্লিজ, এদের বুঝিয়ে দিন আইনত আমাকে যা করার করতেই হবে।"

pathagar.net

চন্দ্রকান্ত তাড়া দিলেন, "চলো সব।"

রোমেনা গোঁ ধরে বলল, "আমাকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে চলুন তা হলে—বাই ফোর্স। কিন্তু আমি বলছি, থানায় নিশ্চয় যাব। যা বলার বলব। এখন কর্নেল সায়েবের সঙ্গে আগে কিছু কথা বলা আমার খুবই দরকার। প্লিজ আন্ডারস্ট্যান্ড ইট, মিঃ পাণ্ডে!"

কর্নেলের দিকে তাকালেন হরিশ পাণ্ডে। কর্নেল আস্তে বললেন, "আমি রোমেনার সিওরিটি, মিঃ পাণ্ডে। আমি ওকে থানায় নিয়ে যাব। যদি আমার ওপর আপনার আস্থা থাকে—"

মিঃ পাণ্ডে হাসলেন। "দ্যাটস ওক্কে কর্নেল সরকার!"

কিংশুক রোমেনাকে কিছু বলবে বলে ঠোঁট ফাঁক করেছিল। বলল না। হন্ হন্ করে এগিয়ে গেল। ডোম দুজন ফিরে এসে মিঃ পাণ্ডের কথামতো রক্তমাখা পাথরটা নিয়ে গেল। পাথরটা কুড়ি কেজি হওয়া আশ্চর্য নয়, কর্নেলের মনে হল্। একটু পরে গাড়িগুলো চলে যাওয়ার পর আসন্ন সন্ধ্যার বনভূমিতে শুধু বাতাসের শব্দ। পাখিদের চ্যাঁচামেচি কমে যাচ্ছিল্। কর্নেল বেদির একটা পাশে ঘাসের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। হঠাৎ হাঁটু গেড়ে বসে ঘাস সরালেন। তারপর আরও দু পা এগিয়ে গেলেন। রোমেনা কাছে গিয়ে বলল, "কী দেখছেন?"

কর্নেল একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, "বরাবর দেখে আসছি, বিশেষ করে আজকাল পুলিশ রুটিন ওয়ার্কসের বাইরে কিছু করে না। আসলে খুনোখুনি প্রচণ্ড বেড়ে যাচ্ছে। তাই একটা খুনের পেছনে বেশি সময় দেওয়ার সুযোগও পুলিশের কম।"

রোমেনা ঝাঁঝালো গলায় বললো, "আপনি কি দেখলেন অমন করে?"

"স্টোনম্যানের পায়ের রক্তের ছাপ।"

রোমেনা তাকিয়ে রইল।

শেষ রোদের লালচে ছটা ক্রমে ফিকে হতে হতে ধূসর হচ্ছে। কর্নেল আবার দু পা এগিয়ে পায়ের জুতোয় ঘাস সরিয়ে বললেন, "এই পথে স্টোনম্যান ফিরে গেছে।"

আরও খানিকটা এগিয়ে ছোট্ট একটা ডোবা। কিছু জল জমে আছে। রোমেনার চোখে পড়ল, জলের ধারে বালিতে জুতোর খুব আবছা ছাপ। কর্নেল জুতোর ছাপের কাছে গিয়ে বললেন, "সাবধানী স্টোনম্যান এখানে রক্ত ধুয়েছে জুতোর। ছাপটা দেখে মনে হচ্ছে সে একজন বেঁটে মানুষ।"

দুটো উঁচু পাথরের মাঝখান দিয়ে কিছুটা এগিয়ে ঢালু ঘাসের জমি। জমিটার নীচেই ধারিয়া ফল্গুসের ওপরের অংশ। রোমেনা বিস্ময়ে বলে উঠল, "এটা শর্টকাট দেখছি!"

"হ্যাঁ। সুপর্ণ এই শর্টকাটে এসে লুকিয়ে ছিল থানের কাছে। জানি না স্টোনম্যানও শর্টকার্ট করে একই পথে এসেছিল, নাকি টিলা বেয়ে নেমেছিল।"

রোমেনা চমকে উঠল। "কিন্তু ফল্‌সের মাথায় আমরা ছিলুম! দেখতে পেতুম তাকে।"

"তখন ছিলে না। তোমার বর্ণনা অনুসারে সবাই ব্যস্তভাবে সুপর্ণকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলে।"

"মামাবাবু ছিলেন!"

"মিঃ রায় সম্ভবত অন্য দিকে ঘুরে বসে ছিলেন। তাই দেখতে পাননি স্টোনম্যানকে।"

কর্নেল ফল্‌সের মাথায় গিয়ে দাঁড়ালেন। রোমেনা একটু ইতস্তত করে বলল, "আমার কিছু কথা বলার ছিল!"

"হুঁ, তুমি বলেছিলে বটে। এবার বলতে পারো!" কর্নেল নিভে যাওয়া চুরুটটা ধরালেন।

রোমেনা চারদিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল, "এখানে আমার কেন কে জানে অস্বস্তি হচ্ছে। বরং চলুন রাস্তায় যেতে যেতে বলব।"

কর্নেল হাসলেন। পাঁচ মাইল রাস্তা। তোমার হাঁটার অভ্যাস নেই। শর্টকাটে দু মাইল নাক বরাবর। কিন্তু চড়াই ভাঙতে হবে। জঙ্গল আর পাথর প্রচুর।

রোমেনা একটু ভেবে নিয়ে ধরা গলায় বলল, "আজ আমি সব কষ্ট সহ্য করত পারব। আমার জীবন শূন্য হয়ে গেছে কর্নেল!"

"বুঝতে পারছি।" বলে হঠাৎ কর্নেল এগিয়ে গেলেন সেই পাথরের ফাঁকে ঝোপটার দিকে, যেখানে রোমেনা লুকিয়ে ছিল এবং ঝোপটায় সাদা ফুলের ঝাঁক।

রোমেনা দেখল, কর্নেল পিঠের কিটব্যাগ থেকে একটা ছোট্ট স্টিক বের করলেন। স্টিকটা টেনে বড় করলেন। তারপর স্টিকের ডগায় একটা সূক্ষ্ম সবুজ রঙের জাল ছাতার মতো ছড়িয়ে গেল। ঝোপের ফুলে একটা প্রজাপতি অবেলায় ছটফট করে উড়ছিল। সেটা জালে আটকানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু ধূর্ত প্রজাপতিটা পালিয়ে গেল। জালটা গুটিয়ে স্টিকটা ছোট করে পিঠের কিটব্যাগে ভরে কর্নেল বললেন, "এস!"

দুজনে একটা খাত ধরে এগিয়ে একটা ঢালু টিলায় উঠলেন। রোমেনা টিলার মাথায় ওঠার পর থমকে দাঁড়াল। টিলার মাথায় এখনও দিনের আলো আছে। সে শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, "আপনি দা হুইল অব লাভের কথা বলছিলেন!"

কর্নেল বাইনোকুলারে দূরে কিছু দেখতে দেখতে বললেন, "হুঁ।"

"কিংশুক সুপর্ণকে ফল্‌সের পাশ দিয়ে নিচে নামার জন্য মাউন্টেনিয়ারিং অ্যাডভেঞ্চারে ডাকছিল। সুপর্ণ গেল না। কিন্তু আমার কানে কিংশুকের এই কথাটা ধাক্কা দিয়েছিল। মনে হচ্ছিল, সে সুপর্ণকে হয়তো—"

রোমেনা থেমে গেলে কর্নেল বললেন, "বুঝেছি।"

রোমেনা মুখ নিচু করে আস্তে বলল, "তারপর হাইড অ্যান্ড সিক গেমের সময় একটা ঝোপের আড়ালে ঝাঁপিয়ে পড়ে হঠাৎ রাতুল আমাকে—আমাকে কিস করল। আমি বাধা দেওয়ার সুযোগ পেলাম না। কিংশুক হয়তো ব্যাপারটা দেখেছিল। কিংশুক রাতুলের ওপর প্রচণ্ড ঈর্ষায় তাকে সুপর্ণের মার্ডারের জন্য যেন দায়ী করতে চায় মনে হচ্ছিল।" রোমেনা বিহ্বলতার মধ্যে বলতে থাকল, "কিংশুকের সঙ্গে দীপিতার প্রেম আছে। দীপিতা গতরাতে সুপর্ণের সঙ্গে লনের গাছপালার ভেতর দাঁড়িয়ে ছিল লক্ষ্য করেছি। কিংশুক তাই সুপর্ণকে মেরে রাতুলের কাঁধে দায় চাপাতে চায়।"

কর্নেল পা বাড়িয়ে বললেন, "তোমার থিওরিতে—আমাকে ক্ষমা করো ডার্লিং ফেমিনিন লজিক কাজ করছে। তুমি হয়তো কেসটাকে জটিল করে ফেলছ।"

রোমেনা হাঁটতে হাঁটতে বলল, "আপনি যা-ই বলুন, সুপর্ণকে রাতুল মেরেছে। কলকাতার স্টোনম্যানের মোডাস অপারেন্ডি অনুসারে কাজটা সেই-ই করেছে।"

আবার ঢাল বেয়ে নেমে জঙ্গলে আদিবাসীদের পায়ে চলা একফালি পথে পৌঁছলেন কর্নেল। তারপর বললেন, "সুপর্ণ এবং তোমার মধ্যে গভীর এমোশনাল সম্পর্ক ছিল। অথচ তোমরা বিয়ে করোনি কেন?"

"সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারছিলুম না।" রোমেনা একটু চুপ করে থাকার পর ফের বলল, "সুপর্ণও পারছিল না। তবে আমার বাবা-মা সুপর্ণকে পছন্দ করতেন না। সুপর্ণ তা জানত।"

"সুপর্ণের বাবা-মা?"

"ওর বাবা-মা বেঁচে নেই। দাদা-বউদির সঙ্গে থাকত।"

"কিংশুকের বাবা-মাকে চেনো?"

রোমেনা ঝাঁঝালো স্বরে বলল, "কিংশুকের বাবার ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের কারবার আছে। একবার ওঁদের বাড়িতে রেভেনিউ ইনটেলিজেন্স থেকে রেড হয়েছিল। কালো টাকার যখ। জেল খাটতে হত। আমার বাবা তখন হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করতেন। বাঁচিয়ে দেন। লোকটার অডাসিটি! আমার সঙ্গে কিংশুকের বিয়ের প্রোপোজাল দিয়েছিল। বাবা রাজি হননি।"

"ক্ষমা করো এ প্রশ্নের জন্য। কিংশুক কি তোমার সঙ্গে—"

রোমেনা দ্রুত বলল, "হি ইজ আ লোফার! আমাকে অ্যাপ্রোচ করেছিল। আই হেট হিম!"

"তবু তুমি কিংশুক যে দলে আসছে, সেই দলে এসেছ?"

"সুপর্ণের এবং দীপিতার টানে।" রোমেনা হাঁটতে হাঁটতে থমকে দাঁড়াল। "আপনাকে বলা হয়নি, কিংশুকের সঙ্গে দীপিতার বিয়ের কথা হয়েছে। দীপিতার বাবা স্কুলটিচার। প্রোপোজাল পেয়ে বর্তে গেছেন।"

"কিংশুক ও দীপিতার মধ্যে এমোশনাল সম্পর্ক আছে?"

একটু পরে রোমেনা বলল, "আছে—মানে ছিল। এখানে এসে লক্ষ্য করেছি, কিংশুক ওর ছোট বোন বিনীতার সঙ্গে ভাব জমাতে চাইছে। এদিকে দীপিতা সুপর্ণের সঙ্গে—গতরাতের কথা তো বলেছি আপনাকে।"

এতক্ষণে টর্চ জ্বালাতে হল। আবার একটা চড়াই। কর্নেল জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে না তো?"

রোমেনা বলল, "নাহ্।"

কুড়ি মিনিট চড়াই ভেঙে উৎরাই শুরু হল। উৎরাইয়ের শেষে পিচের রাস্তা। কিছু দোকানপাট। সেখানে একটা সাইকেলরিকশো নিলেন কর্নেল। ল্যাক রিসার্চ সেন্টারের গেস্টহাউসে পৌঁছে বললেন, "কফি খেয়ে একটু বিশ্রাম করা যাক। তারপর তোমাকে থানায় পৌঁছে দেব।"

রোমেনা লনে হাঁটতে হাঁটতে দ্বিধাজড়ানো গলায় বলল, "থানায় যেতেই হবে আমাকে?"

"হ্যাঁ ডার্লিং! তোমার স্টেটমেন্ট পুলিশ নেবে। আমি কথা দিয়েছি।"

রোমেনা আস্তে বলল, "আমি স্ট্রেটকাট বলব, কিংশুক মার্ডার করেছে সুপর্ণকে।"

"কিন্তু তুমি দেখনি!"

"দেখিনি—বাট আই সাসপেক্ট হি ইজ দ্য কিলার।"

"না রোমেনা। যা যা ঘটেছে—মানে যা-যা দেখেছো, তা-ই বলবে পুলিশকে। তোমার কী ধারণা বা সন্দেহ, তা বলবে না। তাতে পুলিশ বিভ্রান্ত হবে।"

রোমেনা চুপ করে থাকল।

গেস্টহাউসের দোতলায় নিজের রুমে ঢুকে কর্নেল কিটব্যাগ, ক্যামেরা ও বাইনোকুলার রাখলেন। বোতাম টিপে বেয়ারাকে ডেকে ক্যান্টিন থেকে কফি আর কিছু স্ন্যাক্স আনতে বললেন। তারপর রোমেনাকে বললেন, "বাথরুমে যাও। মুখে-হাতে জল দিয়ে এস। পা ধুয়ে ফেলো, ক্লান্তি চলে যাবে।"

রোমেনা বাধ্য মেয়ের মতো কথা শুনল। তাকে এবার একটু ফ্রেশ দেখাচ্ছিল। কফি আর স্ন্যাক্স দিয়ে গেল বেয়ারা। কর্নেল বললেন, "কফি নার্ভকে চাঙ্গা করে। কফি খেয়ে নাও।"

কফি খেতে খেতে রোমেনা বলল, "আমার ধারণা, কিংশুককে আপনি মার্ডারার বলে সন্দেহ করছেন না।"

কর্নেল একটু হেসে সাদা দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, "নাহ্। করছি না।"

"কেন?"

"প্রথম কারণ, এই পাথর তুলে এক ঘায়ে সুপর্ণের মতো শক্তিমান যুবককে মেরে ফেলার জন্য যা শারীরিক ক্ষমতা দরকার, তা রোগা কিংশুকের নেই। দ্বিতীয় কারণ, সে ফিল্ম অনুরাগী। ডকু ম্যুভি-মেকার। কাজেই আর্টিস্ট। কোনও আর্টিস্ট যত এমোশনাল হোক, সে খুনের ব্যাপারে রিস্ক নিতে চাইবে না। ব্যতিক্রম থাকতে পারে। তৃতীয় এবং ভাইটাল কারণ, তার খুনের মোটিভ অত্যন্ত অস্পষ্ট। শুধু তাই নয়, যথেষ্ট জোরালো নয়। ডার্লিং! নরহত্যা—অন্তত এই বিশেষ ক্ষেত্রে একটা দুঃসাহসী কাজ।"

রোমেনা মুখ নামিয়ে কফিতে চুমুক দিল। তারপর আস্তে বলল, "তা হলে রাতুল ফিট করে যায় আপনার থিওরির সঙ্গে। হি কিস্‌ড্ মি সাডনলি। আই ওয়াজ সো মাচ শক্‌ড আই কুডন্‌ট রেসিস্ট হিম। আমি হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলুম। বাধা দিতে পারিনি। ভীষণ—ভীষণ লজ্জা আর অবাক—" সে থেমে গেল। মুখ লাল হয়ে উঠল। নাসারন্ধ্র স্ফীত হল রোমেনার।

কর্নেল প্রায় অট্টহাসি হাসলেন। "আহ্ রোমেনা! রাতুল তোমাকে পেতে চাইলে সুপর্ণকে তার খুন করার দরকার হবে কেন? তুমি তার এমোশনাল অ্যাটাচমেন্টে বাধা দাওনি। চুপ করে ছিলে। সে এ থেকে ভেবেছে, তোমার সম্মতি আছে। কাজেই সে যত দুঃসাহসী বা গোঁয়ার হোক, কিংবা সুপর্ণকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করুক, তাকে তার খুন করার প্রয়োজন হবে কেন?"

রোমেনা ভাঙা গলায় বলল, "তা হলে কে মারল সুপর্ণকে?"

"আমি ঘটনাস্থল দেখে এবং তোমার মুখে শুনে জাস্ট একটা থিওরি গড়ে তুলেছি—সেটা আপাতত মোডাস অপারেন্ডি সংক্রান্ত। খুনীর চেহারা এখনও তাতে অস্পষ্ট। আমাকে স্ট্রং মোটিভ খুঁজে বার করতে হবে আগে।" কর্নেল কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন, "সাইকিক খুনীদের প্রশ্ন উঠছে না। কারণ এই এলাকায় তেমন কোনও খুনখারাপি ঘটেনি। খুনের প্রধানত দুটো উদ্দেশ্য থাকে — ব্যক্তিগত লাভ এবং প্রতিহিংসা চরিতার্থ। আরেক ধরনের খুন আছে। দৈবাৎ আঘাতে মৃত্যু। ধরো তুমি রাগের বশে কাউকে আঘাত করলে। সে মারা পড়ল। একে বলে ম্যানস্লটার। আবার এমনও হতে পারে, তোমার একটা অসতর্ক কাজের ফলে কেউ মারা পড়ল।"

কর্নেল কফি শেষ করে চুরুট ধরিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। "চলো, থানায় ওঁরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।"

সাইকেলরিকশোয় থানার দিকে যেতে-যেতে রোমেনা বলল, আমাদের সবাইকে পুলিশ অ্যারেস্ট করবে তাই না?"

কর্নেল বললেন, "দ্যাট ডিপেন্ডস। পুলিশ নিজের পদ্ধতিতে কাজ করে।"

"মামাবাবুকেও কি অ্যারেস্ট করবে?"

"পুলিশের ইচ্ছা। তবে উনি এলাকার প্রভাবশালী মানুষ।" কর্নেল রোমেনার দিকে ঘুরলেন। "কেন এ কথা জিজ্ঞেস করছ?"

রোমেনা আস্তে বলল, "এমনি।"

"ওঁর সঙ্গে তোমার আগে পরিচয় ছিল?"

"নাহ্। এই প্রথম দীপিতার সঙ্গে এসে পরিচয় হল। জলি মানুষ। শিগগির আপন করে নিতে পারেন। তা ছাড়া মডার্ন-মাইন্ডেড।"

"হ্যাঁ চন্দ্রকান্ত রায় চমৎকার মানুষ। এক সময় নামকরা শিকারি ছিলেন। বাই দ্য বাই, সুপর্ণের সঙ্গে ওঁর পরিচয় ছিল?"

"নাহ্। থাকলে আমি জানতে পারতুম।"

থানায় পৌঁছুলে পুলিশ ইন্সপেক্টার হরিশ পাণ্ডে সহাস্যে বললেন, "সরি কর্নেল সরকার! আপনি এ কেসে কোনও রহস্য খুঁজতে গেলে ব্যর্থ হবেন। আই বি থেকে ইনফরমেশন আছে, ধারিয়া এলাকায় আদিবাসীরা আউটসাইডারদের বরদাস্ত করছে না। বিশেষ করে ওদের সম্প্রতি একটা গোপন মিটিং হয়েছে। ধারিয়া ফল্‌সের কাছে ওদের দেবতার থানে কোনও নন-ট্রাইবালকে পেলেই ওরা বলি দেবে। অফ কোর্স, মিস চৌধুরী এবং আপনার স্টেটমেন্ট ফরম্যালি নেব। মিস চৌধুরী, চলুন। পাশের ঘরে গিয়ে স্টেটমেন্ট দেবেন। তারপর আপনারা ফ্রি। তবে দরকার হলেই আমরা ডাকব। আপনাদের আসতে হবে।"

॥ চার ॥

কর্নেল তাঁর সংক্ষিপ্ত স্টেটমেন্ট সই করে বললেন, "তা হলে আদিবাসী গ্রামগুলোতে আপনারা ধরপাকড় শুরু করবেন মিঃ পাণ্ডে?"

পাণ্ডে বললেন, "নিশ্চয়। আমরা ওদের সমিতির চাঁইগুলোকে আজ রাতেই ধরে ফেলব। তারপর থার্ড ডিগ্রিতে চড়ালে সব কথা বেরিয়ে আসবে।"

"প্লিজ মিঃ পাণ্ডে!" কর্নেল বললেন, "অন্তত একটা দিন আমাকে সময় দিন। তারপর আপনারা নিজের পথে চলবেন।"

পাণ্ডে হাসলেন। "আপনি রহস্যভেদী মানুষ। সর্বত্র রহস্য খুঁজে পান। আশা করি, কোনও ক্লু খুঁজে পেয়েছেন?"

"হয়তো পেয়েছি, কিংবা পাইনি। আমাকে সিওর হতে দিন মিঃ পাণ্ডে। আগামীকাল সূর্যাস্ত পর্যন্ত।"

"কিন্তু ততক্ষণে অপরাধীরা গা ঢাকা দেবে।" পাণ্ডে গোঁফে তা দিয়ে বললেন ফের, "কর্নেল! একটা আদিবাসীদের রিচুয়্যাল কিলিং। থানার রেকর্ডে আছে, একসময় এভাবে ওরা ননট্রাইবালদের বলি দিত দেবতার থানে।"

"মিঃ পাণ্ডে!" হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন কর্নেল। "পাথরটা একবার আমি দেখতে চাই।"

পাণ্ডে উঠলেন। একটু হেসে বললেন, "তখন তো দেখেছেন!"

"দেখেছি বলেই আবার দেখতে চাইছি। আপনি দেবতার বলি কথাটা বলায় আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসে গেল।"

মহাফেজখানার ভেতর একটা টুলে পাথরটা রাখা ছিল। কর্নেল পকেট থেকে আতস কাঁচ বের করে পাথরের ওপর কী সব খুঁটিয়ে দেখতে থাকলেন। পাণ্ডে বললেন, "ওজন করা হয়েছে। কত ওজন জানেন? প্রায় তেইশ কিলোগ্রাম।"

কর্নেল সাবধানে পাথরটার তলা কাত করে দেখেই বললেন, "মাই গুডনেস!"

"কী ব্যাপার?"

"এটা বীভৎস একটা মূর্তির মাথা।"

পাণ্ডে হাসতে লাগলেন। হ্যাঁ —স্টোনম্যান বলা চলে তা হলে। তাই না?"

"বলা চলে মিঃ পাণ্ডে!" কর্নেল বেরিয়ে এলেন। ফের বললেন, "আগামীকাল সূর্যাস্তের মধ্যে আমি এ রহস্য জেনে ফেলব মিঃ পাণ্ডে! আই প্রমিজ।"

চন্দ্রকান্ত ওদের নিয়ে লনে অপেক্ষা করছিলেন। কর্নেলকে দেখে বললেন, "মিঃ পাণ্ডে ইজ রাইট, কর্নেল সায়েব! ব্যাপারটা আমিও জানি। এ শহরের সবাই জানে। তবে শিকারি জীবনে এলাকার আদিবাসীদের সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল, সে তো আপনিও জানেন। তাই আমি এদের ধারিয়া ফল্‌সে নিয়ে গিয়েছিলাম।"

কিংশুক বলল, "তাই আমার সন্দেহ হচ্ছিল, ফল্‌সে কোনও ট্যুরিস্ট নেই কেন? এলাকার সব ফল্‌সে লোকেদের ভিড় হয়। ধারিয়া ফল্‌স একেবারে নির্জন।"

গাড়িতে উঠতে গিয়ে রোমেনা হঠাৎ বলে উঠল, "বিনু! তোমার আঁচল ছিঁড়ল কী করে?"

বিনীতা আঁচলটা দেখে নিয়ে আস্তে বলল, "লক্ষ্য করিনি তো। কাঁটাঝোপে কখন আটকে ছিঁড়ে গেছে।"

দীপিতা বলল, "তুই যা ছোটাছুটি করছিলি!"

কিংশুক একটু হাসল। "অ্যানথ্রোপোলজি স্টাডি করে বেড়াচ্ছিল।"

বিনীতা চটে গিয়ে বিকৃত স্বরে বলল, "স্টপ ইট।"

চন্দ্রকান্ত বললেন, "কর্নেল সায়েব! আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আমরা ফিরব।"

কর্নেল বললেন, "থ্যাঙ্কস মিঃ রায়! আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না। এরা সবাই টায়ার্ড অ্যান্ড টেরিব্‌লি শক্‌ড্! আমি রিকশোয় ফিরব'খন। তো— সুপর্ণের দাদাকে ট্রাঙ্ককল করা হয়েছে কি?

"থানা থেকে চেষ্টা করলাম। সরাসরি লাইন না পেয়ে মিঃ পাণ্ডেকে বললাম লালবাজারে জানিয়ে দিতে। লালবাজার সুপর্ণের দাদাকে মেসেজ পৌঁছে দেবে।"

গাড়ি স্টার্ট দিলেন চন্দ্রকান্ত। কর্নেল তাঁর পাশে এসে বললেন, "একটা রিকোয়েস্ট মিঃ রায়!"

"বলুন!"

"আগামীকাল সকাল নটায় আমি ধারিয়া ফল্‌সের কাছে আদিবাসীদের থানে অপেক্ষা করব! আপনি এদের সবাইকে নিয়ে সেখানে ওই সময় যাবেন।"

"কী ব্যাপার?"

কর্নেল একটু হেসে বললেন, "সুপর্ণকে সত্যিই স্টোনম্যান খুন করেছে। আমি সেটা প্রমাণ করব।"

গাড়ির ইঞ্জিন গরগর করছিল! গাড়ির ভেতর সবাই চুপ। একটু পরে চন্দ্রকান্ত শ্বাস ছেড়ে বললেন, "হ্যাঁ যাব। সবাইকে নিয়ে যাব। আমরাও জানতে চাই কে খুন করল সুপুকে।"

কর্নেল রাস্তায় গিয়ে একটা রিকশো ডাকলেন।

চন্দ্রকান্তের গাড়ি এগোল বাড়ির দিকে। সারা পথ কেউ কোনও কথা বলল না।...

আদিবাসীদের থানের পেছনে উঠে গেছে একটা টিলা। টিলার মাথায় একটা ন্যাড়া বিশাল পাথরে বসে অপেক্ষা করছিলেন কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। দাঁতের ফাঁকে চুরুট, চোখে বাইনোকুলার। উজ্জ্বল শারদ-রোদে দূরে চন্দ্রকান্তের সাদা গাড়িটা আসছে। আঁকাবাঁকা খোয়া-বিছানো রাস্তাটার সংস্কার হয়নি কয়েক বছর। এলাকায় ঝাড়খণ্ডীদের আন্দোলন একটা কারণ। অন্য কারণ এ রাস্তায় টুরিস্ট আসা বন্ধ হয়ে গেছে।

নটা বাজার পনের মিনিট আগেই এসে পৌঁছুলেন চন্দ্রকান্ত। কিংশুক, রাতুল, রোমেনা, দীপিকা, বিনীতা সবাই এসেছে। প্রতিটি মুখে চাপা উত্তেজনা থমথম করছে। চন্দ্রকান্ত আজ সঙ্গে তাঁর রাইফেল এনেছেন।

কর্নেল তাঁদের অভ্যর্থনার ভঙ্গিতে থানের কাছে নেমে এলেন! "মর্নিং অল অব য়ু!"

চন্দ্রকান্ত গম্ভীর মুখে বললেন, "মর্নিং!"

কর্নেল হাসলেন, "রাইফেল কেন মিঃ রায়?"

চন্দ্রকান্ত গলার ভেতর বললেন, "আই মাস্ট কিল দ্য ব্লাডি স্টোনম্যান।"

pathagar.net

"মিঃ রায়! কলকাতায় কোন সাংবাদিক কিংবা পুলিশ অফিসার স্টোনম্যান কথাটা চালু করেছেন। পাবলিক নিয়েছে! কিন্তু এ হল ভাষার ওপর অত্যাচার।" কর্নেল নিভে যাওয়া চুরুট জ্বেলে বললেন, "অবশ্য ভাষা আগে, ব্যাকরণ পরে। স্টোনম্যানের মতো আরেকটি শব্দ আছে, আয়রনম্যান। বাংলায় লৌহমানব বলা হয়। লোহার মতো কঠিন যে মানুষ। সমাসবদ্ধ পদ হিসেবে ব্যাকরণ এই শব্দটা নিতে পারে। কিন্তু স্টোনম্যান? পাথরের মতো মানুষ অর্থে সমাসবদ্ধ পদ হিসেবে একেও ব্যাকরণ পাতে নিতে আপত্তি করবে না। অথচ কলকাতার স্টোনম্যান মানে, পাথর দিয়ে যে মানুষ খুন করে। ভাষার ওপর যথেচ্ছ অত্যাচার মিঃ রায়!"

চন্দ্রকান্ত বললেন, "আপনি কী বলতে চাইছেন?"

"ধারিয়া ফল্‌স এলাকার স্টোনম্যানকে আমরা আক্ষরিক অর্থে নিতে চাই! স্টোনম্যান মানে, পাথরের মানুষ। বরং পাথরে তৈরি মানুষ বললে আরও স্পষ্ট হয় কথাটা।" কর্নেল টিলা বেয়ে উঠতে উঠতে বললেন, "আসুন মিঃ রায়! তোমরাও এস। দেখাচ্ছি।"

চন্দ্রকান্ত তাড়া দিলেন, "চলো সব!"

কিংশুক ও রাতুল আগে, তারপর রোমেনা ও দীপিতা, তাদের পেছনে বিনীতা টিলা বেয়ে উঠতে থাকল। ঝোপঝাড়ে ঢাকা টিলাটার ঢাল প্রায় পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণ সৃষ্টি করেছে সমতল থেকে। প্রায় কুড়ি ফুট ওঠার পর একটা বুড়ো-ঝাঁকড়া গাছ এবং তলায় ঘন ঝোপ। ঝোপের ধারে টুকরো-টুকরো নানা গড়নের পাথর পড়ে আছে। কর্নেল সেখানে দাঁড়িয়ে বললেন, "বিনীতা তুমি নৃবিজ্ঞানের ছাত্রী! দেখ তো এগুলো চিনতে পারো কি না?"

সে কিছু বলার আগেই রাতুল বলল, একটা পাথরের মূর্তি-টুর্তি ভেঙে পড়ে আছে।"

"কারেক্ট।" কর্নেল বললেন, "গতকাল বিকেলে আমি যখন তোমাদের জিজ্ঞেস করলুম, কেউ নীচের ওই থানের কাছে এসেছিলে কি না, সবাই বললে, আসোনি। কিন্তু একজন এসেছিলে। তার মানে একজন মিথ্যা বলেছ।"

চন্দ্রকান্ত ওদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কে সে?"

কেউ জবাব দিল না।

কর্নেল আস্তে বললেন, "মিথ্যা বলা তার পক্ষে স্বাভাবিক। কারণ সে ভাবতে পারেনি একটুর জন্য এমন সাংঘাতিক অঘটন ঘটে যাবে।"

রোমেনা কান্নাজড়ানো গলায় বলে উঠল, "দ্যাটস অ্যান অ্যাকসিডেন্ট।"

চন্দ্রকান্ত তার দিকে তাকালেন। "তুমি এসেছিলে?"

রোমেনা দু হাতে মুখ ঢেকে মাথা নাড়ল।

"তবে কে?"

কর্নেল বললেন, "পুলিশ-চোর খেলার পুলিশ হয়ে সে চোর খুঁজতে থানের ওই দিকটায় এসেছিল। সেখান থেকে এই পাথরের মূর্তির ভগ্নাবশেষ তার চোখে পড়ে। সে খেলা ভুলে ঝোপের ভেতর দিয়ে এখানে চলে আসে। মূর্তির মাথাটা সে তুলে সোজা করার চেষ্টা করে। সেই সময় তার হাত ফসকে তেইশ কিলো পাথরের মাথা—স্টোনম্যানেরই মাথা বলা উচিত—সোজা নিচে গড়িয়ে যায়। থানের আড়ালে সুপর্ণ লুকিয়ে ছিল। সে গুঁড়ি মেরে বসে ছিল সম্ভবত। তাই পাথরটা গিয়ে তার মাথায় পড়ে। রোমেনা ঠিকই বলেছিল, "দ্যাটস অ্যান অ্যাকসিডেন্ট। সে জানত না সুপর্ণ নীচে আছে।"

চন্দ্রকান্ত ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, "কে সে?"

কেউ জবাব দিল না। কর্নেল পকেট থেকে একটা জিনিস বের করে বললেন, "কী ঘটেছে দেখা মাত্র সে ছুটে নেমে যায় এবং তখন কাঁটাঝোপে তার শাড়ির আঁচলের এই টুকরোটা—"

"বিনু! তুই!" চন্দ্রকান্ত চমকে উঠে বললেন।

রোমেনা বিনীতাকে ধরল। সে মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিল। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল বিনীতা। "আমি—আমি ভাবিনি এমন হবে।"

রোমেনা ভাঙা গলায় বলল, "রাত্রে আমাকে বিনু সব কথা বলেছে! ওর কোন দোষ নেই।"

কর্নেল বললেন, "অ্যানথ্রোপলজির ছাত্রীর পক্ষে এটা স্বাভাবিক। সে ট্রাইব্যাল দেবতার মূর্তি দেখতে পেয়ে খেলা ভুলে পরীক্ষা করতে এসেছিল। তবে হ্যাঁ, বিনীতার নার্ভ স্ট্রং।"

চন্দ্রকান্ত হতাশভাবে বললেন, "সুপুর মৃত্যু ঘটানোর জন্য আইনত বিনু দায়ী। এখন ওকে কী করে বাঁচাব বুঝতে পারছি না।"

বিনীতা চোখ মুছে বলল, "আমি পুলিশকে সব বলব। আমার শাস্তি হোক।"

রোমেনা বলল, "ফরগেট ইট বিনু! আমিও সুপর্ণের মৃত্যুর কারণ হতে পারতুম।"

রাতুল বলল, "আমিও হতে পারতুম।"

কিংশুকও বলল, "আমিও। অ্যাকসিডেন্ট ইজ অ্যাকসিডেন্ট। এতে কিছু করার নেই।"

দীপিতা ফুঁসে উঠল। "আমি এখানে এলে পাথর টানাটানি করতুম না। বিনু একটা ইডিয়ট!"

চন্দ্রকান্ত চোখ মুছে বললেন, "হয়তো ট্রাইব্যাল দেবতার অভিশাপ। আমরা নন-ট্রাইবালরা ওদের ওপর যুগ যুগ ধরে উৎপাত করেছি।"

কর্নেল বললেন, "এবার আমারা থানে নেমে যাই চলুন! এই শাড়ির আঁচলের টুকরোর মতো আর একটা জিনিস আপনাদের দেখাব। সেটা ঐ ডোবাটার কাছে ঝোপের ভেতর পড়ে আছে।"

বিনীতা বলল, 'আমার রুমালটা!"

সবাই নামতে থাকল। চন্দ্রকান্ত ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, "রুমাল ফেলে রেখেছিস কেন হতচ্ছাড়া মেয়ে?"

কর্নেল বললেন, "বিনীতার নার্ভ স্ট্রং। সে যখন দেখল, যা হবার হয়ে গেছে, তখন সে রুমালে সুপর্ণের মাথার রক্ত মাখিয়ে থানে ঘষে রক্তমাখা রুমালটা ওখানে ফেলে গিয়েছিল। নৃবিজ্ঞানের ছাত্রী। ট্রাইব্যাল রিচুয়্যাল কিলিং বা বলির খুঁটিনাটি তথ্য তার জানা।"

নীচে নেমে সেই ছোট্ট ডোবার ধারে একটা ঝোপ থেকে শুকনো রক্তমাখা রুমালটা কুড়িয়ে নিলেন কর্নেল। শুকনো পাতা কুড়িয়ে আগুন ধরালেন। সেই আগুনে আঁচলের টুকরো আর রুমালটা পুড়িয়ে দিলেন। হাসতে হাসতে বললেন, "প্রমাণ লোপও বেআইনি। কিন্তু অ্যাকসিডেন্ট।"

চন্দ্রকান্ত বললেন, "কিন্তু পুলিশ তো আদিবাসীদের ওপর খামোকা জুলুম চালাবে।"

কর্নেল বললেন, "নাহ্। আমি পুলিশকে বুঝিয়ে দেব, পাথরটা কোনও বুনো জন্তুর পায়ের চাপে হঠাৎ নিচে গিয়ে পড়েছে।"

"এ জঙ্গলে তো বুনো জন্তু নেই!"

"এ জঙ্গলে এখনও সম্বর আছে। আর সম্বরের স্বভাব হল শিঙ দিয়ে পাথর ওপড়ানো। এই দেখুন! গতরাতে এখানে এসে ফল্‌সের কাছে গাছের ডালে আমার ক্যামেরা পেতে রেখেছিলুম। শাটারে নাইলনের সুতো টানা ছিল জন্তুদের জল খেতে নামার পথে। সম্বরের পায়ে লেগে শাটার ক্লিক করেছে। ফ্লাশে চমৎকার ছবি উঠেছে।" কর্নেল একটা ছবি বের করলেন। "ভোরে ডেভালাপ করে প্রিন্ট করেও ফেলেছি। সব সরঞ্জাম আমার সঙ্গে থাকে, আপনি তো জানেন।"

সবাই ছবিটার দিকে ঝুঁকে পড়ল। একটা সম্বর শিঙ দিয়ে পাথর ওপড়ানোর চেষ্টা করছে ধারিয়া ফলসের ধারে।

চন্দ্রকান্ত বললেন, "হ্যাঁ সম্বরদের এ স্বভাব আছে। তবে ঠিক পাথর ওপড়ানোর চেষ্টা বলা ঠিক হবে না। আসলে ওরা—"

কর্নেল তাঁর কথার ওপর বললন, "আসলে ওরা শিঙ ধারালো করতে চায়। কিন্তু তা-ই করতে গিয়ে পাথর খসে পড়ে পাহাড়ের গা থেকে। আশাকরি, এই ছবি দেখে, মিঃ পাণ্ডে আমার থিওরি মেনে নেবেন। চলুন, এবার ফেরা যাক।"

অ্যান্টি-ড্রাগ ফরমুলা রহস্য
(কর্নেলের জার্নাল থেকে)

হোটেল দা শার্কের দোতলার ব্যালকনিতে বসে চুরুট টানছিলাম। তখন রাত প্রায় নটা! সামনে একটা বালিয়াড়ির ওধারে সমুদ্র। ডানদিকে টানা ঝাউবন চলে গেছে প্রায় আধ কিলোমিটার। সমুদ্রের শব্দের সঙ্গে ঝাউবনের শব্দ মিলেমিশে এক রহস্যময় অপার্থিব অর্কেস্ট্রা শোনা যায়। যত রাত বাড়ে, অর্কেস্ট্রা আরও রহস্যময় হয়ে ওঠে। তন্ময় হয়ে শুনছিলাম।

হঠাৎ ঝাউবনের ভেতর টর্চের আলোর ঝলকানি।

গত রাতেও এই আলোর ঝলকানি দেখেছি। ভেবেছিলাম কেউ বা কারা রাতের সমুদ্র দেখার জন্য বিচে বসেছিল। এতক্ষণে ফিরে আসছে। কোনও দম্পতি, কিংবা কোনও প্রেমিক-প্রেমিকা, অথবা কোন নিঃসঙ্গ মানুষ।

একটু পরে অবাক হলাম। আলোটা গত রাতে তিনবার জ্বলে উঠতে দেখেছি। আজও তেমনি তিনবার জ্বলল তারপর আর কোনও আলো জ্বলল না। ওদিকটা ঘন অন্ধকার। ঝাউবনটা এই হোটেলের সামনা-সামনি ডানদিকে যেখানে শুরু হয়েছে, সেখানে খোলামেলা বালিয়াড়ি। হোটেলের আলোয় জায়গাটা মোটামুটি স্পষ্ট দেখা যায়! ঝাউবন থেকে কেউ এলেই চোখে পড়ার কথা। কিন্তু কাল রাতের মতো আজও কাকেও দেখতে পেলাম না।

দিনে দেখেছি, ঝাউবন থেকে সোজা নেমে আসার কোনও পথ নেই। নিচে ঘন কেয়াবন আর গুল্মজাতীয় জঙ্গল। সাপের উৎপাত থাকা সম্ভব। সোজাসুজি জঙ্গল ভেঙে সমুদ্রের সমান্তরাল পিচ রাস্তায় ওঠা যায়। কিন্তু ভ্রমণবিলাসীদের পক্ষে সেটা রীতিমতো একটা অ্যাডভেঞ্চারের শামিল।

ধরা যাক, কেউ বা কারা অ্যাডভেঞ্চারের আনন্দ নিতে জঙ্গল ভেঙে রাস্তায় উঠল। কিন্তু হাতে যখন টর্চ আছে, তখন আলো সে জ্বালবেই।

অথচ আর আলোর পাত্তা নেই। দ্বিতীয়ত, আলোটা তিনবার জ্বলতে দেখলাম পর পর দুটো রাত।

কোনও গোপন সংকেত নাকি?

চন্দনপুর-অন-সিতে অ্যান্টি-ড্রাগ সেমিনারে যোগ দিতে এসেছি। উদ্বোধন করে গেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেমিনার ব্যাপারটা আমি মোটেও পছন্দ করি না কিন্তু

আমার এক বন্ধু ডঃ শক্তিপদ ব্রহ্মের অনুরোধ (তাঁর মাদক বিরোধী সমিতিই এর উদ্যোক্তা) ঠেলতে পারিনি। এ ছাড়া আরও একটা কারণ ছিল। চন্দনপুর-অন-সিতে সমুদ্রের বন্যতা আমাকে আকর্ষণ করে। কয়েকবারই নানা সুযোগে এখানে তাই এসেছি। এলাকাটা আমার নখদর্পণে।

আলোর ব্যাপারটা নিয়ে আর মাথা ঘামানো নিরর্থক! সমুদ্রের ক্রুদ্ধ গর্জন ঝাউবনে এসে যেন শোকের হাহাকারে পরিণত হচ্ছে, এর চেয়ে আকর্ষণীয় আর কি হতে পারে?

একটু পরে দরজায় কেউ নক করল। বিরক্ত হয়ে উঠে গেলাম। দরজা খুলে দেখি ডঃ ব্রহ্ম। বললেন, "শুয়ে পড়েছিলেন নাকি?"

বললাম, "নাহ্। আসুন।"

ডঃ ব্রহ্ম চাপা গলায় বললেন, "একটা জরুরি দরকারে আসতে হলো।"

দরজা এঁটে ওঁকে ব্যালকনিতে নিয়ে এলাম। বললাম, "আপনাকে একটু উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে। শরীর খারাপ নয় তো?"

ডঃ ব্রহ্ম আস্তে বললেন, "না। একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করছি দুদিন থেকে।"

"ঝাউবনে টর্চের আলো?"

"আলো? ঝাউবনে?" ডঃ ব্রহ্ম একটু থামলেন। "নাহ্। আলোটালো নয়। ডঃ মৈত্রের সঙ্গে যে মহিলা এসেছে, সম্ভবত উনি তাঁর স্ত্রী নন।"

একটু অবাক হয়ে বললাম, "আপনি অধ্যাপিকা মহিলার কথা বলছেন কি?"

"হ্যাঁ। প্রথমত, মহিলার পদবি দাশগুপ্তা। দ্বিতীয়ত, আমাকে ক্ষমা করবেন, অমিতা দাশগুপ্তাকে আমি এক যুবকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখে ফেলেছি। দে ওয়ার কিসিং ইচ আদার। পার্ভাটেড মহিলা।" ডঃ ব্রহ্মের কথার ঘৃণার ছাপ।

"যুবকটি কে?"

"ডঃ মৈত্রের সঙ্গে এসেছে। পঁচিশের মধ্যে বয়স। এদিকে ডঃ মৈত্র আমার বয়সী। পঞ্চাশোর্ধ্ব। স্ত্রী বলে পরিচয় দিয়েছেন অধ্যাপিকা দাশগুপ্তার। তাঁর বয়স তিরিশের বেশি নয়।"

হাসতে হাসতে বললাম, "তাতে কী? শুনুন ডঃ ব্রহ্ম, ওঁদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলিয়ে অকারণ—"

আমাকে থামিয়ে ডঃ ব্রহ্ম বললেন, "আমি একজন মর‍্যালিস্ট, কর্নেল সরকার। তাছাড়া এই অ্যান্টি-ড্রাগ ক্যাম্পেনে মর‍্যালিটির ওপর আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছি। এখন কথা হলো, সর্ষের মধ্যে ভূত থাকা কি বাঞ্ছনীয়? যুবকটিকে দেখে আমার সন্দেহ হয়, সে ড্রাগ-অ্যাডিক্ট। ওর চেহারা লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন।"

pathagar.net

চুরুটে জোরালো টান দিয়ে বললাম, "আমিও কতকটা ড্রাগঅ্যাডিক্ট নই কি ডঃ ব্রহ্ম? এই চুরুট এবং প্রচুর কফি আমার এই বয়সে ভীষণ ক্ষতিকর। তবু দেখুন, এ দুটো ছাড়লে আমার জীবন যেন অনুর্বর হয়ে যাবে। চিন্তাভাবনা থেমে যাবে মনে হয়—যা কি না যে কোনও নেশার ক্ষেত্রে একটা মানসিকতা।"

ডঃ ব্রহ্ম হাসলেন। "নাহ্ কর্নেল সরকার! চুরুট বা কফি নার্কোটিকসের আওতায় পড়ে না।"

বললাম, "যুবকটির নাম কী জানেন?"

"কৌশলে ডঃ মৈত্রের কাছে জেনে নিয়েছি। আশিস সেন। সে নাকি ডঃ মৈত্রের ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট। আপনি তো সেমিনারে ডঃ মৈত্রের মুখে শুনেছেন, উনি অ্যান্টিড্রাগ প্রবণতা সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা করছেন। মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা।"

"হ্যাঁ। একটা ওষুধ আবিষ্কার করতে চান। যা ইঞ্জেক্ট করলে নাকি ড্রাগ-অ্যাডিক্ট নেশা ছেড়ে দেবে এবং তার স্বাভাবিক দেহমন ফিরে পাবে।"

ডঃ ব্রহ্ম আস্তে বললেন, "যাঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট মাদকাসক্ত, তিনি কী করে অমন বড়-বড় কথা বলেন?"

"ডঃ ব্রহ্ম! এমন তো হত পারে উনি ওঁর অ্যাসিস্ট্যান্টের ওপর নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন?"

ডঃ ব্রহ্ম একটু চুপ করে থেকে বললেন, "মে বি। বাট আই কান্ট টলারেট দ্যাট পার্ভাটেড লেডি-অধ্যাপিকা অমিতা দাশগুপ্তা! সেমিনার কাল শেষ হচ্ছে। কলকাতায় ফিরে মহিলার মেম্বারশিপ ক্যান্সেলের জন্য মিটিং ডাকব।"

বলেই ডঃ ব্রহ্ম "গুডনাইট" জানিয়ে চলে গেলেন। জানি প্রচণ্ড নীতিবাগীশ মানুষ উনি। ডঃ মৈত্র আমার সঙ্গে কথা না বললেও কিংবা কেউ পরিচয় করিয়ে না দিলেও আশিসকে আমি লক্ষ্য করেছি। শান্ত উদাসীন প্রকৃতির যুবক। সম্ভবত কবিতা লেখে। কারণ ওর হাতে কবিতার বই দেখেছি। আজকাল শুধু কবিরাই কবিতা পড়ে।

কিন্তু তার চেহারায় মাদকাসক্তের ছাপ তো লক্ষ্য করিনি।

ডঃ ব্রহ্ম তাকে এবং মিসেস দাসগুপ্তকে চুমু খেতে দেখেছেন! সত্যিই দেখেছেন, নাকি—

দরজায় আবার কেউ নক করল।

খুলে দেখি, ডঃ সুদর্শন মৈত্র। নমস্কার করে বললেন, অসময়ে একটু বিরক্ত করতে এলাম।"

"না, না। আমি এগারোটার আগে শুই না। আসুন।"

ব্যালকনিতে বসে ডঃ মৈত্র একটু হেসে বললেন, "দেশবিদেশে কর্নেল

pathagar.net

নীলাদ্রি সরকার রহস্যভেদী হিসেবে সুপরিচিত। এ হেন মানুষের কাছে যদি একটা রহস্যভেদের জন্য অনুরোধ জানাই, আশা করি বিমুখ করবেন না।"

একটু গম্ভীর হয়ে বললাম, "দেখুন ডঃ মৈত্র, আমার বয়স হয়েছে। দাড়ি এবং টাকের অবস্থা লক্ষ্য করুন।"

ডঃ মৈত্র প্রায় অট্টহাসি হাসলেন এবার। "আমি জানি, এ বয়সেও আপনি সিংহের চেয়ে শক্তিমান! এনিওয়ে, আমার রহস্যটা সামান্য।"

অগত্যা বললাম, "বলুন ডঃ মৈত্র।"

ডঃ মৈত্র চাপা স্বরে বললেন, "এই সেমিনারটা হোক্স বলে মনে হচ্ছে আমার। এই উদ্যোক্তা মাদকবিরোধী সমিতি। তার চেয়ারম্যান ডঃ শক্তিপদ ব্রহ্ম গত রাতে এবং আজ কিছুক্ষণ আগে চুপিচুপি কোথায় বেরিয়েছিলেন? উনি বেরিয়ে যাওয়ার পরই বা, ওই ঝাউবনে তিনবার আলোর সিগন্যাল দেখা যায় কেন?"

চমকে উঠলাম। কিন্তু উত্তেজনা চেপে বললাম, "আপনি কি ওঁর প্রতি লক্ষ্য রাখেন?"

"রাখি বলতে পারেন।"

"বিশেষ কোনও কারণ আছে?"

"আছে। এখানে গত পরশু আমি সস্ত্রীক পৌঁছেছি—"

জাস্ট আ কোয়েশ্চন, প্লিজ আনসার ইট। আপনার স্ত্রী আপনার পদবি নেননি, এর কারণ কি নেহাত অফিসিয়্যাল অর টেকনিক্যাল?"

"দ্যাটস রাইট কর্নেল সরকার। আমরা একটু দেরিতে বিয়ে করেছি। সদ্য দুমাস আগে। এবার গিয়ে নোটারি পাবলিকের থ্রু দিয়ে কোর্টে অমিতা এফিডেবিট দিয়ে পদবি বদলাবে।"

"হুঁ, বলুন!"

"গত পরশু পৌঁছে ক্যান্টিনে খেতে গিছলাম। আমরা উঠেছি স্যুট নাম্বার ফোরে। নিচের তলায়। তো খেয়ে ফিরে দেখি, আমার ব্রিফকেস খোলা। ওতে আমার সেমিনার পেপারের দশটা কপি ছিল। একটা নেই। কাকেও বলিনি। সামান্য ব্যাপার। ভাবলাম আমারও ভুল হতে পারে। যাই হোক, গতকাল বিকেলে দেখি ডঃ ব্রহ্মের ঘরের পেছনে সেই পেপার—মোট ছটা জেরক্স করা পাতা কুঁচিকুঁচি হয়ে পড়ে আছে। আজ মর্নিং সেসনে ডঃ ব্রহ্ম আমার থিম নিয়েই বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। হাউ ইট ইজ পসিবিল? ওঁর সাবজেক্ট তো সম্পূর্ণ আলাদা!"

"আপনার অ্যাসিস্ট্যান্টকে সঙ্গে এনেছেন দেখেছি!"

"হ্যাঁ। আশিস অত্যন্ত বিশ্বাসী ছেলে।"

একটু ভেবে নিয়ে বললাম, "আমি কী করতে পারি, বলুন ডঃ মৈত্র?"

pathagar.net

ডঃ মৈত্র ফিসফিস করে বললেন, "ডঃ ব্রহ্ম সম্ভবত এখান সেমিনারের ছলে ড্রাগপাচারকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে এসেছেন! আপনি ওঁর দিকে লক্ষ্য রাখুন!"

ডঃ মৈত্র তখনই চলে গেলেন।...

কলকাতা ছেড়ে বাইরে গেলেই মর্নিংওয়াক না করে পারি না। সঙ্গে থাকে প্রজাপতিধরা নেট এবং স্টিক। স্টিকটি ছড়ির মতো ব্যবহার করা যায়। বাইনোকুলার এবং ক্যামেরাও গলা থেকে ঝোলে। ভোর ছ'টায় উঠে বেরিয়ে পড়েছিলাম। পিচরাস্তা ধরে এক কিলোমিটার হেঁটে বাঁদিকে গুল্মঝোপ ভেঙে বালিয়াড়িতে উঠলাম। আধ কিলোমিটার হাঁটার পর ঝাউবনের ভেতর দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখলাম। সমুদ্র থেকে হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড লাল চাকা এক লাফে আকাশে উঠল। আদিগন্ত সমুদ্র লাল হয়ে গেল। এ এক অলৌকিক দৃশ্য!

ক্যামেরায় ছবি তুলে ঝাউবনের ভেতর দিকে হাঁটতে থাকলাম। ঝাউবনের মাটিতে অজস্র পায়ের ছাপ। অনেকখানি হাঁটার পর বাঁদিকের নিচে কেয়াঝোপে একপাটি স্লিপার চোখে পড়ল। লাল দু'ফিতের মেয়েদের স্লিপার।

স্লিপারটা ছেঁড়া নয়। তাই নেমে গিয়ে ওটা কিছুক্ষণ খুঁটিয়ে দেখলাম। তারপর হঠাৎ মাথায় একটা অদ্ভুত খেয়াল চাপল। ওটা কুড়িয়ে নিয়ে বালিতে পুঁতে একটা শুকনো ডাল ফেলে রাখলাম, যাতে পরে জায়গাটা চিনতে পারি।

জানি না কেন এটা করলাম।

আবার ঝাউবনে উঠে কয়েক পা হাঁটার পর চোখে পড়ল বাঁদিকে, নিচে একটা কাঁটাঝোপে কী একটা জিনিস আটকে আছে। সূর্যের প্রথম আলোয় ইঞ্চি দুই লম্বা জিনিসটা ঝিকমিক করছে। নেমে গিয়ে দেখি, নীল শাড়ির একটু অংশ।

কিন্তু ওই অংশটুকু কোনও পুরনো শাড়ির নয়। তুলে নিয়ে টেনে দেখলাম, আমার ধারণা ঠিক। ফাইবারগুলো শক্ত এবং সিন্থেটিক ফাইবার।

তারপরই মনে পড়ে গেল, অধ্যাপিকা অমিতা দাশগুপ্তার পরনে গতকাল বিকেলে নীল শাড়ি দেখেছিলাম।

ব্যাপারটা খতিয়ে দেখা দরকার। কাপড়টুকু পকেটস্থ করলাম। তারপর আবার ঝাউবনে উঠে কিছুটা এগিয়ে ডাইনে সমুদ্রের বিচে নেমে গেলাম।

বিচে ভিড় জমে গেছে। প্রথম সকালের টাটকা সমুদ্র দেখার নেশা মানুষজনকে পেয়ে বসেছে। নুলিয়ারা কাঠের ভেলা ভাসিয়ে ব্রেকওয়াটার পেরিয়ে মধ্যসমুদ্রে পৌঁছুনোর জন্য লড়াই করছে। সমুদ্র ওদের ঠেলে ফেলে দিচ্ছে। কিন্তু ওরা সমুদ্রে যাবেই যাবে। না গেলে সারাদিন উপোস।

ভিড় থেকে দূরে একলা দাঁড়িয়ে আছেন ডঃ শক্তিপদ ব্রহ্ম। কাছে গেলে আমাকে দেখে সম্ভাষণ করলেন, "গুড মর্নিং!"

"মর্নিং ডঃ ব্রহ্ম!"

ডঃ ব্রহ্ম বাঁকা হেসে আমাকে ইশারায় দেখালেন, ডঃ মৈত্র এবং আশিস পুরনো লাইটহাউসের দিকে এগিয়ে চলেছেন। লাইটহাউসটা পূর্বে এবং এখান থেকে বড় জোর শ'পাঁচেক মিটার দূরে। বাইনোকুলারে ওঁদের দেখে একটু উদ্বিগ্ন হলাম। দুজনের মুখের একটা পাশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। লেন্স অ্যাডজাস্ট করলে মুখের অংশ আরও স্পষ্ট হলো। দুটি মুখেই কী এক বিহ্বলতার ছাপ। দুজনে লাইটহাউসের ওধারে অদৃশ্য হলেন।

ডঃ ব্রহ্ম আস্তে বললেন, "কী বুঝলেন বলুন কর্নেল সরকার?"

বাইনোকুলার নামিয়ে রেখে বললাম, "কিছু বুঝলাম না।"

"আপনি বাইনোকুলারে দেখেও কিছু বুঝলেন না?" হাসলেন ডঃ ব্রহ্ম। "আমি কিন্তু বুঝেছি।"

"কী বুঝেছেন?"

"মান-অভিমানের পালা চলেছে। শ্রীমতী সম্ভবত রাগ করে ওখানে কোথাও বসে আছেন!"

"দেখেছেন যেতে?"

মাথা নাড়লেন ডঃ ব্রহ্ম। নাহ্। ওইরকমভাবে দুই পুরুষের যাওয়া দেখে তা-ই মনে হচ্ছিল।"

একটু ভেবে নিয়ে বললাম, "আচ্ছা ডঃ ব্রহ্ম, শুনেছি ডঃ মৈত্র যে গবেষণাটা করছেন, সেটা নাকি বৈপ্লবিক ব্যাপার ঘটাবে?"

"বোগাস। আমার ধারণা, ভদ্রলোক বিদেশ থেকে কারও থিসিস চুরি করে এনেছেন।"

হাসতে হাসতে বললাম, "আপনি ওঁর ওপর কেন যেন রুষ্ট!"

"হব না রুষ্ট?" ডঃ ব্রহ্ম প্রায় খেঁকিয়ে উঠলেন। "একে-ওকে বলে বেড়াচ্ছেন আমি ওঁর সেমিনার পেপারের কপি চুরি করে সেটা নষ্ট করেছি।"

'কীভাবে নষ্ট করেছেন?"

ডঃ ব্রহ্ম অনিচ্ছাসত্ত্বেও হাসলেন। "ছিঁড়ে কুঁচিকুঁচি করেছি নাকি। আমার ধারণ, ওই ছোকরাকে দিয়ে একটা কপি ছিঁড়ে ডঃ মৈত্র আমার ঘরের জানালার পেছনে ফেলতে বলেছিলেন।"

"কুঁচিগুলো পড়েছিল তাহলে?"

"ছিল। এটাই আশ্চর্য! কেন আমি ওসব ট্র্যাপে হাত দিতে যাব বলুন। আমার সাবজেক্ট তো আলাদা।"

"ডঃ ব্রহ্ম, ওঁর সঙ্গে আপনার কতদিনের পরিচয়?"

"মুখোমুখি আলাপ এখানে এসে। ওঁর নাম রেকমেন্ড করেছিলেন আমাদের সমিতির একজন মেম্বার। আমি ভুল করে ফেলেছি।"

"অধ্যাপিকা দাশগুপ্তার সঙ্গে মুখোমুখি আলাপ কতদিন আগে?"

"মাস তিনেক। উনি কাগজে সমিতির বিজ্ঞাপন দেখে যোগাযোগ করেছিলেন।"

"তখন উনি অবিবাহিতা ছিলেন কি?"

"হ্যাঁঃ" বলে ডঃ ব্রহ্ম পা বাড়ালেন। "আসি কর্নেল সরকার! সকাল ন'টায় সভা বসবে। প্রিপারেশন দরকার। আপনি এই সেশনে অবশ্য থাকবেন যেন।"

ডঃ ব্রহ্ম চলে গেলেন। বাইনোকুলারে আবার লাইটহাউসের দিকটা দেখছিলাম। ডঃ মৈত্র ফিরে আসছেন। পেছনে আশিস সেন। দুটি মুখ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। উদ্বেগের ছাপ গাঢ়। মনে মনে চাইছিলাম, এই সুন্দর সকালে যেন কোনও দুঃসংবাদ শুনতে না হয়।

একটু পরে ওঁরা মোড় নিয়ে বালিয়াড়িতে উঠলেন। তখন ওঁদের অনুসরণ করলাম। হোটেল দা শার্কের কাছাকাছি গিয়ে ওঁদের নাগাল পেলাম। বললাম, "গুড মর্নিং ডঃ মৈত্র!"

ডঃ মৈত্র আস্তে বললেন, "মর্নিং!"

"আপনারা লাইটহাউস দেখতে গিয়েছিলেন!"

আশিস কী বলতে ঠোঁট ফাঁক করেছিল। ডঃ মৈত্র তাকে ইশারায় চলে যেতে বললেন। সে চলে গেল। পিচরাস্তার মোড়ে আমরা দাঁড়িয়ে ছিলাম। সেপ্টেম্বরের ঝলমলে সূর্য হঠাৎ মেঘে চাপা পড়ল। ডঃ মৈত্র আমার দিকে কেমন চোখে তাকিয়ে বললেন, "একটা গণ্ডগোলে পড়েছি কর্নেল সরকার!"

"আপনার স্ত্রী—"

আমার কথার ওপর ডঃ মৈত্র বললেন, "ঘুম থেকে উঠে তাঁকে খুঁজে পাচ্ছি না। হোটেলের কেউ তাকে বেরিয়ে যেতে দেখেনি। অবশ্য আমার স্যুটের পেছনে বাউন্ডারি ওয়ালের খানিকটা অংশ ভাঙা। একজন মানুষ অনায়াসে গলে যেতে পারে।

"রাত্রে কি আপনাদের মধ্যে—সরি! আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলানো অনুচিত!"

ডঃ মৈত্র আস্তে গম্ভীর মুখ বললেন, "আপনি প্রশ্নটা তুলতেই পারেন। কারণ আপনি একজন রহস্যভেদী। গত রাতে আপনার ঘর থেকে ফেরার পর অমিতার সঙ্গে আমার একটু তর্কাতর্কি বেধেছিল। কী নিয়ে, তা-ও বলা দরকার। অমিতা আমার পেপারস হাতড়ে কিছু খুঁজছিল। আশিস ইশারায় সেটা বুঝিয়ে না দিলে জানতে পারতাম না। এই ছেলেটা আমার প্রহরী বলতে পারেন। সে পাশের সিঙ্গলরুমে থাকে।"

"আশিস—" একটু অবাক হয়ে বললাম, "আশিস কি বোবা-কালা?"

"ঠিক ধরেছেন। কিন্তু সে মূক-বধির স্কুলে পড়াশুনা করেছে। সাইন-ল্যাংগুয়েজে কথা বলতে পারে। ওই সাইন-ল্যাংগুয়েজ আমিও জানি।"

"হুঁ, আশিস কীভাবে জানল, মিসেস অমিতা আপনার পেপার হাতড়ে কিছু খুঁজছিলেন?"

"আশিস তখন আমাদের স্যুটে ছিল। বোবাকালা বলে অমিতা তাকে গ্রাহ্য করেনি।" ডঃ মৈত্র পা বাড়ালেন হোটেলের দিকে। "আমি অবশ্য অমিতাকে সেজন্য তত কিছু বলিনি। শুধু বলেছিলাম, কোনও পেপার দরকার হলে আমাকে বললেই তো হয়। তার কাছে আমার গোপনীয় কিছু থাকতে পারে না। অমিতা কেন কে জানে, ভীষণ চটে গেল।"

"আপনারা লাইটহাউসের দিকে ওঁকে খুঁজতে গেলেন কেন?"

ডঃ মৈত্র নীচের দিকে দৃষ্টি রেখে হাঁটছিলেন। বললেন, "কাল বিকেলে আশিসকে নিয়েই অমিতা ওখানে গিয়েছিল। তাই ভাবলাম—যাই হোক, মর্নিং সেশনে যাচ্ছেন তো?"

"নাহ্! আমি এ বেলা প্রজাপতির ছবি তুলতে বেরুব। কেয়াবনের দিকটায় অনেক প্রজাপতি দেখেছি।"

pathagar.net

"কখন বেরুবেন?"

"ব্রেকফাস্ট করার পর।"

"আমি মর্নিং সেশন মিস করব না। আর মিনিট পনের দেরি। আপনি কাইন্ডলি দেখবেন, যদি অমিতা ওদিকে গিয়ে থাকে।"

ওঁর কথার ওপর বললাম, "অবশ্যই।...

ব্রেকফাস্ট করে সাড়ে আটটায় বেরোলাম। সেই জুতো পড়ে থাকা জায়গাটা তন্নতন্ন খুঁজে আর কিছু দেখতে পেলাম না। ঝাউবনে উঠে কিছুটা চলার পর হঠাৎ কী একটা চকচকে জিনিস আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। জিনিসটা একটা ঝাউগাছের গোড়ায় পড়ে আছে। রোদে চকচক করছে। কাছে গিয়ে দেখি, একটা ঘড়ি। চেন খুলে পড়ে গেছে কারও হাত থেকে। ঘড়িটা জাপানি এবং বেশ দামী। পুরুষদের মতো ঘড়ি মেয়েরাও অনেকে আজকাল পরেন।

পকেটে চালান করে চারপাশটা খুঁটিয়ে লক্ষ্য করলাম। টের পেলাম আমি উত্তেজিত। প্রায় আধঘণ্টার বেশি প্রাণীর চোখে খোঁজাখুঁজি করে হাল ছেড়ে দিলাম। এতক্ষণে প্রশ্নটা তীব্র হয়ে বিঁধছিল—অধ্যাপিকা অমিতা দাশগুপ্তাকে কি খুন করা হয়েছে গতরাতে?

দু কিলোমিটার দূরে একটা নদী এসে সমুদ্রে মিশেছে। সেখানে বার্ডস স্যাংচুয়ারি। অনেকক্ষণ পাখি দেখে এবং ফিল্মের একটা রোল প্রায় শেষ করে ছবি তুলে পিচ রাস্তা ধরে ফিরছিলাম হোটেলের দিকে। এক কিমি আসার পর ডাইনে বালিয়াড়ি ও ঝাউবনের মিলনস্থলে দেখি, কয়েকটা শকুন বসে আছে। থমকে দাঁড়ালাম। আকাশে আরও এক ঝাঁক শকুন। ডানার শব্দ করে একে-একে এসে বসছে। ব্যাপারটা দেখতে হয়।

এখানে কয়েকটা কাঠবাদামের গাছ আছে। শকুনগুলো সেইসব গাছে বসে আছে। গুল্মঝোপের ভেতর অতি কষ্টে এগিয়ে গেলাম। খানিকটা জায়গা বালিতে ভর্তি। কোনও গাছ বা এক চিলতে ঘাসও গজায়নি। একদঙ্গল কুকুর বালি আঁচড়াচ্ছে। প্রজাপতি ধরা নেটের স্টিক দিয়ে কুকুরগুলোকে তাড়ালাম। তারপর থমকে দাঁড়ালাম।

একরাশ কালো চুল বেরিয়ে পড়েছে। দেখে আমার মাথার ভেতর ঠাণ্ডা হিম টিল-গড়িয়ে গেল। পিঠের কিটব্যাগ থেকে ভাঁজ করা ছুরি বের করলাম। অনেক কাঁটাঝোপ কেটে ভালো করে পুঁতে দিলাম চারদিকে।

হোটেলে ফিরেই ফোন করলাম পুলিসকে। তখন সেমিনার পুরোদমে চলেছে সরকারি মেরিন হাউসের হলঘরে। সাড়ে এগারোটা বাজে। পুলিশ অফিসার পি আর দাস আমার পরিচিত। ব্যাপারটা আমার কাছে জেনে নিয়ে জিপ ছুটিয়ে অকুস্থলে গেলেন। আমি গেলাম না। বোবাকালা যুবকটিকে খুঁজছিলাম। একটু পরে বাইনোকুলারে দেখালম সে সি-বিচে দাঁড়িয়ে আছে। তার কাছে চলে গেলাম।

বোবা-কালাদের দু'হাতের আঙুলের সাহায্যে সাইন-ল্যাংগুয়েজ শেখানো হয়। আমার সব বিষয়ে একটু বাতিক বা নেশা আছে। দেখা যাক, ওর সঙ্গে চিহ্ন-ভাষায় কথা বলতে পারি কি না। আমার নিজের প্রতিভায় নিজেই অবাক হলাম। সে চমৎকার সাড়া দিল। সেই চিহ্ন-ভাষায় আলাপটা এরকম

"তোমার নাম কি আশিস?"

"হ্যাঁ। আপনি কে?"

"কর্নেল নীলাদ্রি সরকার।" নামটা বোঝাতে অনেক কসরত করতে বলো। মিলিটারি ব্যাপারটা সে ভালোই বুঝল। তবে অসবরপ্রাপ্ত জেনে একটু হতাশ হলো।

সে আমার সম্পর্কে আরও জানতে চাইছিল। তাকে সরাসরি অধ্যাপিকার কথা বললাম। সে বলল, "উনি হয়তো রাগ করে চলে গেছেন।"

কিটব্যাগ থেকে একপাটি স্লিপার, শাড়ির টুকরো এবং ঘড়িটা দেখালাম। অমনি ও ভীষণ উত্তেজিত হয়ে সাইন-ল্যাংগুয়েজ ছেড়ে গলার ভেতর অদ্ভুত শব্দ করতে থাকল। তারপর দৌড়ে চলে গেল। পিচ রাস্তায় গিয়ে সে সেমিনার হলের দিকে ছুটল। আমি হতাশ হয়ে নিজের স্যুটে ফিরে এলাম।...

সারা চন্দনপুর-অন-সি ভেঙে পড়েছিল। সবখানে ভিড়, জটলা, জল্পনাকল্পনা। ডঃ মৈত্রের অভিযোগে পুলিশ ডঃ ব্রহ্মকে গ্রেফতার করল। গ্রেফতারের অবশ্য ভিত্তি ছিল। ডঃ ব্রহ্মের ঘরে ডঃ মৈত্রের হারিয়ে যাওয়া একটা অ্যান্টি-ড্রাগ মানসিকতা তৈরির ওষুধের ফরমুলা পাওয়া গেছে। ডঃ ব্রহ্ম তীব্র আপত্তি জানিয়ে বলছিলেন, "ডঃ মৈত্র ওটা আশিস বা ওঁর স্ত্রীকে দিয়ে পাচার করেছেন।"

কিন্তু আশিস বোবাকালা। সে সাইন-ল্যাংগুয়েজে জানাল, কাজটা সে করেনি। আর মৃতা অমিতার মুখ থেকে জানার কোনও উপায় নেই। তবে আরও সাংঘাতিক প্রামাণ হলো, ঘড়িটা ডঃ ব্রহ্মেরই। ডঃ মৈত্র আমাকে সাক্ষী মেনে রাতের ঝাউবনে আলোর সংকেতের কথাও পুলিশকে জানিয়েছিলেন।

বিকেলে বেড়াতে বেরিয়ে দেখি, ডঃ মৈত্র এবং আশিস লাইটহাউসের দিকে চলেছেন। অনেকটা ঘুরে বালিয়াড়ির আড়ালে ওদের অনুসরণ করলাম।

লাইটহাউসের নিচেই সমুদ্র। অনেক পাথর পড়ে আছে। তাই ওখানে ব্রেকওয়াটারের গর্জন এবং আস্ফালন প্রচণ্ড। হঠাৎ দেখলাম, আশিস ডঃ মৈত্রকে ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করল। ডঃ মৈত্র টাল খেয়ে একপাশে পড়লেন। তারপর দৌড়ে পালিয়ে এলেন।

আশিস চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

এর কী ব্যাখ্যা হতে পারে? ডঃ মৈত্র চলে আসার পর আমি আশিসের কাছে গেলাম। আমাকে দেখে সে সাইন-ল্যাংগুয়েজে বলল, "ডঃ মৈত্র আমাকে একটু হলেই নিচে ফেলে দিতেন।"

অবাক হয়ে বললাম, "কিন্তু আমি তো দেখছিলাম তুমিই ওঁকে ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলার চেষ্টা করছিলে!"

"আপনি ভুল দেখেছেন। উনি আমাকে ফেলে দিচ্ছিলেন। আমি বাধা দিয়েছি।"

"আশিস! তুমি কি অমিতাকে ভালোবাসতে?"

আশিস হকচকিয়ে গেল এই আকস্মিক প্রশ্নে। একটু পরে তার চোখে জল দেখলাম। সে বলল, "হ্যাঁ।"

"উনি তো তোমার চেয়ে বয়সে বড়।"

"না। আমরা প্রায় সমবয়সী।" সে বয়সও বুঝিয়ে দিল। তার বয়স আঠাশ বছর। অমিতাকে একটু বয়স্ক দেখালেও তার বয়স সাতাশ বছর ন-দশ মাসের বেশি নয়। আশিস আরও বলল, "তার সঙ্গে অমিতার বিয়ের কথা ছিল। অমিতার ইচ্ছা সেটা। কিন্তু অমিতার মা বোবাকালার সঙ্গে সুশিক্ষিতা মেয়ের বিয়েতে আপত্তি তোলেন। আত্মহত্যার ভয় দেখান। তাই আমিই অমিতাকে নিবৃত্ত করেছিলাম। দু'মাস আগে ডঃ মৈত্রের সঙ্গে অমিতার আলাপ-পরিচয় হয়। আমিই অমিতাকে বলি, ওঁকে বিয়ে করো। তোমার বিদেশে গিয়ে রিসার্চের

Pathagar.net

সুযোগ হবে। তারপর অমিতার কথায় আমাকে ডঃ মৈত্র ল্যাবরেটারি অ্যাসিস্ট্যান্ট করে নেন।”

“আশিস! রাতে ঝাউবনে কোনও আলো দেখেছ? গত রাত এবং আগের রাতে?”

“না।”

“ডঃ ব্রহ্মের সম্পর্কে তোমার ধারণা কী?”

“নাক-গলানে লোক। খুব নীতিবাগীশ।”

“অমিতাকে কি তিনি খুন করতে পারেন?”

একটু চুপ করে থেকে আশিস জানাল, তেমন কোনও কারণ সে খুঁজে পাচ্ছে না।

“তোমাদের উনি গোপনে পরস্পরকে চুমু খেতে দেখেছেন।”

“তাতে কী? বেশ করেছি।”

“ডঃ মৈত্র ঈর্ষাবশে অমিতাকে খুন করতে পারেন কি?”

“জানি না। তবে ডঃ মৈত্র ভীতু লোক। অমিতাকে ভয় করে চলতেন।”

একটা চুরুট ধরিয়ে নিতে অসুবিধা হচ্ছিল। প্রচণ্ড বাতাস। লাইটহাউসের আড়ালে গেলাম। সেই সময় আশিস হন্হন্ করে চলে গেল।

ডঃ ব্রহ্ম কি উগ্রনীতিবাগীশ বলেই অমিতাকে সহ্য করতে পারছিলেন না? নাহ্, এই তুচ্ছ কারণে কেউ নরহত্যা করতে পারে না। দ্বিতীয় এবং খাঁটি কারণ হলো, অ্যান্টি-ড্রাগ ওষুধ তৈরির ফরমুলা ডঃ মৈত্রের ঘর থেকে চুরি করার সময় সম্ভবত অমিতা দেখে ফেলেছিলেন ডঃ ব্রহ্মকে?...

সেমিনার বন্ধ হয়ে গেছে। পণ্ডিতজনেরা সবাই লাঞ্চের পর বাসে বা নিজের গাড়িতে ফিরে গেছেন। ডঃ মৈত্রকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, আশিসকে খুঁজে পাচ্ছেন না এবং তিনি ভীষণ উদ্বিগ্ন। পুলিশকে জানাবেন ভাবছেন।

লাঞ্চের পর একটু জিরিয়ে নিয়ে থানায় গেলাম। পুলিশ অফিসার মিঃ দাস আমাকে সম্ভাষণ করে বললেন, “হাই ওল্ড বস! আপনিই যেখানেই যান, সেখানেই ডেডবডি পড়ে বলে পুলিশমহলে কিংবদন্তি চালু আছে। আশা করি, খুনখারাপির গন্ধ পেয়ে চন্দপুর-অন-সিতে হাজির হননি?”

“নাহ্। সেমিনারে আমাকে যোগ দিতে অনুরোধ করেছিলেন ডঃ ব্রহ্ম।”

“কর্নেল! প্লিজ, একটু ঝেড়ে কাসুন।”

“কিছু বুঝতে পারছি না মিঃ দাস। আমি ডঃ ব্রহ্মের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।”

“এখনই ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। ওঁকে এখন জেরা করা হচ্ছে!”

কিছুক্ষণ পরে হাজতে ঢুকলাম। ডঃ ব্রহ্ম গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমাকে দেখে হাউমাউ করে ছেলেমানুষের মতো কেঁদে ফেললেন।

বললাম, "ডঃ ব্রহ্ম আপনি একজন পণ্ডিত মানুষ। ভেঙে পড়া আপনার শোভা পায় না! আমার প্রশ্নের জবাব দিন। প্লিজ, যা বলবেন, সত্য বলবেন।"

"বলুন, কী জানতে চান।" ডঃ ব্রহ্ম চোখ মুছে বললেন, "আমি মিথ্যাবাদী নই।"

"আপনার ঘড়ি ওখানে গেল কী করে?"

"ঘড়িটা গতরাতে আপনার ঘরে যাওয়ার সময় টেবিলে খুলে রেখেছিলাম। ফিরে এসে পাইনি। কিন্তু এ নিয়ে হইচই করিনি। শুধু ম্যানেজারকে বলেছিলাম কথাটা। ম্যানেজার বলেছিলেন, এমন অভিযোগ এই প্রথম পেলাম। আমাদের কর্মচারীরা বিশ্বস্ত। তবে জিজ্ঞেস করে দেখব।"

"ঝাউবনে রাতে কোনও আলো দেখেননি বলছিলেন আমাকে।"

"হ্যাঁ কোনও আলো দেখিনি।"

"কিন্তু ডঃ মৈত্র দেখেছিলেন।"

"দেখতে পারেন।"

"ওঁর ওষুধের ফরমুলা আপনার ঘরে গেল কী করে?"

"বলেছি। আশিস বা অমিতা দাশগুপ্তা—" বলে চুপ করলেন ডঃ ব্রহ্ম। একটু পরে বললেন, "মনে পড়ছে। গতকাল ইভনিংয়ে অমিতা এসেছিলেন আমার সঙ্গে আজ সকালের সেশান নিয়ে আলোচনা করতে। তখনই রেখে যেতে পারেন স্বামীর হুকুমে।"

pathagar.net

"কে অমিতাকে খুন করে পুঁতে রেখে আসতে পারে বলে আপনার ধারণা?'

"ডঃ মৈত্র।"

"কেন?"

"স্ত্রী ব্যভিচারিণী। এটাই কি যথেষ্ট কারণ নয়?"

"থ্যাংকস ডঃ ব্রহ্ম! চলি?"

বিকেলে হাঁটতে হাঁটতে সেখানে গেলাম, যেখানে অমিতার লাশ পুঁতে রাখা হয়েছিল। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে—হয়তো ইনটুইশন, হঠাৎ মনে হলো, কেউ আমাকে দেখছে। তখনই বাইনোকুলারে চারদিক খুঁটিয়ে দেখতে থাকলাম। সামনে কিছু দূরে বাঁদিকে কেয়াঝোপের আড়ালে কেউ বসে আছে। সে আমার দিকে ঘুরলে দেখি, আশিস। তার হাতে একটা ভোজালি। চমকে উঠলাম।

একটা ঘন ঝোপের আড়ালে হুমড়ি খেয়ে বসে পড়লাম।

একটু পরে দেখি হনহন্ করে ডঃ মৈত্র এগিয়ে আসছেন ঝাউবনের দিক থেকে। তাঁর হাতে রিভলভার। এদিক-ওদিক তাকিয়ে কাকে খুঁজছেন যেন। খুঁজতে খুঁজতে নিচের জঙ্গলে নামলেন। তারপর যেখানে অমিতার লাশ পোঁতা ছিল, তার একটু তফাতে গুঁড়ি মেরে বসে জুতোয় ডগা দিয়ে বালি সরাতে থাকলেন। একটা ব্রিফকেস বেরুল। ব্রিফকেসটা বাঁ হাতে তুলে নিয়ে উঠে

দাঁড়িয়েছেন, আশিস ভোজালি হাতে গুঁড়ি মেরে বেরিয়ে এল। ডঃ মৈত্রের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, "ডঃ মৈত্র।"

দুজনেই ঘুরলেন আমার দিকে। আশিস আমাকে দেখে পালাতে যাচ্ছিল। ডঃ মৈত্র তার দিকে রিভলভার তাক করলে আবার বললাম, "ডঃ মৈত্র!"

আশিস পালিয়ে গেল। ডঃ মৈত্র বললেন, "দেখুন! দেখুন শয়তানটার কীর্তি! আমাকে খুন করার জন্য এখানে ওত পেতে বসেছিল। কারণ ও জানত, অমিতার হারানো ব্রিফকেস খুঁজতে আমি এখানে আসব! তবে আমিও তৈরি হয়ে এসেছিলাম।"

"রিভলভারটা আমাকে দিন ডঃ মৈত্র। নইলে আপনার রিভলভার ধরা হাতে আমি গুলি করব।"

আমার হাতে রিভলভার দেখে ডঃ মৈত্র তাঁর রিভলভার ফেলে দিলেন। এগিয়ে গিয়ে সেটা কুড়িয়ে কিটব্যাগে ঢোকালাম। তারপর ডঃ মৈত্রের শার্টের কলার খামচে ধরলাম আচমকা। ডঃ মৈত্র বললেন, "এ কী!"

"ডঃ মৈত্র! স্ত্রী হত্যার অভিযোগে আপনাকে গ্রেফতার করা হবে। চুপচাপ আমার সঙ্গে চলুন।"

"আশ্চর্য! কী বলছেন আপনি!"

"ঝাউবনে আলোর সিগন্যাল দিয়ে আপনি আমাকে বোকা বানাতে চেয়েছিলেন। অমিতার অ্যান্টি-ড্রাগ ওষুধের ফরমুলা চুরির জন্য আপনি তাকে বিয়ে করেছিলেন। জানতেন, আপনার স্ত্রী আশিসের প্রতি আসক্ত। তবু আপনার মনে বিকার ঘটেনি। গত রাতে ঝাউবনে আলো জ্বেলে তারপর আপনি আমার কাছে গিয়েছিলেন। তারপর অমিতাকে ঘুমন্ত অবস্থায় ইঞ্জেকশন করে মেরে তার বডি পেছনের বাউন্ডারি ওয়ালের ভাঙা জায়গা দিয়ে বাইরে ফেলেন। সেখানে কিছু চিহ্ন আছে।"

মিঃ দাসকে আভাস দিয়ে এসেছিলাম। তাই কথা বলে সময় কাটাচ্ছিলাম। পুলিশের জিপ এসে রাস্তায় থামল। সদলবলে ছুটে এলেন মিঃ দাস। ডঃ মৈত্রের হাতে হ্যান্ডকাপ পরিয়ে দিলেন।

বললাম, "ব্রিফকেসটা এখানে পুঁতে রেখে আরও ধোঁকা দিতে চেয়েছিলেন মৈত্র মশাই। তাঁর ইচ্ছা ছিল, পুলিশ এটা আবিষ্কার করুক। তা হলে ডঃ ব্রহ্মের ঘাড়ে দোষটা পড়বে। আসলে ডঃ ব্রহ্মের ঘরে পাওয়া ফরমুলাটা বোগাস। এই ব্রিফকেসেই অমিতার আসল ফরমুলা আছে। এটা অমিতারই ব্রিফকেস।"

এতক্ষণে আশিস এল। হাতে ভোজালি নেই। একপাটি স্লিপার। চোখে জল।...

pathagar.net

খরোষ্ঠীলিপিতে রক্ত

।। প্রস্তাবনা ।।

ভদ্রলোক সোফায় বসেই তেতোমুখে বললেন,—সবচেয়ে বাজে আর সাংঘাতিক হোক্স যদি কিছু থাকে, তা আছে আর্কিওলজিতে। মাটির তলায় একটা নাকভাঙা পুতুল বেরুলেই গুপ্তযুগ! একটুকরো মেটাল পাতে হিজিবিজি রেখা দেখলেই খরোষ্ঠী লিপি! ব্যাপারটা একটা ফাঁদের মতো। বাবা এই ফাঁদে পা দিয়ে এবার আমাদের ফ্যামিলিকে পথে বসাতে চলেছেন।

অবাক হয়ে লক্ষ্য করছিলাম ভদ্রলোককে। বয়স বেয়াল্লিশ হতে পারে, পঁয়তাল্লিশও হতে পারে। আবার পঞ্চাশ হলেও হতে পারে। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল। রোদেপোড়া তামাটে গায়ের রঙ। চেহারায় মফস্বলের বনেদি আভিজাত্য স্পষ্ট। শক্ত হাড়ের কাঠামো। লম্বাটে গড়ন। পরনে সিল্কের পাঞ্জাবি, তাঁতের ধুতি। হাতে একটা কালো শৌখিন ছড়ি। কাঁধের সুদৃশ্য ব্যাগটা গুছিয়ে পেটের কাছে রেখে সিগারেটের প্যাকেট বের করলেন। এতক্ষণে আঙুলে গ্রহরত্ন বসানো কয়েকটা আংটিও চোখে পড়ল। কর্নেল নীলাদ্রি সরকার চুরুট কামড়ে ধরে তাকিয়ে ছিলেন। সাদাদাড়ি থেকে একটুকরো ছাই গড়িয়ে পড়ল। টাকে হাত বুলিয়ে বললেন,—আপনি সোমদেব রায়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। এতক্ষণে ভদ্রলোক নমস্কার করলেন। একটু হাসবার চেষ্টা করে বললেন—সাইকিয়াট্রিস্ট ডঃ মহেন্দ্র বোস আমার বন্ধু। গতরাত্রে কথায়-কথায় উনি আপনার কথা বলেছিলেন।

কর্নেল ওঁর কথার ওপর বললেন—আপনি কি আপনার বাবাকে সাইকিক পেশ্যান্ট ভেবেছিলেন?

—ভাবি, আর না-ভাবি, বলুন? সোমদেব সিগারেট ধরিয়ে বিরক্তমুখে বললেন—বছর দশেক আগে স্কুল থেকে রিটায়ার করেছেন। স্কুলে থাকার সময় এসব বাতিক একটু-আধটু ছিল। সেটা এখন বাড়তে বাড়তে একেবারে পাগলামিতে পৌঁছেছে। আজকাল পঞ্চায়েত থেকে রাস্তা তৈরি, পুকুর সংস্কার এ সব কাজ আমাদের এলাকায় লেগেই আছে। বাবার বয়স পঁচাত্তর বছর। এই বয়সে কোথাও খোঁড়াখুঁড়ির খবর পেলেই সেখানে হাজির হবেন। আর রাজ্যের জঞ্জাল কুড়িয়ে এনে—মিউজিয়াম! বুঝলেন? ওয়েস্টে চিঠি লেখালেখি করে

সায়েব-মেমদের ডেকে আনা, তার ওপর বই লেখার বাতিক, পয়সা খরচ করে সেই বই ছাপানো—সংসার ফতুর হতে বসেছে।

—আপনার বাবার মিউজিয়াম থেকে কী হারিয়েছে বলেছিলেন?

সোমদেব সোজা হয়ে বসলেন।—বাবা বলছেন হারিয়েছে। সেই নিয়ে খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। আবোল-তাবোল বকছেন। সামলানো যাচ্ছে না। চূড়ান্ত পাগলামি!

—জিনিসটা কী?

—বলছেন নাকি ব্রোঞ্জের একটা সিল। খরোষ্ঠীলিপিতে কী সব লেখা ছিল। প্রায় নাকি ডিসাইফার করে ফেলেছিলেন। একটু বাকি ছিল।

কর্নেল একটু হাসলেন। —ডিসাইফার কথাটা ঠিক হল না। যতদূর জানি খরোষ্ঠীলিপি আলফাবেটিক রাইটিং সিস্টেম অর্থাৎ বর্ণমালাভিত্তিক লিপি। এখন এ লিপি পড়া হয়। ডিসাইফার করা হয় বলা চলে না।

সোমদেব গম্ভীর মুখে বললেন—কে জানে! বাবা তা-ই বলছেন। যাই হোক, প্রশ্ন হল, বাবার ও-ঘরে পারতপক্ষে আমরা কেউ ঢুকি না। ঢুকলে উনি বিরক্ত হন। তা ছাড়া সব সময় দরজা ভেতর থেকে বন্ধ থাকে। বাবা যখন বেরোন, তালা এঁটেই বেরোন। তালা কেউ ভাঙেনি। বাবার দৃষ্টিশক্তিও এ বয়সে খুব তীক্ষ্ণ। কাজেই আমরা ভেবে পাচ্ছি না কীভাবে ওটা চুরি যেতে পারে। সোমদেব কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর শ্বাসপ্রশ্বাসে মিশিয়ে ফের বললেন,—কিছুদিন থেকে আমার ধারণা হয়েছে, বাবা ইমাজিন্স্ থিংস। যা নেই, তা আছে বা ছিল বলে কল্পনা করেন। পরে অনেকসময় অবশ্য ভুলটা স্বীকার করেন। এনিওয়ে, ডঃ বোস বললেন—

—হ্যাঁ! একটু আগে উনি আমাকে ফোন করেছিলেন। কর্নেল হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে বললেন—কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না এ ব্যাপারে আমি কী করতে পারি! ব্রোঞ্জের সিল হারানোর কথা আপনার বাবা কি থানায় জানিয়েছেন?

—জানিয়েছেন। তবে লোকাল পুলিশ বাবার ব্যাপার-স্যাপার ভালই জানে।

ষষ্ঠীচরণ ট্রেতে কফি রেখে গেল। কর্নেল চোখ খুলে বললেন,—কফি খান।

সোমদেব কফির পেয়ালা তুলে নিয়ে আমার দিকে তাকালেন।

—এঁকে তো চিনতে পারলাম না। ইনি কি আপনার অ্যাসিস্ট্যান্ট? শুনেছি প্রাইভেট ডিটেকটিভদের অ্যাসিস্ট্যান্ট থাকে।

কর্নেল দ্রুত বললেন—একটু ভুল হয়েছে সোমদেববাবু! আমি ডিটেকটিভ নই।

সোমদেব একটু অবাক হয়ে বললেন—কিন্তু ডঃ বোস বললেন—

—আমি ডিটেকটিভ?

সোমদেব বিব্রতভাবে বললেন—না। মানে ঠিক এই কথাটা বলেননি। তবে মিসটিরিয়াস কিছু ঘটলে আপনি নাকি সল্‌ভ্‌ করতে পারেন।

কর্নেল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অট্টহাসিটি হেসে বললেন—আসলে আমি একজন নেচারিস্ট, সোমদেববাবু। প্রকৃতিতে অসীম রহস্য। তা-ই নিয়ে আমি নিজের পদ্ধতিতে মাথা ঘামাই। না—আমি বিজ্ঞানী নই। তবে মানুষও তো প্রকৃতির একটা অংশ। তাই কোথাও মানুষের জীবনে রহস্যময় কিছু দৈবাৎ ঘটে গেলে আমি নাক গলাই। কর্নেল আমার দিকে সস্নেহে তাকিয়ে বললেন—জয়ন্ত চৌধুরী। দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার স্পেশাল রিপোর্টার।

আমরা সৌজন্যমূলক নমস্কার বিনিময় করলাম। তারপর বললাম—আপনি কি হারানো ব্রোঞ্জের সিল উদ্ধার করতে কর্নেলের কাছে এসেছেন?

সোমদেব একটু ইতস্তত করে বললেন—তার চেয়েও ব্যাপারটা সিরিয়াস। বাবার অবস্থা এখন হাফ-ম্যাড। শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছেন। বিড়বিড় করে কী সব বলছেন বোঝা যাচ্ছে না—'পালপুকুর' 'ধর্মপাল' 'পালগড়' এই সব কথা। কিন্তু বারবার পারু মানে আমাদের ছোটবোন পারমিতাকে ডাকছেন। পারু ইজ ডেড! অথচ বলছেন, 'পারুকে ডাকো সে সব জানে!"

কর্নেল আস্তে বললেন,—আপনার বোন মারা গেছে?

—একটা মিসহ্যাপ। ব্যাপারটা খুলে বলি। আমরা তিনভাই এক বোন। আমি, রন্তিদেব, শান্তিদেব আর পারমিতা। মা বেঁচে নেই। আমরা একান্নবর্তী ফ্যামিলিতে থাকি। গতবছর বাবা আমাদের অমতে ওঁর এক প্রাক্তন ছাত্র কমলেশের সঙ্গে পারুর বিয়ে দেন। মাস তিনেক আগে পারু স্যুইসাইড করেছে। একটা স্যুইসাইডাল নোট ওর ঘরে পাওয়া গিয়েছিল। আমরা জমিদার বংশ। বংশের প্রথা হল বাড়ির মেয়ে শ্বশুরঘর করত যাবে না। আমার ছোটবেলায় জমিদারিপ্রথা উচ্ছেদ হয়েছে। কিন্তু বাবা ট্রাডিশন ছাড়তে চাননি। কাজেই কমলেশ ঘরজামাই ছিল।"

—কমলেশবাবু এখন কোথায়?

—বাবা ওকে যেতে দেননি। বাবার আর্কিওলজিতে বাতিক। আর কমলেশ ওঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট!

সোমদেবের মুখে বিকৃতি ফুটে উঠল। কর্নেল ফের বললেন—কমলেশবাবু এখন কোথায়?

—বাবার মিউজিয়ামের পাশের ঘরে থাকে। বাবার দেখাশোনা সে-ই করছে। আসলে বাবা আমাদের কাছে ঘেঁষতে দিচ্ছেন না। কিন্তু ওকে ঢুকতে অ্যালাউ করছেন।

—কমলেশবাবুর বাড়ি কোথায় ছিল?

—পাশের গ্রাম পালগড়ে। ছন্নছাড়া প্রকৃতির যাকে বলে। তিনকুলে কেউ নেই।

—কোনও চাকরি-বাকরি করেন উনি?

—আমাদের কোদালিয়া গ্রামের স্কুলের মাস্টারি করে। জেলার সবচেয়ে পুরনো স্কুল আমার ঠাকুর্দার করা। এখন গভর্নমেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন-বোর্ড বসিয়ে দিয়েছেন। আমার জ্যাঠামশাই ছিলেন সেক্রেটারি। তিনি মারা গেছেন। বাবা ছিলেন হেডমাস্টার।

—আপনার জ্যাঠামশাইয়ের ফ্যামিলি কোথায় থাকেন?

—উনি চিরকুমার ছিলেন।

—কর্নেল কফিতে শেষ চুমুক দিয়ে নিভে যাওয়া চুরুট ধরিয়ে বললেন—আপনি কী করেন?

সোমদেব হাসবার চেষ্টা করে বললেন—কিছু না। থিয়েটার নিয়ে থাকি-টাকি। খুলে বলা উচিত, আমি বাবার প্রিয়পাত্র ছিলাম না কোনওদিন। টেনেটুনে বি এ পাশ করেছিলাম। মেজ রন্তু—রন্তিদেব অবশ্য ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র ছিল। বাবা তাকে ওয়েস্টে লেখাপড়া করতে পাঠিয়েছিলেন। সে এখন আমেরিকার কর্নেল ইউনিভার্সিটিতে এশিয়ান স্টাডিজ ডিপার্টে পড়ায়। ছোট শান্তিদেব ইঞ্জিনিয়ার। দুর্গাপুরে ছিল। চাকরি ছেড়ে গ্রামে ফিরে চাষবাস নিয়ে মেতে আছে। বাই দ্য বাই, আমি জ্যাঠামশাইয়ের মতো ব্যাচেলর।

pathagar.net

—শান্তিদেববাবু—

—বিবাহিত। একটি মেয়ের বাবা। মেয়ের বয়স বছর সাতেক। স্কুলে প্রাইমারি সেকশনে পড়ে।

কর্নেল আবার ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজেছিলেন। সেই অবস্থায় বললেন—সম্প্রতি আপনার বাবার কাছে কোনও বিদেশী এসেছিলেন কি?

সোমদেব একটু চমকে উঠে বললেন—হ্যাঁ। মাসখানেক আগে রন্তু এক সায়েবকে পাঠিয়েছিল চিঠি দিয়ে। কী একটা খটমটে নাম—হ্যাঁ, গ্যান্সলার। সাম গ্যান্সলার। আশ্চর্য! ব্যাপারটা আপনি বলায় এতক্ষণে কথাটি মাথায় এল। গ্যান্সলারসায়েবই সিলটা হাতাননি তো?

—আপনার বোন স্যুইসাইড করেছিল কীভাবে?

অতর্কিত প্রশ্ন করা কর্নেলের স্বভাব। সোমদেব হকচকিয়ে বললেন—বাড়ির পেছনের বাগানে একটা গাছে গলায় দড়ি দিয়েছিল। তবে পারু খুব জেদি আর হিস্টেরিক টাইপ ছিল। তা ছাড়া আমরা জানতাম, বিয়েটা সে মেনে নেয়নি। বাবা জোর করেই আমাদের অমতে বিয়ে দিয়েছিলেন। তো গ্যান্সলার সায়েব—

কর্নেল চোখ খুলে সোজা হয়ে বসে বললেন—আমি তা বলিনি। ওটা জাস্ট্ একটা প্রশ্ন। আমি আপনার বাবার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

সোমদেবের মুখে স্বাভাবিকতা ফিরে এল—আপনার পায়ের ধুলো পড়লে রায়ভবন ধন্য হবে। ডাঃ ঘোষের মুখে আপনার অনেক কীর্তিকলাপ শুনলাম। ডাঃ ঘোষের ফ্যামিলি একসময় কোদালিয়ায় ছিল। সেইসূত্রে চেনাজানা। যাইহোক, আমার এবং শান্তর প্রব্লেম হল বাবাকে নিয়ে। উনি পাগল হয়ে গেলে আমরা ভেসে যাব।

—কেন?

সোমদেব অন্যমনস্কভাবে বললেন—প্রব্লেমটা প্রপার্টিঘটিত। আপনি গেলে ঠাণ্ডা মাথায় সব আলোচনা করব। আমি তাহলে উঠি। আপনি কখন যাচ্ছেন জানতে পারলে স্টেশনে শান্ত জিপ নিয়ে যাবে।

সোমদেব উঠে দাঁড়ালে কর্নেল বললেন—ঠিক সময় দিতে পারছি না। তবে যাব, কোদালিয়া আমার চেনা জায়গা।

সোমদেব কিছু বলতে ঠোঁট ফাঁক করলেন। কিন্তু বললেন না। নমস্কার করে বেরিয়ে গেলেন।

কর্নেল চোখে হেসে বললেন—কী বুঝলে ডার্লিং?

বললাম—একটা গ্রাম্য বনেদি ফ্যামিলির ব্যাকগ্রাউন্ড পাওয়া গেল। টিপিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যান্ড দ্য সেইম ক্যারেক্টার। সেই আদর্শবাদী স্কুলটিচার এবং পুরাতত্ত্বের বাতিক। আমি লক্ষ করেছি গ্রামের লোকেরা নিজেদের এরিয়ায় সবসময় প্রাচীন ইতিহাস এবং বিখ্যাত রাজরাজড়াকে এনে বসাতে চায়। কাল্পনিক অতীত সমৃদ্ধির গৌরব নিয়ে জাবর কাটে। এই ভদ্রলোক—সোমদেব রায় ইজ কারেক্ট। মাটির তলায় পুতুল বা একটা কিছু পেয়ে গেলেই সটান গুপ্তযুগ! কলোনিয়াল হ্যাং-ওভার, কর্নেল! সম্প্রতি একটা বইয়ে পড়েছিলাম কলোনিয়ালিজম ইজ দ্য ওরিয়েন্টালিজম। কিংবা ওরিয়েন্টালিজমই কলোনিয়ালিজম!

—জয়ন্ত, তুমি উত্তেজিত!

—না। দেখুন, এই কবরখোঁড়া ব্যাপারটা আমার অসহ্য লাগে। আমার কাছে অতীতের চেয়ে বর্তমান নিয়ে মাথা ঘামানোই বড় কাজ। কারণ ভবিষ্যৎ সৃষ্টি হয় এই বর্তমান থেকেই।

কর্নেল হাসলেন। —কিন্তু ডার্লিং, প্রবলেম হল, অতীতের ভূত আমাদের পিছু ছাড়ে না। রবিঠাকুরের আর্ষবাণী ভুলে যাচ্ছ। অতীত গোপনে-গোপনে ঠিকই কাজ করে যাচ্ছে। এনিওয়ে, রায়ভবনের এপিসোডটি ইন্টারেস্টিং। হ্যাঁ—খরোষ্ঠী লিপির চেয়ে ইন্টারেস্টিং।

—খরোষ্ঠী লিপিটা কী?

—আদি বৌদ্ধযুগে উত্তর-পশ্চিম ভারত, উত্তর-পূর্ব ইরান, আফগানিস্তান থেকে মধ্যএশিয়া পর্যন্ত বৌদ্ধরা এই লিপি ব্যবহার করতেন। এটা আসলে

সেমিটিক লিপি। ডানদিক থেকে পড়তে হয়। প্রাচীন অ্যারামাইক লিপির হরফ ছিল মাত্র বাইশটা। সেই লিপি অনুকরণ করে বৌদ্ধ অনুশাসন লেখা হত প্রাকৃত ভাষায়। দক্ষিণবঙ্গে এই লিপি আবিষ্কারের দাবি কেউ-কেউ করেন। যেমন সোমদেববাবুর বাবা জয়দেববাবু। আমি ওঁর লেখা পড়েছি। কিন্তু এটাই আশ্চর্য, কোথায় পাহাড়ি পশ্চিম-ভারত আর কোথায় পূর্ব-ভারতের সমতল নিম্নাঞ্চল! বৌদ্ধদের বড় ঘাঁটি ছিল মগধ কলিঙ্গ অঞ্চলে। সেখানে রাশি-রাশি বৌদ্ধ পুরাদ্রব্য পাওয়া গেছে। অথচ কোনও খরোষ্ঠীলিপি মেলেনি। কাজেই প্রশ্নটা হল, পশ্চিম-পূর্ব যোগসূত্রটা কীভাবে মেলানো যাবে? অবশ্য মথুরায় খরোষ্ঠী লিপিরই একটা নিদর্শন পাওয়া গেছে। কিন্তু তার পাঠ নিয়ে বিতর্ক আছে।

উঠে দাঁড়িয়ে বললাম—ওঃ! মাথা ভোঁ ভোঁ করছে, চলি।

—জয়ন্ত, অতীতের ভূত পিছু ছাড়ে না। সেই ভূতকে দেখতে হলে কোদালিয়া চলো। আই প্রমিজ ডার্লিং! তোমাদের দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকা একটা অনবদ্য স্টোরি পাবে।

অবাক হয়ে বললাম—চুরি যাওয়া জিনিস উদ্ধারের কাজটা সরকার পুলিশকে দিয়েছে। আপনি পুলিশের রোলে নামবেন নাকি? ছ্যা ছ্যা! প্রখ্যাত কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের প্রেস্টিজ পাংচার হয়ে যাবে যে!

কর্নেল হাসলেন না। গম্ভীর হয়ে বললেন—ন্যায়শাস্ত্রে অবভাসতত্ত্ব বলে একটা টার্ম আছে। হোয়াট অ্যাপিয়ার্স, ইজ নট রিয়্যাল। ব্রোঞ্জের সিল এবং সেই সিল চুরি যাওয়া সম্ভবত একটা ঘটনার মুখোশ, জয়ন্ত! মুখোশের তলায় অন্য কেউ বা কিছু আছে।

—কী করে বুঝলেন?

কর্নেল উঠে গিয়ে বুকশেলফ থেকে একটা বই টেনে বের করে আপনমনে বললেন—সোমদেববাবুর বোনের আত্মহত্যা, তারপর ব্রোঞ্জের সিল চুরি, জয়দেববাবুর মধ্যে পাগলামির লক্ষণ। সম্পত্তিঘটিত কী একটা প্রব্লেম... আমার কেন যেন বড্ড অস্বস্তি হচ্ছে। জাস্ট্ অ্যান আনক্যানিং ফিলিং।

কর্নেল তাঁর ইজিচেয়ারে ফিরে বইটার পাতা খুলে বিড়বিড় করতে থাকলেন। কথাগুলো বুঝতে পারছিলাম না। বইটার কভারে লেখা আছে 'দ্য ওরিজিন অ্যান্ড ডেভোলপমেন্ট অব খরোষ্ঠীস্ক্রিপ্ট।'....

॥ এক ॥

পুজোর কয়েকটা দিন বড় বিশ্রী গেছে। ঝিরঝিরে বৃষ্টি যখন-তখন। দশমীর দিন তো কলকাতা জুড়ে প্রায় বন্যার দুর্যোগ। তারপর থেকে আবহাওয়া চমৎকার প্রসন্ন। কথা ছিল, কর্নেলের সঙ্গে হিমালয়যাত্রা করব। ততদিনে বাঙালি পর্যটকদের ভিড় ঘরমুখী হবে। স্থান বাছাই না হলেও আমাদের লক্ষ্য

ছিল উত্তরপ্রদেশ। কিন্তু হঠাৎ ত্রয়োদশীর দিন কোন কোদালিয়া থেকে এক সোমদেব রায় এসে প্রোগ্রাম ভন্ডুল করে দিলেন।

সোমদেবের বাবার চেয়ে কর্নেল কোনও অংশে কম যান না। মাথায় একটা কিছু ঢুকলেই হল। তা-ই নিয়ে একেবারে মরণপণ লড়াইয়ে নেমে যাবেন। সমস্যা হল, সেই লড়াইয়ে আমাকেও জড়িয়ে জেরবার করবেন। গতবছর এমনি শরতে ওড়িশার জঙ্গলে একটা পাখির পেছনে নিজে ছোটাছুটি করে সারাদিন কাটিয়েছিলেন এবং আমার হয়েছিল সাপের ছুঁচো গেলা অবস্থা। সঙ্গ ছাড়লে জঙ্গলে বেঘোরে প্রাণটি খোয়াতে হত। কাজেই পেছনে-পেছনে খালি পেটে অকারণ ছোটাছুটি করে কাটাতে হয়েছিল। তবে হ্যাঁ, জঙ্গল থেকে বেআইনি কাঠপাচারের সরেজমিন অভিজ্ঞতা থেকে একটা রেপোর্টাজ উপহার দিতে পেরেছিলাম আমার রুজির মালিক দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকাকে। তাই কথাটি তুলতেই কর্নেল আমাকে সেটা স্মরণ করিয়ে মুখ বন্ধ করে দেন।

পরদিন দুপুরঅব্দি কর্নেলের সাড়া নেই দেখে আশা করছিলাম, সম্ভবত হারানো সিল পুলিশ উদ্ধার করে দিয়েছে। তাই কর্নেল কোদালিয়া যাত্রার প্রোগ্রাম বাতিল করে দিয়েছেন।

pathagar.net

কিন্তু হঠাৎ দুটোয় ওঁর টেলিফোন এল।—জয়ন্ত! তৈরি হয়ে এস। শেয়ালদায় তিনটে দশে ট্রেন।

—কোদালিয়া?

—কোদালিয়া। কুইক ডার্লিং, কুইক!

কিন্তু....

—আবার একটা মিসহ্যাপ হয়েছে রায়ভবনে। সোমদেববাবুর লোক এসে খবর দিয়ে গেল।

—মিসহ্যাপ? কমলেশবাবু....

—নাহ্। নন্দ নামে ওদের বাড়ির একজন পুরানো সারভ্যান্ট গতরাতে খুন হয়েছে। বডি পাওয়া গেছে বাড়ির বাগানে আজ ভোরবেলায়। চলে এস।

লাইন কেটে গেল। কয়েক সেকেন্ডের জন্য একটা অতর্কিত ত্রাস আমার বুকের ভেতর ধাক্কা দিল। আজকাল দেশের আইন-শৃঙ্খলার যা অবস্থা, অজানা গ্রাম্য জায়গায় খুনোখুনির মধ্যে গিয়ে পড়া কি ঠিক হবে? একটু ইতস্তত করে আলমারির লকার থেকে সিক্সরাউন্ডার অটোমেটিক রিভলভার বের করলাম। ক'বছর আগে চিৎপুর রেলইয়ার্ডে স্মাগলিং র‍্যাকেটের খবর কাগজে ফাঁস করার পর আমার ওপর হামলা হয়েছিল। তারপর পুলিশ কমিশনার উদ্যোগী হয়ে আমাকে এই অস্ত্রটার লাইসেন্স পাইয়ে দেন। কর্নেলেরও অবশ্য রিভলভার আছে। অবসরপ্রাপ্ত সামরিক অফিসারের পক্ষে লাইসেন্স পাওয়া সোজা। তবে

কর্নেল বলেন,—বয়স হয়েছে। শারীরিক ক্ষমতার ওপর নির্ভরতা কমে যাচ্ছে। তবে ভেবে দেখ ডার্লিং! এই মরজগতে মৃত্যু অমোঘ। তবু বেঘোরে প্রাণের মতো দামি জিনিস খোয়ানোটা ভারি অসম্মানজনক। প্রাণ প্রকৃতির দান। প্রাণ নেওয়ার অধিকার শুধু প্রকৃতির আছে। অন্য কেউ এতে নাক গলাক, এটা আমি বরদাস্ত করতে পারি না।

বিশালদেহী কর্নেলের বয়স প্রায় সত্তরের কাছাকাছি হয়ে এল। অথচ মুখে উনি যা-ই বলুন, জানি এবং দেখেছিও বটে, এ বয়সেও অনেক শক্তিমান জোয়ানকে ঢিট করতে উনি পটু। সামরিক জীবনে হাতাহাতি লড়াইয়ের গেরিলা-কৌশল এখনও ভোলেননি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বর্মার জঙ্গলে মার্কিন সেনাদের গেরিলাযুদ্ধের তালিম দিয়েছেন! ছয়ের দশকেও ভারতীয় সেনাবাহিনীর লাদাক ডিভিসনের গেরিলাগ্রুপকে পাহাড়ি অঞ্চলে যুদ্ধের ট্রেনিং দিয়ে ছিলেন।

এইসব কথা ভাবলেই ওঁর সঙ্গী হওয়ার ঝুঁকি নিমেষে ঘুচে যায়। কর্নেলের ইলিয়টরোডের তিনতলার অ্যাপার্টমেন্টে যখন পৌঁছলাম, তখন আড়াইটে বাজে। উনি তৈরি হয়ে আমার অপেক্ষা করছিলেন। সেই চিরপরিচিত বেশভূষা। মাথায় টাক ঢাকা টুপি, পরনে ফুলহাতা জ্যাকেট এবং ছাইরঙা আঁটো পাতলুন, পায়ে হান্টিং বুট। বুকে ঝুলন্ত বাইনোকুলার এবং ক্যামেরা। পিঠে আঁটা প্রকাণ্ড কিটব্যাগ থেকে প্রজাপতিধরা নেট-স্টিক উঁকি মেরে আছে। মুখে সাদা দাড়ি ঝকমক করছে।

বড়রাস্তার মোড়ে ট্যাক্সি পাওয়া গেল। ট্যাক্সিতে যেতে যেতে বললাম—কাল আপনি আনক্যানি ফিলিংয়ের কথা বলছিলেন। তারপর এই খুনখারাপি। বস্! আমার ধারণা, আপনার মধ্যে সত্যিই কোনও অতীন্দ্রিয় শক্তি আছে।

কর্নেল একটু হাসলেন।—নাহ্! ওসব বুজরুকি ব্যাপার। আসলে আমার মনে হয়েছিল, আবার কোনও একটা অঘটন ঘটবে।

—কেন মনে হয়েছিল বলতে আপত্তি আছে?

—জানি না। তবে সোমদেববাবুর বিবরণকে যদি নিখুঁত তথ্য, মানে 'ডেটা' ধরে নিই, তা হলে দেয়ার ওয়জ সামথিং অড সামহোয়্যার। কী একটা গোপন ঘটনা থেকে এই 'ডেটা' গড়ে উঠছে। মানুষের মগজ আসলে একটা জটিল কম্পিউটার, ডার্লিং।

—উঃ! বড্ড হেঁয়ালি হয়ে গেল বস!

কর্নেল ঘড়ি দেখে বললেন—ও! তোমাকে বলা হয়নি। নন্দের ডেডবডি দেখে প্রথমে সবাই ভেবেছিল স্যুইসাইড। একই গাছ থেকে গলায় দড়ির ফাঁস আটকে ঝুলছিল। মর্গে সদ্য নতুন একজন ডাক্তার এসছেন। তাঁর চোখে পড়ে, বডির পিঠের হার্টের উল্টোদিকে ইনজেকশনের চিহ্ন। রক্তে সাংঘাতিক নিকোটিন পয়জন পাওয়া গেছে।

pathagar.net

চমকে উঠে বললাম—সর্বনাশ! তা হলে তো—

কর্নেল আমার কথার ওপর বললেন—সেটাই প্রশ্ন। নন্দ রবিঠাকুরের কথায় 'পুরাতন ভৃত্য।' সে কি কিছু জানত, যেজন্য তাকে চুপ করিয়ে দেওয়া হল?

—সিল চুরির ব্যাপারে?

—জানি না।

কর্নেল অন্যমনস্কভাবে আস্তে কথাটা বললেন। মৌলালিতে প্রচণ্ড জ্যাম। ট্যাক্সিড্রাইভার তেতোমুখে গজগজ করতে থাকল। তার বক্তব্য, শেয়ালদার মুখে ফ্লাইওভার করে হলটা কী? জ্যামটা সরিয়ে আনা হল শুধু। 'গোর্মিনলোক খালি উল্টাকে সিধা আউর সিধাকো উল্টা করতা। দেখিয়ে সাব, দেখিয়ে! মিনিবাস টেরামলাইনকা উপ্পর খাড়া হোকে পেসেঞ্জার উঠাতা! কৈ কানুন হ্যায়?'

স্টেশনে পৌঁছতে তিনটে বেজে গেল। টিকিট-কাউন্টারে লম্বা লাইন। তবে ব্যস্ততার কারণ ছিল না। ট্রেন ছাড়ল সাড়ে তিনটেয়। ভয়াবহ ভিড়। স্টেশনের নাম কোদালিয়াঘাট রোড। কস্মিনকালে শুনিনি। কর্নেল উঁচুমানুষ হওয়ায় তাঁর দিকে লক্ষ্য রেখেছিলাম। ঘণ্টাখানেক পরে ভিড় কমে গেল। জানলার ধারে বসার জায়গাও মিলল। কর্নেল বাইনোকুলারে পাখি-টাখি দেখতে লাগলেন।

সাড়ে পাঁচটায় কোদালিয়াঘাট রোডে নেমে দেখি বেশ বড় স্টেশন। মেন গেট দিয়ে বেরুতেই বছর ত্রিশ-বত্রিশ বয়সের একজন শক্তসমর্থ গড়নের ভদ্রলোক কর্নেলের সামনে এসে নমস্কার করলেন—

—আপনি কি কর্নেল সরকার?

কর্নেল বললেন—শান্তিদেব রায়?

—আজ্ঞে। বড়দা আপনার চেহারার ডেসক্রিপশন দিয়েছিলেন। তো আমরা আশা করেছিলাম, আপনি দুলালের সঙ্গে আসবেন।

স্টেশনে জিপ নিয়ে এসেছিলাম। আসুন!

বলে শান্তিদেব আমাকে নমস্কার করলেন।—আপনি সম্ভবত সাংবাদিক...

নমস্কার করে বললাম—জয়ন্ত চৌধুরি।

স্টেশনবাড়ির সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে শান্তিদেব বললেন—আপনাকে পেয়ে আমার একটা বড় লাভ হবে মিঃ চৌধুরি! ওসব খুনোখুনি নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। দাদা ওসব দেখুক। আমার ফার্মহাউসে আপনাকে নিয়ে যাব। বিনা সারে নানা জায়গায় মাটির মিশ্রণ ঘটিয়ে আমি অসম্ভবকে সম্ভব করেছি। আই মাস্ট্ শো য়ু দ্য এক্সপেরিমেন্ট। নেচারের কাছে কত কৌশলে বেশি আদায় করা যায়—এদিকে প্লিজ! এখানে সাইকেলরিকশোর ভিড়ে গাড়ি পার্ক যায় না। জাস্ট্ একমিনিট হাঁটতে হবে।

বাজার ছাড়িয়ে গিয়ে রাস্তা একটা নদীর ব্রিজে পৌঁছেছে। নদীটা দেখেই তার প্রেমে পড়ে গেলাম। উৎরাইয়ের পর বাঁদিকে শুরু হয়েছে বসতি এলাকা। ব্রিজ থেকে দেখেই বুঝতে পারছিলাম কোদালিয়াকে ঠিক গ্রাম বলা চলে না। মফস্বল শহরের আকৃতি প্রকৃতি।

জিপ বসতির শেষদিকটায় একটা পুরনো দোতলা বাড়ির ফটক দিয়ে ঢুকল। বনেদি জমিদারবাড়ি যেমন হয়। বিশাল চৌহদ্দি উঁচু জরাজীর্ণ পাঁচিলে ঘেরা। পেছনদিকে এলোমেলো উঁচু-নিচু গাছের জটলা দেখে বুঝলাম ওটাই সেই বাগান। অনুমান করলাম, বাগানের ওধারে কাছাকাছি নদীটা বয়ে গেছে। কিন্তু এ জায়গাটা যথেষ্ট উঁচু। ধাপবন্দি সিঁড়ি উঠে গেছে বাড়ির পোর্টিকো থেকে। প্রকাণ্ড দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন সোমদেব রায়। পরনে এখন পাজামা-পান্‌জাবি, হাতে সেই ছড়ি।

গতকাল কর্নেলের ড্রয়িংরুমে বসে একেবারে অনুমান করতে পারিনি, এঁরা এমন একটা অভিজাত পরিবারের মানুষ। দোতলা বাড়িটার স্থাপত্যশৈলী প্রমাণ দিচ্ছে পুরনো ঐতিহাসিক সমৃদ্ধির। এখন ক্ষয়াটে, নির্জীব, অপরিচ্ছন্ন দেখালেও উদ্ধত অতীত আভিজাত্যের লক্ষণ স্পষ্ট। স্থবির সিংহের মতো বাড়িটা ধূসর চোখে তাকিয়ে আছে। সোমদেব অভ্যর্থনা করে ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘরটা একটা হলঘর। একটা ফায়ারপ্লেস পর্যন্ত আছে। দেয়ালে কয়েকটা মলিন পোর্ট্রেট। এককোণে পুরনো সেকেলে সোফা। কয়েকটা গদিছেঁড়া চেয়ার দেয়ালে দাঁড় করানো। মাঝখানে বেখাপ্পা একটা বিশাল ডিমালো সাদা পাথরের টেবিল।

শান্তিদেব ঘরে ঢোকেননি। বাইরে ওঁর জিপের শব্দ শুনে বুঝলাম, চলে গেলেন কোথাও। সোমদেবকে গম্ভীর দেখাচ্ছিল। গোঁফদাড়ি কামাননি আজ। ভেতরে একটা দরজার কাছে যেমন-তেমন প্যান্টশার্ট পরা বেঁটে একজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি কর্নেলকে নমস্কার করলেন। সোমদেব বললেন—দুলাল! কর্নেলসায়েবদের গেস্টরুমে নিয়ে যাও। তারপর কর্নেলকে বললেন—একটু বিশ্রাম করুন। আমি আসছি।

দুলালবাবু একটা খালি ঘরের ভেতর দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটা কাঠের সিঁড়ির কাছে আমাদের নিয়ে গেলেন। বললেন—একটু কষ্ট করে ওপরে উঠতে হবে স্যার!

সিঁড়িটা মাত্র হাততিনেক চওড়া। ওঠার মুখে একটা দরজা খোলা ছিল। বাইরে খোলামেলা একটুকরো বারান্দা দেখতে পেলাম। বারান্দার নীচে দেশি-বিদেশি ফুলগাছ আর গুল্মের বাগান। অযত্নে জঙ্গল হয়ে আছে। ঘোরালো সিঁড়ি বেয়ে মোটামুটি বড় একটা ঘরে পৌঁছলাম। কর্নেল জানালার কাছে গিয়ে বললেন, বাঃ!

pathagar.net

নদী এবং ওপারের খাপচা-খাপচা ঝোপজঙ্গল আর ধানক্ষেত দেখা যাচ্ছিল। সূর্যাস্তের ফিকে রোদে নদীর জল ঝিলমিল করছিল। আমিও না বলে পারলাম না—বিউটিফুল!

দুলালবাবু বললেন—এটা সাবেকি আমলের গেস্টরুম স্যার! শুনেছি জমিদারি আমলে সায়েবরা এসে এ ঘরে থাকতেন। নদীর ওপারে তখন ঘন জঙ্গল ছিল। বাঘ মারতে আসতেন সায়েবরা। এখন সব ধানক্ষেত হয়ে গেছে। একটা শেয়ালও নেই।

কর্নেল ছোট্ট ব্যালকনিতে গিয়ে বাইনোকুলারে পাখি খুঁজতে থাকলেন। দুলালবাবু দুটো চেয়ার নিয়ে গেলেন ব্যালকনিতে। বললেন—আমি আসছি স্যার! আর একটা কথা। কোনও দরকার হলে ওই সুইচটা টিপবেন।

দুলালবাবু চলে গেলেন। চেয়ারে বসে বললাম—এই ভদ্রলোক কে?

কর্নেল চোখে বাইনোকুলার রেখেই বললেন—শান্তিদেবের ফার্মহাউসের কর্মচারী। বোঝা যাচ্ছে, নন্দ বেচারা মারা না পড়লে সেই আমাদের সেবা-টেবা করত। তার বদলে দুলালবাবুকে বহাল করা হয়েছে।

—একটা ব্যাপার আশ্চর্য লাগছে।

—কী?

—সেই কমলেশবাবুকে দেখলাম না।

—তাঁকে দেখতে হলে থানায় চলে যাও।

চমকে উঠে বললাম—তার মানে?

—পুলিশ ওঁকে অ্যারেস্ট করেছে।

—নন্দকে খুনের চার্জে?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু উনি কেন নন্দকে খুন করবেন? মোটিভটা কী থাকতে পারে?

কাঠের সিঁড়িতে শব্দ শোনা গেল। কর্নেল চেয়ার টেনে বসলেন। সোমদেববাবুকে দেখা গেল। উনি একটা মোড়া তুলে এনে দরজার কাছে বসলেন। ব্যালকনিতে তিনজনের ঠাঁই হবে না, এত স্বল্পায়তন! সোমদেব বললেন—সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে তালগোল পাকিয়ে গেছে। এবার মনে হচ্ছে আমিও পাগল হয়ে যাব। কারণ পারুর ব্যাপারটা আমাকে হন্ট করছে। মর্গের আগের ডাক্তার ছিলেন বয়স্ক মানুষ। দায়সারা কাজ করতেন। নতুন ডাক্তারবাবুর মতো অ্যালার্ট থাকলে নিশ্চয় ধরা পড়ত, একই ভাবে পারুকে—

চোখে জল এসে গিয়েছিল সোমদেবের। রুমাল বের করে চোখ মুছলেন। কর্নেল বললেন—আপনার বাবা জানেন নন্দ মারা গেছে?

pathagar.net

—নাহ্। ওঁকে আমরা বলিনি। বুঝতেই পারছেন, বাবা এখন আনপ্রেডিক্টেবল ম্যান হয়ে উঠেছেন। কী রিঅ্যাকশন হবে তা তো জানি না।

—আপনার বাবাকে দেখাশোনা করত কে?

—উনি স্বাবলম্বী মানুষ। কারও সাহায্য নিতেন না। সিল চুরির পর কমলেশই ওঁকে দেখাশোনা করত। তা ছাড়া কেন জানি না, নন্দকে বাবা কিছুদিন থেকে বরদাস্ত করতে পারছিলেন না। ধারে-কাছে দেখলেই ধমক দিয়ে সরে যেতে বলতেন।

—এটা কোন সময় থেকে?

সোমদেব একটু ভেবে নিয়ে বললেন—পারুর মৃত্যুর পর থেকে।

—এখন আপনার বাবার দেখাশোনা কে করছে?

—শান্তুর বউ। এগারোটা নাগাদ পুলিশ কমলেশকে বাজার থেকে অ্যারেস্ট করেছে। তারপর বাবা ওকে ডাকাডাকি করেছিলেন। শান্তুর বউকে বাবা মোটামুটি পছন্দ করেন। আমরা তাকে শিখিয়ে দিয়েছি। বাবা জিজ্ঞেস করলে যেন বলে, কমলেশ কলকাতা গেছে কী কাজে।

—শুনে উনি কী বলেছেন?

—কিছু বলেননি। শান্তুর বউকে আপনি বরং জিজ্ঞেস করবেন। ডিটেলস বলবে।

—কোন গাছে নন্দের বডি ঝুলছিল এখান থেকে দেখা যায়?

সোমদেব ছড়ি তুলে বললেন—ওই যে পাইনগাছটা দেখছেন, তার পেছনে আমগাছটা। ওদিকে একটা লম্বালম্বি ডাল আছে। সেই ডালে।

কর্নেল বাইনোকুলারে গাছটা দেখতে থাকলেন। আমি বললাম—আশ্চর্য তো! এই মাটিতে পাইনগাছ!

সোমদেব বললেন—শান্তুর যেমন এগ্রিকালচারে বাতিক, আমার ঠাকুরদার তেমনি প্ল্যান্টেশনের বাতিক ছিল। নর্থবেঙ্গলে ওর কয়েকটি চা বাগিচা ছিল। তরাইয়ের জঙ্গল থেকে অনেক ধরনের গাছ এনে পুঁতেছিলেন। সব গাছ বাঁচেনি। কিভাবে ওই পাইনটা।

কর্নেল বললেন—পাইন দীর্ঘজীবী গাছ। ক্যালিফোর্নিয়ায় তিন হাজার বছরের সিকুইয়া পাইন আছে। অবশ্য এটা হিমালয়ান পাইন।

বললাম—কিন্তু এটা তো পাহাড়ী এলাকার মাটি নয়। এখানে পাইন গাছের বেঁচে থাকাটা আশ্চর্য!

কর্নেল হাসলেন। —আশ্চর্য হলেও তুমি গাছটা দেখতে পাচ্ছ!

সোমদেব বললেন—আসলে এই মাটিটা বাবার মতে প্রাচীন যুগের কোন ধ্বংসাবশেষ। বাবার ছোটবেলায় ঠাকুরদালানের ভিত খুঁড়তে নাকি পাথরের স্ল্যাব

pathagar.net

পাওয়া গিয়েছিল। দুটো স্ল্যাব বাবার ঘরে রাখা আছে। এটা নাকি একটা মাউন্ড ছিল। নাইনটিন্থ সেঞ্চুরিতে তার ওপর এই বাড়িটা তৈরি। আমাদের বংশের কুলকারিকায় আছে সেভেনটিন্থ সেঞ্চুরিতে মোগল সেনাপতি মানসিংহের সঙ্গে আমাদের পূর্বপুরুষ এই এলাকায় এসেছিলেন। তো—

সিঁড়িতে আবার শব্দ শোনা গেল। দুলালবাবু একটা ট্রেতে স্ন্যাক্স আর কফির প্লেট-পেয়ালা সাজিয়ে ঘরের টেবিলে রাখলেন। আমরা ঘরে গেলাম। দুলালবাবু চেয়ার দুটো নিয়ে এলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন—মানিক এসেছে। বললাম, বড়দা এখন ব্যস্ত। বলল, খুব জরুরী দরকার। কি বলব?

সোমদেব ব্যস্তভাবে বললেন—বাবার ঘরে গিয়ে ঢোকেনি তো?

—নাহ্। ছোটবউদি আছেন বাবুমশাইয়ের কাছে। মানিক হলঘরে বসে আছে।

—জ্বালাতন! আসছি কর্নেলসাহেব।

বলে সোমদেব বেরিয়ে গেলেন। দুলালবাবু কুণ্ঠিতভাবে বললেন—স্যার কফি ছাড়া কিছু খান না শুনে ছোটবউদি কফি আনিয়ে রেখেছিলেন। টেস্ট ঠিক আছে স্যার?

কর্নেল চুমুক লাগিয়ে বললেন—ফাইন! আপনার ছোটবউদিকে থ্যাংকস জানিয়ে দেবেন।

দুলালবাবু বললেন—লক্ষ্মীপ্রতিমা স্যার! উনিই এতবড় সংসারটাকে রেখেছেন। পারুদিদিমণি তো জামাইবাবুর চেয়ে এককাঠি সরেস ছিল। পরনের শাড়িটা পর্যন্ত গুছিয়ে পরতে জানত না। আর কথায়-কথায় ভাঙচুর। ছোটবউদির হেনস্থা! তো ছোটবউদি মাটির মানুষ। ননদকে পেটের মেয়ের মতো সামলে রাখতেন। অথচ দেখুন, কলকাতার মেয়ে। অনার্স গ্র্যাজুয়েট। এদিকে পারুদিদিমণি হায়ার সেকেন্ডারি পাস। হেডমাস্টার বাবার মনের অবস্থা বুঝুন স্যার!

কর্নেল একটু হেসে বললেন—বড়ছেলে থিয়েটার করেন। এতে বাবার অমত ছিল না?

দুলালবাবু হাসলেন—অমত কী বলছেন স্যার! কতবার ত্যজ্যপুত্র করবেন বলে থ্রেটন করেছেন। তবে বড়দার থিয়েটার স্যার মাঝে মাঝে কলকাতায় গিয়ে প্রাইজ নিয়ে আসে। নিজেই নাটক লেখেন। ডাইরেকশন দেন। অ্যাকটিং করেন। একেবারে অন্যরকমের থিয়েটার স্যার! এবার পুজোয় হওয়ার কথা ছিল। পারুদিদির মিসহ্যাপের জন্য ডেট পিছিয়ে গিয়েছিল। আবার নন্দের মিসহ্যাপ। ওদিকে বাবুমশাইয়ের হঠাৎ মাথাখারাপ।

—সিলচুরি!

—আজ্ঞে। আপনাকে তো বলেছি স্যার, বাবুমশাইয়ের ঘরে উঁকি মেরে অনেক কিছু দেখেছি। কিন্তু তেমন কোনও জিনিস দেখিইনি। জার্মান সাহেব

pathagar.net

এলেন ওমাসে। বড়দা মেজদাকে আমেরিকায় চিঠি লিখে ওর কাছে খোঁজ নিতে বলেছিলেন। সেদিন মেজদার চিঠি এল। সায়েব বলেছেন, না তাঁকে তেমন কিছু দেখাননি বাবুমশাই।

আমি কর্নেলের দিকে তাকালাম।—সোমদেববাবু তো কাল সকালে আপনার কথা শুনে—

কর্নেল চোখ কটমটিয়ে বললেন—লিপিটা খরোষ্ঠি না খরোস্তি এসব পণ্ডিতরা ভাল বোঝেন। পাকিস্তানি আর পার্সিয়ান পণ্ডিতদের দাবি, কথাটা খারপোস্তি। খার মানে গাধা পোস্ত মানে চামড়া। সংস্কৃতে খার মানে গাধা। গাধার ভুঁড়ির চামড়ায় লেখা বলেই নাকি খারপোস্তি। যাই হোক, মহাযানী বৌদ্ধদের লেখা সংস্কৃতে বুদ্ধের জীবনী 'ললিত-বিস্তর' বইয়ে ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠী নিয়ে ৬৪টা লিপির উল্লেখ আছে। বইটা রাজেন্দ্রলাল মিত্র গত শতকে ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন। ব্যাপারটা বড্ড জটিল। বুঝলে জয়ন্ত।

আমি তো থ। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিলাম। দুলালবাবুও হাঁ করে তাকিয়ে ছিলেন কর্নেলের দিকে। বললেন—আজ্ঞে স্যার! ঠিক এইসব কথাবার্তা বলতে শুনেছি বাবুমশাইয়ের মুখে। কমলেশের সঙ্গে এই নিয়ে ডিস্‌কাস করতেন।

কর্নেল বললেন—কখন শুনেছেন?

কর্নেলের প্রশ্নের ঝাঁকে একটু ভড়কে গিয়ে দুলালবাবু বললেন, —আজ্ঞে রাত্রিবেলা। আমি তো সারাটা দিন ফার্মেই থেকেছি। সন্ধ্যার পর ছোটবাবুর সঙ্গে এসে চা-কফি খেয়ে কিছুক্ষণ আড্ডা দিয়ে বাড়ি ফিরতাম। ছোটবাবুর ড্রয়িংরুম থেকে বাবুমশাইয়ের কথাবার্তা স্পষ্ট শোনা যায়।

—ফার্মে কতবিঘে জমি আছে?

—পঁচিশ একর। তিনভাই একবোনের নামে বাবুমশাইয়ের বাবা উইল করে গিয়েছিলেন। বাবুমশাই তো মাস্টারি আর ওইসব ছাইপাঁশ নিয়ে ব্যস্ত থেকেছেন। বাবুমশাইকে দিয়ে গেছেন শুধু এই বাড়িটা। তাও ছোটবাবু চাকরি ছেড়ে না এসে পড়লে বাবুমশাই বাড়িটা মিউজিয়াম আর লাইব্রেরি করার জন্য গভর্নমেন্টকে দান করে ফেলতেন। বরাবরই স্যার এইরকম পাগলামি ছিল। একবার খেয়াল হল, গার্লস স্কুলের জন্য বাড়িটা দান করবেন। তখন—

আবার কাঠের সিঁড়িতে শব্দ। দুলালবাবু চুপ করে গেলেন। সোমদেব এসে বললেন—বউমা তোমাকে ডাকছে।

দুলালবাবু বললেন—যাই। এঁদের খাওয়া হলে ট্রেটা নিয়ে যাব ভেবে ওয়েট করছিলাম।

—পরে নিয়ে যেও।

দুলালবাবু চলে গেলেন। সোমদেব মোড়ায় বসে বললেন—কমলেশের এক কলিগ এসেছিল। মানিক চ্যাটার্জি নাম। পলিটিক্যাল পার্টির মাতব্বর। দুপুরে একবার এসেছিল। এখন আবার এসে বলছে, কমলেশ একাজ করতেই পারে না। আমি বললাম, পুলিশ কেস। আমরা কেউই ওর নাম করিনি। পুলিশ সবাইকে জেরা করে গিয়ে ওকে অ্যারেস্ট করেছে। পুলিশকে গিয়ে বলো। মানিক বলছে, আমিও যেন ওর সঙ্গে যাই। তা কী করে হয়? আসল কথাটা এবার বলি। শান্তর বউ মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হবে না? সে স্পষ্ট দেখেছে—জ্যোৎস্না ছিল রাত্রে, কমলেশ আর নন্দ বাগানের দিকে যাচ্ছে। তখন রাত প্রায় সাড়ে দশটা কি এগারোটা হবে। শান্ত খবর পাঠায়নি রাত্রে, ফার্মহাউসে থাকবে। তাই বউমা—

কর্নেল চুরুট ধরাচ্ছিলেন। তাঁর কথার ওপর বললেন—ওঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই।

সোমদেব গম্ভীর মুখে বললেন—আসবে। আমি বলে এলাম আসতে।...

॥ দুই ॥

সোমদেব থিয়েটার নিয়ে কথা বলছিলেন। আমি ব্যালকনিতে গিয়ে দিনশেষের নদী দেখছিলাম। কর্নেল বলেন, এই সময়টাতে নাকি প্রকৃতিতে একটা আশ্চর্য সন্ধিকাল! প্রকৃতি জুড়ে একটা সাড়া পড়ে যায়। আমি অবশ্য তেমনি কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না। পাখিগুলো কেন যেন খুব ঝগড়াঝাঁটি করছিল। নদীর বাঁকে এক জেলে তার নৌকো থেকে শেষবার জাল ফেলে গুটিয়ে নিল। নৌকোটা ক্রমশ কালো হয়ে উঠছিল। ওপারের গাছপালার ওপর নীলাভ কুয়াশার স্তর জমে উঠল। বাঁদিকে পের্টিকোর সামনে ঘাসের ওপর একটি ছোট্ট মেয়ে আপনমনে স্কিপিং করছিল। শান্তিদেবের মেয়েই হবে। মুখের পাশে একটা ঝকমকে উজ্জ্বলতা। বাবার গায়ের রঙ তো শ্যামবর্ণ। মায়ের রঙ পেয়েছে হয়তো।

ঘরের ভেতর তখন স্যামুয়েল বেকেট, ইউনেস্কো, ইউজিন ও নিল ব্রেখট হুল্লোড় করছেন।... ব্রেখ্‌ট্ ইজ অলরাইট। আমিও ‘ককেসিয়ান চকসার্কেল’, করেছিলাম ‘ব্যূহ’ নাম দিয়ে —মাই কনসেপসন ইজ কোয়াইট ডিফারেন্ট কর্নেলসায়েব! সমাজচেতনা বা সমাজবদলানোর হাতিয়ার-টাতিয়ার, ওসবে আমি বিশ্বাস করি না। ফোকড্রামা লোকশিক্ষার বাহন ছিল কখন? যখন কিনা ওরাল ট্রাডিশানের যুগ। এখন লোকের শেখার অসংখ্য সোর্স আছে। ফোকফর্ম আমি প্রয়োগ করি। কখনও প্রসিনিয়াম থিয়েটারের অ্যাপ্রোচও ভেঙে ফেলি। কিন্তু শেষ কথা রস। এনটারটেনমেন্ট! ওই যে গল্প আছে না? যাত্রার আসরে রাম সেজে সীতার জন্য কান্নাকাটি করে-টরে বাড়ি ফিরে দরজা খুলতে দেরি হওয়ার জন্য বউকে হারামজাদি বলে এক লাথি!

এইসব কথাবার্তার পর সোমদেব উঠে আলো জ্বেলে দিলেন। কাঠের সিঁড়িতে একটু শব্দ শুনিনি। অথচ কেউ ঘরে ঢুকল। চোখ জ্বলে দেখে। রবিঠাকুরের 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পের সেই মহিলা একেবারে। টানা দুটি চোখে কী এক বিহ্বলতা। খোঁপা যেমন-তেমন করে বাঁধা। পরনে ফিকে নীল হাল্কা ডোরাকাটা শাড়ি। কর্নেলকে নমস্কার করলেন—নাকি করল বলব? মেয়েদের বয়স আমি কিছুতেই আঁচ করতে পারি না। তবে পঁচিশের বেশি হওয়া অসম্ভব।

কর্নেল বললেন—বসুন!

—আমার নাম রমা। আপনি নাম ধরে ডাকবেন এবং তুমি বলবেন।

সোমদেব হাসতে হাসতে বললেন—হ্যাঁ। আপনার মেয়ের বয়সী। আমি সময়মতো বিয়ে করলে আমার মেয়েও এই বয়সের হত। বউমা, তুমি বসে কথা বলো।

কর্নেল সোমদেবের দিকে তাকিয়ে আস্তে বললেন—যদি কিছু মনে না করেন, আমি একটু নিরিবিলি কথা বলতে চাই।

সোমদেব ব্যস্তভাবে বললেন—অবশ্যই।

রমা বললেন—দুলালদাকে আমি একটু বাইরে পাঠিয়েছি। আপনি টিংকুকে একটু বকে দিন তো গিয়ে। ডাকলাম। এল না। শিশিরে ঠাণ্ডা বাধিয়ে বসবে।

সোমবাবু ছড়ি হাতে বেরিয়ে গেলেন। কর্নেল আমার দিকে ঘুরে বললেন —আলাপ করিয়ে দিই। জয়ন্ত চৌধুরি। দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার সাংবাদিক।

রমা একটু হাসবার চেষ্টা করে বললেন—জানি। আপনাদের দুজনই আমার পরিচিত।

কর্নেল ভুরু কুঁচকে বললেন—কী করে?

—দুর্গাপুরে থাকার সময় আমি দৈনিক সত্যসেবক পড়তাম। এখানে এসে কাগজ পড়ার অভ্যাস চলে গেছে।

কর্নেল হাসলেন। —জয়ন্ত, তোমার একজন পাঠিকার দর্শন পেলে! চলে এস এখানে। রমা একটু ইতস্তত করে বললেন—আমার কিছু কথা আছে। এক মিনিট। সিঁড়ির নীচের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আসি।

রমা বেরিয়ে তেমনই নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলেন। কর্নেলের দিকে তাকালাম। দেখলাম বৃদ্ধ রহস্যভেদী টাকে হাত বুলোচ্ছেন। চোখ বন্ধ।

এ ঘরটার সঙ্গে দোতলার কোনও ঘরের সম্পর্ক নেই। দক্ষিণে ছোট্ট ব্যালকনি, পশ্চিমে দুটো বড়ো জানলার নীচে সেই জংলি ফুলবাগান, উত্তরে দরজার পর কাঠের সিঁড়ি এবং পুবদিকটায় নিরেট দেয়াল। সেদিকেই বাড়ির দরজা বা জানালা আছে কি না কে জানে।

pathagar.net

রমা এসে উত্তরের দরজাটাও বন্ধ করে একটা চেয়ারে বসলেন। ঘরের দুধারে দুটো সিঙ্গল খাট। একটায় আমি বসলাম। কর্নেল চোখ খুলে বললেন—তুমি গত রাতে কমলেশ আর নন্দকে বাগানের দিকে যেতে দেখেছিলে?

রমা চাপাস্বরে বললেন—হ্যাঁ। তবে শুধু গতরাতে নয়, দশমীর রাতেও দেখেছিলাম।

—ওদের কাকেও জিজ্ঞেস করোনি সে সম্পর্কে?

—নন্দকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। ও বলেছিল, 'জামাইবাবু নদীর ধারে বেড়াতে যাচ্ছিলেন। আমিও গেলাম।' ওদিকে একটা দরজা আছে। নদীর ধারে যাওয়া যায়। বাঁধানো একটা ঘাট আছে। রমা শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বললেন—গতরাতে টিংকুর বাবা বাড়ি ফিরল না। খবরও পাঠায়নি। তাই ঘর-বার করছিলাম। তো জানালা দিয়ে দেখি, দুজনে বাগানের দিকে যাচ্ছে। আমি ভাবলাম, খিড়কি দিয়ে নদীর ঘাটে বেড়াতে যাচ্ছে।

—তোমার শ্বশুরমশাইয়ের কোন সাড়া পাচ্ছিলে?

—নাহ্। কদিন থেকে ওঁকে ঘুমের ট্যাবলেট খাইয়ে দিই। উনি ঘুমিয়ে পড়েন।

—কমলেশ তো ওঁর পাশের ঘরে শোয়।

—হ্যাঁ। বাবামশাইয়ের ঘর থেকে ওর ঘরে যাওয়া যায়। আমার ননদ বেঁচে থাকার সময় ওরা দোতলায় থাকত। শেষের দিকে ঝগড়াঝাঁটিতে অতিষ্ঠ হয়ে জামাইবাবু নীচের ওই ঘরে এসে শুত।

—সেইসময় ব্রোঞ্জের সিল চুরি যায়?

—হ্যাঁ। বাবা বলছেন সিল চুরি যাওয়ার কথা। আমি ও-ঘরে তেমন কিছু দেখিনি।

—কিছু মনে কোরো না। তোমার এডুকেশন?

—পলিটিক্যাল সায়েন্স নিয়ে য়ুনিভার্সিটিতে পড়ছিলাম। হঠাৎ বাবা মারা গেলেন। তারপর একটার পর একটা বিপদ। মামাবাবু দুর্গাপুরে ইঞ্জিনিয়ার। বিয়ে লাগিয়ে দিলেন।

—গতরাতে তুমি কমলেশ আর নন্দকে বাগানে যেতে দেখেছিলে। তখন কটা বাজে?

—ঘড়ি দেখিনি। তবে এগারোটা হবে। রমা গলার স্বর আরও নামিয়ে বললেন—পুলিশকে যেটা বলিনি, আপনাকে বলছি। আমার ঘুম আসছিল না। টিংকুর বাবা ফিরলে ফটকের ওদিকে হর্ন বাজাবে। তখন নন্দ যদি ঘুমিয়ে পড়ে, ফটক কে খুলবে ভেবে জেগে ছিলাম। তারপর লোডশেডিং হয়ে গেল। হেরিকেন জ্বেলে দম কমিয়ে জানলার কাছে গেলাম। বাইরে পরিষ্কার জ্যোৎস্না।

pathagar.net

হঠাৎ দেখি জামাইবাবু পালিয়ে আসার মতো ছুটে আসছে। তারপর ওঁর ঘরের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ শুনলাম।

—গিয়ে খোঁজ নিলে না কেন?

রমা চুপচাপ কিছুক্ষণ আঙুল খুঁটে মুখ তুললেন। ছোট্ট শ্বাস ছেড়ে বললেন—তখন জামাইবাবু যে পালিয়ে আসার মতো ছুটে আসছে সেটা কিন্তু তত মনে হয়নি। মানে, গুরুত্ব দিইনি। হয়তো তাড়াতাড়ি ফিরছেন। তবু একবার মনে হয়েছিল, বেশ জোরেই আসছেন—ব্যাপারটা যেন একটু অস্বাভাবিকও। কিন্তু ভোরে নন্দের সাড়া না পেয়ে ওর ঘরে গিয়ে দেখি, দরজা বাইরে থেকে আটকানো। ভেতরে সে নেই। খাটিয়ায় বিছানা গুটোনো। তখন ভাবলাম বাথরুম করতে বেরিয়েছে। সাতটা বাজল। তখনও পাত্তা নেই ওর। টিংকুর জেঠুকে চা দিতে গিয়ে কথাটা বললাম। উনি গ্রাহ্য করলেন না। বাবামশাইকে চা দিয়ে এলাম। দেখলাম, আজ একটু যেন স্বাভাবিক হাবভাব। জামাইবাবুর দরজায় টোকা দিলাম। বাবামশাই বললেন—ঘুমোক। ওকে ডিসটার্ব কোরো না। সাড়ে সাতটায় টিংকুর বাবা এল। বলল, কী সব ধান-টান পেকেছে। চোরের উপদ্রব। আমার ধারণা—

pathagar.net

রমা হঠাৎ চুপ করলে কর্নেল বললেন—হুঁ, বলো।

—ড্রাংক হয়ে পড়েছিল। রমা একটু ফুঁসে উঠলেন। —ওই দুলালদাকে দেখছেন, সে-ও একই দলের লোক। সেও গতরাতে বাড়ি ফেরেনি।

—নন্দের বডি কখন দেখতে পেলে তোমরা?

—লক্ষ্মী নামে একটা মেয়ে এসে সারাদিন কাজ করে। সন্ধ্যার আগেই বাড়ি চলে যায়। ও আসে সকাল আটটা নাগাদ। আজ ফটকে ঢুকেই নাকি বাগানের দিকে তাকিয়ে ছিল। আসলে ওর ব্যাপারটা বুঝি। আমার ননদ স্যুইসাইড করার পর থেকে ওর চোখ সবসময় বাগানের দিকে থাকে। সন্ধ্যার আগেই কেটে পড়ে। বুঝতেই পারছেন, প্রচণ্ড সুপারস্টিশন ওদের। কতদিন বানিয়ে বলেছে আমাকে, আমগাছটার তলায় নাকি দিনদুপুরে একটা মেয়েকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে। আজও ওর কথা বিশ্বাস করিনি। কিন্তু লক্ষ্মী কান্নাকাটি করে বলতে লাগল। টিংকুর জ্যাঠা বললেন, দেখাই যাক না অমন করে বলছে যখন।

—সোমদেববাবু গিয়ে দেখতে পেলেন?

হ্যাঁ। টিংকুর বাবাও দৌড়ে গেল। আমি দূর থেকে একটু দেখেই চলে এলাম। ওঃ!

রমা শিউরে ওঠার ভঙ্গি করলেন। কর্নেল বললেন—তখন কমলেশ কোথায় ছিল?

—ঘরে ছিল না। আমরা অবশ্য কেউই লক্ষ্য করিনি। পুলিশ এসে বডি নিয়ে গেল। তখনও ওকে দেখিনি। দুলালদা এসে বলল, বাজারে একটা স্টেশনারি দোকানে বসে আছে। ঘণ্টা দুই পরে আবার পুলিশ এল। তখন শুনলাম, ডাক্তার পিঠে ইঞ্জেকশনের চিহ্ন দেখতে পেয়েছেন। পুলিশ হলঘরে প্রত্যেককে আলাদা ডেকে জেরা করল। আমি জামাইবাবুর সঙ্গে নন্দের যাওয়ার কথাটা শুধু বললাম। ওর পালিয়ে আসার ব্যাপারটা বললাম না। রমার চোখে জল এসে গেল। মুখ নামিয়ে বললেন—ওর জন্য আমার কষ্ট হত। এখনও হচ্ছে। আমার ধারণা, কমলেশ কখনও নন্দকে মার্ডার করেনি। তা ছাড়া ও রোগী মানুষ। নন্দকে গাছের ডালে ঝোলানো ওর পক্ষে সম্ভব নয়।

আমি বললাম—সঙ্গে লোকজন থাকতে পারে!

রমা জোর দিয়ে বললেন—নন্দকে কেন মারবে জামাইবাবু, তা ছাড়া আমি এখন সিওর, আমার ননদকেও একইভাবে কেউ মেরে গাছে ঝুলিয়েছিল। এ একই লোকের কাজ।

কর্নেল বললেন—সে কে হতে পারে?

—জানি না। আপনি খুঁজে বের করুন। আমি জানি, আপনি তা পারবেন।

—পারমিতার ডেডবডি কে প্রথম দেখতে পেয়েছিল?

—জামাইবাবু। ও মাঝেমাঝে বাগানে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকত।

—নন্দকে কেন মারা হল বলে তোমার ধারণা?

একটু চুপ করে থেকে রমা খুব আস্তে বললেন—নন্দ হয়তো টের পেয়েছিল কে টিংকুর পিসিকে মেরে গাছে ঝুলিয়ে দিয়েছে। তাই তার মুখ বন্ধ করা হল।

—পারুকে কেন মারা হয়েছে? মানে, তোমার কী ধারণা?

—আমি কথাটা ভেবেছি। কোনও উত্তর খুঁজে পাইনি। তবে....

—তবে?

—জামাইবাবু হয়তো জানে। না জানলেও ওর একটা আইডিয়া থাকতে পারে। কারণ পারুর মৃত্যুর পর একদিন কথায়-কথায় আমাকে বলেছিল, পারু আর যা-ই করুক, মরার ইচ্ছে ওর ছিল না। অথচ ওকে মরতে হল। এটাই কি নিয়তি বউদি? জামাইবাবু আমাকে বউদি বলে।

—তুমি কী বলেছিলে ওকে?

—কী বলব? আসলে তখন ওসব কথার আলাদা কোনও মানে তো খুঁজিনি। জাস্ট কথা। এখন মানে খুঁজে পাচ্ছি।

—পারুর মৃত্যুতে তোমার শ্বশুরমশাইয়ের কী রিঅ্যাকশন হয়েছিল?

—প্রচণ্ড শক পেয়েছিলেন। চুপচাপ বসে থাকতেন। সেই প্রথম পাগলামির

লক্ষণ শুরু হল। আমার ধারণা, সিল চুরি ওঁর ইমাজিনেশন। লোকাল ডাক্তার বলেছেন, স্কিজোফ্রেনিয়া। তাই টিংকুর জেঠু সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে গিয়েছিলেন।

কর্নেল এতক্ষণে চুরুটের কেস থেকে একটা চুরুট বের করে ধরালেন। তারপর বললেন—আমি এখনও বুঝতে পারছি না কেন সাইকিয়াট্রিস্ট ডঃ ঘোষ সোমদেববাবুকে আমার কাছে পাঠালেন। আচ্ছা, তুমি কি জানো ডঃ ঘোষ এখানকার লোক?

—শুনেছি।

কর্নেল চোখ বুজে বললেন—পারুর অমতে কমলেশের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। জানো কি?

—হুঁ।

—অমতের কোন বিশেষ কারণ ছিল?

রমা মুখ নামিয়ে আস্তে বললেন—কাঞ্চন নামে একটা ছেলের সঙ্গে ওর সম্পর্ক ছিল। ছেলেটাকে আমি বার দু-তিন দেখেছি। মস্তানটাইপ বাজে ছেলে। হাফ এডুকেটেড। তবে ওর বাবার বড় বিজনেস আছে ট্রান্সপোর্টের। কলকাতার একটা মেয়েকে এলোপ করে এনেছিল। পুলিশকেস হয়েছিল। মিটে গেছে শুনেছি।

—মেয়েটি?

—এখন ওর বউ। কাঞ্চনের বাবা মেনে নিয়েছেন।

—তোমার শ্বশুরমশাই সিল হারানোর ব্যাপারে নাকি বলেন, 'পারু সব জানে। তাকে ডাকো।'

—হ্যাঁ। প্রায়ই বলেন। উনি বিশ্বাস করেন না পারু মারা গেছে।

আমি বললাম—কিন্তু সোমদেববাবু বলেছিলেন, পারুর একটা নিজের হাতে লেখা স্যুইসাইডাল নোট পাওয়া গিয়েছিল?

রমা আমার দিকে তাকালেন। একটু পরে বললেন—সেই কথাটাই কর্নেলসায়েবকে গোপনে বলতে চাই। আমি পারুর হাতের লেখা চিনি। ও লেখা পারুর হাতে লেখার মতো। কিন্তু কিছুতেই পারুর নয়।

কর্নেল বললেন—নয় বলছ?

—নাহ্। লোকাল পুলিশের ব্যাপার তো জানেন। তাড়াহুড়ো করে সব হাশ আপ করতে চায়।

—তুমি এ কথা কাকেও বলেছিলে?

—টিংকুর বাবাকে বলেছিলাম। বিশ্বাস করেনি।

—আর কাকেও?

—নাহ্। টিংকুর বাবা নিষেধ করেছিল। বাড়িতে অশান্তি শুরু হত।

—চিঠিটা কোথায় আছে জানো?

—পুলিশ নিয়ে গিয়েছিল।

—পুলিশ পারুর লেখার সঙ্গে মিলিয়ে দেখেনি ওটা?

—জানি না। রমা উঠে দাঁড়ালেন। —আপনি খুব কফির ভক্ত জানি। জয়ন্তবাবুর ফিচারে পড়েছি। কফি পাঠিয়ে দিই।

কর্নেল হাসলেন। —দিতে পারো। তো একটা কথা। এই যে তুমি নীচের দরজা বন্ধ করে আমার সঙ্গে কথা বললে, এত সতর্কতার কি বিশেষ কোনও কারণ আছে?

—দুলালদার খুব আড়িপাতার অভ্যাস আছে। তা ছাড়া আমি... একটু ইতস্তত করে রমা খুব আস্তে বললেন—টিংকুর জেঠু সম্পর্কে সিওর নই। মানে, ওঁর হাবভাব চালচলন আমার কেমন অস্বাভাবিক লাগে। উনি থিয়েটারের লোক। কখন অভিনয় করছেন, কখন করছেন না। আমি বুঝতে পারি না।

—আর দুটোমাত্র প্রশ্ন করব তোমাকে।

—করুন না!

—তোমার স্বামী কোন ডিপার্টে ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন?

—ইরিগেশন ।

—হঠাৎ চাকরি ছেড়ে এখানে এসে চাষবাসে মেতে উঠলেন কেন জানো?

—বাবামশাই চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন, টিংকুর জেঠু দুলালদাকে দিয়ে চাষ করাচ্ছেন। বর্গাদারের নাম বসানো ঠেকানো গেছে বটে; কিন্তু ওঁর সন্দেহ, ভেতরে-ভেতরে কিছু জমিও বেচে দিয়েছেন। 'এজমালি প্রপার্টি' না কী বলে যেন। বণ্টন হওয়ার আগে এভাবে কোনও শরিক নাকি আইনত জমি বেচতে পারে না। তা ছাড়া মেজভাসুরেরও অংশ তো আছে। টিংকুর বাবার কাছে শুনেছি, ওর ঠাকুরদার উইলে তিরিশ একর লেখা আছে। সেটা ঠেকেছে পঁচিশ একরে। তবে ভাইদের মধ্যে বনিবনা আছে। টিংকুর বাবার দাদার বিরুদ্ধে কিছু বলেনি।

—এই বাড়িটা তোমার শ্বশুরমশাইয়ের নামে দেওয়া আছে?

রমা নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে বললেন—যত গণ্ডগোল এই বাড়ি। বাবামশাই নাকি মাস তিনেক আগে আমার ননদ আর জামাইবাবুর নামে এই বাড়ি উইল করে দিয়েছেন। সত্যিমিথ্যা জানি না। টিংকুর বাবা কার কাছে শুনেছিল। তবে এনিয়ে প্রকাশ্যে কোনও অশান্তি হয়নি। বাবামশাইকে দুই ছেলেই এ নিয়ে চার্জ করেনি। করলে জানতে পারতাম। আপনি যেন দয়া করে ও ব্যাপারে আমার নাম করবেন না। তা হলে...

কর্নেল হাত তুলে ঋষিসুলভ বরাভয়ের ভঙ্গিতে বললেন—হুঁ, কফি।

pathagar.net

রমা চলে গেলেন। একটু পরে আমি বললাম—দ্য মিস্ট্রি ইজ সলভ্‌ড্ বস্!

কর্নেল মিটিমিটি হেসে বললেন—কী ভাবে?

সোজা হিসেব। এতবড় একটা বাড়ি। চারদিকে বিশাল জায়গা। নির্ঘাত কয়েক লাখ টাকার সম্পত্তি। আজকাল মানুষের যা ব্যাপার স্যাপার, ভাই-বোন রক্তের সম্পর্কের চেয়ে প্রপার্টির মূল্য অনেক বেশি। দুই ভাই মিলে চক্রান্ত করে বোনকে মেরে বোনের স্বামীকে ফাঁসানোর জন্য শেষে নন্দকে মেরেছে। নন্দ নিশ্চয়ই ব্যাপারটা জানত। তারপর এই ভদ্রমহিলাকে দিয়ে গত রাতের গল্পটা সাজিয়েছে। মেয়েরা জন্ম অভিনেত্রী। সোজা ব্যাপার।

কর্নেল অট্টহাসি হাসলেন। —সোজা ব্যাপার আর রইল না ডার্লিং! রহস্য আরও জটিল হল।

কাঠের সিঁড়িতে শব্দ হচ্ছিল। তাই চুপ করে গেলাম। শান্তিদেব এলেন এবার।....

॥ তিন ॥

শান্তিদেব বললেন—ফার্মে গিয়েছিলাম। আজকাল চোরের বড় উপদ্রব। এক জাতের হাই-ইল্ডিং ভ্যারায়টির ধান বেমরশুমে ফলে। কাঁটাতারের বেড়া কেটে চোর ঢুকেছিল পরশু রাতে। বলছি বটে চোর, ব্যাপারটা ঈর্ষাজনিত শত্রুতা। যাইহোক, কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো আপনাদের?

pathagar.net

কর্নেল বললেন—একটুও না। আপনার স্ত্রী আমার ফ্যান। জানেন কি?

—জানি মানে? শান্তিদেব হাসলেন। বড়দা সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যাচ্ছে শুনে রমাই আমাকে আপনার কথা সাজেস্ট করল। সমস্ত ব্যাপারটা মিসটিরিয়াস—আই মিন, সিলচুরি এবং বাবার অদ্ভুত পাগলামি। তো দুজনে কনসাল্ট করে বড়দা রওনা হওয়ার আগেই আমি ডাঃ ঘোষকে ট্রাঙ্ককল করে অনুরোধ করলাম, বড়দা গেলে উনি যেন তাকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেন। ফোনগাইডে নিশ্চয়ই আপনার ঠিকানা পাওয়া যাবে, সে-কথাও বললাম।

—আই সি!

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে দেখুন, তারপর মিস্ট্রিটা সাংঘাতিক জটিল হয়েও গেল। আপনি আসছেন, এদিকে নন্দ মার্ডার হয়ে গেল। রমা ইজ ইনটেলিজেন্ট। মেয়েদের যে সত্যিই অন্য একরকম ইনটুইশন আছে, আই বিলিভ ইট।

—আপনার স্ত্রীর বিশ্বাস, তার ননদকেও কেউ একইভাবে খুন করে গাছে ঝুলিয়ে রেখেছিল।

শান্তিদেব গোঁফ চুলকে একটু দ্বিধার সঙ্গে বললেন—এখন আমাদেরও তাই মনে হচ্ছে। কমলেশকে সন্দেহ করা ছাড়া কোনও উপায় থাকছে না। আরও বড় কথা, কমলেশকে লোকাল পলিটিক্যাল পার্টির এক মাতব্বর মানিক

চ্যাটার্জি ডিফেন্ড করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। কাজেই বোঝা যাচ্ছে, কমলেশের পেছনে দলবল আছে। বডি গাছে ঝোলানোর মতো লোকের অভাব থাকছে না তা হলে। বলুন পয়েন্টটা কারেক্ট কি না?

কর্নেল আস্তে বললেন—হুঁ। দ্যাটস পসিবল।

শান্তিদেব জোর দিয়ে বললেন—রিলায়েবল সোর্সে জেনেছি, বাবা পারু এবং কমলেশের নামে এই বাড়ি সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি-সহ উইল করে রেখেছেন। শর্ত হল, বাড়িটা মিউজিয়াম হবে এবং একাংশে ওরা দুজনে বসবাস করতে পারবে। কমলেশ হবে মিউজিয়ামের কিউরেটর ইত্যাদি। এদিকে মানিক চ্যাটার্জিরাও এটা চাইছিল অনেকদিন থেকে। বাবাকে ওরাই তাতিয়েছে বরাবর। সো কমলেশের মোটিভ ইজ ক্লিয়ার।

—আপনার স্ত্রীর মতে, স্যুইসাইডাল নোটের লেখা আপনার বোনের নয়।

শান্তিদেব নড়ে বসলেন।—হ্যাঁ রমা আমাকে বলেছিল কথাটা। আমি পাত্তা দিইনি। কারণ পারু হিস্টেরিক টাইপ মেয়ে। ওর বিয়েটা বাবা জোর করে দিয়েছিলেন বলা যায়। বড়দা তো থিয়েটারপাগল মানুষ। ইন্টারফেয়ার করেনি। আমি তখন দুর্গাপুরে। এনিওয়ে, স্যুইসাইড করার আগে হাতের লেখা অন্তত পারুর মতো মেয়ের পক্ষে একটু অন্যরকম হতেই পারে। তাড়াহুড়ো করে লেখা আঁকাবাঁকা হরফ।

আমি বললাম—মর্গের ডাক্তারের কোনও সন্দেহ হয়নি, এটা অবাক লাগছে!

শান্তিদেব একটু চুপ করে থেকে বললেন—মফস্বলের মর্গের অবস্থা আপনি জানেন না। ডোমই বডি কাঁটাছেঁড়া করে। ডাক্তার দায়সারাভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন। স্যুইসাইড না স্যুইসাইড! তো নতুন ডাক্তার ভদ্রলোক ইয়ংম্যান। ভেরি পার্টিকুলার সব ব্যাপারে। আলাপ করে মনে হল, ডাক্তারিটা চাকরি হিসেবে নেননি এবং প্রফেশনের ব্যাপারে হি ইজ অ্যামবিশাস।

কর্নেল বললেন—আপনার দাদা বলছিলেন, বাবা পাগল হয়ে গেলে আপনারা নাকি ভেসে যাবেন। হোয়াটস দ্যাট?

শান্তিদেব গম্ভীর হয়ে বললেন—দাদা বলেছে আপনাকে?

—হ্যাঁ।

শান্তিদেবকে বিস্মিত দেখাচ্ছিল। বললেন—কেন এ কথা দাদা বলেছে বুঝতে পারছি না। ঠাকুর্দা অতসব ধানী জমি আমাদের তিন ভাই-বোনকে দিয়ে গেছেন। রন্তুদা সম্ভবত আমেরিকায় থেকে যাবে। পারু বেঁচে নেই। কাজেই সব জমি দাদা আর আমার হাফ-হাফ শেয়ার। ভেসে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

আমি বললাম—তা হলে হয়তো এই বাড়ির ব্যাপারেই কথাটা বলেছেন আপনার দাদা।

শান্তিদেব আমার দিকে তাকালেন। —বাবার উইলের ব্যাপারটা নিয়ে দাদার সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম। বাবা পাগল হয়ে গেলে তো উইলের এগেনস্টে স্ট্রং লিগ্যাল অপজিশন দাঁড় করানো সহজ হবে। শান্তিদেব মাথা দোলালেন। —থিয়েটারের নেশা দাদার মাথাটা খেয়েছে। কী বলতে কী বলেন। জানেন? আমাদের বংশটাই বাতিকগ্রস্ত। কেউ ছিলেন গাছপাগলা। কেউ ধর্মপাগল। কেউ সর্বস্বান্ত হয়ে সমাজসেবী। এদিকে বাবা আর্কিওলজি-পাগল। দাদা থিয়েটারপাগল। আর আমি হলাম চাষপাগল।

শান্তিদেব হেসে ফেললেন। সিঁড়িতে শব্দ হচ্ছিল। দুলালবাবু আরেকবার কফি নিয়ে এলেন। শান্তিদেব বললেন—তুমি এখনও ফার্মে যাওনি?

দুলালবাবু বললেন—যাচ্ছিলাম। বউদি বললেন স্যারদের কফি দিয়ে যেতে।

—শিগগির চলে যাও। দেরি কোরো না। রমা আমাকে বললেই পারত।

দুলালবাবু চলে গেলেন। কর্নেল বললেন—আপনি গতরাতে ফার্মে ছিলেন?

—হ্যাঁ। নিজে না থাকলে চলে না—আজকাল কাউকে বিশ্বাস করা কঠিন। আজ রাত্রেও থাকার কথা ছিল। রমা নিষেধ করল। আপনারা এসেছেন। দাদা এইমাত্র থিয়েটারক্লাবে চলে গেল। বড্ড ইরেসপনসিবল টাইপ।

—আপনার বাবা এখন কী করছেন?

—দরজা বন্ধ আছে দেখে এলাম। বাবার যা কাজ! মিউজিয়ামের জিনিসপত্র নাড়াঘাঁটা, কিংবা একটা ভাঙাচোরা পুতুল হাতে নিয়ে তাকিয়ে থাকা আর বিড়বিড় করে প্রলাপ বকা।

—কমলেশবাবুকে খুঁজছেন না, খোঁজেননি আজ?

—খুঁজছিলেন নাকি। রমা বলেছে, কলকাতা গেছে। বাবার সঙ্গে এখন দেখা করবেন?

—কোনও অসুবিধে না হলে...

—রমা ক্যান ম্যানেজ ইট। কফি খেয়ে নিন। রমাকে বলছি।

শান্তিদেব চলে গেলেন। কফি খেতে ইচ্ছে করছিল না। আসলে এ কফি কর্নেলের বাড়ির পারকোলেটারে তৈরি নির্ভেজাল কফি নয়। বাজারচলতি গুঁড়ো কফি। কিন্তু কর্নেলের কাছে 'কফি' নামটাই যথেষ্ট। তারিয়ে-তারিয়ে খেতে খেতে বললেন—খাসা।

বাইরের দিকে তাকিয়ে বললাম—তার চেয়ে খাসা জিনিস আপনার মাদারনেচার ঝুলিয়ে দিয়েছে আকাশে। একেবারে ঢাকাই পরোটা।

—ডার্লিং! নদীর শিয়রে চাঁদ প্রকৃতির এক অলৌকিক উপহার। ঢাকাই পরোটা নিছক লৌকিক জিনিস। খেতেও আহামরি নয়। কর্নেল কফির জাগ হাতে ব্যালকনিতে গেলেন।

আমিও গেলাম। গিয়েই চোখ পড়ল বাগানের গাঢ় ছায়ার ভেতর টর্চের আলো। আলোটা যেন সাবধানী। নীচে কয়েকবার কয়েকটি ছোট্ট আলোর বৃত্ত গড়ে নিভে গেল। বললাম—ওখানে কে কী করছে এখন?

কর্নেল কোনও জবাব দিলেন না।

—শান্তিদেববাবু নাকি?

কর্নেল তবুও চুপ করে রইলেন।

একটু বিরক্ত হয়ে বললাম—ব্যাপারটা মিসটিরিয়াস কিন্তু!

—হুঁঃ!

—কী আশ্চর্য! ওই ভুতুড়ে জঙ্গলে আলো দেখে আপনার কিছু মনে হচ্ছে না?

কর্নেল কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন—যতদূর জানি, ভূতেরা টর্চ ব্যবহার করে না।

—আহা, আমি তা বলছি না।

এবার নীচে বাঁদিকে পোর্টিকোর তলা থেকে জোরালো টর্চের আলো দেখা গেল। বাড়ির বাইরে কোনও আলোর ব্যবস্থা নেই। ঘাসেভরা লনের ওপর জ্যোৎস্নায় এতক্ষণে একটা মূর্তি বেরিয়ে এল। আলো ফেলতে ফেলতে সে জঙ্গলে বাগানের দিকে দ্রুত হেঁটে যাচ্ছিল। লোকটাকে চিনতে পারলাম। শান্তিদেব!

একটা নাটকীয় ঘটনা ঘটতে চলেছে ভেবে বললাম—কর্নেল। আমাদের যাওয়া উচিত। শান্তিদেববাবু বিপদে পড়তে পারেন। নিশ্চয় কোনও আউটসাইডারকে তাড়া করতে গেলেন উনি।

কর্নেল ঘরে গেলেন। কফির পাত্র রেখে চুরুট ধরিয়ে চেয়ারে গ্যাঁট হয়ে বসলেন। মুখে নির্বিকার ভাব।

ঘরে ঢুকে ওঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারপর দেখি, বৃদ্ধ রহস্যভেদী দাড়িতে হাত বুলোচ্ছেন। চোখদুটি বন্ধ। এমন অবস্থায় কী আর করা যাবে, হতাশভাবে বসে পড়লাম।

বেশ কিছুক্ষণ পরে দরজায় রমাকে দেখা গেল। আশ্চর্য ব্যাপার! ভদ্রমহিলা এমন নিঃশব্দে চলাফেরা করতে পারেন। পুরনো কাঠের সিঁড়িকেও ওঁর পা চুপ করিয়ে রাখে কী কৌশলে? তারপর ওঁর পায়ের দিকে চোখ পড়ল। খালি পায়ে হাঁটেন দেখছি। তাই এমন নিঃশব্দ চলাফেরা।

রমা আস্তে বললেন—বাবামশাইয়ের অদ্ভুত ব্যাপার। কখন বেরিয়ে বাগানে ঢুকেছিলেন লক্ষ্য করিনি। টিংকুর বাবা ধরে নিয়ে এল।

কর্নেল তাকালেন।

—আপনি কথা বলবেন বলেছেন। আসুন। একটু স্বাভাবিক মনে হচ্ছে এখন।

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—আমার কী পরিচয় দিয়েছেন ওঁকে?

রমা একটু আড়ষ্ট হেসে বললেন—আমি বললাম আরকিওলজিস্ট। কাগজে আপনার আবিষ্কারের খবর পড়ে আলাপ করতে এসেছেন। শুনে বাবামশাই বললেন, আর্কিওলজি ব্যাপারটাই গোড়ার দিকে মিলিটারি অফিসারদের একচেটিয়া ছিল। ওঁরাই সাইট এক্সক্যাভেশন, ফিল্ডরিসার্চ করতেন। ওঁকে নিয়ে এস।

সিঁড়িতে নামতে নামতে বললাম—বাগানে উনি কী করতে গিয়েছিলেন?

—হঠাৎ নাকি ওঁর ভয় হয়েছিল পারুর মতো কমলেশও স্যুইসাইড করছে। তাই তাকে দেখতে পাচ্ছেন না। আমরা নাকি বানিয়ে বলেছি, কলকাতা গেছে। টিংকুর বাবা জোর করে নিয়ে এল বাগান থেকে। আসছিলেন না। তখন আপনার আসার কথা বলেছেন। অমনি উনি ইন্টারেস্টেড হয়ে উঠেছেন।

নীচের ঘরে নেমে কর্নেল হঠাৎ বললেন—তোমার ভাসুরমশাইয়ের হাতে সবসময় ছড়ি থাকে কেন জানো?

রমা যেন একটু চমকে উঠলেন। —জানি না। তবে প্রায় মাসখানেক থেকে দেখছি ছড়িটা। খাওয়ার টেবিলেও সঙ্গে থাকে। হল ঘরে গিয়ে রমা অন্যমনস্কভাবে বললেন—এ বাড়ির যা অবস্থা, প্রায় সাপ বেরোয়। নন্দ একটা কেউটে মেরেছিল বর্ষার সময়। হয়তো সাপের ভয়েই উনি ছড়ি হাতের কাছে রাখেন। মানুষটা একটু ভীতুও।

হলঘরের ভেতরে একটা দরজা দিয়ে রমা আমাদের যেখানে নিয়ে এলেন, সেখানে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। পাশে সংকীর্ণ করিডর। ডানদিকের দরজায় পর্দা ঝুলছে। ভেতরে উজ্জ্বল আলো। রমা পর্দা ফাঁক করে বললেন—বাবামশাই! কর্নেলসায়েব এসেছেন।

রুগ্ণ এবং ফ্যাসফেঁসে গলায় সাড়া এল—স্বাগতম! সুস্বাগতম!

কর্নেল আগে ঢুকলেন। তাঁর পেছনে আমি। ঘরটা বিশাল। প্রথমেই চোখে পড়ল এলোমেলো পাথর। আবর্জনার ডাঁই। দেয়াল ঘেঁসে দাঁড় করানো সারিবন্দি আলমারিতে জরাজীর্ণ বই ঠাসা। আলমারিগুলোর মাথায় পাথর আর পোড়ামাটির ভাঙাচোরা অসংখ্য মূর্তি। বিবর্ণ তৈজসপত্র। এক কোনায় প্রকাণ্ড একটা সেকেলে খাট। খাটের পাশে একটা টেবিলের ওপর হাতখানেক উঁচুতে আলাদা একটা জ্বলন্ত শেড-ল্যাম্প ঝুলছে। টেবিল জুড়ে ভাঙাচোরা খেলনাপাতির মতো জিনিস। চশমার খাপ। একগাদা কলম। হোমিওপ্যাথির বাক্সোর মত একটা বাক্সো পর্যন্ত। খাটে পা ঝুলিয়ে বসে আছেন অবিকল সোমদেববাবুর বৃদ্ধ এক প্রতিমূর্তি। সন্ন্যাসীদের মত লম্বা চুল, পেল্লায় গোঁফ—সবই সাদা। খোঁচা খোঁচা দাড়ি গজিয়ে আছে মুখে। এক হাতে একটা আতসকাঁচ, অন্যহাতে একটা কালচে চাকতি। মনেমনে ভাবলাম, এ যে দেখছি কর্নেলেরই দোসর!

কর্নেল করজোড়ে নমস্কার করে কাছে গেলে জয়দেববাবু উঠে দাঁড়িয়ে ওঁর দুটো হাত চেপে ধরলেন। কর্নেলের মতোই মাথায় উঁচু। কিন্তু শীর্ণ আর একটু কুঁজো। বললেন—আমার এই মিউজিয়ামে বিশ্বের বড়-বড় পণ্ডিতের পায়ের ধুলো পড়েছে। রন্তু! আমার মধ্যম পুত্র। আমেরিকায় থাকে। তার কাছে খোঁজ পেয়ে সব চলে আসেন। এই তো এক জার্মান সায়েব—মাথার চুল আঁকড়ে ধরে নামটা স্মরণের চেষ্টা করলেন।

কর্নেল বললেন—গ্যান্সলার?

—গ্যান্সলার! চেনেন আপনি?

রমা বললেন—বাবামশাই এঁদের বসতে বলুন।

জয়দেব বললেন—আপনি কী যেন....

কর্নেল বললেন—কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। এর নাম জয়ন্ত চৌধুরি। সাংবাদিক।

—কী সৌভাগ্য! কী সৌভাগ্য! হাসলেন জয়দেব। দাঁতগুলো বাঁধানো মনে হল। আমরা টেবিলের পাশে রাখা দুটো গদিআঁটা চেয়ারে বসলে ফের বললেন—ওরা সব বিরক্ত হয়। আমি বলি, মধু থাকলে মৌমাছি আসবেই। পালসাম্রাজ্যের স্মৃতিপিণ্ড! স্বচক্ষে দর্শন করুন। বাট আই হ্যাভ ডিসকভার্ড মোর দ্যান দ্যাট।

বলে লম্বা হাত ছড়িয়ে পাপুরে আবর্জনার দিকটা দেখলেন জয়দেব। কর্নেল বললেন—খরোষ্ঠীলিপির সিল?

—ইয়েস! আরও দেখাচ্ছি! জয়দেব এগিয়ে আলমারির পাশে রাখা একটা কালো কলসি নিয়ে এলেন—পালপুকুর খোঁড়ার সময় এটা পাওয়া গেছে। এই দেখুন, খরোষ্ঠীতে লেখা আছে—বলে চোখে চশমা পরলেন। আমি পাঠোদ্ধার করেছি। 'ব্যপয় কোশা' তার মানে 'সেচের পাত্র'। 'কো'—টা মুছে গেছে। ওটা বোঝাই যায়। চলতি কথায় কোশা-কুশি বলি আমরা।

আমি না বলে পারলাম না—সেকালের লোকে কি জলের গ্লাসেও জলের গ্লাস লিখত?

—এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়ান আর্ট।

কর্নেল কী যেন ভাবছিলেন। আমি বললাম—এটা কত বছরের পুরনো?

জয়দেব বললেন—প্রায় দুহাজার বছরের। খরোষ্ঠীলিপির যুগ! মাইন্ড দ্যাট।

—পুকুরের তলায় পাওয়া গেছে?

—হ্যাঁ। জয়দেব সস্নেহে পাত্রটার গায়ে হাত বোলাতে লাগলেন।

—এটা মাটির তৈরি?

—হ্যাঁঃ।

—দু হাজার বছরের মাটির কলসি পুকুরের তলায় এমন আস্ত থেকে গেছে?

জয়দেবের চোখদুটো জ্বলে উঠেছিল। দ্রুত কর্নেল বললেন—এটা সাংবাদিক সম্মেলন নয়, জয়ন্ত! তাছাড়া আর্কিওলজির ছাত্রও তুমি ছিলে না। ওই লিপিই প্রমাণ দিচ্ছে—এনিওয়ে! জয়দেববাবু, আপনি এর আগেও নিশ্চয় সাংবাদিকদের পাল্লায় পড়েছেন?

জয়দেব খিক খিক করে হাসলেন। —পড়েছি। আই নো দেম ওয়েল। ইয়েস! আস্কস্ মি কোয়েশ্চনস!

—আপনার মিউজিয়াম থেকে খরোষ্ঠীলিপির একটা ব্রোঞ্জ সিল হারিয়েছে শুনলাম?

জয়দেব কলসিটা টেবিলে সাবধানে রেখে চোখ থেকে চশমা খুললেন। হঠাৎ তাঁকে অত্যন্ত দুঃখিত মানুষ মনে হল, ফিসফিস করে বললেন—নন্দ! চোর! তেমনি ফিসফিস করে কথাটা উচ্চারণ করলেন জয়দেব—একের নম্বর চোর।

—নন্দ কি এবাড়ির সারভ্যান্ট?

—পারু, আমার মেয়ে পারু সব জানে। ওকে ডাকি।

জয়দেব ব্যস্তভাবে খাট থেকে উঠে দাঁড়ালে কর্নেল বললেন—আপনি বসুন। আমি আপনার মেয়ের কাছে জেনে নেবখন।

জয়দেব বসলেন! হতাশভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বললেন—তাকে পাচ্ছেন কোথায়? শি ইজ ডেড।

—তাই বুঝি?

—ডেড। বাট শি স্পিকস টু মি। এই তো গতরাতে... নাহ্। আপনি কর্নেল?

—হ্যাঁ। রিটায়ার্ড।

জয়দেবের মুখে সামান্য পাগলামির লক্ষণ ফুটে উঠল। বিড় বিড় করে বললেন—সিলটাতে লেখা ছিল 'য়েন্ন দাদভঃ'। প্রাকৃত ভাষা। সংস্কৃত করলে কথাটা হবে 'যেন দাদভঃ'। বাকি লেটারগুলো পড়তে বাকি ছিল... পালরাজারা বৌদ্ধ। বৌদ্ধরাই খরোষ্ঠীলিপি ব্যবহার করত। আর্লি প্রাকৃত ওয়াজ পালি।

—জয়দেববাবু!

—নন্দ সিল চুরি করবে কেন? ওটা নিয়ে কী করবে সে?

জয়দেববাবু একটু চুপ করে থাকার পর স্বাভাবিক হলেন। ফিসফিস করে বললেন—সায়েবকে বেচেছে। সায়েব—কী যেন নাম?

—গ্যান্সলার।

—গ্যান্সলার বলেছিলেন মিউনিখ মিউজিয়াম পাকিস্তান থেকে একটা খরোষ্ঠী সিল কিনেছে ফর্টি থাউজ্যান্ড ডয়েটস মার্কে। স্মাগলিং র‍্যাকেটের থ্রু দিয়ে কিনেছে।

—নন্দ আজ কোথায় আছে জানেন?

—বউমা বলছিল, গতরাতে পালিয়ে গেছে। সোমুকে দিয়ে থানায় খবর দিয়েছে।

—আপনি ঘুম থেকে কখন ওঠেন?

—সাড়ে সাতটা। আগে ছটায় উঠতাম। ইদানীং কেন যেন ঘুম ভাঙে না।

—আজ সকালে বেরিয়েছিলেন?

—বেরিয়েছিলাম কি না জিজ্ঞেস করছেন? নাহ্। আর আমার বেরুনোর যো নেই। সব চুরি হয়ে যাবে। আর আমি কাউকে বিশ্বাস করি না বউমাকেও না। এই যে আপনারা বসে আছেন, আমি কিন্তু নজর রেখেছি।

জয়দেব ফিক ফিক করে হাসতে লাগলেন।

—সারাটা দিন কী করলেন ঘরে বসে?

একটা বাঁধানো মস্ত খাতা দেখিয়ে জয়দেব বললেন—মিউজিয়ামের প্রত্যেকটা জিনিসের তালিকা করছি। আইটেম নাম্বার, ডেসক্রিপসন, আনুমানিক পিরিয়ড, প্লেস অব ডিসকভারি অ্যান্ড রিমার্কস! ফোর হানড্রেড থার্টি সেভেন পিসেস অব আর্কিওলজিক্যাল অবজেক্টস। মাইনাস ওয়ান—ওই ব্রোঞ্জ সিলটা।

—আপনার এই মিউজিয়ামের উত্তরাধিকারী কাকে ঠিক করেছেন?

—কমলেশ। আ ব্রিলিয়ান্ট বয়। আমার হাতে গড়া ছাত্র। আপনি জানেন আমি সারাজীবন শিক্ষকতা করেছি?

—শুনেছি। আপনি স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। কমলেশবাবু আপনার জামাই, তা-ও শুনলাম।

জয়দেববাবু ফিস ফিস করে বললেন—আমার মেয়ে-জামাইয়ের নামে মিউজিয়ামসুদ্ধ গোটা বাড়িটা উইল করে রেখেছি।

—আপনার মেয়ে তো বেঁচে নেই।

—আত্মা অমর। শি স্পিকস্ টু মি।

জয়দেববাবু পাঞ্জাবির একটা আস্তিনের ভেতর বাঁহাত ঢুকিয়ে বাহু চুলকোতে থাকলেন।

কর্নেল বললেন—আপনি কি কোনও ডাক্তারকে দিয়ে নিয়মিত চিকিৎসা করান?

জয়দেব বিকৃতসুরে বললেন—ওই যে নাড়ু ডাক্তার আছে। ইঞ্জেকশন দেয় মাসে একটা করে। চুলকোচ্ছে।

—অসুখটা কী?

—পালগড় মাউন্ড এক্সক্যাভেশন আমি নিজের খরচায় করিয়েছি, জানেন? কী কী করেছি শুনুন। জয়দেব বাঁধানো খাতাটার দিকে হাত বাড়ালেন।

কর্নেল ফের বললেন—আপনার অসুখটা কী?

—এক্সক্যাভেশন সাইটে সুপারভাইজ করছিলাম। হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলাম।

—এনি সর্ট অব নার্ভাস ব্রেকডাউন?

—আই অ্যাম দ্য ম্যান অব স্ট্রং নার্ভ। পঁচাত্তর পেরিয়ে ছিয়াত্তরে পড়েছি। এখনও দৌড়ুতে পারি।

—ডাক্তারবাবু কি স্টেরয়েড ইঞ্জেকশন দিচ্ছেন?

ড্রয়ার থেকে একটা ভাঁজকরা কাগজ বের করে দিলেন জয়দেব।

—নাড়ুগোপাল মিত্তিরের চিত্তির! স্কুলে আমার সহপাঠী ছিল। অঙ্কে আর সায়েন্সে গোল্লা পেত। কী করে যেন ডাক্তার হয়ে গেল!

প্রেসক্রিপশন দেখে কর্নেল বললেন—হ্যাঁ। স্টেরয়েড। কিন্তু স্টেরয়েড বিপজ্জনক।

জয়দেব হাসলেন—আর নিই না ইঞ্জেকশন। নাড়ু এলেই দরজা আটকে দিই।

—আপনার বউমা ট্যাবলেট খাওয়ান রাত্রে?

—হ্যাঁ ট্যাবলেটটা ভাল। ইনসমনিয়া সেরে গেছে।

—ওটা খাবেন! কিন্তু ইঞ্জেকশন আর নেবেন না।

বলে কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। জয়দেব বললেন—চলে যাচ্ছেন? দেখার মত জিনিস দেখে যান।

—আমি আছি। সকালে দেখব'খন।

জয়দেব আমার উদ্দেশে বললেন—কাগজের লোক আপনি?

বললাম—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আপনি কোন কাগজের?

—দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকা।

—কী আশ্চর্য! এতক্ষণ বলবেন তো! আপনাদের কাগজই প্রথম আমার আবিষ্কারকে অনার দিয়েছিল। কাটিং দেখাচ্ছি।

রমা সম্ভবত বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ঘরে ঢুকে বললেন—সকালে দেখাবেন। ওঁরা টায়ার্ড। কলকাতা থেকে একটু আগে এসেছেন।

জয়দেব কর্নেলের দু'হাত জড়িয়ে ধরে বললেন—আমার সৌভাগ্য! মেজর—

কর্নেল বললেন—কর্নেল নীলাদ্রী সরকার।

—সরি! কর্নেলসায়েবকে ঠিক মতো যত্নআত্তি করো বউমা! রাতবিরেতে দরকার হলে পারু আছে। ডাকলেই সাড়া পাবেন। আত্মা অমর।...

হলঘরে গিয়ে রমা বললেন—আজ সকাল থেকে বাবামশাই একেবারে নর্মাল। অন্যদিন কী অবস্থা করেন, সামলানো যায় না।

কর্নেল বললেন—অদ্ভুত ডাক্তার তো! এই বয়সে ওঁকে স্টেরয়েড ইঞ্জেকশন দিয়েছেন। কতগুলো দিয়েছেন এ পর্যন্ত?

—তিনটে।

—ইঞ্জেকশনের অ্যাম্পিউলগুলো দেখেছিলে তুমি?

pathagar.net

—না তো। ডাক্তারবাবু নিয়ে আসেন।

—অ্যাম্পিউল তো ফেলে দেবার কথা!

রমা অবাক হয়ে তাকাল। —আমি লক্ষ্য করিনি। হয় তো জানালার বাইরে ছুঁড়ে ফেলেছেন।

কর্নেল বললেন—ডাক্তারবাবু শেষ ইঞ্জেকশন কবে দিয়েছেন?

—মহালয়ার দিন সন্ধ্যাবেলা।

—আগেও কি সন্ধ্যায় আসতেন ইঞ্জেকশন দিতে?

—হ্যাঁ। সারাদিন নাকি রোগীর ভিড়। তাই সন্ধ্যায় কল অ্যাটেন্ড করেন।

—ঠিক আছে। তোমাকে আর আসতে হবে না।

—আপনাদের খাবার ওপরে পাঠাব বরং। অ্যাটাচ্‌ড্ বাথ আছে। বেসিন আছে।

—ঠিক আছে। বলে কর্নেল পা বাড়ালেন।—আমরা একটু বেরোচ্ছি এখন। সাড়ে নটার মধ্যে ফিরব। কোদালিয়া আমার চেনা জায়গা। আর শোন! হলঘরের দরজা বন্ধ করে দাও।...

॥ চার ॥

কর্নেল পোর্টিকো থেকে বেরিয়ে বাড়ির পুবদিকে ঘুরে ফটকের দিকে হাঁটছিলেন। কোথায় যাচ্ছেন, জিজ্ঞেস করলাম না। ওই পাগলবুড়োর এক দোসর। জিজ্ঞেস করলে কী জবাব পাব, সেটা অনিশ্চিত।

ঘরগুলোর মেঝে উঁচু। যেতে—যেতে একটা জানলার ফাঁক দিয়ে দেখলাম, শান্তিদেব মেয়েকে নিয়ে পড়াতে বসেছেন। হঠাৎ মনে হল, এতটুকু মেয়ের এবাড়িতে দিন কাটে কী করে? একা স্কিপিং করে? এই নির্জন 'ক্ষুধিত পাষাণ' আর মাত্র চারজন প্রাপ্তবয়স্ক লোক এখন। নন্দ বেঘোরে মারা পড়েছে। কমলেশবাবু পুলিশ হাজতে। জামিন পেলেও কি আর এবাড়িতে আসবেন ভদ্রলোক? কোন মুখে আসবেন?

একটা সাইকেলরিকশা ডাকলেন কর্নেল। বললেন—থানা।

রিকশায় উঠে বললাম—পুলিশটুলিশের কাছে রাত্রিবেলায় যাওয়া কি ঠিক হচ্ছে?

কর্নেল এত জোরে অট্টহাসি হাসলেন যে, রিকশোওয়ালা মুখ ঘোরাল।

বললাম—এতে হাসির কী আছে? রাতে পুলিশের মুড বদলে যায় দেখেছি। শিকারি বাঘের মতো হিংস্র হয়ে ওঠে। তাতে মফস্বলের পুলিশ।

কর্নেল চুপ করে থাকলেন। ঘিঞ্জি বাজার এলাকা ছাড়িয়ে একটা চওড়া রাস্তায় রিকশার গতি বাড়ল। রীতিমতো টাউনশিপ। কিছুদূর চলার পর একটা পাঁচিলঘেরা এলাকার গেটের কাছে রিকশো থামল। গেটের মাথায় বোগেনভিলিয়ার ঝাঁপি। চৌকো সাদা কাঁচের বোর্ডে নিয়ন আলোয় লেখা আছে, 'কোদালিয়া পি এস।' গেটে সেন্ট্রি বেয়নেট হাতে পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

দোতলা বাড়ি। করিডরে সাদা পোশাকের এক পুলিশকে কর্নেল বললেন—সি আই সায়েব আছেন?

সে নিঃশব্দে সিঁড়ির দিকে আঙুল দেখাল। দোতলায় উঠে আরেকজনকে জিজ্ঞেস করলে সে ঘরটা দেখিয়ে দিল। কর্নেল পর্দা তুলে বললেন—আসতে পারি?

হ্যাল্লো ওল্ড বস! ওয়েলকাম। ওয়েটিং ফর য়ু। আর দশ মিনিট দেখে চলে যেতাম।

সার্কেল ইন্সপেক্টর দীপক মুখার্জির সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলেন কর্নেল।

আমার বয়সী লোক। স্মার্টনেস ঝকমক করছে চেহারায়। আমরা বসলে বোতাম টিপে একজনকে ডাকলেন।

বললেন—ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর সায়েবকে বলো কর্নেলসায়েব এসেছেন। ও সি সায়েব আছেন না বেরিয়েছেন?

—একটু আগে বেরোলেন স্যার!

—ওক্কে!

pathagar.net

সে চলে গেলে মুখার্জি বললেন—আপনার ট্রাঙ্ককল পেয়ে আমি সত্যি বলতে কী, খুব অস্বস্তি বোধ করছিলাম। দিব্যেশকে ডেকে বললাম, আপনি ওকে থাকতে বলেছেন। দিব্যেশ তো শুনে নার্ভাস হয়ে পড়ল। বিলিভ মি! আপনি এসেছিলেন মার্চের শেষাশেষি। তখন অবশ্য—তো একটু পরে দিব্যেশই আমাকে মনে করিয়ে দিল রায়ভবনের মার্ডার কেসের কথা। আর য়ু ইন্টারেস্টেড? ⁄

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন—আমরা রায়ভবনে গেস্ট হয়ে এসেছি। এখন সেখান থেকেই আসছি।

—সো দ্যাটস দ্যাট! কফির ব্যবস্থা করি আগে? আমার কোয়ার্টার পাশেই।

—থাক। বেশিক্ষণ বসব না।

একজন টাকমাথা গোলগাল ভদ্রলোক—দেখতে একেবারে সাদাসিধে এবং অমায়িক, ঘরে ঢুকে হাত বাড়িয়ে কর্নেলের করমর্দন করলেন। তারপর অন্যপাশে একটা চেয়ারে বসে বললেন—মশা মারতে কামান দাগার আয়োজন করল কেডা?

—দিব্যেশ, তুমি আমাকে কামান বলছ?

ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর হাসলেন—হঃ! ত কী কমু?

মুখার্জি বললেন—হঠাৎ আজ দুপুর থেকে দিব্যেশ মাতৃভাষায় কথা বলতে শুরু করেছে। আমি জানি, এটা ওর নার্ভাসনেস!

গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—দৈনিক সত্যসেবক। খাইছেরে!

কর্নেল বললেন—বেশিক্ষণ বসব না। আসামী কী বলছে?

গোয়েন্দা অফিসার হাই তুলে বললেন—বিকেল চারটেয় নার্ভ ব্রেক করল। অ্যান্ড হি কনফেসড।

—বলল নন্দকে মার্ডার করে গাছে ঝুলিয়েছে?

—হুঃ!

—কেন?

—নন্দ রায়বাবুর মিউজিয়ামের দামী একটা সিল চুরি করে নাকি এক সায়েবকে বেচেছিল। সেজন্যই নাকি রায়বাবু, মানে ওনার শ্বশুরমশাই পাগল হয়ে গেছেন। শ্বশুর-প্রেমিক জামাই। নন্দকে নদীর ঘাটে বেড়াতে ডেকে নিয়ে গিয়ে ইঞ্জেকশন দিয়ে মেরেছে। তারপর বডি এনে গাছে ঝুলিয়েছে। সিরিঞ্জ নদীতে ফেলে দিয়েছে।

—কী ভাবে ঝোলাল গাছে?

দিব্যেশবাবু পকেট থেকে একটা ভাঁজকরা কাগজ বের করে দিলেন কর্নেলকে। —আসামীর নিজের হাতে আঁকা পিকচার। শুনুন। আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি, যে ভাবে আসামী বুঝিয়েছে আমাকে।

pathagar.net

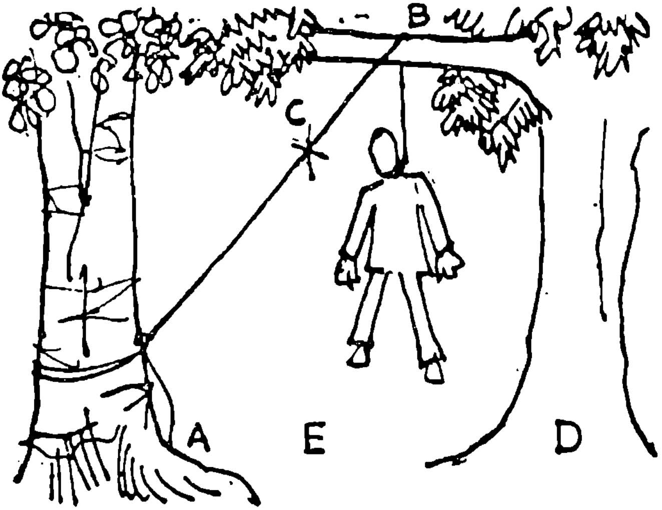

কর্নেল কাগজটা খুললে ঝুঁকে গেলাম দেখার জন্য। দিব্যেশবাবু বললেন—বডি এনে পয়েন্ট 'ই'—তে ফেলে রাখে। গলায় শক্ত নাইলনের দড়ির ফাঁস আটকে দেয়। আমগাছটা 'ডি' পয়েন্ট। পয়েন্ট 'বি'—র ওপর দিয়ে দড়ির অন্যপ্রান্তে ছুঁড়ে দেয়। এবার পয়েন্ট 'এ'—একটা অশোকগাছ। দড়িটা ধরে টান দিল এবং বডি উঠে পয়েন্ট 'বি' ঝুলতে লাগল। দড়ির ডগাটা বাঁধল পয়েন্ট 'এ'—তে। এবার আমগাছে উঠে পয়েন্ট 'বি'—তে দড়ির ওপর দুই পা চাপ দিয়ে ব্লেড দিয়ে পয়েন্ট 'সি'—তে দড়িটা কাটল। তারপরের কাজটা সোজা। পয়েন্ট 'বি'—তে কাটা দড়ির ডগা ফাঁস দিয়ে আটকাল। বডি একটু নেমে এল বটে, কিন্তু টাইট হয়ে গেল ফাঁস। গাছ থেকে নেমে পয়েন্ট 'এ' থেকে দড়ির কাটা অংশ খুলে নদীতে ফেলে দিয়ে এল। সো ইজি! বাট টেরিব্‌লি ইনটেলিজেন্ট।

মুখার্জি বললেন—হরিফাইং জিওমেট্রিক্যাল প্যাটার্ন! একটা ত্রিভুজ। লোকটা তো স্কুলটিচার। কী পড়াতো?

—অঙ্ক আর জ্যামিতি।

—আই সি!

Pathagar.net

কর্নেল বললেন—দড়িটা পেল কোথায়, বলেছে?

গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর বললেন—বাড়ির একটা ঘরে ছিল। ওই ঘরে সোমবাবুর থিয়েটারের স্টেজ সিনসিনারি থাকে। বাঁশ, তক্তা, দড়িও থাকে।

মুখার্জি চেয়ারে হেলান দিয়ে বললেন—এদিকে প্রেসার আসছে হেভি। মানিক চ্যাটার্জি, ইউ নো। এস ডি পি ও ইজ অলসো ইন্টারেস্টেড। ও সিকে ফোন করেছিলেন। উনি এসে আমাকে বলছিলেন, দেখুন তো কী করি! আই পি সি থ্রি জিরো টু কেস। থানা থেকে জামিনের প্রশ্নই ওঠে না। কাল কোর্টে প্রডিউস করে তারপর—এনিওয়ে, কর্নেল বলুন, হোয়াট ইজ ইওর ওপিনিয়ন?

কর্নেল ছবিটা দেখছিলেন। ফেরত দিয়ে বললেন—আপনাদের আসামীর সঙ্গে দু'একটা কথা বলতে চাই। সম্ভব হবে?

দিব্যেশবাবু উঠে দাঁড়ালেন। —একটা অসুবিধা। অন্যান্য আসামীদের সঙ্গে রাখা হয়েছে ওকে। ফর হিজ সেফটি। কনফেস-করা আসামীদের নিয়ে আমাদের দুর্ভাবনা থাকে।

মুখার্জি বললেন—হ্যান্ডকাফ দিয়ে এঘরে নিয়ে আসুন বরং।

—দেখছি। বলে গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর বেরিয়ে গেলেন।

মুখার্জি হাসলেন। —কর্নেল সায়েব এখন হাতের কার্ড শো করবেন না, আই নো দ্যাট ওয়েল। একেবারে অকুস্থলে এসে উঠলেন। আমার ধারণা, ইতিমধ্যে অনেকটা এগিয়েছেনও। আপনার থিওরির সঙ্গে মিলছে?

কর্নেল বললেন—নাহ্।

—মাই গড! আসামীর কনফেসন অ্যান্ড দ্যাট পিকচার।

—ছবিটা ঠিকই আছে। মোডাস অপারেন্ডি ইজ অলরাইট।

—তা হলে কী ঠিক নেই?

—মোটিভ। দ্য মোটিভ ইজ উইক। বড্ড অস্পষ্ট। কিছুটা অ্যাবসার্ডও বটে।

—ধরুন, আসামী নিজেই সিল চুরি করে বেচেছে। নন্দ সেটা জানত। নন্দ রায়বাবুকে জানালে জামাইকে তাড়িয়ে দিতেন। এমন কি রায়বাবু সম্পর্কে যতটা জানি, আর্কিওলজিতে প্রচণ্ড বাতিক। এদিকে মেয়ে বেঁচে নেই। কাজেই প্রাক্তন জামাই আউটসাইডার। এক্ষেত্রে ওকে পুলিশে দেওয়াই স্বাভাবিক ছিল। কাজেই—

কমলেশবাবু আর মেয়ের নামে বাড়ি ও মিউজিয়াম উইল করে রেখেছেন রায়বাবু।

—শুনেছি। সোমবাবু বলছিলেন। মুখার্জি জোর দিয়ে বললেন—কাজেই কমলেশের ভয় পাওয়া স্বাভাবিক। অতবড় একটা প্রপার্টি থেকে বঞ্চিত হওয়ার ঝুঁকি ছিল। রায়বাবু উইল বদলাতেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, নন্দকে আর টাকা দিয়ে চুপ করানো যাচ্ছিল না। তাই ওকে মারল কমলেশ।

কর্নেল টাকে হাত বুলিয়ে বললেন—একটা ব্রোঞ্জের সিলের খরোষ্ঠী লিপি সম্পর্কে নন্দের কোনও ধারণা থাকা অসম্ভব, দীপক! ছোট্ট একটা সিল, যা পকেটে লুকোন যায়, তা গোপনে বেচাকেনাটা অন্তত নন্দের মতো লোকের কাছে ধরাপড়ার চান্স অত্যন্ত কম। গ্যান্সলার নামে এক জার্মান সায়েব এসেছিলেন। তারপর সিল হারিয়েছে। গ্যান্সলারকে কমলেশ সিল বেচলে সে এমন বোকা নয় যে, নন্দের চোখে পড়ার মত জায়গায় বেচবে। এগেন আই স্ট্রেস দ্য পয়েন্ট, নন্দের পক্ষে এমন ঘটনা জানার চান্স খুবই কম।

মুখার্জি টেবিলে ডান কনুই রেখে দুই ভুরুর মধ্যিখানটা খামচে ধরে বললেন—কোর্টে অবশ্যি এসব কনফেসনের লিগ্যাল ভ্যালু নেই। আসামী বললেই হল, পুলিশের চাপে পড়ে মিথ্যা বলতে বাধ্য হয়েছে। সো উই নিড আদার এভিডেন্স। এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষদর্শী নেই। অতএব সারকামস্ট্যানশিয়াল এভিডেন্সের ওপর নির্ভর করতে হবে।

—অ্যান্ড দ্য সারকামস্ট্যানশিয়াল এভিডেন্স বেসিক্যালি নিডস অ্যা স্ট্রং মোটিভ অব দ মার্ডার।

—নিশ্চয়! যুক্তিপূর্ণ এবং বিশ্বাসযোগ্য মোটিভ।

কর্নেল চুপচাপ কিছুক্ষণ চুরুট টানার পর বললেন—সিল চুরির ডায়েরি করা হয়েছিল থানায়?

—শুনলাম হয়েছিল। ওইদিন ডিউটি অফিসার ছিলেন এস আই মাখনবাবু। তিনি বদলি হয়ে গেছেন। ডাইরি দেখবেন নাকি?

—নাহ্।

এই সময় গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর ফিরে এলেন। তাঁর পেছনে হ্যান্ডক্যাপ পরা একজন রোগা যুবক। কোটরগত উজ্জ্বল চোখ। মাথায় একরাশ ঝাঁকড়া চুল। পরনে প্যান্টশার্ট। পায়ে জুতো নেই। তার পেছনে দু'জন তাগড়াই কনস্টেবল। তারা সিআই সায়েবকে সেলাম দিয়ে প্রস্তরীভূত দাঁড়াল। সি আই মুখার্জি বললেন—বাহারমে যাও।

তারা বেরিয়ে গেল। কর্নেল বললেন—বসুন কমলেশবাবু।

কমলেশ তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল। দিব্যেশবাবু মিষ্টি গলায় বললেন—বসুন, বসুন। যা হবার হয়ে গেছে। "নিয়তি কেন বাধ্যতে?"

মুখার্জি বললেন—আলাপ করিয়ে দিই। কর্নেল নীলাদ্রি সরকার আর ইনি হলেন দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার সাংবাদিক জয়ন্ত চৌধুরি।

কমলেশ শান্ত নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলল—যা বলার বলেছি। নিউজপেপারে স্টেটমেন্ট দিতে আমি বাধ্য নই।

দিব্যেশবাবু হাসলেন। —কী যে কন! স্টেটম্যান্ট চায় কেডা? কর্নেলসায়েবের লগে আলাপ করেন। ইনিও আপনার শ্বশুরের লাইনের লোক। আর্কিওলজিস্ট।

মুখার্জিও হাসলেন—অ্যান্ড নেচারিস্ট।

কর্নেলের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি কমলেশকে চোখ নামাতে বাধ্য করল। অন্যপাশের খালি চেয়ারে সে বসল। আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না, এই রোগাপটকা যুবকটি কী করে গাছের ডালে বডি ঝোলাল, পদ্ধতিটা কি সত্যিই 'ইজি'?

কর্নেল বললেন—সিলটা সম্পর্কে আমি ইন্টারেস্টেড কমলেশবাবু! আমাকে পুলিশের লোক ভাববেন না। খুন-খারাপির মধ্যে আমি নেই। খরোষ্ঠী সিল দক্ষিণ বাংলায় পাওয়া একটা যুগান্তকারী ঘটনা। শুধু বাংলা কেন, সারা ভারতের ইতিহাস তাহলে নতুন করে লিখতে হবে। তাই না?

কমলেশ ঠাণ্ডা গলায় বলল—হ্যাঁ কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না ওইসব লিপি খরোষ্ঠী। মাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে তর্ক করা চলে না। তাই কিছু বলিনি এতদিন।

—মাস্টারমশাই মানে আপনার শ্বশুর জয়দেব রায়?

—আমি মাস্টারমশাই বলি।

—হারানো সিলটা আপনি দেখেছিলেন?

—দেখেছি। হাজার-হাজার বছর মাটির তলায় পড়ে থাকা অবজেক্টে ন্যাচারাল কেমিক্যাল কনট্যামিনেশন হয়। পুরনো লিপি পড়ার আগে অবজেক্ট ন্যাচারাল কেমিক্যাল প্রসেসে পরিষ্কার করে নিয়ে ফোটোকপিতে কয়েক গুণ বড় করে

pathagar.net

নিতে হয়। তারপর পাঠের প্রশ্ন। আজকাল টেকনোলজির সুবিধে আছে। কম্পিউটার প্রসেসিংয়ের ব্যবস্থা আছে। তা না করে খালি চোখে—

কর্নেল তার কথার ওপর বললেন—প্রিন্সেপ ব্রাহ্মী এবং খরোষ্ঠীর পাঠোদ্ধার করেছিলেন।

—জানি। কিন্তু তাঁকেও তখনকার টেকনোলজির সাহায্য নিতে হয়েছিল। মাস্টারমশাই একটা আনক্লিন এবং কনট্যামিনেটেড সিল আতস কাঁচে দেখেই খরোষ্ঠী বলছেন। আপনি 'ললিতবিস্তর' পড়েছেন?

—সংস্কৃত বই। বুদ্ধের জীবনী। তাতে ৬৪টি লিপির কথা আছে।

—তাহলে দেখুন, অসংখ্য লিপি হারিয়ে গেছে। তা ছাড়া মাস্টারমশাই একটু বেশি উৎসাহী। একটি মাটির কলসির গায়ে কী লিপি ছিল। উনি তার ওপর সাদা রঙ বুলিয়েছেন। আ সর্ট অব ম্যানিপুলেশন! উইশফুল ডিসাইফারিং। আমি দেখামাত্র বুঝতে পেরেছিলাম কুমোরের তৈরি নকসামাত্র। কলসির গলায় নকসা এখনও করা হয়।

—সিলটা নন্দ চুরি করেছিল, আপনি সিওর হলেন কী করে?

—মাস্টারমশাই মিউজিয়ামের কোনায় বসে একটা পাথরের স্ল্যাব পরীক্ষা করছিলেন। আমি পাশের ঘরে থাকি। নন্দ গ্লাসে জল নিয়ে ঢুকছিল। খাটের পাশে একটা টেবিলে জল রেখে গেল। টেবিলেই সিলটা ছিল। আমি পর্দা তুলে ঢুকেছি, নন্দ তাড়াতাড়ি চলে গেল। দু'দিন পরে মাস্টারমশাই হইচই শুরু করলেন। সিলটা নেই।

—নন্দ জল দিতে আসার সময় জার্মান সায়েব ছিলেন রায়ভবনে?

—ছিলেন। হঠাৎ সেদিনই বিকেলের ট্রেনে কলকাতা ফিরে গেলেন। গ্যান্সলার সিলটা দেখেছিলেন। নন্দ গেস্টরুমে ওঁর দেখাশোনা করত। দুইয়ে দুইয়ে চার।

—স্কুলে আপনি কী পড়ান?

—পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি।

—আপনি জানেন দেশের পুরাদ্রব্যসংক্রান্ত আইনে ব্যক্তিগত সংগ্রহে পুরাদ্রব্য রাখা যায় না। কিন্তু একটা ট্রাস্টি বোর্ড থাকলে তবেই রাখা যায়?

—জানি।

—জয়দেববাবুর উইলে আপনি এবং আপনার স্ত্রীকে রায়ভবনের সবকিছুর উত্তরাধিকারী করা হয়েছে। বাড়ির ব্যাপারে প্রব্লেম নেই। কিন্তু মিউজিয়ামে আপনাদের আইনত অধিকার থাকছে না জানেন কি? ওটা সরকার ইচ্ছে করলে যে কোনও সময় নিতে পারেন।

কমলেশের ঠোঁটের কোণে একটা বাঁকা রেখা দেখলাম। সে বলল—মাস্টারমশাই বোকা নন। ওঁর অ্যাটর্নি আইন জানেন। মানিকদা—আমার কলিগ

মানিক চ্যাটার্জি কোদালিয়া মিউজিয়ামের প্রেসিডেন্ট। আমি সেক্রেটারি। এই মিউজিয়াম 'কোদালিয়া প্রত্ন উদ্ধার সমিতি' নামে অলরেডি রেজিস্টার্ড হয়ে আছে। মেম্বারদের মধ্যে লোকাল পঞ্চায়েত এবং স্কুল থেকে প্রতিনিধিরা আছেন।

—আপনি সিওর নন্দ সিল চুরি করে সায়েবকে বেচেছিল?

—সিওর। পরদিন নন্দ কলকাতা গিয়েছিল কী কাজে। ডলার বা মার্ক ভাঙাতেই গিয়েছিল। টাকা কোথায় লুকিয়ে রেখে গেছে। গতরাতে ওকে জেরা করে কবুল করানো গেল না। তখন—আই কিলড দ্য বাস্টার্ড।

—নিকোটিন অ্যাম্পিউল কোথায় পেলেন?

—পাওয়া যায়। পৃথিবীতে সবই পাওয়া যায়।

—কোদালিয়ায়?

পাওয়া অসম্ভব নয়। কোদালিয়া এখন শহর। বর্ডার বেশি দূরে নয়। পুলিশ অফিসারদের জিজ্ঞেস করুন, এটা ফরেন গুডসের কতবড় স্মাগলিং সেন্টার।

—আপনার শ্বশুরকে স্টেরয়েড ইঞ্জেশন দেওয়া হত জানেন?

—হুঁউ, জানি। কিন্তু বাধা দিইনি। ওঁর ছেলেরা আছে। তবে...

—বলুন!

—মাস্টারমশাই ক'মাস আগে একটা এক্সক্যাভেশন সাইটে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন। তারপর থেকে ভীষণ দুর্বল বোধ করতেন। চলাফেরা করতে কষ্ট হত। তাই আমি স্টেরয়েড নিতে বাধা দিইনি। আই ফিল ফর হিম। ছোটবেলায় বাবা-মাকে হারিয়েছি। পিসিমা মানুষ করছিলেন। মারা গেলেন। তখন মাস্টারমশাই আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। উনি ছাড়া এ পৃথিবীতে আমার কে আছে? ওঁর মনে কেউ আঘাত দিলে তাকে আমি ক্ষমা করতে পারি?

—আপনার স্ত্রী স্যুইসাইড করেছিলেন?

কমলেশ তাকাল। একটু পরে বলল—শি ওয়জ আ সাইকিক পেশ্যান্ট। সবাই জানে।

—একই গাছের একই ডালে গলায় ফাঁস দিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ। ওই থেকে আমার মাথায় নন্দকে একইভাবে ঝোলানোর প্ল্যান এসেছিল।

—আপনার স্ত্রীও কি নাইলনের দড়ির ফাঁসে...

—হ্যাঁ। বড়দার থিয়েটার রুমে অনেক দড়ি আছে।

—আমি যদি বলি, আপনি আপনার স্ত্রীকেও একইভাবে মেরে একই পদ্ধতিতে ঝুলিয়েছিলেন?

কমলেশ হাসল। —মাস্টারমশাইয়ের শিক্ষা, সমাজের হিতের জন্য কোনও কাজে পাপ নেই।

pathagar.net

—আই সি!

—আমার স্ত্রীকে মেরে সমাজের হিতসাধন হত না। অন্য দেশে পুরাদ্রব্য পাচারকারীদের গুলি করে মারা হয়। এদেশে সেই সভ্য আইন নেই। তাই আমি নিজে সভ্য দেশের আইন প্রয়োগ করেছি।

—নন্দকে মেরে?

—নন্দকে মেরে।

—কিন্তু আপনার স্ত্রীকে হত্যার প্রত্যক্ষ মোটিভ তো ছিল?

—হত্যা! এবং মোটিভ?

—হ্যাঁ। কাঞ্চন নামে একজনের সঙ্গে আপনার স্ত্রীর পূর্বপ্রণয় ছিল।

কমলেশ ঠোঁট কামড়ে ধরল। তারপর হিসহিস করে বলল—হু আর য়ু? ডিটেকটিভ অফিসার, নাকি সি বি আই অফিসার?

—প্লিজ এক্সপ্লেন দিস পয়েন্ট!

—স্ত্রীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল না। শুধু মাস্টারমশাইয়ের কথা অমান্য করতে পারিনি বলেই—নাহ্ স্যার! যার সঙ্গে এতটুকু ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্ট ছিল না, তার জন্য প্রতিহিংসার প্রশ্নই ওঠে না।

—কিন্তু আপনারা একই ঘরে রাত্রিবাস করতেন?

—না। পারু আমাকে পাশের ঘরে শুতে বলত। তা-ই শুতাম। পরে মাস্টারমশাইয়ের কানে গেলে উনি নিজের ঘরের পাশের ঘরে আমার থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন।

—আপনি স্ত্রীর মৃত্যুর পর শান্তিবাবুর স্ত্রীকে বলেছিলেন 'এটাই কি নিয়তি বউদি'? এক্সপ্লেন ইট।

—বউদি বলেছে আপনাকে?

—হ্যাঁ।

—বলে থাকতে পারি। মনে নেই। আত্মহত্যাও তো নিয়তি।

—স্ত্রীর ডেডবডি আপনিই আবিষ্কার করেছিলেন?

হ্যাঁ। ভোরবেলা নদীর ধারে বেড়ানো আমার অভ্যাস। বাগানের ভেতর দিয়ে যেতে হয়।

—ওই ঘটনায় নন্দর রিঅ্যাকশন কী হয়েছিল, মনে পড়ে?

—কান্নাকাটি করেছিল। পারু—মানে আমার স্ত্রীকে নাকি সে-ই মানুষ করেছিল।

—নন্দের কোনও বিশেষ উক্তি—মানে স্মরণে রাখার মতো...

কমলেশ হাতকড়া পরা হাত দুটো টেবিলে রেখে দ্রুত বলল—নন্দের বিশেষ উক্তি...হুঁ, 'ওরা পাগল বংশ—সবাই মাথা খারাপ'...তবে এটা লোকাল লোকেরা

সবাই বলে। মাস্টারমশাই বলতেন, তাঁর কোন জমিদার পূর্বপুরুষ নিরীহ প্রজাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুযন্ত্রণা এনজয় করতেন।

—মেয়ের মৃত্যুর পরই কি জয়দেববাবুর মধ্যে পাগলামির লক্ষণ প্রথম দেখা যায়?

—হ্যাঁ। ভীষণ শক। তবে মাস্টারমশাই তার আগেও কোনও কোনও ব্যাপারে যা সব করতেন, সুস্থ মানুষ করে না।

—ফর এক্‌জাম্পল্‌?

—এত মনে নেই। বড্ড উইশফুল থিংকিং ছিল—যেমন এই খরোষ্ঠীলিপি। সামটাইমস হি ইমাজিনড থিংস।

আমি বলে উঠলাম—সোমদেববাবুও...কিন্তু কর্নেল চোখ কটমটিয়ে তাকাতেই চুপ করে গেলাম।

কমলেশ বলল—র‍্যাদার আ শিজোফ্রেনিক টাইপই বলব। রিয়্যাল—আনরিয়্যালের পার্থক্য হারিয়ে ফেলতেন মাঝে মাঝে। কী করতে কী করছেন টের পেতেন না। মিউজিয়ামে কিছু প্রাচীন অস্ত্র আছে। একদিন দেখি, একটা তলোয়ার দিয়ে নিজের হাত কাটার জন্য ঘষছেন। ভাগ্যিস মরচে ধরা ভোঁতা তলোয়ার। বাধা দিলাম। তখন বললেন, 'এতে একটা স্ক্রিপ্ট আছে। ডিসাইফার করছি'। দিজ সর্ট অব থিংস্‌।

মুখার্জি বললেন—শিজোফ্রেনিয়া এবং প্যারানোইয়া প্রায় একই টাইপের অসুখ।

কমলেশ নিষ্পলক চোখে গোয়েন্দা ইন্‌সপেক্টারের দিকে তাকাল। —আপনারা এবার আমাকেও এই অসুখ ধরাবেন। হোয়াই এনি মোর কোয়েশ্চনস? পরিষ্কার লিখে দিয়েছি তো, আমি নন্দকে মেরেছি।

দিব্যেশবাবু বললেন—আপনার সত্য বলার সাহস আছে। আই প্রেইজ য়ু। আর একটা কথা। আপনার শ্বশুরমশাইয়ের কোনও প্ররোচনা ছিল না তো? ওই যে ওনার মেসেজ কইলেন, সমাজের হিতের জন্য কিছু করনে পাপ নাই!

—নাহ্‌। প্রায় গর্জন করল কমলেশ। তারপর উঠে দাঁড়াল। —অন্য দেশ হলে জয়দেব রায়কে মাথায় তুলে রাখত। জীবদ্দশায় স্ট্যাচু বানিয়ে সম্মান জানাত। নিজের পয়সায় এক্সক্যাভেশন করেছেন। সরকার নিজে তো একটা পয়সা দেনইনি, উপরন্তু রাষ্ট্রপুঞ্জ যে সাহায্য করতে চেয়েছিল, তা-ও আটকে দিয়েছেন। ইউনেস্কোর টিমকে পর্যন্ত ভিজিটের পারমিশন দেওয়া হয়নি। এই দেশে সুস্থ মানুষের বেঁচে থাকতে আছে? আমার ফাঁসি হলে সুখে মরতে পারব।

কমলেশ পা বাড়ালে বাইরে থেকে সেই কনস্টেবলরা এসে ওর সামনে দাঁড়াল। দিব্যেশবাবু উঠে পড়লেন। কর্নেলকে বললেন—আর কিছু জিগাইবেন নাকি?

কর্নেল মাথা নাড়লেন। আসামীকে নিয়ে চলে গেলেন দিব্যেশবাবু।

মুখার্জি বললেন—পাগলবংশের পাল্লায় পড়ে এ-ও দেখছি এক পাগল।

কর্নেল বললেন—উঠি।

—কী বুঝলেন বলে যান।

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—জানেন তো? স্বদেশীযুগে ক্ষুদিরাম ফাঁসির মঞ্চে উঠে বলেছিলেন, দড়িতে মোম দেওয়া হয়েছে কেন? উই আর প্রাউড অব আওয়ার কান্ট্রি—ক্ষুদিরামস আর স্টিল বর্ন্ অ্যান্ড ডাই।

মুখার্জি শুকনো অট্টহাসি হাসলেন। —বুঝি না মানুষ মেরে সমাজের কী হিত হয়! চলুন, আমিও বেরোই। কোয়ার্টারে গেলে শ্রাবণী খুশি হত। ওকে বলেছি, আপনি আসছেন।

—আগামী কাল যাব এবং কফি খাব।

—টাইম দিন।

—দশটা নাগাদ।

—থ্যাংকস!...

সাইকেল রিকশোয় রায়ভবনের ফটকে পৌঁছলাম। দেখি, শান্তিদেব টর্চ হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। বললেন—দেরি দেখে রমা তাগিদ দিল। কোথায় বেরিয়েছিলেন?

কর্নেল বললেন—থানায় গিয়েছিলাম।

শান্তিদেব আলো ফেলে হাঁটতে হাঁটতে ব্যস্তভাবে বললেন—কমলেশকে মিট করলেন?

—হ্যাঁ। কমলেশ স্বীকার করেছে।

—বলেন কী!

—নন্দ সিল চুরি করে সায়েবকে বেচেছে, সে জানতে পেরেছিল।

—সে জন্য নন্দকে সে মারল? অদ্ভুত তো!

—সিল হারিয়ে তার মাস্টারমশাই পাগল হয়েছেন। তাই...

—অবিশ্বাস্য! অন্য কোনও গোপন ব্যাপার আছে। বাবার মিউজিয়াম থেকে জিনিসপত্র চুরি করত দুজনে। বখরা নিয়ে গণ্ডগোল। এখানে স্মাগলার্স গ্যাং আছে জানেন তো? তাদের সাহায্য নিয়ে মেরেছে নন্দকে।

কর্নেল কোনও মন্তব্য করলেন না। হলঘরের দরজায় রমা দাঁড়িয়েছিলেন। বললেন—রাত হয়ে যাচ্ছে দেখে ভাবছিলাম।

শান্তিদেব বললেন—জানো? কমলেশ কবুল করেছে।

রমা কানে নিলেন না কথাটা। বললেন—তুমি এস। ওপরে খাবারটা পৌঁছে দেবে।

আমরা গেস্টরুমে গিয়ে পোশাক বদলে পালাক্রমে বাথরুম সেরে নিলাম। একটু পরে শান্তিদেব ট্রেতে রাতের খাবার এনে দিলেন। লুচি, আলুরদম, মাছভাজা, মুর্গির মাংস, সন্দেশ এবং একপট কফি।

যতক্ষণ খেলাম, শান্তিদেব কমলেশের কথা বলতে থাকলেন। তার পুরো জীবনী এবং কার্যকলাপ। শান্তিদেবের মতে মানিক চ্যাটার্জি ওর মুরুব্বি। কাজেই পুলিশ চার্জশিট উইক করে দেবে। মামলা কেঁচে যাবে।

কর্নেল বললেন—আপনার দাদা ফিরেছেন?

—এখন কী? রাত এগারোটা বাজুক। চুটিয়ে রিহার্সাল দিচ্ছেন। পাগল! পাগল!...

॥ পাঁচ ॥

নতুন জায়গায় গেলে আমার ঘুম আসতে চায় না। কর্নেলের কথায় সিঁড়ির নীচের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। এ ঘরের দরজাও বন্ধ। তবু কী অস্বস্তি আমাকে পেয়ে বসেছিল। বাইরে ঝলমলে জ্যোৎস্না। মশারির ভেতর থেকে বারবার ব্যালকনির দিকে তাকাচ্ছিলাম। জয়দেববাবুর 'আত্মা অমর' এবং 'পারু স্পিকস টু মি' কথাদুটো ক্রমশ আমার চেতনায় ঝাঁপিয়ে আসছিল। এমন একটা পুরনো ক্ষুধিত পাষাণ-টাইপ বাড়ি এবং একটা আত্মহত্যা, একটা সদ্য খুনখারাপি! ভূতে বিশ্বাস না করলেও ভূতের ভয় আমার আছে। রিভলভার আর টর্চ বালিশের পাশে রেখেছি! শিলিং ফ্যানের হাওয়ায় মশারি দুলছে। ঝুলন্ত ব্যালকনির দিকের দরজাটা কর্নেল বন্ধ করতে দেননি। হঠাৎ-হঠাৎ সেখানে যেন একটা আবছায়া দেখছি। মশারি থেকে মুখ বেরও করছি মাঝে মাঝে। এ এক অস্বস্তিকর রাত্রি।

কর্নেল নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন। বিশ্বাস করা চলে জিম করবেটের মতো ওঁর গাছের ডালে ঘুমুনোর গল্প। আজীবন প্রকৃতিচর এবং সামরিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত লোকদের পক্ষে হয়তো এটাই স্বাভাবিক। যুদ্ধের ফ্রন্টে পরিখায় সৈনিকেরাও নাকি দিব্যি ঘুমিয়ে নেয়।

নীচের হলঘরে গ্র্যান্ডফাদার ঘড়ির অস্পষ্ট ঘণ্টার শব্দ শুনলাম একবার। একবার আমাকে চমকে দিয়ে কী একটা পাখি ক্র্যাঁক্র্যাঁ করে চেরা গলায় ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল। সম্ভবত পেঁচা। বহুদূরে ট্রেন বা মালগাড়ির শব্দ কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ নীচে কোথাও একটা শব্দ শুনতে পেলাম। কে যেন সিঁড়ির নীচের দরজাটা ঠেলছে। আস্তে ডাকলাম—কর্নেল! কর্নেল!

কর্নেলের নাকডাকা থেমে গেল।

—কর্নেল! নীচের দরজায় কে ধাক্কা দিচ্ছে।

—ভূত।

—কী আশ্চর্য! ওই শুনুন?

আবার কর্নেলের নাক ডাকতে থাকল। শব্দটাও থেমে গেল। আবার স্তব্ধতা। কতক্ষণ পরে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম কে জানে! স্বপ্নে দেখছিলাম, দৈনিক সত্যসেবকের চিফ অব দা নিউজবুরো সুনীলদা সবুজরঙের নাইলনের দড়িতে ফাঁস বানিয়ে নিষ্ঠুর হেসে বলছেন—তুমি আজ কাগজকে ফাঁসিয়েছ। তোমাকে ফাঁসিতে ঝোলাবো। সারা নিউজরুম জুড়ে সহকর্মীরা আমাকে তাড়া করে আসছেন। চ্যাঁচাতে চেষ্টা করছি—কর্নেল! কর্নেল! বেয়ারা হরিবন্ধু বলছে—জয়ন্তবাবু পাগল! জয়ন্তবাবু...

বাবু! বাবু!

তাকিয়ে দেখ, দিব্যি মশারির ভেতর শুয়ে আছি। ঘরে দিনের উজ্জ্বল আলো। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একটি মধ্যবয়সী গ্রাম্য মেয়ে ডাকছে—বাবু! বাবু কোফি এনিচি। উঠুন!

মশারি থেকে বেরিয়ে এলাম। মেয়েটি টেবিলে ট্রে রেখে চলে গেল। এই তাহলে কাজের মেয়ে লক্ষ্মী। কর্নেলের বিছানা খালি। মশারি গুটোনো। প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছেন বোঝা গেল। বাথরুম সেরে এসে বিস্কুট দিয়ে কফি খেলাম।

ব্যালকনিতে গিয়ে চোখে পড়ল সেই নদী আর নির্জন প্রকৃতি। তারপর মনে পড়ল, গতরাতে নীচের দরজায় কেউ ধাক্কা দিচ্ছিল। সোমদেববাবু কি ক্লাব থেকে ফিরে গল্প করতে আসছিলেন? কিন্তু তখন রাত প্রায় বারোটা বা একটা। তাছাড়া উনি যদি বিশেষ জরুরি কারণে এসেই থাকতেন, নিশ্চয় ডাকতেন।

দিনের উজ্জ্বল আলোয় ভূত ব্যাপারটা হাস্যকর হয়ে গেল। কিন্তু ব্যাপারটা রহস্যজনক তো বটেই।

সওয়া আটটা বাজে। কর্নেল কখন ফিরবেন, সেটা ওঁর মর্জি। রাতের পোশাক বদলে প্যান্ট শার্ট পরে নিলাম। চুপচাপ ঘরে বসে থাকার মানে হয় না। সতর্কতার দরুন রিভলভারটা ঘরে রেখে যাওয়া ঠিক মনে করলাম না। পয়েন্ট বাইশ ক্যালিবারের অস্ত্রটা প্যান্টের পকেটে দিব্যি ঢুকে যায়। রুমালে জড়িয়ে পকেটে ঢোকালাম। অস্ত্রটা অটোমেটিক। কিন্তু ট্রিগারের পিঠের ওপর ইঞ্চিটাক লম্বা ক্লিপটা টেনে নামিয়ে রাখলে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। ওটার সঙ্গে ভেতরে স্ট্রাইকিং হ্যামারের যোগ আছে। একটা গুলি ছুঁড়লে দ্বিতীয়টা ঘুরে এসে হ্যামারের সামনে বসে যায়। এই প্রক্রিয়াটাই অটোমেটিক।

পোর্টিকো নির্জন। জঙ্গলে লন পেরিয়ে বাগানে ঢুকলাম। সরু একফালি পায়ে চলা পথ চোখে পড়ল। পাইনগাছের ওপাশে আমগাছটা যেন ভয়াল জৈব চোখে আগন্তুককে দেখছে। একমিনিট দাঁড়িয়ে লম্বা ছড়ানো ডালটা এবং বাঁদিকে লম্বাটে অশোকগাছের গোড়াটা লক্ষ্য করলাম। আমগাছের ডালে

কোনও চিহ্ন নেই। কিন্তু অশোকগাছের গোড়ায় হাতখানেক উঁচুতে ঘষা দাগ স্পষ্ট। ছাল ঘষা খেয়েছে দড়ির বাঁধনে।

পায়ে চলা পথটা শেষ হয়েছে একটা ফুট সাতেক উঁচু এবং ফুট চারেক চওড়া জরাজীর্ণ দরজায়। ধূসর হয়ে গেছে কপাট। তার ওপর মাকড়শা হয়তো গতরাতেই জাল ছড়িয়েছে। উঁচু পাচিলের ধারে ফার্নের জঙ্গল। কপাটের মাঝামাঝি জায়গায় একটা লম্বা কাঠের হুড়কো বসানো। দরজা খুলেই দেখি দুধারে লাইমকংক্রিটের চাবড়া, গুল্মলতা, তার শেষে পাথরের স্ল্যাব বসানো ঘাট। ধাপের ফাটলে কাশ এবং আগাছা গজিয়ে আছে। শ্যাওলায় সবুজ হয়ে আছে ধাপগুলো। ডাইনে একটা ন্যাড়া লাইমকংক্রিটের প্রকাণ্ড চাঁই। দেখে মনে হল, ওখানেই সম্ভবত কমলেশ এসে বসে থাকত।

রোদ্দুরে ওখানে বসার মানে হয় না। মন্থর নদীটাকে 'মন্দালসা' ইত্যাদি উপমায় কাব্য করার অভ্যাস আমার নেই। তবে বারবার কর্নেলের সঙ্গে নিসর্গভ্রমণে গিয়ে বুঝেছি, মানুষ ছাড়া প্রকৃতি-ট্রকৃতি অর্থহীন জড়পদার্থ মাত্র। এই নির্জন প্রকৃতিকে মানুষই অর্থপূর্ণ আর উদ্দেশ্যপূর্ণ করে তুলতে পারে।

কিন্তু আমি প্রকৃতিতে সবসময় নিজেকে আউটসাইডার আবিষ্কার করি। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট শেষ করে নদীতে ছুঁড়ে ঘুরে দাঁড়ালাম। তারপর পা বাড়িয়েই চোখে পড়ল, লাইমকংক্রিটের চাঁইঢাকা আগাছার ভেতর কোনাকুনি এসে পড়া রোদের মধ্যে কী একটা জিনিস চকচক করছে।

কাছে গিয়ে দেখি, একটা ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ—সুঁচসুদ্ধ!

এটাই কি মার্ডার উইপন?

কর্নেলের সঙ্গগুণে জানি ওতে খুনির আঙুলের ছাপ থাকা সম্ভব। তাই রিভলভার জড়ানো রুমালটা সাবধানে বের করলাম। তারপর ঝোপে হাত ঢুকিয়ে রুমাল দিয়ে ওটা তুলে নিলাম।

এই সময় পেছনে একটা শব্দ হল। চমকে উঠে ঘুরে দেখি জয়দেববাবু। চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে। ফ্যাসফেঁসে গলায় বললেন—ব্রোঞ্জের সিল? খরোষ্ঠী স্ক্রিপ্ট?

বললাম—আজ্ঞে না। একটা ইঞ্জেকশন সিরিঞ্জ!

—দেখি, দেখি!

ওঁর সামনে হাতের তালুতে রুমালে রাখা সিরিঞ্জটা এগিয়ে দিলাম। অমনি উনি খপ করে সিরিঞ্জটা তুলে নিয়ে জোরে নদীতে ছুঁড়ে ফেললেন। উত্তেজিতভাবে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন—নাড়ুর ইঞ্জেকশন আর আমি নিচ্ছি না। আমাকে পাগল করার চক্রান্ত? আমি পুলিশ কেস করব। সোমু, রন্তু, শান্তু, পারু, বউমা সব্বাইকে আসামি করব। ওরা আমাকে পাগল সাব্যস্ত করে আমার উইল

pathagar.net

কেঁচিয়ে দেবে। হুঁ হুঁ বাবা, আমি সব বুঝি। লেট কমলেশ রায় ব্যাক ফ্রম ক্যালকাটা।

ঘটনার আকস্মিকতায় হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। বললাম—কিন্তু সিরিঞ্জটা যে...

চু-উ-প! আঙুল তুলে গর্জন করলেন জয়দেব রায়। —হু আর ইউ টু ইন্টারফিয়ার ইন মাই পার্সোনাল অ্যাফেয়ার? কে আপনি? এখানে ট্রেসপাস করেছেন কেন? বলে দরজার দিকে ঘুরে চিড়-খাওয়া গলায় হাঁকলেন—নন্দ! নন্দ!

বাগানের ভেতর দিয়ে রমাকে হন্তদন্ত আসতে দেখলাম। এসেই শ্বশুরের হাত ধরে টেনে ভেতরে ঢোকালেন। জয়দেববাবু রুষ্ট চোখে বারবার ঘুরে আমাকে দেখছিলে। রমা বললেন—ঘরে চলুন তো!

—এই লোকটা আমার মিউজিয়ামে চুরি করতে এসেছে। ঘাপটি পেতে দাঁড়িয়ে আছে। চোর!

—আহ্! কাকে কী বলছেন! গতরাতে আলাপ হল না ওঁর সঙ্গে? কর্নেলসায়েবের সঙ্গে এসেছেন উনি। নিউজপেপারের লোক।

জয়দেববাবু ঘুরলেন। এবার মুখে হাসির ছাপ। —সরি জেন্টলম্যান। আজকাল লোক চেনা দায় বুঝলেন তো? আসুন, আসুন! আমি একটা স্টেটমেন্ট দেব। হেডিং দেবেন 'ফ্রম হিন্দুকুশ টু লোয়ার বেঙ্গল।' আমি প্রাচীন গ্রিকদের দেখা সেই 'গঙ্গারিডি' সাম্রাজ্য আবিষ্কার করেছি। পালযুগ পর্যন্ত সেই সাম্রাজ্য টিকে ছিল। হখমনশীয় পারস্যসাম্রাজ্যের কথা শুনেছেন? ফাইভ হান্ড্রেড ফিফটি এইট বিসি টু থ্রি হান্ড্রেড থার্টি বিসি। দারিয়ুসের রাজত্ব ছিল নীল নদ থেকে সিন্ধু নদ পর্যন্ত বিস্তৃত। তখন অলরেডি বৌদ্ধযুগ চলেছে। হখমনিশীয়দের সাম্রাজ্যে প্রচলিত আরামাইক ভাষা লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা। কাজেই অশোক আরামাইকে অনুশাসন চালু করলেন। কান্দাহার ইডিক্টস, ইউ নো! হিন্দুকুশ এরিয়ার বৌদ্ধরা আরামাইক স্ক্রিপ্ট থেকে খরোষ্ঠী ইডিক্টস অন সিলভার লিফ।...

কথা বলতে বলতে হাঁটছিলেন জয়দেব। রমা শ্বশুরের একটা বাহু ধরে আছেন। একবার ঘুরে চোখের ইশারায় আমাকে কেটে পড়তে বললেন। সুন্দরী পরস্ত্রীর এই ভ্রূভঙ্গি বুকের ভেতর সেতারের ঝংকার তুলেই থেমে গেল। ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জটা এ মুহূর্তে আমার মাথায় বিপজ্জনকভাবে ভেসে বেড়াচ্ছে।

রমা শ্বশুরকে পূর্বদিকে খোলা বারান্দা দিয়ে ঘরে ঢোকালেন। দক্ষিণের কোণে গেস্টরুমের ব্যালকনিতে আমার চোখে পড়ল। কর্নেল চুরুট কামড়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। চোখে বাইনোকুলার। ফিরেছেন তা হলে!

ওপরে গেস্টরুমে ঢুকেই বললাম—মার্ডার উইপন!

কর্নেল বাইনোকুলারে চোখ রেখেই বলেন—হুঁ!

—শুনুন! মার্ডার উইপন সেই ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জটা নদীর ঘাটে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। ঝোপের ভেতর পড়ে ছিল। কিন্তু হঠাৎ জয়দেববাবু গিয়ে খপ করে কেড়ে নিয়ে নদীতে ছুঁড়ে ফেললেন।

কর্নেল বাইনোকুলার নামিয়ে ঘরে এলেন। বললেন—নদীতে ছুঁড়ে ফেললেন?

—হ্যাঁ। বললেন, নাড়ু ডাক্তার এই ইঞ্জেকশন দিয়ে ওঁকে পাগল করে দিচ্ছে। উনি পাগল সাব্যস্ত হলে ওঁর উইল নাকি কেঁচে যাবে। অসম্বদ্ধ প্রলাপ। তারপর আমাকে চার্জ—হু আর ইউ টু ইন্টারফিয়ার ইন মাই পার্সোনাল অ্যাফেয়ার? নন্দকে ডাকতে থাকলেন। ভাগ্যিস রমাদেবী গিয়ে বাঁচালেন।

—লক্ষ্য করেছি। তো সিরিঞ্জটাতে নিড্‌ল্ ফিট করা ছিল?

—ছিল। বোঝা যাচ্ছে কমলেশ তাড়াহুড়ো করে ছুঁড়ে ফেলেছিল। জলে পড়েনি।

কর্নেল ঘড়ি দেখে বললেন—দশটায় মুখার্জির কোয়ার্টারে কফির নেমন্তন্ন। কিন্তু যাওয়া হচ্ছে না। ব্রেকফাস্ট খেয়েই বেরুব।

—কাল রাত্রে সিঁড়ির নীচের দরজায় কে ধাক্কা দিচ্ছিল। আপনাকে ডাকলাম—

কর্নেল একটু হাসলেন।—সব পুরনো অভিজাত বাড়িতে রাতবিরেতে পুরনো মানুষদের আত্মারা চলাফেরা করে। জয়দেববাবু বলছিলেন, আত্মা অমর। হি ইজ রাইট। তাছাড়া আমিও রবিঠাকুর কোট করে বলেছিলাম, অতীত বর্তমানের মধ্যে কাজ করে।

বিরক্ত হয়ে বললাম—বাজে কথা। কেউ ঢোকার চেষ্টা করছিল। কোনও জ্যান্ত মানুষ।

—ডার্লিং! শেষপর্যন্ত যা ঘটেনি, তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই।

—সোমদেববাবুর পাত্তা নেই। ভারি অদ্ভুত লোক তো!

—শুনলাম উনি দায়ে না ঠেকলে নটা-সাড়ে নটার আগে বিছানা থেকে ওঠেন না।

দরজায় রমা দেখা দিলেন। কাঁচুমাচু মুখে বললেন—জয়ন্তবাবু রাগ করেননি তো?

বললাম—না, না। আমি তো জানি ওঁর অবস্থা। তবে ইঞ্জেকশনের...

কর্নেল আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন—ওঁর ঘরের বাইরে জানালার নীচে কোনও ইঞ্জেকশনের অ্যাম্পিউল খুঁজে পাইনি। রমা কি পেয়েছ?

রমা বললেন—নাহ্। আমি খুঁজছিলাম। সেইসময় বাবা মশাইয়ের ডাকাডাকি শুনতে পেয়ে দৌড়ে গেলাম। আপনি এখন কফি খাবেন?

—নাহ্।

কোনো অসুবিধে নেই। রেডি আছে। পাঠিয়ে দিচ্ছি। একটা ছোট্ট শ্বাস ছেড়ে রমা ফের বললেন—লক্ষ্মীকে দিয়ে পাঠাচ্ছি। বাবামশাইয়ের দিকে

আমাকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ঘরে ফিরেই পাগলামি শুরু করেছেন। টিংকুর বাবা ফার্মে গেল। টিংকুর জেঠু এখনও ঘুমোচ্ছেন।

বলে রমা চলে গেলেন। কর্নেল পোশাক বদলাতে গেলেন বাথরুমে। তারপর বেসিনের জলে হাত ধুলেন। ফিরে এলে বললাম—ভদ্রমহিলা খালি পায়ে কেন চলাফেরা করেন? অবাক লাগছে।

কর্নেল মিটিমিটি হেসে বললেন—মেয়েরা নাকি প্রকৃতির অংশ। একটা বইয়ে পড়েছি, মধ্যযুগে ইউরোপের লোকেরা বিশ্বাস করত উইমেন স্পিক টু দা নেচার অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ল্যাংগুয়েজ অব দা নেচার।' পায়ে জুতো থাকলে নেচারের সঙ্গে যোগসূত্র ছিঁড়ে যায়। খালি পায়ে হেঁটে দেখো। ইউ মে ফিল দা রিদম অব নেচার। অবশ্য তুমি পুরুষ। মেয়েদের যে সব সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় আছে, তোমার নেই।

হাসতে হাসতে বললাম—বোগাস! ভদ্রমহিলা হয়তো কোনও ব্রত পালন করছেন।

—মেয়েদের ব্রত ব্যাপারটাও কিন্তু টু কমিউনিকেট উই দা নেচার থ্রু সাম মিডিয়াম। সেগুলোই রিচুয়ালস।

—আপনি জয়দেববাবুর দোসর। উনি আমাকে ইতিহাস শোনাচ্ছিলেন। কাগজে স্টেটমেন্ট দেবেন। হেডিং দিতে হবে, 'ফ্রম হিন্দুকুশ টু লোয়ার বেঙ্গল।' আপনারটাও হেডিং হওয়া উচিত; 'উইমেন অ্যান্ড নেচার।'

—সুসান গ্রিফিনের ওই নামেরই একটা বই আছে। তোমাকে দেব। গ্রিফিন উইমেনস লিবের দুর্ধর্ষ প্রবক্তা। এই মার্কিন মহিলার কলমের জোর আছে বটে। উওমেন-নেচার সম্পর্কটা যে পুরুষদেরই বানানো চক্রান্ত, সেটা প্রমাণ করে ছেড়েছেন।

লক্ষ্মী ট্রে নিয়ে এল। প্রচুর টোস্ট, এগপোচ, কলা, আপেল, সন্দেশ। কফির পট।...

ফটক দিয়ে আমরা বেরিয়েই সাইকেল রিকশো পেলাম। কর্নেল রিকশোওয়ালাকে বললেন—ইন্দ্রপুরী আবাসন।

অনেক গলিঘুঁজি ঘুরে চওড়া রাস্তা। সেখান থেকে নদী দেখা গেল বাঁদিকে। ডানদিকে ছোট রাস্তায় মোড় নিল রিকশো। দুধারে একতলা সব নতুন বাড়ি। রিকশো একবার দাঁড় করিয়ে কর্নেল এক পথচারীকে জিজ্ঞেস করলেন—সি থ্রি থ্রি কোনদিকটায় পড়বে বলতে পারেন?

—বাঁয়ে ঘুরে পার্ক দেখতে পাবেন। পার্কের নর্থে সি ব্লক।

বাড়িটা পাওয়া গেল। সামনে একটুকরো ফুলবাগিচা। বারান্দায় গ্রিল। আমরা গেটের কাছে রিকশো থেকে নামলে একটি কিশোরী দৌড়ে এল। এসেই কর্নেলকে দেখে থমকে দাঁড়াল। সম্ভবত পাদ্রিসায়েব ভাবল।

কর্নেল বললেন—বেণীমাধববাবুকে খবর দাও। বলো কর্নেল সরকার এসেছেন।

—দাদু আমাকে বলেছে। আসুন!

আমরা বসার ঘরে ঢুকলাম। সাম্প্রতিক মফস্বলের সচ্ছল মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের বাড়ি। বসার ঘরে সোফাটোফা। বুক শেলফ। একটা টিভি। কোনার টুলে ঝালরকাটা ঢাকনার ওপর টেলিফোন।

এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক, রোগা, ফ্যাকাসে চেহারা, হাতে ছড়ি নিয়ে ঢুকলেন।—নমস্কার! নমস্কার! বলে কর্নেলের মুখোমুখি বসলেন। —আমাদের এই রিটায়ার্ড ফিজিশিয়ানদের আমৃত্যু কতকগুলো লায়েবিলিটি থেকে যায়। তাই থানা থেকে ফোন করল যখন, আমি বুঝলাম, আই মাস্ট বিয়ার দা লায়াবিলিটি, হোয়াটেভার দ্যাট ইজ। তো আপনি কর্নেল সায়েব। ইনি আপনার জুনিয়র অফিসার, আই থিংক।

কর্নেল সে-কথার জবাব দিলেন না। বললেন—কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করেই চলে যাব।

—কয়েকটা কেন? ইউ আস্ক্ মি হান্ড্রেড কোয়েশ্চেনস। আই উইল আনসার।

—আপনি হাসপাতালে সার্জারি ওয়ার্ডের হেড ছিলেন?

—ছিলাম। ডাঃ বেণীমাধব হাসলেন। —শেষ পর্যন্ত মর্গের চার্জে ঠেলল। বুঝলেন তো? আজকাল সবখানেই কেলোর কীর্তি চলেছে। তবে আই ওয়াজ অলওয়েজ স্যাটিসফায়েড উইদ মাই জব।

—জয়দেব রায়ের মেয়ে পারমিতার বডি—

ডাক্তার দ্রুত বললেন—আই সি! কিন্তু সে নিয়ে তো কোনও কেস হয়নি।

—পারমিতার মৃত্যুর কারণ কি শ্বাসরোধ?

—তা-ই। আপনি রিপোর্ট চেক করেছেন কি? ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড, এক্সকিউজ মি কর্নেলসায়েব, দা মেডিক্যাল টার্মস—ইউ নো!

—বডির এক্সটার্নাল চেক করেছিলেন কি?

—সিওর। যেহেতু হ্যাংগিং কনডিশনে পাওয়া গেছে, সেটা প্রাথমিক কাজ।

—বডির কোথাও ইঞ্জেকশনের চিহ্ন লক্ষ্য করেননি?

ডাক্তার ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন—রিপোর্টে সব ডিটেলস আছে। হোয়াই আস্ক মি?

—প্লিজ! আপনার তেমন কিছু চোখে পড়েছিল কি না মনে আছে? একটু ভেবে বলুন।

ডাক্তার স্মরণ করার চেষ্টা করে বললেন—পিঠে একইঞ্চি ক্ষত ছিল। ছড়ে যাওয়া চিহ্ন। দ্যাট ওয়জ এক্সপ্লেন্ড। গাছ থেকে বডি নামাবার সময় নাকি হাত ফস্কে পড়ে যায়। মাটিতে ইঁটের টুকরো ছিল।

—তা হলে পিঠে ছড়ে যাওয়া চিহ্ন ছিল?

—ছিল। আমি সেটা মেনশন করেছি রিপোর্টে।

—একটু ভেবে বলুন। চিহ্নটা হার্টের উল্টোদিকে ছিল?

—পসিব্লি। রিপোর্ট খুঁটিয়ে দেখুন। নতুন-নতুন সব ছোকরা ডাক্তার এসেছে। উই আর ওল্ড হ্যাগার্ডস। রিপোর্টটা তাদের দেখান।

কর্নেল উঠলেন। —থ্যাংকস। এই যথেষ্ট।

—গৃহস্থবাড়ি এসেছেন। একটু চা অন্তত—

—নাহ্। থ্যাংকস।

ভদ্রলোক প্রায় হতবাক হয়ে বসে রইলেন। কর্নেল হন্তদন্ত হাঁটছিলেন। বাইরে গিয়ে দেখলাম, বারান্দায় বাড়ির মেয়েদের একটা ভিড়। পুতুলের মতো দেখাচ্ছে তাঁদের।

রাস্তার মোড়ে পার্কের কাছে গিয়ে বললেন—কী বুঝলে?

মর্গে ঠেলে দেওয়ায় উনি খুশি ছিলেন না।

—কারেক্ট।

—কাজেই দায়সারা কাজ করতেন।

—একজ্যাক্টলি।

—পারমিতাকেও নন্দের মতো বিষাক্ত ইঞ্জেকশানে খুন করে বডি ঝোলানো হয়েছিল।

—ফাইন! তোমার মাথা খুলেছে।

—অ্যান্ড আই ডিসকভার্ড দা মার্ডার উইপন।

—হুঁঃ।

পার্ক পেরিয়ে গিয়ে খালি সাইকেল রিকশো পাওয়া গেল। কর্নেল রিকশোওয়ালাকে বললেন—নিউমার্কেট।

বলে কর্নেল হাসলেন। —বেতলা ফরেস্টে রাস্তার ধারে একবার 'পার্ক হোটেলে' খেয়েছিলাম। টালির চালাঘর। নড়বড়ে কাঠের টেবিল-চেয়ার। তবে ট্যাঁড়সের তরকারিটা ছিল অপূর্ব। আসলে ব্যাপারটা হল, জয়দেববাবুর থিওরি অনুসারেই দেশটা চলছে। উনি এখানে গ্রিকদের জানা গঙ্গারাইড রাজ্যে বাস করছেন। ক্রমশ ভাষায় ইংরেজি যে হারে ঢোকাচ্ছি, আমিও ব্যতিক্রম নই এবং তুমিও নও—তাতে বছর পঞ্চাশ পরে পিজিন ইংলিশ 'বাংরেজি' হবে বাংলার লিঙ্গুয়া ফ্রাংকা। কলকাতায় একবার ট্যাক্সিওয়ালাকে বললাম, সুরেন ব্যানার্জি রোডে যাব। সে বলে, কোথায় সেটা? বলেই গিয়ার টানল—ও! এস এন ব্যানার্জি রোড! যাই হোক, বেতলার জঙ্গলে পার্ক হোটেল থাকলে কোদালিয়ায় নিউ মার্কেটে আপত্তি কী? দুটোতেই যুক্তি আছে। বেতলা ন্যাশনাল পার্ক থেকে

pathagar.net

পার্ক কথাটা আসতেই পারে। কোদালিয়ায় নতুন সাজানো গোছানো একেলে রীতির বাজার 'নিউ মার্কেট' হবেই।

বকবকানিতে কান ঝালাপালা হলেও সময় কেটে গেল। একটা বাসস্টেশন চোখে পড়ল। অসংখ্য বাসের ভিড়। মানুষজন। ট্রাক-টেম্পো-সাইকেলরিকশো গিজগিজ। তারপর দোতালা নতুন বিশাল বাড়ির মাথায় 'নিউমার্কেট' সাইনবোর্ড। ভেতরে করিডরের দুধারে দোকানপাট। থরেথরে উজ্জ্বল ভোগ্যপণ্য সাজানো। মফস্বল বাংলা প্রচণ্ড বদলে গেছে বটে!

রিকশো থেকে কর্নেল দুধারে তাকাচ্ছিলেন। একটু পরে ডাকলেন—এস!

উল্টোদিকে একটা ডাক্তারখানায় ঢুকলাম আমরা। নেমপ্লেটে লেখা 'ডাঃ এন জি চক্রবর্তী' এবং একসার ইংরেজি হরফ। ভেতরে কাঠের পার্টিশন। সামনে ওষুধের আলমারি। এক যুবক ঝিমোচ্ছিল কাউন্টারের সামনে। কর্নেল বললেন—ডাক্তারবাবু আছেন?

সে আমাদের দিকে না তাকিয়েই বুড়ো আঙুল দিয়ে পার্টিশনের দিকটা দেখাল। আমরা সটান গিয়ে ঢুকলাম। ইনিও প্রবীণ মানুষ। কিন্তু চেহারায় গ্রাম্য ছাপ। কর্নেলকে দেখেই উঠে দাঁড়ালেন। প্রায় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে হ্যান্ডশেকের জন্য হাত বাড়িয়ে বললেন—গুড মর্নিং! হাউ ক্যান আই হেল্প ইউ স্যার?

কর্নেলকে বোধ করি সায়েব ভেবেছিলেন ডাঃ নাড়ুগোপাল চক্রবর্তী। কর্নেল বসেই বিনা ভূমিকায় বললেন—আপনি রায়ভবনের জয়দেব রায়কে কি স্টেরয়েড ইঞ্জেকশন দিয়েছিলেন, নাকি অন্য কিছু?

ডাক্তারবাবু গুলিগুলি চোখে তাকিয়ে বললেন—আপনার পরিচয়?

কর্নেল পকেট থেকে তাঁর নেমকার্ড বের করে দিলেন। ডাক্তারবাবু খুঁটিয়ে পড়ে বললেন—বুঝলাম না। আপনি কি আই বি অফিসার ইন ডিসগাইস?

—আমার দাড়ি টেনে দেখতে পারেন।

রসিকতায় ডাক্তারবাবু একটুও হাসলেন না। বললেন—নন্দের মার্ডারকেসের তদন্তে এসেছেন? এইমাত্র শুনলাম কমলেশ কবুল করেছে। তো এর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী?

আপনি জয়দেববাবুকে কী ইঞ্জেকশন দিয়েছিলেন?

—ডেকাডিউরেবলিন।

—না ডাঃ চক্রবর্তী! আপনি দিয়েছিলেন নার্কোটিক ড্রাগ।

—ব্লান্ট্ লাই। কে বলেছে?

—ইঞ্জেকশনের কয়েকটা অ্যাম্পিউল বলেছে। বলে কর্নেল পকেট থেকে তিনটে অ্যাম্পিউল বের করলেন। ফের বললেন—জয়দেব রায়ের জানালার বাইরে পড়েছিল।

ডাক্তারবাবু গুলিগুলি চোখে তাকিয়ে রইলেন। একটু পরে বললেন—ওটা নার্ভের ওষুধ। অন্যায় করিনি।

—আপনি তো এম বি বি এস নন?

—আই অ্যাম আ রেজিস্টার্ড মেডিক্যাল প্র্যাকটিশনার।

—আপনি হাজারিবাগ গভর্নমেন্ট হসপিট্যালে ডিসপেন্সিং কেমিস্ট্ ছিলেন। কোদালিয়ায় ফিরে মেডিক্যাল প্র্যাকটিস শুরু করেন?

ডাক্তারবাবুর মুখ সাদা হয়ে গেল। গলা ঝেড়ে বললেন—এ কেসের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক? রুগ্‌ণ মানুষের চিকিৎসা করা অন্যায় নয়। মফস্বলে ডাক্তারের অভাব। আমি অভিজ্ঞ ডাক্তার। এলাকায় আমার পপুলারিটি আছে।

—আপনি তো সোমদেববাবুর থিয়েটার ক্লাবের প্রেসিডেন্ট?

—থিয়েটারে আমার আজীবন নেশা। কিন্তু নন্দের মার্ডার কেসের সঙ্গে...

—নাহ্। এ কেসের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক নেই।

—তা হলে হঠাৎ ওসব প্রশ্ন কেন?

—আপনি সত্যিই নার্ভের ওষুধ ইনজেক্ট করেছিলেন জয়দেববাবুর শরীরে। তবে তার সঙ্গে মর্ফিয়া গ্রুপের যে ওষুধ ছিল, তার ক্রিয়া বিপজ্জনক। সেটা নার্কোটিক্স্ ছাড়া কিছু নয়। সুস্থ মস্তিষ্কের স্নায়ু ক্রমশ অসুস্থ হয়ে পড়ে। হ্যালুসিনেশন রোগ দেখা দেয়। ক্রমশ রোগী স্কিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত হয়। রিয়্যাল-আনরিয়্যালের তফাত বুঝতে পারে না। সে অবসেসনের মধ্যে থাকে। বিশেষ করে রাতের দিকে এ রোগের লক্ষণ বেড়ে যায়। আপনি এই বিখ্যাত গল্পটি নিশ্চয় জানেন, এক ভদ্রলোক রাত্রে নিজের পোশাক বাগানে পুঁতে রেখে আসতেন। দিনে সেই পোশাক খুঁজে না পেয়ে চাকরকে বকাবকি করতেন। আপনি নিশ্চয় মালোপঁতির 'দা ফেনোমেনোলজি অব পার্সেপশন' বইটা পড়েননি। ওতে এক রোগিণীর কথা আছে। তিনি দিনদুপুরেই চিৎকার করতেন, 'জানালার নীচে একটা লোক! জানালার নীচে একটা লোক!' অথচ কোনও লোককে দেখা যেত না। কিন্তু রোগিণী তার চেহারা ও পোশাকের ডিটেলস বর্ণনা দিতেন। এইসব রোগীর ক্ষেত্রে বিপজ্জনক ব্যাপার হল, এঁরা দীর্ঘকাল কোনও উপেক্ষা-তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ভোগ করলে এঁদের একটা সাংঘাতিক অবসেসন তৈরি হয়। অবচেতনায় পুঞ্জীভূত ক্ষোভ আর অভিমান কোনও এক মুহূর্তে বার্স্ট করে। তখন তাঁরা এক অন্ধ শক্তির হাতের পুতুল মাত্র। তাঁরা জানেন না কী করছেন।

কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। ডাক্তারবাবু তেমনি গুলিগুলি চোখে তাকিয়ে আছেন—পলকহীন। কোনও কথা বললেন না।

কর্নেল বেরিয়ে গিয়ে হনহন করে হাঁটতে থাকলেন। 'নিউমার্কেট' এলাকা

ছাড়িয়ে গিয়ে নির্জন রাস্তায় তিনি হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। তারপর বাইনোকুলারে আকাশদর্শনে ব্যস্ত হলেন। বললাম—পাখি?

—আভাঁ গার্দ।

—তার মানে?

—ডার্লিং! এই প্রখ্যাত টার্মটি তোমার জানার কথা।

—কি আশ্চর্য! ওটা তো সমাজতত্ত্বের টার্ম। চিন্তার ক্ষেত্রে যারা এগিয়ে থাকে। অ্যাডভান্স গার্ডের ফরাসি বয়ান। আকাশে তারা থাকে না। তারা মাটির বাসিন্দা।

কর্নেল বাইনোকুলার নামিয়ে একটু হেসে বললেন—হিমালয় পেরিয়ে আসা সাইবেরীয় হাঁসের একটা আগাম ঝাঁক মালঞ্চীর বিলে যাচ্ছে। একমাস পরে ওরা আলিপুর চিড়িয়াখানার জলায় যাবে। যাই হোক, উত্তেজনার পর চমৎকার একটা রিলিফ পাওয়া গেল।

বলে আবার হাঁটতে থাকলেন। বললাম—আপনি সত্যিই ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। ওই গ্রাম্য কোয়াক ডাক্তারবাবুকে অত সব হেভি তত্ত্ব বোঝানোর কি কোনও দরকার ছিল?

—ছিল। তবে গ্রাম্য কোয়াকদের এত ছোট করে দেখো না জয়ন্ত। জন্মগত প্রতিভা এঁদের কারও-কারও থাকে। অশিক্ষিত পটুত্ব বলে একটা কথা আছে। তার জোরে এঁদের কেউ-কেউ তথাকথিত পশ্চিমফেরত বড়-বড় ডিগ্রিধারী ডাক্তারদেরও কান কাটতে পারেন।

—হয় তো পারেন। কিন্তু বুঝতে পারছি না নাড়ুডাক্তার কোন স্বার্থে জয়দেব রায়কে পাগল করতে যাবেন।

—তুমি বড্ড অমনোযোগী, জয়ন্ত! উনি সোমদেবের থিয়েটার ক্লাবের প্রেসিডেন্ট। সোমদেবের প্ররোচনায় এ কাজটা করা ওঁর পক্ষে স্বাভাবিক। আর জয়দেববাবু পাগল হয়ে গেলে তাঁর উইল অকেজো হয়ে যাবে। পূর্বপুরুষের অমন একটা বাড়ি...

দ্রুত বললাম—আই সি!

কর্নেল গলার স্বর নামিয়ে বললেন—শান্তিদেব বলছিলেন কেন তাঁর বড়দা আমাকে বলেছেন, 'বাবা পাগল হলে আমরা ভেসে যাব', এটা শান্তিদেব বুঝতে পারছেন না। মনে পড়ছে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। কথাটা তা হলে চালাকি?

—পঁচাত্তর বছর বয়সী বুড়ো বাবা। বোঝা যাচ্ছে। একবার মাইনর স্ট্রোক হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর সম্ভাবনা যে-কোনও মুহূর্তে। কাজেই তাঁকে পাগল করে ফেললে যদি সম্পত্তিটা বাঁচানোর শক্ত চান্স পাওয়া যায়, ছাড়তে চাননি

সোমদেববাবু। তাঁর মৃত্যুর পর কোর্টে উইল প্রোবেট করাতে হবে। তখন সোমদেব আপত্তি তুলে বলতে পারবেন, বাবা পাগল অবস্থায় উইল করেছিলেন। কাজেই উইলের বৈধতা নেই।

একটু হেসে বললাম—তাহলে সোমদেব আপনার কাছে গিয়ে ভুল করেছেন!

—নিজের ইচ্ছায় যাননি। কিছু তলিয়ে ভেবেও যাননি। রমার কৌশলে সাইকিয়াট্রিস্ট ডাক্তার ঘোষের নির্দেশেই আমার কাছে গিয়েছিলেন। ভুলে যেও না।

—হ্যাঁ। দ্যাটস রাইট। কিন্তু ডঃ ঘোষের কাছেই বা কেন গেলেন সোমদেব?

—বাবা যে সত্যি মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত, তার সার্টিফিকেট সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। ওঁর নার্সিংহোমে কিছুদিন রাখা হত। কিন্তু জয়দেববাবুর মানসিক বৈকল্য সারানোর আর কোনও উপায়ই নেই সম্ভবত। এ বয়সের শিথিল আর বিকল নার্ভকে সুস্থ করার মতো ওষুধ এখনও আবিষ্কৃত হয়নি।

একটু পরে দেখলাম, আমরা থানার সামনে এসে গেছি। বললাম—আবার থানায়?

—এস তো! বলে কর্নেল আমার হাত ধরে টানলেন। যেন আসামী ধরে নিয়ে যাচ্ছেন।

pathagar.net

দোতলায় এবার অফিসার-ইন-চার্জের ঘরে গেলাম আমরা। উর্দিপরা অফিসার সম্ভাষণ করে বসতে বললেন। কর্নেল আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন—জয়ন্ত চৌধুরী। সাংবাদিক। জয়ন্ত, ইনি অশোক মজুমদার।

ওসি হাসলেন। —এখানকার লোকে বলে বড়বাবু। 'সেই ট্রাডিশন সমানে চলিতেছে' আর কী!

—দীপক নিশ্চয় আমার মুণ্ডুপাত করে গেছে?

—সি আই সায়েব একটু আগে বেরুলেন। গ্রামের দিকে একটা এনকোয়ারিতে—যাক্‌গে, ছোকরাকে এনে বসিয়ে রেখেছি দিব্যেশদার ঘরে। এখনই ওর একদঙ্গল লোক এসে ঝামেলা করছিল। দিব্যেশদাকে তো জানেন! বাঙাল বুলিতে তাদের সঙ্গে অনেক জোক-টোক করে সামাল দিয়েছে।

—তা হলে ওর ঘরেই যাই?

ওসি ব্যস্তভাবে বললেন—না, না। কত ভাগ্যে আপনার দর্শন পেয়েছি। মর্নিংয়ে এলেন, তখন তো এক কাপ চা-ও খেলেন না। সরি! আপনি তো কফি ছাড়া কিছু খান না।...

একটু পরে দিব্যেশবাবু এক কেতাদুরস্ত চেহারার যুবকের কাঁধে হাত রেখে এঘরে ঢুকলেন। একেবারে ফিল্মের হিরো। কিন্তু মুখটা গম্ভীর। মুখে আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট। দিব্যেশবাবু সহাস্যে বললেন—মুখার্জি কইয়া গেল, কর্নেল সায়েবরে

অ্যারেস্ট করবা। আমি ব্যাক না করা পর্যন্ত বওয়াইয়া রাখবা। সি দা অডাসিটি! আমি কইলাম, ফোর্ট উইলিয়াম খবর পাইলে কমান্ডো আইয়া পড়ব।

বলেই কাঞ্চনের দিকে ঘুরলেন। —ইনি ক্রিসমাসের সান্তাক্লজ নন ভাইটি! মিলিটারির কর্নেলসায়েব। না, না! ভয় পাইবা না। নামেই কর্নেল। ওই দেখ, গলায় কী ঝুলতাছে। পাখি দেখা যন্তর। পাখি ছাড়া কিছু দ্যাখেন না। মানুষজন ব্যাবাক। বও ভাইটি বও!

কর্নেল বললেন—বসো, কাঞ্চন!

এমন ভঙ্গিতে বললেন যেন কতকালের চেনা। কাঞ্চন কুণ্ঠিতভাবে বসল।

কর্নেল বিনা ভূমিকায় বললেন—রমা আমাকে বলছিল, পারুর সঙ্গে তোমার বিয়ে হলে পারু সুখী হত। কিন্তু পারুর বাবা একে মাস্টারমশাই, তাতে পাগল। রমার কাছেই শুনলাম, বিয়ের পরও পারুর সঙ্গে তোমার সম্পর্ক ছিল। রমা এ-ও বলল, তোমাদের গোপনে দেখাসাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিত সে।

কর্নেল নিশ্চয় এতগুলো চমৎকার মিথ্যা আওড়ে গেলেন। কাঞ্চন মুখ নামিয়ে বসে রইল।

—পারু গলায় দড়ি দিয়ে মরত না, যদি সে-রাতে তুমি ওর কথামতো যেতে। রমা তোমাদের পালিয়ে যেতে সাহায্য করত। পারু তৈরি ছিল। তুমি গেলে না। কেন যাওনি কাঞ্চন? তুমি গেলে মেয়েটা সুইসাইড করত না।

কাঞ্চন মুখ তুলে আস্তে আস্তে বলল—গিয়েছিলাম।

—পারু কথামতো বাগানে অপেক্ষা করছিল?

—হ্যাঁ। কিন্তু হঠাৎ আমাদের ওপর টর্চের আলো পড়ল। আমি নদীর দিকের দরজা খুলে পালিয়ে গেলাম।

—টর্চের আলো পড়েছিল?

—হ্যাঁ।

কর্নেল বললেন—এই যথেষ্ট। দিব্যেশ! কাঞ্চনকে ছুটি দাও...

॥ ছয় ॥

আমরা সাইকেল রিকশোয় চেপে রায়ভবনে ফিরছিলাম। পথে যেতে যেতে বললাম—রমা দেবীর নামে আপনি একরাশ মিথ্যা আওড়ে গেলেন দেখে অবাক লাগছিল।

কর্নেল একটু হাসলেন। —কোনও জিনিস সত্য কি না সেটা মিথ্যা দিয়েই বাজিয়ে নিতে হয়। নৈলে সত্য-মিথ্যার তফাত বোঝা যায় না। আমার থিওরি সত্য কি না, যাচাই করতে মিথ্যার দরকার ছিল।

—কী আপনার থিওরি?

—মাঝেমাঝে পারুর এই রাতের অভিসার খুনী টের পেয়েছিল। তাই সে সে-রাতে তৈরি ছিল। কাঞ্চন পালিয়ে যাওয়ার পর খুনী গিয়ে পড়ে পারুর মুখোমুখি। পারু সম্ভবত চলে আসার জন্য ঘুরে পা বাড়াতেই খুনী তার পিঠে মারাত্মক ইঞ্জেকশনের নিডল ঢুকিয়ে দেয়। পারু মারা পড়ে। তুমি লক্ষ্য করেছ কি নন্দের ঘর দক্ষিণপূর্ব কোণে? পারু নিশ্চয় অন্তিম আর্তনাদ করেছিল। নন্দ ছুটে গিয়ে খুনী ও পারুর সামনে পড়ে। এ অবস্থায় যে কি না বাড়ির বংশগত পুরাতন ভৃত্য, সেই নন্দ কী করতে পারে? খুনী বাড়িরই লোক। তাকে তো সে পুলিশে ধরিয়ে দিতে পারে না। এ একটা পারিবারিক ট্র্যাজেডি নয় কি? অতএব নন্দ বাড়িরই অন্য কোনও লোকের সাহায্যে গলায় দড়ি বেঁধে গাছে ঝুলিয়ে সাজায়। হ্যাঁ—কমলেশ যে ছবি এঁকে ব্যাপারটা দেখিয়েছে, সেই পদ্ধতিতেই কাজটা করা হয়। বাড়ির সাহায্যকারী লোকটি এবং নন্দ দুজনেরই স্বাভাবিক সন্দেহ হতে পারে, পারুকে কী ভাবে মারা হল? দেহে ক্ষতচিহ্ন নেই, অথচ মৃত!

—তাহলে ধরে নিচ্ছি বডিতে আঘাতের চিহ্ন খুঁজতে গিয়েই পিঠে ইঞ্জেকশনের চিহ্ন দেখতে পেয়েছিল ওরা।

কিন্তু সেই চিহ্ন তো সূক্ষ্ম!

—জয়ন্ত! এভাবে অতর্কিতে দেহে ইঞ্জেকশনের নিড্‌ল ঢোকালে রক্তচিহ্ন থাকা স্বাভাবিক। কাজেই পিঠে কোনও ভোঁতা জিনিস ঘষে ছড়ে যাওয়ার ক্ষত তৈরি করে দুজনে।

pathagar.net

সাহায্যকারী নিশ্চয় সোমদেব? নাকি শান্তিদেব?

কর্নেল চুপ করে রইলেন। একটু পরে বাইনোকুলারে আকাশ দেখতে থাকলেন।

রায়ভবনের ফটকে রিকশো থেকে নেমে দেখলাম, রমা এদিকের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। ভেতরে ঢুকলে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে বললেন—বাবামশাইয়ের আবার পাগলামি বেড়ে গেছে। ওঁর ঘরে একটা মরচেধরা তলোয়ার আছে। সেটা দিয়ে আঙুল কেটে রক্তারক্তি করেছেন। টিংকুর জেঠুকে ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়েছি দুঘণ্টা আগে। এখনও ফিরছেন না। এখনই এটিএস দেওয়া দরকার। টিটেনাস হয়ে যেতে পারে। ডেটল দিয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়েছে অবশ্য।

আমরা জয়দেববাবুর ঘরে গেলাম। দেখলাম, ডানহাতের বুড়োআঙুল আর তর্জনীতে পট্টিবাঁধা। খাটে বসে ছোট্ট ব্রাশ দিয়ে একটা কালচে চাকতি সাফ করছেন। আমরা ঢোকামাত্র ফুঁসে উঠলেন—ট্রেসপাসার্‌স্ উইল বি প্রসিকিউটেড। গেট আউট! গেট আউট ফ্রম মাই মিউজিয়াম!

রমা দ্রুত বললেন—বাবামশাই! ইনি কর্নেলসায়েব আর ইনি কাগজের রিপোর্টার। এঁদের সঙ্গে আপনার তো আলাপ হয়েছে।

জয়দেব রায় একটা ছোট্ট শিশিতে ব্রাশ চুবিয়ে চাকতিতে ঘষতে ঘষতে ফের বললেন—ট্রেসপাসার্‌স্ উইল বি প্রসিকিউটেড।

কর্নেল বললেন—জয়দেববাবু, শুধু নিকোটোমাইন সলিউশন দিয়ে চাকতিটা সাফ হবে না। খানিকটা প্যারাফিন অয়েল মিশিয়ে নেবেন। নইলে হিতে বিপরীত হবে। সব সাইন মুছে যাবে।

জয়দেব রুষ্ট চোখে তাকিয়ে গর্জন করলেন—ডোণ্ট ডিসটার্ব মি। গেট আউট! তারপর সেই 'পালযুগ বা গুপ্তযুগের' তলোয়ার তুলে উঠে দাঁড়ালেন।

আমরা বেরিয়ে এলাম। জয়দেব এসে দরজা জোরে বন্ধ করে দিলেন ভেতর থেকে। রমা কেঁদে ফেললেন। কর্নেল বললেন—কেঁদে কী হবে রমা? আমার সঙ্গে এস।

আমরা গেস্ট হাউসে উঠে এলাম। কর্নেল বসে একটা চুরুট ধরিয়ে রমাকে বসতে ইঙ্গিত করলেন। রমা দ্বিধার সঙ্গে বসে বললেন—টিংকুর জেঠুর এত দেরি হচ্ছে কেন, বুঝতে পারছি না। নাড়ুবাবুকে বললেই তো ছুটে আসবেন।

—নাড়ুবাবু আর এবাড়ির ছায়া মাড়াবেন না।

রমা চমকে উঠে বললেন—সেকি! কেন?

—উনি এ বাড়িরই একজনের চক্রান্তে তোমার শ্বশুরকে পাগল সাব্যস্ত করার জন্য নার্কোটিক ড্রাগ ইঞ্জেকশন দিয়েছিলেন। ওঁর মৃত্যুর পর কোদালিয়ার প্রত্ন-সংরক্ষণ সমিতি উইলের ভিত্তিতে বাড়ির দখল নিতে এলে আদালতে উইল চ্যালেঞ্জ করা যাবে যে, তোমার শ্বশুর উন্মাদ অবস্থায় উইল করে গেছেন।

রমা তাকিয়ে রইলেন। একটু পরে ফুঁপিয়ে উঠে মাথা নাড়লেন। —না। না। কে এমন চক্রান্ত করবে?

—তোমার ভাসুর এই কাজটি করেছেন। যাইহোক, তোমার শ্বশুরকে যত শিগগির পারো ডঃ ঘোষের সাহায্য নিয়ে যে নার্সিং হোমে বা হাসপাতালে নার্কোটিক ড্রাগে আসক্ত রোগীদের চিকিৎসা হয়, সেখানে পাঠানোর ব্যবস্থা করো। তোমার স্বামীকে বলো। তবে তোমার ভাসুর এই চক্রান্ত করেছিলেন, এ কথা যেন ভুলেও বোলো না। পারিবারিক অশান্তি বাড়বে।

রমা চোখ মুছে বললে—এ বাড়িতে আমার একটুও থাকতে ইচ্ছে করে না। টিংকুর বাবারও না। ফার্মহাউসে বাড়ি করা আছে। আমরা বরং সেখানেই চলে যাব।

—তাই যেও। সোমদেবের শাস্তি পাওয়া দরকার। আমি নিরুপায়। আইন নিজের পথে চলবে। সোমদেব এবং নাড়ুবাবু তার ফল ভুগবেন। আর শোনো, আমরা খেয়ে নিয়েই কলকাতা ফিরব।

রমা উঠে দাঁড়িয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরলেন। তারপর বললেন—কিন্তু কমলেশ পারু বা নন্দকে মেরেছে, আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। সে এত ভাল...

কান্না সামলাতে না পেরে রমা বেরিয়ে গেলেন।

কর্নেল গোছগাছ শুরু করলেন। বললেন—স্নান করছি না। তুমিও কোরো না। সাড়ে বারোটায় একটা ট্রেন আছে। ওই ট্রেনটা ধরতেই হবে। কলকাতা ফিরে ট্রাঙ্ককলে দিব্যেশকে যা জানাবার জানাব। সোমদেব অ্যান্ড দ্যাট কোয়াক ডক্টর মাস্ট্ বি পানিশড।

কিন্তু কমলেশ কি সত্যিই পারু এবং নন্দকে...

কর্নেল হঠাৎ চটে গেলেন। —ইউ ফুল! জয়দেববাবুর ঘরে নিকোটোমাইন সলিউশন দেখে এখনও বুঝতে পারছ না কী ঘটেছে? বুঝতে পারছ না তোমার হাত থেকে ইঞ্জেকশন সিরিঞ্জ কেড়ে কেন ছুঁড়ে ফেলতে হল জয়দেববাবুকে?

—মাই গুডনেস! তা হলে জয়দেববাবু নিজের মেয়ে খুন করেছিলেন?

—দ্য সাইকিক কিলার'স ভায়োলেন্ট রিঅ্যাকশন। নন্দ সেই খুনের সাক্ষী। নন্দ পাগলা মনিবকে বাঁচাতে কমলেশের সাহায্য নিয়েছিল। জয়দেববাবুর উইলে তাঁর প্রিয় ছাত্র কমলেশ উত্তরাধিকারী। কাজেই তার বিরুদ্ধে অবসেসনে জয়দেবের কোনও ঘৃণা নেই, বরং আছে প্রগাঢ় স্নেহ।

কিন্তু নন্দ খুনের সাক্ষী হয়ে রইল। তা ছাড়া কল্পিত সিল চুরির অবসেসনে আক্রান্ত জয়দেব। তাই নন্দকে মরতে হল। শ্বশুরকে বাঁচাতে কমলেশ আগের পদ্ধতিতে নন্দের বডি ঝোলাল। কিন্তু শেষরক্ষা হল না মর্গের নতুন ডাক্তারের সতর্কতায়। তখন কমলেশ সমস্ত দায় নিজের কাঁধে নিল। তোমার মনে পড়ছে গতরাতে দীপক মুখার্জিকে বলছিলাম, 'ক্ষুদিরামস্ আর স্টিল বর্ন্ অ্যান্ড ডাই।'

—কিন্তু রমা বলছেন, সে রাতে কমলেশ ও নন্দ বাগানে যায়। পরে কমলেশ পালিয়ে আসে।

—সরল ব্যাখ্যা সম্ভব। দুজনে নদীর ঘাটে জ্যোৎস্না রাতে বেড়াতে যেত—রমাই বলেছে। জয়দেব ঘাটে ওত পেতে ছিলেন। নন্দের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ইঞ্জেকশনের নিডল ঢুকিয়ে দেন। হতবুদ্ধি কমলেশ পালিয়ে আসে। পরে বুদ্ধি করে সোমদেবের থিয়েটারের আসবাবের ঘর থেকে দড়ি নিয়ে গিয়ে নন্দের বডি একই পদ্ধতিতে ঝোলায়।

উত্তেজনায় একটা সিগারেট ধরাতে হল। আজকাল সিগারেট কদাচিৎ টানি। বললাম—কিন্তু কমলেশ নির্দোষ। তাকে বাঁচাবেন না?

—কমলেশ বেঁচে যাবে। মানিক চ্যাটার্জিরা আছে। তুমি শুনেছ, ইতিমধ্যে পলিটিক্যাল প্রেসার এসেছে। এস ডি পি ও প্রেসারের মুখে পড়েছেন। এটা আইনের দিক থেকে অন্যায়। কিন্তু মানুষের জন্য আইন, না আইনের জন্য মানুষ, ডার্লিং? একজন নির্দোষ সৎ বিবেকবান যুবককে বাঁচাতে আইনকে কেউ যদি লাথি মারে—পলিটিক্যাল প্রেসার তো দূরের কথা, আই ওয়েলকাম এনি সর্ট অব ড্যাম থিং।

একটু হেসে বললাম—'খুনের রহস্যটা চাপা থেকে যাবে?

—আই কোট জয়দেব রায়। 'সমাজের হিতসাধনের জন্য সবকিছু করা চলে।' রহস্য তুমি-আমি জানলাম। দ্যাটস এনাফ। রহস্য চাপা থেকে বরং এই বাড়িটা একটা মিউজিয়াম হোক। এখানে একটা প্রত্ন-গবেষণাকেন্দ্র হোক। দেশবিদেশের পণ্ডিতরা আসুন। সেই মহৎ উদ্দেশ্যের স্বার্থে একটা কেন, একশো রহস্য চাপা রাখতে আমার আপত্তি নেই।

বলে কর্নেল ব্যালকনিতে গেলেন। সেখান থেকে ফের বললেন—হতভাগিনী পারু আর হতভাগ্য নন্দের জন্য আমার কষ্ট হচ্ছে ডার্লিং! কিন্তু তাদের মৃত্যুর শোধ নিতে একজন বৃদ্ধ সাইকিক কিলারকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে লাভ কী? এর জন্য প্রকৃত দোষী তো সোমদেব এবং নাড়ুডাক্তার। তাদেরই শাস্তি হওয়া দরকার। জয়দেববাবু যদি চিকিৎসায় সেরে ওঠেন এবং স্মৃতি ফিরে পান, তাহলে অজ্ঞানে অবচেতন হিংসায় যে সাংঘাতিক অপরাধ করে ফেলেছেন, তার প্রায়শ্চিত্ত নিজেই করবেন। লেট আস ওয়েট অ্যান্ড সি।...

কলকাতায় ফেরার পরদিন বিকেলে অফিস থেকে কর্নেলকে ফোন করলাম। আমার সাড়া পেয়েই বৃদ্ধ রহস্যভেদী বললেন—এবার দৈনিক সত্যসেবককে খরোষ্ঠীলিপিরহস্য উপহার দিতে পারো ডার্লিং! সোমদেব রায় এবং ডাঃ নাড়ুগোপাল চক্রবর্তীকে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে। জয়দেব রায় কলকাতায় সাইকিয়াট্রিক ডাক্তারের চিকিৎসাধীনে আছেন।

বললাম—শুধু দুটো পয়েন্ট ব্যাখ্যা করুন। সে রাতে জয়দেববাবু টর্চ জেলে বাগানে কেন গিয়েছিলেন?

—ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ খুঁজতে।

—গেস্টরুমের সিঁড়ির নীচের দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিল কে?

—আবার কে? জয়দেব রায়। সারারাত অবসেসনের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে উনি জ্যান্ত প্রেতের মতো ঘুরে বেড়াতেন। তোমাকে বলেছিলাম, স্কিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত রোগীর কাছে বাস্তব-অবাস্তব একাকার হয়ে যায়। সে কী করছে নিজেই জানে না। পরে যখন জানতে পারে কী করেছে, যন্ত্রণায় ভেঙে পড়ে। প্রত্ন-তলোয়ার দিয়ে জয়দেবের হাতের আঙুল কাটার চেষ্টা সেই প্রতিক্রিয়া। সেই রোগী চেতনা-অবচেতনার মধ্যে সবসময় ছোটাছুটি করে বেড়ায়। আর একটা কথা। সোমদেব হাতে ছড়ি রাখেন। ওটা ওঁর আত্মরক্ষার অস্ত্র।

—থ্যাংকস। বুঝেছি।

টেলিফোন ছেড়ে কাগজের জন্য 'স্টোরি' লিখতে প্যাড টেনে নিলাম।...

pathagar.net

বিজ্ঞাপনের আড়ালে

কর্নেল নীলাদ্রি সরকার তাঁর ড্রয়িংরুমে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। দাঁতে কামড়ানো জ্বলন্ত চুরুট থেকে সুতোর মতো নীল ধোঁয়া তাঁর টাকের কয়েক ইঞ্চি ওপরে গিয়ে সিলিং ফ্যানের হাওয়ায় ছত্রখান হয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ কাগজ নামিয়ে আমার দিকে ঘুরে বললেন, "আচ্ছা জয়ন্ত, আজকাল রঙিন বাংলা ফিচার ফিল্ম তুলতে কত টাকা লাগে?"

বললুম, "কেন? ফিল্ম মেকার হতে চান নাকি?"

আমার বৃদ্ধ বন্ধু গম্ভীর মুখে সাদা দাড়ি নেড়ে বললেন, "নাহ্! এমনি জানতে ইচ্ছে করছে। ফিল্ম লাইনে তোমার তো জানাশোনা আছে। তাই—"

"সঠিক জানি না। তবে আমার ধারণা, পনের লাখ টাকার কমে আজকাল রঙিন ছবি হয় না। হিন্দি করলে সম্ভবত মিনিমাম এর দ্বিগুণ।"

কর্নেল চোখ বুজে ইজিচেয়ারে হেলান দিলেন। বললেন, হুঁ লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যাপার। কাজেই মাসের পর মাসঅভিনেতা চেয়ে কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে অসুবিধে নেই। কিন্তু মাত্র একজন অভিনেতার জন্য—ঠিক এই ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারছি না। একজন বয়স্ক অভিনেতা। নায়িকার বাবার চরিত্রে তাঁকে নামানো হবে। বয়স্ক অভিনেতার কি আকাল পড়ে গেছে দেশে?"

স্বগতোক্তির মতো কথাগুলো চোখ বুজে আওড়ালেন কর্নেল। তারপর টাকে হাত বুলোতে থাকলেন। একটু অবাক হয়ে বললুম, "এত আপনার চিন্তা-ভাবনার কী আছে, বুঝতে পারছি না।"

"আছে। গত দু'মাস ধরে প্রতি রবিবার চোখে পড়ার মতো জায়গায় প্রত্যেকটি কাগজে বিজ্ঞাপন ইংরেজি এবং বাংলায়।"

কর্নেলকে এই সাধারণ ব্যাপারে চিন্তাকুল হতে দেখে একটু হেসে বললুম, "আশাকরি কোনও রহস্যের আঁচ পেয়েছেন। বিজ্ঞাপনটা দেখি!"

কর্নেলের সামনে টেবিলের ওপর কয়েকটা বাংলা আর ইংরেজি কাগজ ভাঁজ করা আছে। তাঁর কোলের বাংলা কাগজটা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। বললেন, "তোমাদের দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকা। যতদূর জানি, এই কাগজটা সারা দেশের সমস্ত আঞ্চলিক ভাষার কাগজের চেয়ে বেশি বিক্রি হয়। এতেও দু'মাস ধরে বিজ্ঞাপন! তুমি এই কাগজের স্পেশাল রিপোর্টার। কাজেই ভালোই জানো, তোমাদের কাগজে বিজ্ঞাপনের দর সবচেয়ে বেশি।"

কর্নেল আবার তেমনি চোখ বুজে আপন মনে এইসব কথা বলছিলেন। ততক্ষণে বিজ্ঞাপনটা দেখা হয়ে গেছে আমার। কর্নেল লাল ডটপেনে ডাবল্-কলম বিজ্ঞাপনটার চারদিকে রেখা টেনে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু বিজ্ঞাপনটা পড়ে আমার একটুও খটকা লাগল না। এ ধরনের বিজ্ঞাপন প্রায়ই কাগজে থাকে।

বয়স্ক অভিনেতা চাই

জয় মা কালী পিকচার্সের নির্মীয়মান বাংলা কাহিনীচিত্রে নায়িকার পিতার ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য একজন বয়স্ক অভিনেতা চাই। ফটোসহ পূর্ব অভিজ্ঞতার উল্লেখ করে লিখুন।

বক্স নং ৮৮৭৩

সিগারেট ধরিয়ে হাসতে হাসতে বললুম, "রহস্যের পেছনে সারাজীবন ছোটাছুটি করে আপনাকে রহস্যের ভূতে পেয়েছে। এখন সবকিছুতেই রহস্য দেখছেন।"

কর্নেল সোজা হয়ে বসে হাঁকলেন, "ষষ্ঠী! কফি।" তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "বিজ্ঞাপনটা স্বাভাবিক মনে হবে—মানে, বিজ্ঞাপনের ম্যাটারটার কথা বলছি। কিন্তু কেন একই বিজ্ঞাপন গত দুমাস ধরে প্রায় আটবার? আবার সেই কথাটাই বলছি, জয়ন্ত! দেশে কি প্রবীণ অভিনেতার অভাব আছে?"

"প্রবীণ নয়, বয়স্ক?"

"একই কথা। তা ছাড়া বয়স্ক চরিত্রে অভিনয়ের জন্য যখন এতদিন উপযুক্ত লোক পাওয়া যাচ্ছে না এখনও বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে বলেই কথাটা উঠছে, তখন একজন যুবক অভিনেতাই যথেষ্ট। মেক-আপ করে তাকে বয়স্ক মানুষ সাজানো কত সহজ।"

"হয়তো পরিচালক অত্যন্ত আধুনিকমনা। মেকআপের চেয়ে স্বাভাবিকতার পক্ষপাতী।"

কর্নেল নিভে যাওয়া চুরুটটা অ্যাশট্রেতে রেখে বললেন, ঠিক বলেছে ডার্লিং! স্বাভাবিকতার পক্ষপাতী।" এটাই একটা মূল্যবান পয়েন্ট। কিন্তু কেন এই দুমাসে তেমন কাউকে খুঁজে পাওয়া গেল না?"

"কী মুশকিল!" একটু বিরক্ত হয়ে বললুম। "লোক পছন্দ হচ্ছে না। কিংবা চেহারার পছন্দ হলেও অভিনয়ে কাঁচা। অজস্র কারণ থাকতে পারে।"

ষষ্ঠীচরণ এসে কফির ট্রে রেখে ব্যস্তভাবে বলল, "জোর বৃষ্টি আসছে, বাবামশাই! আপনি বলছিলেন নতুন টবগুলো পলিথিনে ঢেকে দিতে। দেব?"

কর্নেল গম্ভীরমুখে কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন, "হুঁ", দ্যাটস দা পয়েন্ট, ডার্লিং! অজস্র কারণ থাকতে পারে। কিন্তু—বলে জানালার দিকে ঘুরলেন। "ষষ্ঠী! বৃষ্টি! শিগগির ছাদে যা!"

ষষ্ঠী বেজার মুখে বলল, "সেটাই তো আমি বলছিলাম। আপনি কানই করছেন না।"

কর্নেল চোখ কটমট করে তাকালেন। সে চলে গেল। বললুম, "জোর বৃষ্টি মনে হচ্ছে। আপনাদের এই রাস্তাটায় একপশলা বৃষ্টিতেই এককোমর জল জমে যায়। কফিটা শেষ করে কেটে পড়ি।"

কর্নেল আমার কথায় কান করলেন না। কফির পেয়ালা হাতে উঠে জানালায় গিয়ে বৃষ্টি দেখে আমার দিকে ঘুরলেন। বললেন, "অজস্র কারণ, নাকি একটা কারণ? সেই বিশেষ কারণের জন্য এখনও নায়িকার বাবার চরিত্রে লোক পাওয়া যাচ্ছে না।"

ওঁর কথার ওপর বললুম, "আপনি নিজের ফটোসহ চিঠি লিখুন বরং। আমি চলি।"

এই সময় ডোর বেল বাজল। কর্নেল ইজিচেয়ারে বসে বললেন, "ষষ্ঠী ছাদে। জয়ন্ত, কিছু যদি মনে না করো, দেখ তো কে এলেন?"

একটু হেসে চাপা স্বরে বললুম, "নিশ্চয় জয় মা কালী পিকচার্সের পরিচালক।"

কর্নেল গম্ভীর হয়েই বললেন, "কিছু বলা যায় না। ওই শোনো, লিন্ডাদের কুকুর চ্যাচামেচি করছে। তার মানে কেউ এই প্রথম আমার অ্যাপার্টমেন্টে আসছেন।"

pathagar.net

উঠে গিয়ে সংলগ্ন ছোট ওয়েটিংরুমের দরজা খুলে দিলুম। ঝোড়ো কাকের মতো এক ভদ্রলোক জড়োসড়ো দাঁড়িয়েছিলেন। বৃষ্টিতে পোশাক একটু ভিজেছে। হাতে ভিজে ছাতি। লম্বাটে গড়নের অমায়িক চেহারা। প্যান্টের পকেট থেকে স্টেথিস্কোপ উঁকি মেরে আছে! অতএব হাতের গাব্দাগোব্দা ব্যাগটা নিঃসন্দেহে ডাক্তারি ব্যাগ এবং ভদ্রলোক একজন ডাক্তার। নমস্কার করে আড়ষ্টভাবে বললেন, "আমি কর্নেলসায়েবের সঙ্গে একটা বিশেষ জরুরি ব্যাপারে দেখা করতে চাই।"

ওঁকে ড্রয়িংরুমে নিয়ে এলুম। উনি কর্নেলকে নমস্কার করে একটা নেমকার্ড দিলেন। তারপর সোফায় ধপাস করে বসলেন। বললেন, "কাগজে আপনার অনেক কীর্তিকলাপ পড়েছি। আমার এক আত্মীয় পুলিশ অফিসার। তিনি বললেন, এ ব্যাপারে পুলিশের কিছু করার নেই। বরং কর্নেলসায়েবের কাছে যান। তাঁর কাছে আপনার ঠিকানা পেয়ে সোজা চলে এলুম।"

কর্নেল কার্ডটায় চোখ বুলিয়ে বললেন, "বলুন।"

"ভবানীপুর এরিয়ায় আমার চেম্বার। খুলে বলাই উচিত, ডিগ্রি থাকলেও ডাক্তারিতে আমি বিশেষ সুবিধা করতে পারিনি। চেম্বারে বসে মাছি তাড়াই।" করুণ হেসে ডাক্তার বললেন, "যাই হোক, মাসখানেক আগে লেকভিউ রোডের এক অসুস্থ ভদ্রলোককে চিকিৎসার জন্য কল পেয়েছিলুম। বনেদী বড়লোক।

রোগীর বয়স প্রায় ৬৫ বছর। অনেক পরীক্ষা করেও কোনও শারীরিক গণ্ডগোল টের পাইনি। মানসিক অসুখ বলেই মনে হয়েছিল। কিন্তু স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, নেহাত টাকার জন্য এমন শাঁসালো রোগীকে হাতছাড়া করতে ইচ্ছে ছিল না! ভাবুন, প্রতিবার কল অ্যাটেন্ড করি আর পাঁচশো করে টাকা পাই। এক সপ্তাহে পাঁচটা কল! তার মানে আড়াই হাজার টাকা! এদিকে রোগীর সেই একই অবস্থা! প্রেসক্রিপসানে টনিক আর ঘুমের ওষুধ লিখে দিই। এভাবেই চলছিল। শেষবার কল অ্যাটেন্ড করতে গিয়ে দেখি, রোগীর অবস্থা সাংঘাতিক খারাপ। শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। দেখেই বুঝলুম, অন্তিমকাল ঘনিয়ে এসেছে। তখন আমার খুব অনুতাপ জাগল। ডাক্তার হিসেবে যে এথিক্স মেনে চলা উচিত ছিল, আমি টাকার লোভে তা মানিনি। আসলে ওই যে বললুম, নিছক মানসিক অসুখ বলেই মনে হয়েছিল। বড়লোকদের বুড়োবয়সে অনেক বাতিক উপসর্গের মতো দেখা যায়। সেটাই ভেবেছিলুম।"

ডাক্তার শ্বাস ফেলে চুপ করলেন। কর্নেল বললেন, "রোগী মারা গেল?"

"হ্যাঁ! আমারই ভুলে—"

"আপনি ডেথ সার্টিফিকেট দিলেন নিশ্চয়?"

"দিলুম। না দিয়ে তো উপায় ছিল না। আমার সামনেই মৃত্যু হলো। তা ছাড়া অতদিন ধরে দেখছি।"

"মৃত্যুর কী কারণ দেখালেন?"

"করোনারি থ্রম্বসিস।"

কর্নেল হাঁকলেন, "ষষ্ঠী! কফি।" তারপর বললেন, "রোগী মারা গেল কোন তারিখে?"

"আজ সতের জুলাই। রোগী মারা গেছে ২৭ জুন।"

"হুঁ, তা এ ব্যাপারে আমার কাছে আসার কারণ কী?"

ডাক্তার নড়ে বসলেন। মুখে উত্তেজনার ছাপ। চাপা স্বরে বললেন, "কিছুদিন আগে সন্ধ্যায় চেম্বারে একা বসে আছি। হঠাৎ এক ভদ্রলোক এলেন। দেখেই ভীষণ চমকে উঠলুম। সেই রোগী! একই চেহারা। আমার ভুল হতেই পারে না। মুখে কেমন ভুতুড়ে হাসি। আমি ভয় পেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলুম। উনি বললেন, কী ডাক্তারবাবু খেলাটা ধরতে পারেননি? আসুন, আমরা একটা রফা করি। আমার অবস্থা তখন শোচনীয়। মাথা খারাপ হয়ে গেছে। চেঁচিয়ে উঠলুম, 'বেরিয়ে যান বলছি। বেরিয়ে যান!' ভদ্রলোক সেইরকম ভুতুড়ে হেসে বেরিয়ে গেলেন।"

ডাক্তার পকেট থেকে ইনল্যান্ড লেটার বের করে বললেন, "এই চিঠিটা গত পরশু ডাকে এসেছে। পড়ে দেখুন।"

কর্নেল চিঠি পড়ে আমার হাতে দিলেন। চিঠিটা এই

"ডাক্তারবাবু,

আমি জানি, আপনার আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। যদি বাড়ি গাড়ি করার মতো

pathagar.net

টাকাকড়ি পান, ছাড়বেন কেন? সেদিন আপনার সঙ্গে রফা করতে গিয়েছিলুম। আপনি ভয় পেয়ে চ্যাঁচামেচি শুরু করলেন। আপনার ভয়ের কোনও কারণ নেই। আপনি আগামী রবিবার ১৭ই জুলাই সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ দেশপ্রিয় পার্কে অবশ্য করে আসুন। আপনাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলব। আমি আপনার হিতৈষী।"

চিঠির তলায় কোনও নাম নেই। চিঠিটা পড়ে কর্নেলকে ফেরত দিলুম! কর্নেল বললেন, "আমিও আপনাকে বলছি, আপনি আজ সন্ধ্যায় দেশপ্রিয় পার্কে ওঁর সঙ্গে দেখা করুন। উনি কী বলছেন শুনুন।"

ডাক্তার করুণ মুখে বললেন, "যদি কোনও বিপদে পড়ি?"

"আমরা দুজনে আপনার কাছাকাছি থাকব। আপনার চিন্তার কারণ নেই।"

যষ্ঠী কফি আনল। বাইরে বৃষ্টিটা কমেছে। কফির পেয়ালা ডাক্তারের হাতে এগিয়ে দিয়ে কর্নেল বললেন, "এবার আমার কিছু প্রশ্নের জবাব দিন।"

ডাক্তার কফিতে চুমুক দিয়ে তেমনি করুণ মুখে বললেন, "একটা কেন, যত খুশি প্রশ্ন করুন। আমার বুদ্ধিসুদ্ধি গুলিয়ে গেছে।"

টেবিলে ওঁর নেমকার্ডটা রাখা ছিল। এতক্ষণে হাতে নিয়ে দেখলুম, ওঁর নাম ডাঃ বি বি পাত্র। ডিগ্রির লেজুড়টি বেশ লম্বা। অথচ পসার করতে পারেননি, এর কারণ বোধহয় ওঁর হাব-ভাব-ব্যক্তিত্ব। ডাক্তারি পেশায় স্মার্ট না হলে চলে না। ডঃ পাত্রের এই জিনিসটার অভাব আছে। সর্বদা কেমন আড়ষ্ট এবং করুণ হাবভাব। ডাক্তারকে দেখে যদি রোগীরই মায়া হয়, তাহলে সমস্যা।

কর্নেল বললেন, "লেকভিউ রোডে সেই বাড়ির নম্বর কত?"

ডাঃ পাত্র বললেন, "১৭/২ নম্বর। গেট আছে। বনেদী পুরনো বাড়ি। চারদিকে উঁচু দেয়াল ঘেরা। দেখলে পোড়ো বাড়ি মনে হয়। জঙ্গল গজিয়ে আছে লনে।"

"রোগীর নাম কী ছিল?

"দেবপ্রসাদ রায়।"

"বাড়িতে লোকজন কেমন দেখেছেন?"

"কয়েকজন লোক দেখেছি। দেবপ্রসাদবাবুর মেয়ে চৈতী পরমাসুন্দরী। আর একজন ভদ্রলোক চৈতীর মামা। পুরো নাম জানি না। ওঁকে গোপালবাবু বলে ডাকতে শুনেছি। গোপালবাবুই গাড়ি করে আমাকে চেম্বার থেকে নিয়ে যেতেন।"

"রোগীকে দেখার সময় কোনও বিশেষ ব্যাপার আপনার চোখে পড়ত?"

ডঃ পাত্র একটু ভেবে বললেন, "ঘরে শুধু চৈতী আর গোপালবাবু থাকতেন। চৈতী তার বাবার পায়ের কাছে। গোপালবাবু মাথার কাছে।... হ্যাঁ, একটা ব্যাপার—"

"বলুন!"

"ঘরে প্রচণ্ড আলো। আমার চোখ ধাঁধিয়ে যেতো! কিন্তু রোগী নাকি উজ্জ্বল আলো ছাড়া থাকতে পারেন না।"

"আর কিছু?"

"হ্যাঁ, আলোর আড়ালে কারা সব ফিসফিস করে কথা বলত। ভাবতুম, আত্মীয়স্বজন।"

"দেবপ্রসাদবাবু মৃত্যুর দিন বিশেষ কিছু চোখে পড়েছিল?"

"নাহ্।"

"আলো?"

ডঃ পাত্র নড়ে বসলেন। বললেন, "সে রাতে আলো অত বেশি ছিল না। শুধু একপাশে মাথার দিকে একটা টেবিলল্যাম্প জ্বলছিল। সম্ভবত অন্তিম অবস্থা দেখেই আলো কমানো ছিল।"

কর্নেল নিভে যাওয়া চুরুট জ্বেলে বলল, "কেসটা করোনারি থ্রম্বসিস বলে মনে হয়েছিল আপনার?"

ডঃ পাত্র একটু ইতস্তত করে বললেন, "নাকেমুখে রক্ত, একটু ফেনা এসব দেখেই...তবে গোপালবাবু বলেছিলেন, থ্রম্বসিস লিখে দিন। আমি তাই লিখেছিলুম ডেথ সার্টিফিকেটে।"

"আর একটা প্রশ্ন। সবগুলো কলই কি রাত্তে অ্যাটেন্ড করেছিলেন?"

"হ্যাঁ। রাত আটটা থেকে নটার মধ্যে।"

"প্রতিবার গোপালবাবু এসে গাড়ি করে আপনাকে নিয়ে যেতেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

pathagar.net

কর্নেল একটু চুপ করে থাকার পর বললেন, "ঠিক আছে। আপনি আজ সন্ধ্যায় ঠিক সময়ে দেশপ্রিয় পার্কে উপস্থিত থাকবেন। ভয়ের কারণ নেই। আমার মনে হচ্ছে, আপনার কোনও ক্ষতি হবে না। তাছাড়া আমরা আড়ালে থেকে লক্ষ্য রাখব।"

ডাঃ বি বি পাত্র চলে যাওয়ার পর কর্নেল মিটিমিটি হেসে বললেন, "কী বুঝলে বলো জয়ন্ত?"

বললুম, "মাথামুণ্ডু কিস্যু বুঝিনি।"

"বরং চলো লেকভিউ রোডে ঘুরে আসি। বৃষ্টি ছেড়ে বেশ রোদ্দুর উঠেছে।"

আমি গাড়ি আনিনি। কর্নেলের লাল টুকটুকে ল্যান্ডরোভারে চেপে লেকভিউ রোডে গিয়ে পৌঁছুলুম। ১৭/২ নম্বরের বাড়িটা ডঃ পাত্রের বর্ণনা অনুযায়ী বনেদী এবং পুরনো। গেটে কোনও দারোয়ান নেই। লনে একসময় সুদৃশ্য ফুলবাগান ছিল বোঝা যায়। এখন জঙ্গল হয়ে আছে। কর্নেল ও আমি গাড়ি থেকে নেমে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ভেতরটা দেখছিলুম। পোর্টিকোর দিক থেকে একজন সাদাসিধে চেহারার লোক এসে জিজ্ঞেস করল, "কাকে চাই স্যার?"

কর্নেল আমায়িক হেসে বললেন, "গোপালবাবু আছেন?"

"উনি তো সকালে বেরিয়ে গেছেন।"

"তোমার নাম কী ভাই?"

লোকটা কর্নেলকে দেখে নিশ্চয় অভিভূত। একটু হেসে বলল, "আজ্ঞে স্যার, আমি গোবিন্দ। এ বাড়িতে থাকি।"

"তোমাদের বুড়োকর্তা দেবপ্রসাদবাবু—"

কথা শেষ করার আগেই গোবিন্দ বলল, "উনি তো মারা গেছেন স্যার। ও মাসে আমাকে নিয়ে নৈনিতাল বেড়াতে গিয়েছিলেন। বাড়ি ফিরেই রাত্তিরে হঠাৎ স্ট্রোক হয়ে মারা গেলেন।"

"দেবপ্রসাদবাবুর মেয়ের নাম চৈতী। তাই না? ওকে একবার ডেকে দাও না! একটু কথা আছে।"

গোবিন্দ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বলল, "বুড়োকর্তার তো কোনও মেয়ে নেই স্যার! উনি একা মানুষ।"

"তাহলে চৈতী নামে সুন্দরী মেয়েটি কে? এ বাড়িতেই গতমাসে ওকে দেখেছি গোপালবাবুর সঙ্গে।"

গোবিন্দ হাসল। "বুঝেছি। গোপালবাবু সিনেমা করেন। ওঁর ছবিতে পার্ট করে যে মেয়েটি, আপনি তার কথাই বলছেন।"

এবার আমার ফ্যালফ্যাল করে তাকানোর পালা। কর্নেল বললেন, "গোপালবাবু দেবপ্রসাদবাবুর কে হন?"

"দূরসম্পর্কের মামাতো ভাই।"

"বুড়োকর্তার সব সম্পত্তি উনিই পেয়েছেন তাই না?"

"আজ্ঞে। গোপালবাবুর নামে উইল করা ছিল।"

"তুমি কিছু পাওনি?"

"আজ্ঞে স্যার, পাইনি বললে মিথ্যা বলা হবে। নগদ ভালই পেয়েছি।"

"দেবপ্রসাদবাবু কবে মারা যান?"

"নৈনিতাল থেকে দুপুরে ফিরলুম ওঁর সঙ্গে। শরীরটা এমনিতেই ভাল ছিল না। সকাল সকাল খেয়ে শুয়ে পড়েছিলেন। ট্রেন জার্নির ধকল। তো হঠাৎ শুনি গোপালবাবু ডাকাডাকি করছেন আমাকে। আমি নিচের তলায় থাকি। ওপরে গিয়ে দেখি কর্তামশাই ধড়ফড় করছেন। গোপালবাবু তখনই ডাক্তার ডাকতে গেলেন। গোপালবাবুর ছবির মেয়েটি আর আমি কর্তামশাইয়ের সেবাযত্ন করলুম। কিন্তু বাঁচানো গেল না। ডাক্তার আসার একটু পরেই মারা গেলেন।

"তোমার কর্তামশাই কোনও কথা বলেননি তোমাকে? কী হয়েছে বা হঠাৎ কেন—"

গোবিন্দ বলল, "মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছিল না। গোঁ-গোঁ করছিলেন। মুখে ফেনা বেরুচ্ছিল।"

কর্নেল বললেন, "আচ্ছা, চলি গোবিন্দ। পরে আসব'খন। গোপালবাবুর সঙ্গে দরকার ছিল।"

"টালিগঞ্জে মায়াপুরী স্টুডিওতে ওঁকে এখন পেতে পারেন।"

কর্নেল ডাকলেন, "এস জয়ন্ত।"

গাড়ি লেকভিউ রোড ধরে এগোচ্ছিল টালিগঞ্জের দিকে। আমি চুপচাপ বসে আছি। কর্নেল বললেন, "এবার আশা করি কিছু বুঝতে পেরেছ জয়ন্ত।"

বললুম, "পারছি, আবার পারছি না। সেই বিজ্ঞাপনটা—"

"হ্যাঁ ডার্লিং, সেই বিজ্ঞাপনটাই এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত।"

"কিন্তু ঘটনাটা কী?"

নৈনিতালে বেশ কিছুদিন কাটিয়ে এসে হঠাৎ দেবপ্রসাদবাবুর মৃত্যু এবং তাঁর মামাতোভাই ফিল্মমেকার গোপালবাবুর সম্পত্তি লাভ। ফিল্ম করার জন্য যত টাকার দরকার, এবার পেয়ে গেছেন।"

"আর বলবেন না প্লিজ! মাথা ভোঁ ভোঁ করছে।"

টালিগঞ্জের কাছাকাছি গিয়ে কর্নেল বললেন, "নাঃ। থাক। অকারণ জল এখনই ঘোলা করে লাভ নেই। চলো, তোমাকে পৌঁছে দিই। কিন্তু ঠিক সন্ধ্যা ছটা নাগাদ তুমি আসতে ভুলো না।"

pathagar.net

কথামতো কর্নেল ও আমি সন্ধ্যা সাড়ে ছটা নাগাদ দেশপ্রিয় পার্কে পৌঁছেছিলুম। গাড়ি বাইরে রেখে পার্কের ভেতরে ঢুকে একটা বেঞ্চে দুজনে বসলুম। সময় কাটতে চায় না। পার্কে এখানে ওখানে লোকজন আছে। কিছুক্ষণ পরে কর্নেল চাপা স্বরে বললেন, "ডঃ পাত্র এসে গেছেন। ওই দ্যাখো।"

কিছুটা তফাতে একটা ঝোপের কাছে ডঃ পাত্রকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলুম। উনি এদিক-ওদিকে তাকাচ্ছিলেন। একটু পরে একটা লোক এসে ওঁর সামনে দাঁড়াল। আবছা আলোয় দেখতে পাচ্ছিলুম, লোকটির পরনে প্যান্ট-শার্ট। মাথার চুল শাদা। অথচ কাঠামোটি মজবুত। বয়স্ক লোক বলেই মনে হলো!

ডাঃ পাত্রের সঙ্গে কথা বলতে বলতে সে ছায়ার আড়ালে চলে গেল। কর্নেল আমাকে ইশারা করলেন। দুজনে এগিয়ে গেলুম। কিছুটা এগিয়েছি, হঠাৎ পর-পর তিনবার গুলির শব্দ শোনা গেল। তারপর একটা শোরগোল পড়ে গেল। লোকেরা এদিকে-ওদিকে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। পালানোর হিড়িক পড়ে গেছে। কর্নেল হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে ঝোপের পেছন থেকে যাকে টানতে টানতে নিয়ে এলেন, তিনি ডাঃ পাত্র।

কর্নেল চাপা স্বরে বললেন, "চলে আসুন আমাদের সঙ্গে।"

তিনজনে গিয়ে গাড়িতে উঠলুম। ডাঃ পাত্র দম আটকানো গলায় বললেন, "ও! আর একটু হলেই কি সাংঘাতিক কাণ্ড! এজন্যই আমি আসতে চাইছিলুম না।"

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন, "গোপালবাবু অসম্ভব ধূর্ত লোক। সম্ভাব্য ব্ল্যাকমেলারকে শেষ করে দিলেন। আমার ধারণা ভদ্রলোক ওঁর ফিল্ম ইউনিটেরই লোক। যাই হোক, ডাঃ পাত্র! ঘাবড়ানোর কিছু নেই। আপনাকে দিয়ে আমি ফাঁদ পাততে চাই।"

ডাঃ পাত্র ভয় পাওয়া গলায় বললেন, "ওরে বাবা! আমি আর এসবের মধ্যে নেই।"

কর্নেল একটু হাসলেন। "ভয়ের কিছু নেই। আসলে ওই সম্ভাবনাটা আমি আঁচ করতে পারিনি। তবে ডাঃ পাত্র, আপনি এবং দেবপ্রসাদবাবুর পুরাতন ভৃত্য গোবিন্দ গোপালবাবুর পক্ষে বিপজ্জনক। এখনই গোবিন্দকেও বাড়ি থেকে সরানো দরকার। অবশ্য জানি না, এখন সে জীবিত, না মৃত।"

শিউরে উঠে বললুম, "বলেন কী!"

কর্নেল সারা পথ চুপচাপ গাড়ি চালিয়ে এলেন। ডাঃ পাত্রকে মনে হচ্ছিল ভিজে কাকতাড়ুয়া। তেতলায় কর্নেলের অ্যাপার্টমেন্ট। ড্রয়িংরুমে ঢুকেই কর্নেল ষষ্ঠীকে কড়া কফির হুকুম দিলেন। তারপর টেলিফোনের কাছে গেলেন। ডায়াল করার পর কথাবার্তা শুনে বুঝলুম, লালবাজারে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টে ডেপুটি কমিশনার অরিজিৎ লাহিড়ীর সঙ্গে কথা বলছেন।

ফোন করে কর্নেল ইজিচেয়ারে বসে বললেন, "আপনার প্যাডে একটা চিঠি লিখবেন ডাঃ পাত্র! গোপালবাবুকে লিখবেন।"

ডাঃ পাত্র করুণমুখে বললেন, "প্যাড তো সঙ্গে নেই।"

"কফি খেয়ে চাঙ্গা হয়ে আপনাকে বাড়িতে পৌঁছে দেব'খন। তবে কী লিখবেন, শুনুন।" কর্নেল একটু ভেবে নিয়ে বললেন, "লিখবেন : প্রিয় গোপালবাবু, আগামীকার সোমবার রাত আটটায় আমার চেম্বারে অবশ্যই দেখা করবেন। জরুরি কথা আছে। আপনি দেখা না করলে সমস্ত ঘটনা পুলিশকে জানাব। দেবপ্রসাদবাবু যখন নৈনিতালে ছিলেন, তখন আপনি ওঁর বাড়িতে একজন লোককে দেবপ্রসাদবাবু সাজিয়ে আমাকে ডেকেছিলেন। সেই লোকটি ভাবত, সে অভিনয় করছে। আপনার বিজ্ঞাপনের গোপন কথা, আমি জানতে পেরেছি।... বিজ্ঞাপন কথাটা আন্ডারলাইন করে দেবেন।"

ডাঃ পাত্র অবাক হয়ে বললেন, "কিসের বিজ্ঞাপন?"

"অবিকল দেবপ্রসাদবাবুর মতো দেখতে এমন একজন বয়স্ক অভিনেতা চাই। বিজ্ঞাপনটা গত দু'মাস ধরে বেরুচ্ছে।" কর্নেল একটু হাসলেন। "জয়ন্তদের কাগজের বিজ্ঞাপন দফতরে খোঁজ করলে নিশ্চয় দেখা যাবে, বিজ্ঞাপনদাতা কে? কাল সেটা জেনে নেব'খন। যাই হোক, ডাঃ পাত্র, আপনি চিঠিটা লিখে আমাকে দেবেন। আমি আজ রাতেই ওটা গোপালবাবুর বাড়ির লেটার বক্সে রেখে আসব।"

এতক্ষণে আমার বুদ্ধির দরজা খুলে গেল। বললুম, "কর্নেল! রহস্য ক্লিয়ার।"

"বলো শুনি।"

ষষ্ঠী কফি রেখে গেল। কফি খেতে খেতে বললুম, "ডাঃ পাত্র বলেছেন মোট পাঁচটা কল অ্যাটেন্ড করেছিলেন। চারটে কলের সময় নকল দেবপ্রসাদবাবু রোগী সেজে ছিলেন এবং ২৭ জুন শেষ কলের সময় সত্যিকার দেবপ্রসাদবাবুকে দেখেছেন। নিশ্চয় তাঁকে বিষ-টিষ খাওয়ানো হয়েছিল। গোপালবাবুর দরকার ছিল একটা ডেথ সার্টিফিকেটের। পাছে কোনওভাবে ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে যায়, তাই ডাঃ পাত্রের সাহায্য নিয়েছিলেন। ডাঃ পাত্র বরাবর দেবপ্রসাদবাবুর চিকিৎসা করেছেন। তাঁর কোনও সন্দেহ হওয়ার কথা নয়। তাছাড়া কোনও ঝামেলা হলে তিনি সাক্ষী দেবেন। অসাধারণ প্ল্যান। শুধু বোঝা যাচ্ছে না, কাজ হয়ে যাওয়ার পরও কেন বিজ্ঞাপন দিচ্ছে লোকটা?"

কর্নেল বললেন, "ঘটনাটা চাপা দেওয়ার জন্য। এখনও বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে, তার মানে এখনও লোক পাওয়া যায়নি। খুব সহজ হিসেব। এতে গোপালচন্দ্র নিরাপদ থাকছে। কিন্তু যেভাবে হোক নকল দেবপ্রসাদ রহস্যটা আঁচ করেছিলেন। দুঃখের বিষয়, তাঁকে খুন করা হলো, তাঁর কাছে আর কিছু জানার উপায় রইল না। অভিনেতা ভদ্রলোক প্রথমে ভেবেছিলেন, শুটিং করা হচ্ছে। পরে সব টের পান।"

pathagar.net

পরদিন দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার কাজে আমাকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাইরে যেতে হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী আসছেন। দুর্গাপুরে। তারই কভারেজ। কলকাতা ফিরতে রাত হয়ে গিয়েছিল। অফিসে খবরটা লিখে-টিখে বাড়ি ফিরলুম, তখন রাত এগারোটা। কর্নেলকে ফোন করলুম।

কর্নেল সাড়া দিয়ে বললেন, "নাটকের শেষ দৃশ্য মিস্ করলে ডার্লিং!"

"কী ব্যাপার বলুন।"

"ব্যাপার খুব সামান্য। গতরাতে অরিজিৎকে বলেছিলুম গোবিন্দকে একটা অজুহাতে অ্যারেস্ট করতে। গোবিন্দ এখন তাই নিরাপদ। গোপালবাবু আমার ফাঁদে পা দিতে গিয়েছিলেন ডাঃ পাত্রের চেম্বারে। পুলিশ আড়ালে তৈরি ছিল। আমিও ছিলুম। গোপালচন্দ্র ঢুকেই পিস্তল বের করেছিল। এক সেকেন্ড দেরি হলে ডাঃ পাত্রের অবস্থা হতো সেই বয়স্ক অভিনেতা নারাণবাবুর মতো।'

"ওঁর পরিচয় পাওয়া গেছে?"

"হ্যাঁ। যাত্রায় অভিনয় করতেন ভদ্রলোক। বিজ্ঞাপন দেখে ফটো পাঠিয়েছিলেন।"

"গোপালবাবু এখন কোথায়?

"পুলিশের হাজতে। গোবিন্দ সাক্ষী, ডাঃ পাত্রও সাক্ষী। কাজেই—"

টেলিফোনের লাইনটা কেটে গেল। ট্রেন জার্নিতে ক্লান্ত। শুয়ে পড়া দরকার।...

হাওয়া সাপ

(কর্নেলের জার্নাল থেকে)

হোটেল দা সি ভিউয়ের দোতলার ব্যালকনি থেকে বাতিঘরটা দেখা যায়। পাখিওড়া পথে দূরত্ব এক কিমি হতে পারে, আমার বাইনোকুলারের হিসেবে। তবে মানুষ পাখি নয়। জঙ্গল বালিয়াড়ি এবং পাথর ডিঙিয়ে সিধে পৌঁছুনো যদিও একটা অ্যাডভেঞ্চার, অন্তত আমি সেই ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত নই।

গভীর এবং ভয়াল একটা খাঁড়ির মাথায় ছোট্ট টিলার ওপর দাঁড়ানো পোড়ো ওই বাতিঘর কাদের কীর্তিস্তম্ভ পর্তুগিজ না মোগলদের, এ নিয়ে পণ্ডিতী তর্ক আছে। কিন্তু এটাই ছিল চন্দনপুর অন-সিতে পর্যটন দফতরের দ্রষ্টব্য তালিকার এক নম্বরে।

মাসদুয়েক আগে শোনা গেছে একটা বিপজ্জনক হাওয়ার কথা, 'স্নেকউইন্ড' -কোনও কোনও রাতে সমুদ্র থেকে উঠে আসে নাকি সাংঘাতিক হাওয়া, যার আনুমানিক গড়ন বিশাল সাপের মতন, এবং এঁকেবেঁকে তীক্ষ্ণ শিস দিতে দিতে ঘুরপাক খেতে খেতে বাতিঘরের ভেতর ঢুকে যায়। সিঁড়ি বেয়ে শীর্ষে উঠে ভাঙা জানালাগুলোর কোনও একটা গলিয়ে সমুদ্রে আছড়ে পড়ে ঝোড়ো প্রশ্বাসের মতো। তারপর ফুরিয়ে যায়, যদিও তার অন্তিম শ্বাসাঘাত ব্রেকারের পর ব্রেকারে কতক্ষণ ধরে সমুদ্রকে আলোড়িত করতে থাকে।

প্রাকৃতিক কোনও রহস্যময় ঘটনা গণ্য করা চলে, যেমন নাকি বার্মুডা ট্রাঙ্গল। কিন্তু নীচের খাঁড়িতে পর পর কয়েকটি থ্যাঁতলানো দলাপাকানো লাস রহস্যটিকে ভিন্নমাত্রা দিয়েছে। এগুলো নাকি সেই ঘাতক হাওয়ারই কীর্তিকলাপ, এবং এর বিস্ময়কর দিকটা হল, কেনই বা অত রাত্রে ওরা বাতিঘরে ঢুকেছিল। নীচের দরজার তালা প্রতিবারই ভাঙা ছিল। পাহারাদার থাকে খানিকটা দূরে তার সরকারি ঘরে। রাত দশটায় তালা এঁটে সে ফিরে যায়। যাওয়ার আগে অবশ্যই বাতিঘরের ভেতরে কেউ থেকে গেল কি না দেখে নেওয়া তার কর্তব্য।

গত ডিসেম্বরে এসে কিন্তু তেমন কোনও রহস্যময় রাতের হাওয়ার গুজব শুনিনি। তবে একটা ঘটনা মনে পড়ছিল। বিকেলে বাতিঘরটার শীর্ষে আমাকে উঠতে দেখে একদল যুবক-যুবতীর চোখে অবিশ্বাস লক্ষ করেছিলাম। তারা আগেই সেখানে উঠেছিল। প্রচণ্ড ঝাপটানি স্বাভাবিক সামুদ্রিক হাওয়ার, যা তাদের স্থির হতে দিচ্ছিল না। আমি যখন বাইনোকুলারে সমুদ্রদর্শন করছি, কানে এল তাদের হাসিতামাশা।

pathagar.net

'মাই গাড্! হি ডানা ইট্রা'!

'ইট্রা ঠু হার্ডা ফার আন ওল্ড মান!'

'ওল্ডা ইসা গোল্ডা। হে! হি লুক্কা পাডার ক্রিসমাসা...'!

দলটি নিঃসন্দেহে দক্ষিণী। বাইনোকুলার নামিয়ে তাদের দিকে ঘুরে আমার ব্যক্তিগত সৌজন্য অনুসারে জ্যাকেটের পকেট থেকে একমুঠো চকোলেট বের করে যেই বলেছি, 'ফ্রম ফাদার ক্রিসমাস টু অল অব য়ু অন দা ইভ অব হ্যাপি ক্রিসমাস', অমনই তারা যেন আমি সাইনাইড ক্যাপসুল দিচ্ছি এমন আতঙ্কে হুড়মুড় করে সিঁড়ি বেয়ে পালিয়ে গেল। কতক্ষণ তাদের পায়ের শব্দ ক্রমশ নিচের দিকে। আমি অপ্রস্তুত!

এবং দুঃখিত।

চন্দনপুরমের আর দলটির দেখা পাইনি। কিন্তু আমার মনে প্রশ্নের কাঁটা খচখচ করে বিঁধছিল। ওরা আমাকে কী ভেবেছিল? শুনেছি টুপি দিয়ে আমার চওড়া টাক ঢাকলে নাকি আমাকে ফাদার ক্রিসমাস দেখায়। এও শুনেছি আমার মুখে নাকি সর্বোত্তম অমায়িকতার রেখাগুলো শোভা পায়। ওরা আমায় অমন ভয় পেয়েছিল কেন? অত উচুঁতে উঠতে পেরেছি বলে কি? তবে উল্লেখযোগ্য ঘটনা, আমার সাদাদাড়ি বিশৃঙ্খলভাবে উড়ছিল, যা দৃষ্টিকটু। এখন মনে হচ্ছে, বাতিঘরটা সম্পর্কে বরাবর কোনও ভৌতিক গুজব চালু ছিল, যা আমি জানতে পারিনি। আসলে কিছু জানতে চাইলে তবেই তো জানা যায়। অজানা কিছু এমনি এমনি কারও জানা হয়ে যায় না। চোখ অনেককিছু দেখাতে পারে, জানাতে পারে না। দেখা আর জানা এক নয়।

সি ভিউ হোটেল চন্দনপুরম-অন-সির শেষ প্রান্তে। পারিপার্শ্বিক নিরিবিলি। এ কারণে এই ছোট হোটেলটাই আমার পছন্দ। কিন্তু পর্যটকরা স্বভাবে হুল্লোড়বাজ। তারা আসে ফুর্তি করতে, সমুদ্র উপলক্ষ্যমাত্র। পেছনকার মসৃণ ও নতুন রাস্তা সমুদ্রের সমান্তরালে দক্ষিণ পশ্চিমে এগিয়ে বাঁক নিয়েছে। বাঁকের মুখে ডাইনে একটা পুরনো বাড়ি পড়ে। বাড়ি বললে অসম্মান করা হয়, প্রাসাদ। রাজপ্রাসাদই ছিল মধ্যযুগে। হাতফেরতা হতে হতে বোম্বের এক কোটিপতি জনেশ্বরজীর (পুরো নাম জানি না) হাতে এসেছিল। তিনি মাঝে মাঝে আসতেন এবং পার্টি দিতেন। মন্ত্রী, নেতা, আমলারা আমন্ত্রিত হতেন। সারারাত আমোদপ্রমোদ খানাপিনা চলত।

গত সপ্তাহে একটা পার্টি চলছিল। সকালে বাতিঘরের নিচের খাঁড়িতে থ্যাঁতলানো একটা লাশ পাওয়া যায়। সেটা জনেশ্বরজীর। বাতিঘরের দরজার তালা ভাঙা ছিল। কাজেই দুয়ে দুয়ে চার। আরও বিভীষিকা, আরও গুজব। প্রবল সরকারি তোলপাড়। কিন্তু রহস্যের কিনারা হয়নি।

জনেশ্বরজীর প্রাসাদ থেকে পায়ে চলা পথ গেছে বাতিঘরের দিকে সিধে পূর্বে। বড় বড় পাথর, জঙ্গল, বালিয়াড়ি পেরিয়ে বাতিঘরের টিলা। কিন্তু চূড়ান্ত

প্রশ্ন, কেন ভদ্রলোক পার্টি থেকে কখন বেরিয়ে বাতিঘরে যান এবং তালা ভেঙে ভেতরে ঢোকেন?

পাহারাদার আসলাম সে রাতে সেই তীক্ষ্ণ শিস শুনতে পেয়েছিল। ফলে পুলিশ তাকেই গ্রেপ্তার করেছে।

সি ভিউয়ে আমার প্রিয় পরিচারক কুণ্ডনাথনের বক্তব্য, নিশির ডাকের মতো সেই ঘাতক হাওয়া মানুষকে ডেকে নিয়ে যায় এবং তালাটা সে ছাড়া আর কে ভাঙবে? উল্টো স্ক্রুর মতো পেঁচালো হাওয়াটা পাক খাইয়ে খাইয়ে জনেশ্বরজীকে ওপরে তোলে। তারপর জানালা গলিয়ে নীচের সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। আসলামের কী দোষ?

এখানকার সমুদ্রে সবখানেই অসংখ্য পাথর দেখেছি। বুনোহাতির পাল যেন সমুদ্রস্নানে নেমেছে। আমি দেখেছি, ব্রেকারগুলো কী মর্মান্তিক ধরনের ছেলেমানুষী করে। পাথরের পর পাথরে দাপাদাপি করতে করতে তীব্র গতিশীল হতে হতে গুঁড়ে গুঁড়ো ফেনিল আত্মবিনাশ! আঁশটে গন্ধটাও বিরক্তিকর। আর মাঝে মাঝে লক্ষকোটি শূন্য ড্রাম গড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো অভ্যন্তরীণ গর্জন। এমন সমুদ্রে স্নান করা দুঃসাহসিকতা।

সব মিলিয়ে চন্দনপুরম উপকূল সৌন্দর্য এবং বিভীষিকার আশ্চর্য সমন্বয়। এখন সেপ্টেম্বরে পর্যটক বিরল। বিকেলে বাতিঘরের দিকে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু ঘন কালো মেঘ দেখে মনে হচ্ছিল তুমুল বৃষ্টি আসন্ন। বরং সামনে বিচের দিকটায় ঘুরে আসা যায়। পর্তুগীজ বা মোগলদের তৈরি পাথরের সারবন্দী গুদামঘর যত জরাজীর্ণ হোক, মাথা বাঁচানোর পক্ষে যথেষ্ট। বিচ জনশূন্য। একটু পরে ঝিরঝিরে বৃষ্টি এলে বিচের মাথায় একটা পাথরের ঘরে ঢুকে পড়লাম। হঠাৎ দেখি, সামান্য দূরে বিচের ওপর প্রকাণ্ডপাথরে বসে এক যুবক আর যুবতী সামুদ্রিক বৃষ্টি সারা শরীর দিয়ে নিচ্ছে। ঈর্ষা হচ্ছিল। যৌবন প্রেমের জন্য কতকিছু করতে পারে। এ তো সামান্য।

দুপুরে ব্যালকনিতে বসে বাইনোকুলারে সম্ভবত এদেরই দেখেছিলাম। আমার এই বাইনোকুলারটি আমার বয়সকে নিয়ে কখনও-সখনও অশালীন রসিকতা করে, পরে মনে হয়েছিল, চুম্বনরত প্রেমিক প্রেমিকাকে কেন প্রয়োজন হয় অন্ধ প্রকৃতির? তা কি নিজের অর্থহীনতাকে অর্থপূর্ণ করে নিতে? সৌন্দর্যকে কিছুক্ষণের জন্য করতলগত করতে? অবশ্য প্রকৃতিতে অশ্লীল বলে কিছু নেই।

রদ্যাঁর ভাস্কর্য! তোমাদের ঠিকানা কোথায়?

সন্ধ্যায় বৃষ্টিটা থেমে গিয়েছিল। ব্যালকনিতে বসে সমুদ্রের শ্বাসপ্রশ্বাসে তৃপ্তির স্বাদ অনুভব করছিলাম। অথবা আমার অনুভূতির ভুল। এ সময় এক পেয়ালা কড়া কফির প্রতীক্ষা ছিল। কিন্তু কুণ্ডনাথন কফি আনতে বড় বেশি দেরি করছে।

দক্ষিণপশ্চিমে বাতিঘরটা অন্ধকারে ডুবে আছে। সেদিকে একটা লাল

স্ফুলিঙ্গ সদ্য নিভে গেল। চোখের ভুল নয়। নিশ্চয় কোনও প্লেন মেঘের ভেতর এইমাত্র ঢুকে গেল।

কিন্তু আবার সেই লাল স্ফুলিঙ্গ। বাইনোকুলার হাতের কাছে বেতের টেবিলে রাখা ছিল। দ্রুত চোখে রাখলাম। কয়েক সেকেন্ড পরে আলোটা আবার নিভে গেল। বাইনোকুলারের হিসেবে টর্চের মুখের সাইজ লাল আলো। কিন্তু আলোটা স্থির ছিল। রশ্মি বিকীরণও করছিল না।

কুণ্ডনাথনের সাড়া পেয়ে বললাম, 'এস। দরজা খোলা আছে।'

সে ব্যালকনিতে এসে টেবিলে ট্রে রাখল। বিনীতভাবে বলল, 'বাতি জ্বেলে দিই স্যার।'

'থাক। অন্ধকার আমার পছন্দ।' কফির পেয়ালা তুলে নিয়ে বললাম, 'আচ্ছা কুণ্ডনাথন, তুমি কি কখনও রাতের দিকে বাতিঘরে লাল আলো জ্বলতে দেখেছ?'

এটা নেহাতই প্রশ্ন। আমার সিদ্ধান্তকে ঝালিয়ে নেওয়ার জন্য। কিন্তু প্রশ্নটা শুনেই কুণ্ডনাথন ভীষণ চমকে উঠল। 'লাল আলো স্যার?'

হ্যাঁ লাল আলো। জ্বলে। আবার নিভে যায়।

সে গম্ভীর মুখে চাপা স্বরে বলল, 'দেখেছি স্যার! জনেশ্বরজীর লার্স যেদিন পাওয়া যায়, তার আগের রাতে এই ঘরে এক আমেরিকান সায়েব মেমসায়েব ছিলেন। ওদের কফি সার্ভ করতে এসে হঠাৎ চোখে পড়ল বাতিঘরের মাথায় যেন লাল আলো জ্বলছে। তার আগেও একবার দেখেছিলাম। তারপর সকালে একজন টুরিস্টের লার্স পাওয়া গেল। কাকেও বলিনি স্যার! কিন্তু আপনি কি আলো দেখেছেন?'

লোকটি বুদ্ধিমান। গত শীতে এসে ওর সঙ্গে ভাব জমিয়েছিলোম। ওর ফ্যামিলি থাকে কয়েক কিমি দূরে একটা গ্রামে। সেখানকার পাহাড়ী জঙ্গলে আমাকে কিছু অর্কিডের খোঁজ দিয়েছিল কুণ্ডনাথন।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে সে ভয় পাওয়া গলায় ফের বলল, 'দেখে থাকলে কাল সকালে আবার একটা লার্স পাওয়া যাবে।'

একটু ঠাট্টার সুরে বললাম, 'আজ রাতে তা হলে ওই সাংঘাতিক শিসও শোনা যাবে। কী বলো কুণ্ডনাথন?'

'যাবে স্যার!' কুণ্ডনাথন জোর দিয়ে বলল, 'শিস দিতে দিতে হাওয়াটা আসবে।'

'তুমি শিসের শব্দ তো শোননি কখনও?

'নাহ্। নিজে শুনিনি। অনেকে শুনেছে। শুনেছে বলেই তো কথাটা রটেছে।' সে তার কাঁধের তোয়ালেতে মুখের ঘাম মুছে বলল, 'আপনি কি সত্যিই আলো দেখেছেন স্যার?'

'দেখেছি।' কফিতে চুমুক দিয়ে একটু হেসে বললাম, 'তবে প্লেনের আলো হতে পারে।

'আমিও তো স্যার প্লেনের আলো ভেবেছিলাম। কিন্তু পরদিন খাঁড়িতে লাস্ন পাওয়া গেল। একবার নয়, দুবার। দুবারই খাঁড়িতে লাস।'

'আগের লাসটা শনাক্ত হয়েছিল জানো?'

'না স্যার। কোনও টুরিস্ট হবে।'

'টুরিস্ট্ হলে নিশ্চয় কোনও হোটেলে এসে ওঠার কথা।'

কুণ্ডনাথন আস্তে বলল, 'পুলিশের ঝামেলার ভয়ে হোটেল মালিকেরা চেপে যায়।

'কিন্তু রেজিস্টার চেক করলে তো—'

আমার কথার ওপর সে বলল, 'রেজিস্টারে চেকআউট দেখালেই হল।'

'কুণ্ডনাথন!' হাসতে হাসতে বললাম, 'সে তোমাদের হোটেলে ওঠেনি তো?'

তার মুখটা হঠাৎ কাতর হয়ে গেল। বছর পঞ্চাশ বয়স বেঁটে মোটাসাটা থলথলে গড়নের এই পরিচারকের তাগড়া কাঁচাপাকা গোঁফ আছে। গোঁফটা কাঁপতে লাগল। কিছু গোপন কথা চেপে থাকতে বাধ্য হয়েছে, অথচ বলার জন্য মনে ছটফটানি আছে, এটা সেই সঙ্কটাপন্ন ভাব।

সাহস দেবার ভঙ্গিতে ফের বললাম, 'উঠেছিল?'

কুণ্ডনাথন বড়বড় চোখে তাকিয়ে থাকল। একটু পরে বলল, 'আমি তাকে যেন দেখেছিলাম।'

'তুমি তার নাম ঠিকানা, চেক-ইনের তারিখ এনে দিলে বকশিস পাবে কুণ্ডনাথন।'

মাথাটা একটু দুলিয়ে সে সেলাম ঠুকে বেরিয়ে গেল। কফিতে চুমুক দিয়ে নিভে যাওয়া চুরুটটা জ্বালিয়ে নিলাম। সামুদ্রিক হাওয়া ব্যালকনিকে ছুঁয়েছুঁয়ে খেলছে। সামনে সোজাসুজি তাকালে সমুদ্র ঝাউবনের আড়ালে পড়ে যায়। একটু বাঁদিকে ভাঙাচোরা পাথুরে একতলা মোগলাই বা পর্তুগিজ ঘরগুলো দাঁড়িয়ে আছে। একখানে অনেকটা ফাঁকা। সেই ফাঁক দিয়ে সমুদ্র দেখা যায়। রাতের বিচে কোনও আলো নেই। আমার ধারণা বা ইচ্ছে হল, সেই প্রেমিক-প্রেমিকা বিচে বসে থাক অন্ধকারে। পরিব্যাপ্ত প্রাকৃতিক স্বাধীনতা সেখানে। আমি তাদের অবাধে খেলতে দিলাম।

আসলে নিজে বৃদ্ধ বলে যৌবনকে অনেক বেশি দাম দিয়ে থাকি।...

এই বে-মরসুমে চন্দনপুরম-অন-সিতে আমার ছুটে আসার পিছনে সুনির্দিষ্ট একটা উদ্দেশ্য ছিল, যেটা এবার বলা দরকার। গতমাসের শেষাশেষি এখানে কেন্দ্রীয় শক্তিমন্ত্রকের উদ্যোগে 'সমুদ্রতরঙ্গ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা'

শীর্ষক একটি সেমিনার হয়। আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সেমিনার। কাজেই ঝাঁকেঝাঁকে তথাকথিত মিডিয়াম্যানদের আবির্ভাব স্বাভাবিকই ছিল। তাদের মধ্যে ফ্রিল্যান্স সাংবাদিকের সংখ্যা কম ছিল না। সেমিনার শেষে সবাই যে-যার ঠিকানায় ফিরে যায়। ফেরেনি শুধু একজন। সুমিত্র গুহরায়। ছাব্বিশ বছর বয়স। রোগা, ফর্সা, উচ্চতা আন্দাজ পাঁচফুট তিন ইঞ্চি। কয়েকটা ইংরেজি বাংলা হিন্দি পত্রিকায় পুলিশের মিসিং স্কোয়াডের পক্ষ থেকে ছবি ছাপানো হয়েছিল। টিভিতেও ছবিটি দেখেছি। কিন্তু এ যাবৎ খোঁজ মেলেনি। চন্দনপুরম পুলিসও হদিস দিতে পারেনি। অথচ এখানে এসে শুনছি, বাতিঘরের খাঁড়িতে পাঁচটা লাসের খবর!

আশ্চর্য ব্যাপার, স্থানীয় পুলিস কিংবা চন্দনপুরম ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (সি ডি এ) এ নিয়ে মাথা ঘামায়নি সেটা বোঝা যায়, সেই খবর কাগজে বেরোয়নি। এখানে পৌঁছুনোর পর কুণ্ডনাথনের মুখে আমি খবরটা পেয়েছি। সি ভিউ হোটেলের ম্যানেজার গোপালকৃষ্ণনের বক্তব্য, খবর চেপে রাখার পিছনে পর্যটন দফতরের হাত আছে। 'পর্যটন অর্থনীতি' ঘা খাবে!

'পর্যটন-অর্থনীতি!' আজকাল শব্দ জুড়ে জুড়ে অদ্ভুত সব টার্ম চালু করা আমলাতন্ত্রের আরামকেদারা বিলাস। নিছক বিলাস বলা ভুল হবে। এর পিছনে অর্থনীতি (!) আছে। কমিশনভোগী দালাল রাজনীতিওয়ালা, কন্ট্রাক্টার আর আমলাতন্ত্রের একটা দুষ্টচক্র অধুনা দেশজুড়ে লুঠ চালাচ্ছে।

তো সুমিত্র গুহরায় ফোটোফিচারিস্ট হিসেবে বেশ নাম করেছিল। কলকাতার সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকায় তার কিছু সচিত্র ফিচার আমি পড়েছিলাম, যেগুলি প্রায় অ্যাডভেঞ্চারারের মানসিকতার লক্ষণ এবং প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে তথ্যসংগ্রহ। এ থেকে সুমিত্র সম্পর্কে আমার একটা স্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠেছিল। তাই সত্যসেবক পত্রিকার সাংবাদিক আমার বিশেষ প্রীতিভাজন জয়ন্ত চৌধুরী তার নিখোঁজ বন্ধু সম্পর্কে আমাকে অনুরোধ করামাত্র রাজি হয়েছিলাম। জয়ন্তকে সঙ্গে নিইনি সতর্কতার দরুন। তাছাড়া তার স্বভাবে হঠকারিতার ঝোঁক আছে।

সকালে এখানে পৌঁছুনোর পর থানা এবং 'সি ডি এ' আপিসে যাব ভেবেছিলাম। কিন্তু পরে মনে হয়েছিল, সেটা হঠকারিতাই হবে। এ ধরনের কেসে তাড়াহুড়ো করা ঠিক নয়। আজকাল বোঝাই যায় না, কোথায় কোন স্বার্থ ওঁত পেতে আছে। এক বৃদ্ধ রিটায়ার্ড কর্নেল নীলাদ্রি সরকার কেনই বা খাঁড়ির লাস বা 'সমুদ্রতরঙ্গ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন'-সংক্রান্ত সেমিনার নিয়ে খোঁজখবর করতে এসেছেন? একটা স্বাভাবিক সন্দেহের উদ্রেক হবে এবং আমার পথ নিরঙ্কুশ হবে না।

সি-ভিউয়ের ম্যানেজার গোপালকৃষ্ণন অবশ্য গতি ডিসেম্বরেই আমাকে বাতিকগ্রস্ত সাব্যস্ত করেছিলেন। এটাই আমার বাড়তি সুবিধা। 'সমুদ্রতরঙ্গ থেকে

বিদ্যুৎ উৎপাদন' ব্যাপারটা নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছি। শুনেছি, বাতিঘরের নিচের খাঁড়িতেই একটা প্রজেক্ট হবে। 'সাইট সিলেকশন' হয়ে গেছে নাকি। গোপালকৃষ্ণন বিষয়টি বোঝেন। খাঁড়িতে একটা কংক্রিটের ঘর তৈরি হবে, যার একদিকে তলার অংশ খোলা থাকবে। সমুদ্রের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে তীব্রবেগে এসে ফাঁক দিয়ে ঢুকে একটা টারবাইনকে ধাক্কা দেবে ক্রমাগত। টারবাইন ঘুরবে। ঘরের মাথায় থাকবে জেনারেটর। গোপালকৃষ্ণনের মতে, কস্টলি প্রডাকশন। মিসইউজা লাট্টা অব মানি অ্যান্ডা লেবার।'

'বাতিঘরে সাংঘাতিক হাওয়ার উপদ্রব সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?'

'হাঃ হাঃ! দ্যাটা স্নেক-উইন্ডা?'

'নিছক গুজব?'

'জানি না। তবে বাতিঘরটা নিয়ে আগের অনেক ভুতুড়ে গল্প শুনেছি। এবারকারটা নতুন। তবে—'

'বলুন!'

'এখানে সমুদ্র খুব আদিম। সভ্যভব্য নয়। শুধু টুরিস্টরা নয়, আমরা সবাই সভ্যভব্য সমুদ্র দেখতে ভালবাসি। সে সমুদ্রে স্নান করা যায়, হুল্লোড় করা যায়। নেড়েচেড়ে দেখা যায়, স্বাদ নেওয়া যায়, এমন সমুদ্রই মানুষের প্রিয়। এখানকার সমুদ্রকে আকর্ষণীয় বলা চলে না কর্নেল সরকার। এখানকার একমাত্র আকর্ষণ ওই বাতিঘর। উঁচুতে উঠে অনেক দূর পর্যন্ত সমুদ্রের চেহারা দেখার সুযোগ দেয় বাতিঘরটা। পূর্ব উপকূলে আর কোথায় আপনি সমুদ্রের অতটা বিশালতা দেখতে পাবেন, চিন্তা করুন!'

'শুনলাম, বাতিঘর সম্প্রতি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।'

'হাঃ হাঃ! জনেশ্বরজীর আত্মার সম্মানে। সেমিনারের জন্য উনি তিন লাখ টাকা দান করেছিলেন। চক্ষুলজ্জা কর্নেল সরকার। প্রজেক্টের কন্ট্র্যাক্ট, জনেশ্বরজীই পেতেন, আমি বাজি রেখে বলতে পারি।'

সম্ভবত গোপালকৃষ্ণন সেই ধরনের লোক, যাঁরা সব ঘটনার যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা দিতে চান। তবে বুঝতে পেরেছি 'স্নেকউইন্ড' অর্থাৎ কিনা ঘাতক সামুদ্রিক সর্পিল হাওয়া সম্পর্কে উনি কোনও ব্যাখ্যা খুঁজে বের করতে পারেননি এখনও। আবার এ-ও বুঝেছি, বাতিঘরটা নিয়ে বরাবর ভুতুড়ে গুজব ছিল...।

রাত নটায় নিচের ডাইনিং হলে ডিনার খেতে গেলাম।

ডাইনিং হলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পাঁচজন ডিনার-প্রত্যাশী বসেছিলেন। এক প্রৌঢ় দম্পতি—সম্ভবত গোয়ানিজ, একজন বেঁটে গাঁট্টাগোট্টা মধ্যবয়সী—সম্ভবত তামিল, একজন রাগী চেহারার যুবক—সম্ভবত বাঙালি এবং একজন শ্বেতাঙ্গ ইউরোপীয়। এরা সবাই বোর্ডার কি না জানি না। কারণ এখানে রুচির কারণে

বাইরের লোকেরাও মহার্ঘ খাদ্য খেতে আসে। লাঞ্চের সময় ডাইনিং হলে আমি একা ছিলাম। কারণ ততক্ষণে লাঞ্চপর্ব শেষ। আমার ফিরতে দেরি হয়েছিল এবং তখন প্রায় আড়াইটে বেজে গিয়েছিল।

কোনার দিকে জানালার পাশের টেবিলে বসলাম। পিছনের দরজায় ঝোলানো পর্দার ফাঁকে রিসেপশন এবং লাউঞ্জের কিছু অংশ দেখা যাচ্ছিল। রিসেপশন কাউন্টারে মোটামুটি সুন্দরী অ্যাংলো যুবতী (ডিসেম্বরে একে দেখিনি) হেসে হেসে কথা বলছিল কারও সঙ্গে। একটু ঘুরে দেখে নিলাম কাউন্টারের টেবিলে বাঁহাত কনুই পর্যন্ত বিছিয়ে ঝুঁকে আছেন ম্যানেজার গোপালকৃষ্ণন। লাউঞ্জে সোফায় বসে পত্রিকা পড়ছেন এক ভদ্রলোক। পরনে টাইসুট। কোনও কোম্পানি এক্সিকিউটিভ না হয়ে যান না।

কুণ্ডনাথন এগিয়ে এল আমাকে দেখে। 'আপনার ডিনার ওপরে পাঠিয়ে দিতাম স্যার!'

আস্তে বললাম, 'এঁরা সবাই কি বোর্ডার?'

'হ্যাঁ স্যার। আজকাল রাতে এতদূরে কেউ ডিনার খেতে আসে না।'

'স্নেকউইন্ডের ভয়ে নাকি?'

কুণ্ডনাথন হাসল না। তাকে উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল। বলল, 'সন্ধ্যার পর রাস্তায় লোক দেখা যায় না।'

এই সময় যে রাগী চেহারার যুবকটিকে বাঙালি ভেবেছিলাম, সে দক্ষিণী ভাষায় কুণ্ডনাথনের উদ্দেশে কিছু বলল। কুণ্ডনাথন তার কাছে চলে গেল। মনে মনে হাসলাম! তা হলে সত্যিই দেখা এবং জানা এক জিনিস নয়। অথচ আমার সম্পর্কে চালু গুজব, আমি নাকি অন্তর্যামীর প্রায় একটি পার্থিব সংস্করণ এবং আমার দৃষ্টি নাকি গামা রশ্মির মতো ইস্পাতের প্রাচীরভেদী!

খাওয়া শেষ করেছি, এমন সময় আমার বুক কাঁপিয়ে বিচে দেখা সেই প্রেমিক-প্রেমিকার আবির্ভাব। দুটো টেবিলের ওধারে ওরা মুখোমুখি বসল। এমন চঞ্চল হাসিখুশি যৌবন এদেশে কদাচিৎ দেখেছি। ওরা বাংলায় কথা বলছিল চাপা স্বরে। এও আমার বিহ্বলতার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু প্রশ্ন হল, ওরা কি স্নেকউইন্ড সম্পর্কে কিছু শোনেনি? সাবলীল সৌন্দর্যের সঙ্গে ঈষৎ কুণ্ঠার পরিশীলিত মিশ্রণ আমাদের প্রাচ্য যৌবনের নাকি সাধারণ লক্ষণ। সেই মিশ্রণ দেখছি না। বেপরোয়া উদ্দামতা চন্দনপুরমের বন্য আদিম সমুদ্রের কাছেই কি ওরা সংগ্রহ করেছে? কিন্তু হনিমুন করতে চন্দনপুরমকে বেছে নিল কেন, যে সমুদ্রে স্নান করা প্রায় অসম্ভব? মেয়েটির সিঁথিতে সিঁদুর আছে কি না কম আলোর জন্য দেখা যাচ্ছিল না। ন্যাপকিনে হাত মুছে চুরুট ধরালাম। কুণ্ডনাথন এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, কফি ঘরে পৌঁছে দেবে, না কি এখানে বসেই খাব।

কুণ্ডনাথন ভাঙাচোরা ইংরেজি বলে। সঠিক শব্দটি খুঁজে না পেলে হিন্দি বসিয়ে দেয়। ওর প্রশ্নের জবাবে ইচ্ছে করেই বাংলায় বললাম, 'ওপরে পাঠিয়ে দিও।'

'স্যার?'

এবার ইংরেজিতে বললাম। কুণ্ডনাথন সরে গেল। কিন্তু আমার তীর লক্ষ্যভেদ করেছিল। ওরা দুজনেই ঘুরে আমার দিকে তাকাল। দৃষ্টিতে ঈষৎ বিস্ময় ছিল। অনেকে আমাকে বিদেশী কিংবা কোনও সময়ে পাদ্রিবাবা বলে ভুল করে। বিদেশি পাদ্রিরা আবার চমৎকার বাংলাও বলেন। কিন্তু ওদের বিস্ময় সে ধরনের নয়। হকচকিয়ে ওঠার মতো।

যুবকটি দৃষ্টি সরিয়ে নিল। কিন্তু তার হাবভাবে আর সেই স্বাভাবিকতা লক্ষ্য করছিলাম না। যুবতীটি মাঝে মাঝে চোখ তুলে আমাকে দেখে নিচ্ছিল। কাজেই সিদ্ধান্ত করলাম, হনিমুন নয়। অর্থাৎ ওরা দম্পতি নয়, খাঁটি প্রেমিক-প্রেমিকা। সিঁদুর এক্ষেত্রে ধর্তব্য নয়। কিন্তু চন্দনপুরম বেছে নিল কেন ওরা?

আমি উঠে দাঁড়াতেই যুবকটি আমার দিকে তাকাল। এই সুযোগটা নিলাম। 'কলকাতা থেকে?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় উঠেছেন?'

'কাছেই।'

একটু হেসে বললাম, 'এক কিলোমিটারের মধ্যে কোনও হোটেল নেই। কাজেই নিশ্চয় কাছাকাছি নয়।'

'সো হোয়াট?'

এই ফুঁসে ওঠা আশা করিনি। দেখা এবং জানায় সত্যিই দুস্তর ফারাক। ছোটখাটো অট্টহাসি হেসে বললাম, 'শুভ মধুচন্দ্রিমা!'

তারপর পিছু না ফিরে লাউঞ্জে গিয়ে ঢুকলাম।

গোপলকৃষ্ণন নেই। সম্ভবত নিজের ঘরে গেছেন। রিসেপশনিস্ট মেয়েটি 'হাই' করল। তার সম্ভাষণে সাড়া দিয়ে সোফায় বসে পত্রিকাপড়া ভদ্রলোকের দিকে তাকালাম। উনি আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। এবার ঘড়ি দেখলেন। কারও প্রতীক্ষা করছেন হয়তো। হাট করে খোলা বড় দরজার বাইরে পোর্টিকোর নিচে একটা গাড়ি দেখা যাচ্ছিল।

কার্পেটমোড়া সিঁড়ি বেয়ে ঘরে ফিরলাম। দরজা খোলাই রইল। ডিনারের পর এক পেয়ালা কফি আমার চাই-ই। ব্যালকনিতে বসে অন্ধকারে বাতিঘরটার দিকে তাকিয়ে চুরুট টানতে থাকলাম। আবার সেই লাল আলো, ঘাতক হাওয়া এবং খাঁড়িতে লাশ পড়ার সম্ভাবনা আমার মগজে ঘুরপাক খাচ্ছিল।

pathagar.net

কিছুক্ষণ পরে কুণ্ডনাথনের সাড়া এল। সে জানে, তাঁর জন্য দরজা খুলে রাখি। কিন্তু লোকটি অতিশয় ভদ্র। ক্রিশ্চান মিশনারি স্কুলে কবছর পড়েছিল। বিলিতি আদবকায়দা জানে।

টেবিলে কফি রেখে সে উর্দির পকেট থেকে ভাঁজ করা একটা কাগজ দিল। আস্তে বলল, 'মেরি রিসেপশনে নতুন এসেছে। তারিখটা আমার মনে ছিল। ২৭ অগাস্ট। সন্ধ্যা ৬টায় চেক-ইন করেছিল। মেরিকে বলামাত্র রেজিস্টার দেখে লিখে দিল। ওকে বলেছি আপনার দরকার আছে।'

কাগজটা খুলে নিরাশ হয়েছিলাম। সুমিত্র গুহরায় নয়। এ কে দাশগুপ্ত এবং ঠিকানা কলকাতারই। বললাম, 'তুমি লাসটা দেখেছিলে?'

'হ্যাঁ স্যার। আমিই দেখে এসে বললাম ম্যানেজার সায়েবকে। উনি বললেন, চেপে যাও। সকাল ছটায় চেক আউট দেখিয়ে দিলেন রেজিস্টারে। সাড়ে ৬টায় একটা বাস ছাড়ে। চন্দনপুরম স্টেশনে নটায় কলকাতার ট্রেন। পাক্কা হিসেব।'

'চেহারা মনে পড়ছে?'

'রোগা মতো।'

'গায়ের রঙ?'

'ফর্সা।'

'সঙ্গে ক্যামেরা ছিল?'

'ছিল। একটা স্যুটকেসও ছিল।'

pathagar.net

উত্তেজনা চাপতে চুপচাপ কফিতে চুমুক দিলাম। সুমিত্র হোটেল দা শার্কে উঠেছিল ২২ অগাস্ট সকাল নটায়। সেখান থেকে চেক আউট করে ২৭ আগস্ট বিকেল তিনটেয় চন্দনপুরম স্টেশনে আপ মাদ্রাজ মেল পৌঁছয় সন্ধ্যা ছটায়। কাজেই পুলিশের তদন্তে কোনও গণ্ডোগোল নেই। বিশেষ করে তার ফেরার টিকিট ছিল ওই ট্রেনেরই। রেলে তদন্ত করে পুলিশ জেনেছে সুমিত্র গুহরায় নির্দিষ্ট বগির নির্দিষ্ট বার্থেই ফিরে গিয়েছিল।

কিন্তু দেখা যাচ্ছে

১। কোনও কারণে সে ওই ট্রেনে কলকাতা যায়নি।

২। তার টিকিটে অন্য কেউ গিয়েছিল। টিকিট কি সে কাউকে বেচে দিয়েছিল? নাকি তার টিকিট চুরি করা হয়েছিল?

৩। সে কোনও কারণে নাম বদলে সি ভিউয়ে উঠেছিল এবং সকালে তার থ্যাতলানো লাস খাঁড়িতে পাওয়া যায়। শনাক্ত করার মতো কোনও জিনিস লাসের সঙ্গে ছিল না। কিন্তু শুধু কুণ্ডনাথন তাকে চিনতে পেরেছিল।

পয়েন্টগুলো মাথার রেখে বললাম, 'তুমি সকালে খাঁড়িতে কেন গিয়েছিলে কুণ্ডনাথন?'

সে ভড়কে গিয়ে বলল, 'অনেকে গিয়েছিল স্যার!'

তার চোখে চোখ রেখে বললাম, 'তুমি কি তাকে রাত্রে হোটেল থেকে বেরোতে দেখেছিলে?'

'ডিনার খেয়েই উনি বেরিয়ে যান।'

'কিছু বলে গিয়েছিল তোমাকে বা অন্য কাউকে?'

'না স্যার! হোটেল তো চব্বিশঘণ্টা খোলা থাকে। আমরা শিফট ডিউটি করি।'

'ওর ক্যামেরা, স্যুটকেস বা অন্য জিনিসপত্র কী হল?'

কুণ্ডনাথন বিব্রতভাবে তাকাল। করজোড়ে বলল, 'আমি সামান্য টাকার চাকরি করি স্যার। কোনও বিপদ হলে আমার পরিবার সমুদ্রে ভেসে যাবে।'

'তোমার কোনও ক্ষতি হয়, এমন কিছু করব না কুণ্ডনাথন! আমাকে আশা করি তুমি ভালো জানো। তুমি বুদ্ধিমান কুণ্ডনাথন! তোমার ভালভাবে বেঁচে থাকার জন্য চাই শুধু খানিকটা সাহস। আর দেখ, আমি একজন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক অফিসার। তুমি আমার ওপর ভরসা রাখতে পারো!'

এবার কুণ্ডনাথন এদিক-ওদিক তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'সব ম্যানেজারসায়েব নিয়ে গিয়েছিলেন। হয়তো নষ্ট করে ফেলেছেন।'

কথাটা বলেই সে চলে গেল। উঠে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলাম। ঘরে শুধু টেবিলবাতিটা জ্বালিয়ে রেখে ব্যালকনিতে এসে বসলাম। ওপরে তিনটে সুইট এবং তিনটে ব্যালকনি। আমারটা পূর্বমুখী, অন্যদুটো দক্ষিণমুখী। তাই দেখা যায় না। তা ছাড়া আমার এই সুইটের পরই সিঁড়ি। অন্য দুটি সুইট সিঁড়ির উল্টো দিকে। একটা করিডর হয়ে পৌঁছুতে হয় সে-দুটিতে।

তাহলে নিখোঁজ সুমিত্র গুহরায়ের খোঁজ পাওয়া গেল। এর পরের ধাপ গোপালকৃষ্ণনের কাছে পৌঁছানো। লোকটা তো আপাতদৃষ্টে অতিশয় ভদ্র। যুক্তিবাদীও বটে। কিন্তু সুমিতের ব্যাপারে নিছক পুলিশের ঝামেলা এড়াতেই ব্যাপারটা চেপে যাওয়া এবং তার জিনিসপত্র গাপ করা সঙ্গত মনে হচ্ছে না। ঝামেলাটা কী আর হত? একজন বোর্ডার বেঘোরে মারা পড়তেই পারে। কোনও হোটেল নিজস্ব এলাকার বাইরে বোর্ডারের কিছু ঘটলে তার জন্য দায়ী হতে পারে না। আইনতই পারে না।

কাজেই গোপালকৃষ্ণনের আচরণ খুবই সন্দেহজনক।

কিন্তু আগবাড়িয়ে তাকে চার্জ করতে গেলে হিতে বিপরীত হতে পারে। একটা ব্যাপার স্পষ্ট। রিসেপশনিস্ট মেরির সঙ্গে কুণ্ডনাথনের বোঝাপড়া আছে। ম্যানেজারের সঙ্গে মেরির হেসে হেসে কথাবার্তা বলা অবশ্য দেখেছি। সেটা চাকরির স্বার্থেই বলা যায়। কুণ্ডনাথনের সঙ্গে মেরির বোঝাপড়া না থাকলে নাম ঠিকানাটা আমি পেতাম না। কিন্তু নাম-ঠিকানার বদলে কুণ্ডনাথনকে সরাসরি জিজ্ঞেস করলেই তো সুমিত্রকে আবিষ্কার করতে পারতাম।

একটু ভুল করে ফেলেছি। মেরির সঙ্গে কুণ্ডনাথনের বোঝাপড়া থাক বা না-ই থাক, মেরিকে আমার তদন্তের সুতোয় জড়িয়ে ফেলেছি। এর কোনও দরকারই ছিল না।

চুরুটটা নিভে গিয়েছিল। লাইটার জ্বেলে ধরিয়ে নিলাম। নাহ্! হয়তো ঠিক করেছি। গোপালকৃষ্ণনের কানে ব্যাপারটা দৈবাৎ গেলে তার প্রতিক্রিয়া বোঝা যাবে। সে নিজে থেকেই আমার সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসতে চাইবে। দেখা যাক।

বাইরে গাড়ির শব্দ শোনা গেল। উঠে গিয়ে পশ্চিমের জানালায় উঁকি দিলাম। পোর্টিকো থেকে সেই গাড়িটা বেরিয়ে যাচ্ছে। গেট পেরিয়েই চন্দনপুরমের দিকে চলে গেল খুবই জোরে।...

ঘুম ভেঙে গেল। দরজায় কেউ টোকা দিচ্ছিল। টেবিলবাতি জ্বেলে ঘড়ি দেখলাম। বারোটা কুড়ি। বললাম 'কে?'

'আমি কুণ্ডনাথন স্যার!'

'কী ব্যাপার কুণ্ডনাথন?'

'এত রাতে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত স্যার। কিন্তু এই ভদ্রমহিলার জন্য আপনার ঘুম ভাঙাতে হল।'

কোথায় কোন ক্রূর স্বার্থ ওঁত পেতে আছে ভেবে আগে রিভলভারটা হাতে নিলাম। তারপর ঘরের আলো জ্বেলে দিলাম। আই হোলে চোখ রেখে দেখি কাঁচুমাচু মুখে কুণ্ডনাথন দাঁড়িয়ে আছে এবং তার পেছনে সেই 'প্রেমিকা'।

তবু ফাঁদের কথা মাথায় রেখেই দরজা খুলে সরে এলাম। আমার হাতে রিভলভার দেখে কুণ্ডনাথন হকচকিয়ে গেল। 'স্যার! এই ভদ্রমহিলা আপনার সাহায্য চান।'

'কী সাহায্য?'

'ভদ্রমহিলা' ঘরে ঢুকে আমার পা ছুঁতে ঝুঁকল। 'আপনি আমার বাবার মতো। আমাকে বাঁচান। আমি ভীষণ বিপদে পড়েছি। সে কান্না ও শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে কথা বলছিল। 'আমাকে লাউঞ্জে বসিয়ে রেখে ও চলে গেল। এখনও ফিরছে না। আমার ভয় করছে। আপনি কলকাতা থেকে এসেছেন! তাই ওকে বললাম আপনার কাছে নিয়ে যেতে।'

'বসো। আগে শান্তভাবে বসো।'

ওকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিলাম। কুণ্ডনাথনকে বললাম, 'ম্যানেজারসায়েব কি বাড়ি চলে গেছেন?'

সে বলল, 'রাত সাড়ে দশটায় গুপ্টাসায়েবের গাড়িতে চলে গেছেন।'

'কে গুপ্টাসায়েব?'

pathagar.net

'মাদ্রাজে থাকেন। জনেশ্বরজীর কারবারের পার্টনার। **মাঝেমাঝে আসেন** এই হোটেলে। ম্যানেজারসায়েবের সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে।'

'গাড়িতে আর কে গেল দেখেছ?'

তাঁকে চিনি না। চুস্ত পাঞ্জাবি পরে এসেছিলেন। উনি এলে ওঁর সঙ্গে গুপ্টাসায়েব আর ম্যানেজারসায়েব বেরিয়ে গেলেন।'

'ঠিক আছে। তুমি এস। দরকার হলে তোমাকে ডাকব।'

পালিয়ে বাঁচার ভঙ্গিতে কুগুনাথন সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল। আমার হাতে রিভলভার দেখার আশা করেনি সে। আমিও অবশ্য একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি। কিন্তু যে-কোনও অবস্থার জন্য তৈরি থাকা ভাল। এ একটা ফাঁদ হতেও পারত।

দরজা বন্ধ করে যুবতীর মুখের দিকে তাকালাম। প্রেমিকার সৌন্দর্য ছত্রখান। আমার চোখ কবির নয় যে বিষাদময়ী প্রতিমার সৌন্দর্য দেখতে পাব! তা ছাড়া ওই মুখে বিষাদ নয়, উদ্বেগ আর আতঙ্ক নখের আঁচড় কেটেছে। বললাম, 'কী নাম তোমার?'

'দীপা।'

'দীপা—কী?'

'দীপা মিত্র।'

'তোমার সঙ্গীর নাম কী?'

pathagar.net

দীপার ঠোঁট কেঁপে উঠল। একটু ইতস্তত করে ভাঙা গলায় বলল, 'অমল...দাশগুপ্ত।'

'এক মিনিট।' বলে টেবিলে রাখা কিটব্যাগের চেন টেনে কুণ্ডনাথনের দেওয়া কাগজটা বের করলাম। ওর সামনে খুলে বললাম, 'দেখ তো, চেনো মনে হয় নাকি?'

দীপা নাম ঠিকানাটা পড়ে দেখেই চমকে উঠল। 'এ তো অমলেরই নাম ঠিকানা!'

'বাই এনি চান্স তুমি সুমিত্র গুহরায় নামে কাকেও চেনো?'

'চিনতাম।' দীপা নড়ে উঠল। শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, 'অমলের বন্ধু ছিল। আমার কয়েকটা ছবি তুলে দিয়েছিল। কাগজে তার ছবি দেখেছিলাম। তার কী হয়েছিল, অমল জানে। এখান থেকে অমলকে সুমিত্র একটা চিঠি লিখেছিল।'

'কী লিখেছিল?'

'আমি পড়িনি। অমল বলছিল, সুমিত্রকে নাকি কারা ফাঁদে ফেলে মার্ডার করেছে।'

'তোমরা এখানে কবে এসেছ?'

'গতকাল সকালে।'

'কোথায় উঠেছ?'

'অমলের এক ম্যাড্রাসি বন্ধুর একটা কটেজ আছে, সেখানে।'

'অমল বলেনি কেন এখানে আসছে?'

'জায়গাটা নাকি দেখার মতো। খুব নির্জন বিচ।' দীপা রুমালে চোখ মুছে আস্তে বলল, 'আমার ভয় হচ্ছে অমল আর বেঁচে নেই। হয়তো সুমিত্রের মতো তাকেও কারা ট্র্যাপ করেছে। কর্নেলসায়েব! আপনি একটা কিছু করুন।'

'আমাকে তুমি চেনো?'

'চিনতাম না। হোটেলের বেয়ারা ভদ্রলোক বলল, আপনার নাম কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারেন।'

'তুমি লাউঞ্জ থেকে থানায় ফোন করলে না কেন?'

'দীপা মুখ নামিয়ে বলল, আমরা লিগ্যালি স্বামী-স্ত্রী নই। পুলিশ যদি—'

'বুঝেছি।' উত্তেজনা এলে চুরুট তা প্রশমিত করে। চুরুট ধরিয়ে বললাম, 'অমল কোথায় যাচ্ছে বলে যায়নি?'

'কিচ্ছু না। বলে গেল, ঘণ্টাখানেক পরেই ফিরবে।'

'কোথায় যাচ্ছে তুমি জানতে ইনসিস্ট করোনি কেন?'

'আমার মাথায় আসেনি। ভাবলাম পত্রিকা পড়ে একঘণ্টা কাটিয়ে দেব।'

'তুমি কী কর?'

'একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে স্টেনো-টাইপিস্ট।'

'বাড়িতে কে-কে আছেন?'

'বাবা বেঁচে নেই। মা আমার কাছে থাকে। দাদা রাঁচিতে থাকে। দীপা আবার ছটফটিয়ে বলল, 'কর্নেলসায়েব! আপনি একটু খোঁজ নিন প্লিজ! আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, ওর কোনও বিপদ হয়েছে।'

'এখানে আসার পর অমলের সঙ্গে কাকেও মিট করতে দেখেছ?'

'নাহ্। এখানে কারও সঙ্গে ওর চেনাজানা আছে বলে মনে হয়নি। ওর ম্যাড্রাসি বন্ধু তো কলকাতায় থাকে। তার কাছে কটেজের চাবি নিয়ে এসেছি আমরা!'

'অমল কী করে?'

'একটা অ্যাড এজেন্সিতে চাকরি করে।'

উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'তুমি নিচে লাউঞ্জে গিয়ে অপেক্ষা করো। আমি যাচ্ছি। একটা কথা। কেউ বাইরে যেতে ডাকলে যাবে না। এমন কি কুণ্ডনাথন ডাকলেও না। দু মিনিটের মধ্যে আমি যাচ্ছি!'

দীপা বেরিয়ে গেলে পোশাক বদলে নিলাম। রেনকোট, টুপি চড়িয়ে এবং অস্ত্রটি বুকের কাছে সহজ আয়ত্তে রেখে বের হলাম। দরজা লক করে

আস্তেসুস্থে নেমে গেলাম। লাউঞ্জে দীপা দাঁড়িয়ে ছিল। রিসেপশনে মেরির বদলে এখন আরুলাপ্পান। কুগুনাথনকে দেখতে পেলাম না। আরুলাপ্পান সম্ভাষণ করে বলল, 'খারাপ কিছু কি ঘটেছে স্যার? পুলিশকে জানিয়ে দিন না।'

স্মার্ট ছোকরা আরুলাপ্পানকে মার্কিন ব্ল্যাক বলে ভুল হতে পারে। গলায় সোনার চেনে ক্রস ঝুলছে। গায়ে লাল গেঞ্জি, পরনে ব্যাগি প্যান্ট, ঝাঁকড়মাকড় কোঁকড়া চুল। ওকে বললাম, 'খারাপ কিছু ঘটার কথা ভাবছ কেন তুমি?'

'মেরি বলছিল এই মহিলার স্বামী নিখোঁজ হয়েছেন।' সে চোখ নাচিয়ে বলল, 'অ্যাণ্ড য়ু নো দা স্নেকউইন্ড স্যার!' আরুলাপ্পানের মুখে সবসময় হাসি মেখে থাকে। কাউন্টারে যেন দাঁড়িয়ে নেই, নাচছে।

দীপাকে বললাম, 'চলো! আগে তোমাকে কটেজে পৌঁছে দিই। তোমাদের কটেজটা একবার দেখা দরকার।'

যেতে যেতে দীপা বলল, 'কটেজে অমল যায়নি। গেলে একা কেন যাবে?'

কোনও কথা বললাম না। নির্জন রাস্তায় দূরে দূরে দাঁড়ানো ল্যাম্পপোস্ট থেকে নিষ্প্রভ আলো ছড়াচ্ছে। দুধারে বসতি নেই। টিলা, বালিয়াড়ি, কেয়াঝোপ আর বড় বড় পাথরের চাঁই ঘেঁষে ঘন উঁচু-নিচু জঙ্গল। সতর্ক দৃষ্টি রেখে হাঁটছিলাম। কিছুক্ষণ পরে রাস্তা বাঁদিকে বেঁকে গেল। সেদিকটায় বসতি। ডানদিকে খোয়া-ঢাকা সংকীর্ণ রাস্তা গেছে সমুদ্রের সমান্তরালে। বাঁকের মুখে দীপা বলল, 'এই দিকে।'

খোয়াঢাকা রাস্তাটা উৎরাই। নিচু টিলার ঢেউখেলানো বিস্তার। কোথাও নগ্ন, কোথাও জঙ্গলে ঢাকা। ছোট-ছোট বাংলোবাড়ি এখানে-ওখানে এলোমেলো দাঁড়িয়ে আছে। একখানে দীপা ডাইনে ঘুরল। সামনে কাঠের বেড়া এবং গেট। গেটের আগড় সরিয়ে টালিঢাকা ছোট্ট বাংলোর সামনে দাঁড়ালাম। সমুদ্রের শব্দ কানে এল এতক্ষণে। বারান্দায় কম পাওয়ারের বাল্ব জ্বলছিল। দীপা দরজার তালা খুলে দিল। দেখলাম ভেতরেও আলো জ্বালানো আছে। দীপা একটা জানালা খুলে বলল, এখান থেকে সমুদ্র দেখা যায়।'

এ অবস্থায় তার মুখে সমুদ্রের সংবাদ অপ্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু আমার তত্ত্ব অনুসারে যৌবনের উপাদানগুলি এরকমই হয়। নিজস্ব ধর্ম মেনে চলে। দীপা বলল, 'এটা বসার ঘর। ওটা বেডরুম! ওদিকে কিচেন আছে। আমরা অবশ্য রান্না করিনি।'

বেডরুমটাও ছোট। ডাবলবেড একটা খাট, দেওয়ালে ঝোলানো ডিমালো আয়না, তার নিচে একটা ছোট্ট টেবিলে কিছু প্রসাধনসামগ্রী। কোনার দিকে একটা ওয়ার্ডরোব।

দীপা ঠোঁট কামড়ে দাঁড়িয়েছিল। বললাম, হাতে সময় কম। তোমরা সঙ্গে নিশ্চয় স্যুটকেস এনেছ?'

'স্যুটকেস আর ওই কিটব্যাগটা।'

'স্যুটকেসের চাবি তোমার কাছে আছে?'

দীপা চোখে প্রশ্ন রেখে বলল, 'আছে।'

ততক্ষণে বিছানার কোনায় পড়ে থাকা কিটব্যাগটা আমি খুলেছি। ময়লা জামাকাপড় ছাড়া কিছু নেই। দুদিকের চেন খুলে শূন্য দেখলাম।

'আপনি কী খুঁজছেন?'

'এবার তোমার হ্যান্ডব্যাগটা দেখতে চাই।'

দীপা কথা না বলে তার কালো হ্যান্ডব্যাগটা দিল। তিনটে একশো টাকার নোট, কয়েকটা দশ, পাঁচ, দুই, এক টাকার নোট এবং খুচরো পয়সা দেখতে পেলাম দুদিকের দুটো খোপে। মেয়েদের হ্যান্ডব্যাগে অনেকগুলো খোপ থাকে কেন, আমার কাছে দুর্ভেদ্য রহস্য। দুটো রেলের টিকিট বেরুল। জার্নির তারিখ আগামীকাল সকালের ট্রেনের। বললাম, 'তোমাদের সকালে কলকাতা ফেরার কথা তা হলে?'

দীপা চোখে প্রশ্ন এবং বিস্ময় রেখে বলল, 'হুঁ। কিন্তু আপনি কী খুঁজছেন?'

'জানি না। স্যুটকেসটা খোলা।'

স্যুটকেসে দুজনেরই জামাকাপড় ঠাসা। যত দ্রুত সম্ভব দেখে নিয়ে ওপরকার চেন টেনে হাত ভরলাম। অমলের অ্যাড এজেন্সির নেমকার্ড বেরুল অনেকগুলো। একটা নিলাম। তারপর একেবারে কোণা থেকে বেরুল একটা ইনল্যান্ড লেটার। দেখেই বুঝলাম, যা খুঁজছিলাম পেয়ে গেছি। সুমিত্রের চিঠি। ২৭ আগস্ট লেখা।

চিঠিটায় চোখ বুলিয়ে পকেটে ভরে বললাম, 'তুমি এখানেই থাকো। আমার ধারণা, এখানে থাকাই তোমার পক্ষে নিরাপদ। কিন্তু সাবধান! আমি কিংবা অমল না ডাকলে দরজা খুলো না। জানলা দিয়ে আগে দেখে নিও। আর কোন হামলা হলে প্রচণ্ড চিৎকার-চেঁচামেচি করবে। আশপাশের কটেজ থেকে লোকেরা বেরিয়ে আসবে। তবে আমার বিশ্বাস, তত কিছু ঘটবে না।'

দীপা শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, 'আমার ভয় করছে। বরং আপনার হোটেলে'—

'না। সাহসী হও।' বলেই আমি বেরিয়ে এলাম।...

জানতাম, যে টিলার ওপর এইসব কটেজ করেছেন বিত্তবান মানুষেরা, তার নিচে বিচ নেই। ওদিকটায় গভীর খাঁড়ি। সমুদ্রের ধাক্কায় টিলার পাথুরে পাঁজর বেরিয়ে পড়েছে। বাঁকের মুখে পৌঁছে দেখলাম, সি-ভিউয়ের দিক থেকে একটা গাড়ি আসছে। একটা কেয়াঝোপের আড়ালে গেলাম। গাড়িটা চলে গেল চন্দনপুরম বসতির দিকে। এই গাড়িটাই হোটেলের পোর্টিকোতে দেখেছিলাম। সম্ভবত গোপালকৃষ্ণনকে হোটেলে ফেরত দিয়ে এল।

তারপর আচমকা ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হল। বিরক্তিকর বৃষ্টি। প্রায় পৌনে এককিমি চলার পর বাঁদিকে বিচে নামার রাস্তা। এখান একে সি-ভিউয়ের আলো

দেখা যাচ্ছিল। সংকীর্ণ পাথরের ইঁটে ঢাকা রাস্তার দুধারে কয়েকটা মাচা, যেখানে শঙ্খমালা, কড়ি, শঙ্খ এইসব সামুদ্রিক নিদর্শন বিক্রি করে স্থানীয় আদিবাসীরা। একটা মাত্র চায়ের দোকান, সিগারেট এবং পানও বিক্রি হয়—সেটার দেয়াল কাঠের, চাল টিনের তৈরি। এটা পুরনো বিচ এবং এর আয়ু নাকি কমে আসছে। বিচের ঢালু গড়ন দেখে সেটা অনুমান করা চলে। সামান্য দূরে সেই মোগল কি পর্তুগিজদের তৈরি পাথরের সারবন্দি পোড়ো ঘর। নতুন বিচ উত্তরে দু কিমি দূরে। চন্দনপুরম বসতি এলাকার কাছাকাছি। কিন্তু সে বিচের দৈর্ঘ্য বড়জোর পাঁচশো মিটার এবং অজস্র পাথরে ধাক্কা খেয়ে ফেনিল সমুদ্রচূর্ণ মানুষজনকে মুহুর্মুহু ভিজিয়ে দেয়। বিব্রত করে।

এর কারণ, নতুন বিচে সামুদ্রিক হাওয়াকে বাধা দেওয়ার মতো কোনও আড়াল নেই, যা আছে পুরনো বিচে। পাথরের ঘরগুলো হাওয়াকে প্রতিহত করে। তাই মরসুমে যা কিছু ভিড়, তা পুরনো বিচেই। কিন্তু আমলাতন্ত্রের ফাইলে পুরনো বিচের মৃত্যুসংবাদ ঘোষিত হয়ে গেছে। অতএব সি ডি এ এখানে টাকা ঢালতে চাননি। বিদ্যুৎ দেওয়া হয়নি। চায়ের দোকানটিতে হ্যাজাগবাতি জ্বলতে দেখেছি। এখন রাত সওয়া একটায় দোকানটা বন্ধ। টর্চের আলো পায়ের কাছে ফেলে দোকানটার গা ঘেঁষে একটু দাঁড়িয়ে রইলাম।

বৃষ্টিটা থেমে গেল। তখন বিচে নেমে গেলাম। হঠাৎ মনে হল, কী বিস্ময়কর আমার আচরণ। বাতিঘরে পাখিওড়া পথে এগিয়ে যাওয়ার অ্যাডভেঞ্চার একটা কঠিন ঝুঁকি এবং সেই ঝুঁকি নিতে কদাচ চাইনি। কিন্তু এখন আমি ঝুঁকি নিচ্ছি।

আমার স্বভাব, ঝুঁকি নিলে আর পিছু হটি না। হটলাম না। পাথরের ঘরগুলো যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে উঁচু বালিয়াড়িতে ঝাউবনে উঠে গেলাম। সি-ভিউ চোখে পড়ল।

এবার সত্যিকার অ্যাডভেঞ্চার শুরু হল। দিনের আলোয় বাইনোকুলারে যেমনটা দেখেছি, তেমনটি নয়। বড়-বড় পাথর, দুর্ভেদ্য শরবন এবং বালিয়াড়ি, দুর্গম জঙ্গলে ঢাকা ছোট-ছোট টিলা। টিলার নিচে গভীর খাঁড়িতে সমুদ্র ভয়ঙ্কর গর্জন করছে।

কিন্তু আর পিছিয়ে আসা অসম্ভব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে, বার্মাফ্রন্টে একবার দলছুট হয়ে এমনি অবস্থায় পড়েছিলাম। কিন্তু তখন আমি তরুণ।

আবার একটা বালিয়াড়ি এল সামনে। কালো পাথর ঢুকে আছে বালির ভেতর। এসে সুবিধেই হল ওপরে ওঠার। আকাশে নক্ষত্র দেখা যাচ্ছে না। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে দক্ষিণ এবং পূর্বে সমুদ্রের শিয়রে। একটু বিশ্রাম নিতে হল। সেইসময় পূর্বে অনেক দূরে সমুদ্রের বুকে আলো জ্বলতে-নিভতে দেখলাম। বাইনোকুলার চোখে রাখতেই একটা জাহাজ দেখা গেল। ঢেউয়ের আড়ালে ঢাকা পড়ছে বারবার। জাহাজটা যে দূরের সমুদ্রে সরে যাচ্ছে, তাতে ভুল নেই।

জাহাজ নিয়ে এখন চিন্তার মানে হয় না। আবার বিদ্যুৎ চমক দিল। এতক্ষণে সামান্য দূরে বাতিঘরটা দেখতে পেলাম। স্বস্তির শ্বাস পড়ল। বালিয়াড়ি থেকে নেমে পাথর আর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে বাতিঘরের টিলার নিচে পৌঁছিলাম।

কিছুক্ষণ গুঁড়ি মেরে বসে চারিদিকটা খুঁটিয়ে দেখছিলাম। ঘন ঘন বিদ্যুৎ ঝলসে ওঠায় পারিপার্শ্বিক স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। কোনও লোক নেই। সন্দেহজনক কোনও শব্দ শুনছি না, শুধু খাঁড়ির নিচের সামুদ্রিক গর্জন ছাড়া।

বাতিঘরের দরজা দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে। কারণ ওদিকেই টিলায় ওঠার রাস্তা। রাস্তা বেয়ে ওঠার সময় হাওয়ার তোলপাড় ছিল। দরজার কয়েকমিটার দূরে পৌঁছে টর্চের আলো ফেললাম। চমকে উঠলাম। দরজা হাট করে খোলা!

সবে পা বাড়িয়েছি, হঠাৎ খাঁড়ির দিক থেকে একটা জোরালো হাওয়া এসে ধাক্কা দিল। টাল সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। মনে হল, হাওয়াটা আমাকে টানছে। উপুড় হয়ে পড়ে হাতের কাছে একটা ঝোপের গোড়া চেপে ধরলাম। টর্চটাসুদ্ধ চেপে ধরেছিলাম। আমার রেনকোট খুলে যাওয়ার উপক্রম। তারপরই শুনলাম বাতিঘরের ভেতর তীক্ষ্ণ শিসের শব্দ! শিঁ...ই...ই...ই...চিঁ...ই...ই...ই...

শব্দটা যেন সত্যি ঘুরে ঘুরে ওপরে উঠে যাচ্ছে! বাতিঘরের লোহার কপাটও ঝনঝন শব্দে কাঁপছে। শিসের শব্দে কানে সুঁচ ঢুকে যাচ্ছিল। টুপিটা উড়ে গেছে কখন। মাথা কাত করে অন্য হাতে কানে আঙুল গুঁজে দিলাম। টর্চসুদ্ধ হাতটা ঝোপের গোঁড়া আঁকড়ে রইল। কারণ ওই হাতটা ছাড়লেই আমাকে হাওয়াটা টেনে নিয়ে গিয়ে বাতিঘরে ঢোকাবে।

কোনও সাংঘাতিক ঘটনা যত দীর্ঘক্ষণ বলে মনে হয়, আসলে ততক্ষণ ধরে ঘটে না। এই ঘটনাটা পাঁচ মিনিট, না তিন মিনিট, নাকি এক মিনিট ধরে ঘটল বলতে পারব না। তারপর সত্যি যেন শ্বাস ছাড়ার মতো শব্দ ভেসে এল সমুদ্রের দিক থেকে। অজস্র বাষ্পীয় রেলইঞ্জিনের একসঙ্গে বাষ্প ছাড়ার মতো আওয়াজ।

তাহলে 'স্নেকউইন্ড' আমার দেখা হয়ে গেল! অদ্ভুত এবং বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা।

এবং হয়তো আমি দৈবাৎ বেঁচে গেলাম। বাতিঘরে ঢুকে যাওয়ার পর ভুতুড়ে হাওয়াটা এসে পড়লে আমাকে নিশ্চয় ঘুরপাক খাইয়ে ওপরে তুলত এবং জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিত।

ঘড়ি দেখলাম। রাত দুটো পঁয়ত্রিশ। টর্চের আলোয় টুপিটা সেই ঝোপের গায়ে আটকানো অবস্থায় খুঁজে পেলাম। এবার উঠে দাঁড়ানো উচিত। চুরুট টানাও খুব দরকার। যা দেখলাম, তা না বুঝে চলে যাওয়া উচিত হবে না।

বাতিঘরের লোহার কপাট ভেতরের দিকে খোলে। টর্চের আলোয় দেখলাম, প্রকাণ্ড একটা তালার মাথার দিকটা কাটা এবং গলে গেছে কিছুটা। অ্যাসিটিলিন

দিয়ে কাটা। অতএব মানুষেরই কাজ। তার মানে 'স্নেকউইন্ড' দরজা ভাঙে না। সম্ভবত বাতিঘরের গায়ের ফোকরগুলো দিয়ে ঢোকে। এখন দরজা খোলা পেয়েছিল।

সাবধানে টর্চের আলো ফেলে ভেতরে ঢুকে গেলাম। ঘোরাল লোহার সিঁড়িতে কাদাবালি আর ঘাসের কুটোয় কি জুতোর ছাপ? আতস কাঁচে ছাপগুলো পরীক্ষা করলাম। কারা ওপরে উঠেছিল কিছুক্ষণ আগে। অনেকগুলো ধাপ ওঠার পর কালো পাথরের দেয়ালে রক্তের ছাপ ছোখে পড়ল। রক্তটা টাটকা।

তাহলে কি কেউ একটু আগে ভেতরে ঢুকেছিল এবং স্নেকউইন্ড ধাক্কা মেরে তাকে রক্তাক্ত করতে করতে ওপরে তুলে ছুঁড়ে ফেলল? আমার যুক্তিবোধ ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছিল। শরীর এবং মেধার পার্থক্য আমাকে বাঁচাল। উঠতে কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু পিছু হটা আমার ধাতে নেই। প্রায় ষাট ফুট উঠতে জায়গায়-জায়গায় তেমনই জুতোর দাগ এবং রক্তের ছোপ দেখতে পেলাম। ওপরতলায় প্রচণ্ড হাওয়ার তোলপাড়। কিছুক্ষণ বসে দম নেওয়ার পর পূর্বের জানলার ফাঁকে চাপচাপ রক্ত দেখে শিউরে উঠলাম। রক্ত সবে জমাট বাঁধতে শুরু করেছে।

তারপর চোখে পড়ল মেঝেয় দেয়ালের নিচের খাঁজে আটকে আছে এক টুকরো ছেঁড়া দড়ি। স্নেকউইন্ডের টানেই সম্ভবত খাঁজে আটকে গেছে। ইঞ্চি পাঁচেক রক্তাক্ত দড়ির একদিকটায় গিঁট আছে।

বৃত্তাকার পাথরের কুণ্ডের মতো একটা জায়গায় পর্তুগিজ বা মোগলরা আগুন জ্বালিয়ে রাখত। সেখানে প্রায় এক মিটার গর্ত। ইন্ধন বোঝাই করার জায়গা। বাঁহাতের দুটো আঙুল চিমটের মতো করে দড়িটা তুলে সেখানে ফেলে দিলাম। কেন এমন করলাম জানি না। অনেক সময় নিজের অজ্ঞাতসারে, সম্ভবত ইনটুইশন এ ধরনের কাজ করায়।

এরপর আপাতত এখানে কিছু করার ছিল না। জুতোর ছোপগুলো আগের মতো এড়িয়ে নিচে নামলাম। তারপর বেরিয়ে গেলাম। ক্লান্তিতে পাথর শরীর টেনে-টেনে মাতালের মতো টলতে-টলতে হাঁটছিলাম।

এবার সোজা রাস্তায় ফিরে যাওয়াই উচিত। জনেশ্বরজীর সেই প্রাসাদপুরিতে আলো জ্বলছে। সেখানের রাস্তা এড়িয়ে গুঁড়ি মেরে ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে কিছুটা চলার পর পিচরাস্তায় উঠলাম। এ রাস্তা গেছে সি-ভিউয়ের সামনে দিয়ে। জনেশ্বরজীর বাড়ি থেকে কিছুদূর অন্তর একটা করে লাইট পোস্ট। সেই হাল্কা আলোয় আমাকে দানব বা পিশাচ দেখানো স্বাভাবিক। সি-ভিউয়ে পৌঁছুলাম রাত তিনটেয়।

দুজন নাইটগার্ডকে ঝিমোতে দেখছিলাম পোর্টিকোর সিঁড়িতে। গেট বন্ধ। প্রচণ্ড ক্লান্তিতে গলার ভেতরটা শুকনো। জিভ ব্লটিং পেপার। গেটের রড ধরে

ঝাঁকুনি দিলাম। নিশুতি রাতের বিরক্তিকর এই শব্দ ওদের একজনকে জাগিয়ে দিল। সে আস্তে-সুস্থে উঠে দাঁড়াল এবং এগিয়ে এল। ঘুমঘুম চোখে সেলাম ঠুকে গেট খুলে দিল।

আরুলাম্থান রিসেপশন কাউন্টারে দুই পা তুলে দিয়ে ঘুমোচ্ছিল। টেবিলে শব্দ করে তাকে জাগালাম। সে কয়েক সেকেন্ড আমার দিকে তাকিয়ে থাকার পর পা নামিয়ে একটু হাসল। 'এনিথিং রং স্যার?'

'নাহ্। এক গ্লাস জল খাওয়াতে পারো?'

'কেন নয়?' বলে সে বেরিয়ে গেল ডাইনিংয়ের দিকে।

কাছাকাছি একটা চেয়ারে বসে পড়লাম। আরুলাম্থান জল এনে দিল। জল খেয়ে ধাতস্থ হলাম। এখন এক পেয়ালা কফির দরকার ছিল। কিন্তু রাত তিনটেয় সেটা আশা না করাই ভাল। আরুলাম্থান আমার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে বললাম, 'ম্যানেজার-সায়েব ফিরেছেন?'

'না। উনি সকালে ফিরবেন বলে গেছেন।'

চুরুট ধরিয়ে চুপচাপ টানতে থাকলাম। কী করা উচিত ভাবছিলাম। থানায় ফোন করে জানাব কি? সুমিত্রের মতোই নির্বোধ অমল ফাঁদে পা দিয়ে বেঘোরে মারা পড়েছে। নাকি সেই ঘাতক হাওয়া—স্নেকউইন্ডের পাল্লায় পড়েছিল।

আরুলাম্থান কাউন্টারে ঢুকে বলল, 'আপনি কি ওদের ওখানে ছিলেন? কী ঘটেছে?'

'কাদের ওখানে?'

'সেই স্বামী-স্ত্রী।' সে হাসল। 'অদ্ভুত লোক। আপনি যাওয়ার ঘণ্টাদেড়েক পরে এলেন।'

চমকে উঠলাম। 'কে?'

'ভদ্রমহিলার স্বামী। আমি বললাম আপনি ওঁর স্ত্রীকে নিয়ে ওঁকে খুঁজতে বেরিয়েছেন। তখন চলে গেলেন ভদ্রলোক।'

'তুমি ঠিক চিনতে পেরেছিলে?'

আরুলাম্থান একটু অবাক হয়ে বলল, 'চেনার প্রশ্ন ওঠে না। ভদ্রলোক এসে জিজ্ঞেস করলেন লাউঞ্জে ওঁর স্ত্রীর অপেক্ষা করার কথা ছিল। কাজেই আমি সব বললাম। তাছাড়া কুণ্ডনাথন আমাদের কথাবার্তা শুনে বেরিয়ে এসেছিল। সে চেনে। কারণ সে ডিনার সার্ভ করেছিল ওঁদের। কিন্তু আপনি তাহলে কোথায় ছিলেন?'

'ভদ্রমহিলাকে তাঁদের কটেজে পৌঁছে দিয়ে বিচে বসে ছিলাম।'

'আপনাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে। প্রায় সওয়া তিনটে বাজে। আমার মনে হয়, এবার আপনার শুতে যাওয়া উচিত।'

pathagar.net

উঠে দাঁড়ালাম। তখনও মনে প্রশ্ন, থানায় ফোন করে বাতিঘরে রক্তের খবর দেব কিনা।

'স্যার!'

'বলো।'

'ব্রান্ডি আছে। দেব কি? আপনাকে সত্যি বড্ড ক্লান্ত দেখাচ্ছে।'

'ধন্যবাদ।' বলে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম। বাতিঘরে রক্ত অমলের নয়, এটা আপাতত আমার স্বস্তির কারণ। কিন্তু অমল কোথায় গিয়েছিল?...

যত রাত জাগি না কেন, ভোরে ঘুম ভাঙবেই। পাঁচটা থেকে ছটার মধ্যে যে কোনও সময়। আজ ছটায় ভেঙেছিল। সুইচ টিপে কুণ্ডনাথনকে ডাকলাম। ব্যালকনিতে গিয়ে দেখি আকাশ নির্মেঘ এবং নীলাভ। বাইনোকুলারে বাতিঘরটা দেখে নিলাম। প্রশ্নটা ধাক্কা দিল কার রক্ত?

কুণ্ডনাথন কফি নিয়ে হাজির হল। বলল, 'আপনি যাওয়ার পর সেই ভদ্রলোক—'

তাকে থামিয়ে বললাম, 'জানি। তো খাঁড়িতে কি লাশ পড়েছে কুণ্ডনাথন?

সে বিব্রতভাবে বলল, 'জানি না স্যার। একটু বেলা হলে জানা যাবে।'

'কীভাবে জানা যাবে? এর আগে কীভাবে জানা গিয়েছিল?'

'জনেশ্বরজীর দারোয়ান বা কোনও কর্মচারী বাতিঘরের দিকে টাট্টিতে যায়। দরজা খোলা দেখলে, তাদের সন্দেহ হয়। আসলাম দরজা খোলে নটা থেকে দশটার মধ্যে।'

'এখন তো আসলাম পুলিসের হাজতে!'

'হ্যাঁ স্যার!'

'ঠিক আছে। তুমি এস। আমি কফি খেয়ে বেরুব।'

কুণ্ডনাথন সেলাম ঠুকে চলে যাচ্ছিল। তাকে ডাকলাম। 'আচ্ছা কুণ্ডনাথন! তুমি বলেছিলে বর্ষার পর এই এলাকায় জগন্নাথ প্রজাপতি দেখা যায়!'

কুণ্ডনাথনের আড়ষ্টতা কেটে গেল। 'অনেক স্যার! অনেক দেখা যায়।'

'তুমি বলেছিলে জগন্নাথ প্রজাপতি ধরা যায় না। আমি কিন্তু ধরব।'

সে একটু হাসল। 'দেবতাকে ধরা যায় না স্যার! ধরলে পাপ হয়।'

'জীবনে একটু-আধটু পাপ করে দেখা ভাল কুণ্ডনাথন!'

'আমি তা ঠিক মনে করি না স্যার!'

'কিন্তু কুণ্ডনাথন, আমরা কি না-জেনেও কোন পাপ করতে পারি না?'

'আমি সামান্য লোক। আমি মনে করি, না-জেনে পাপ করলে ভগবান শাস্তি দেন না!'

'কুণ্ডনাথন! না জেনে আগুনে হাত দিলে কি হাত পোড়ে না!'

সে ভয়ার্ত চোখে তাকাল। তারপর কোনও কথা না বলে বেরিয়ে গেল। বুঝলাম, স্পর্শকাতর জায়গায় খোঁচা দিয়েছি।

কিছুক্ষণ পরে গলায় ক্যামেরা, বাইনোকুলার এবং পিঠে কিট্‌ব্যাগে প্রজাপতিধরা নেটের স্টিক গুঁজে বেরিয়ে গেলাম। লাউঞ্জ ফাঁকা। রিসেপশনে একজন অচেনা মধ্যবয়সী লোক ডিউটিতে এসেছে। সে খাতায় কিছু লেখালিখিতে ব্যস্ত।

বেরিয়ে কটেজের দিকে হাঁটছিলাম। রাস্তায় শর্টস পরা এবং হাতের চেনে বাঁধা অ্যালসেশিয়ান নিয়ে এক বৃদ্ধকে দেখলাম। চন্দনপুরমের দিক থেকে দুটি মেয়ে এবং একটি ছেলে জগিং করে আসছে দক্ষিণী চেহারা। আমার পাশ দিয়ে তিনটি তাজা যৌবন চলে গেল। ঘুরে তাদের কিছুক্ষণ দেখলাম। ওরা কি বাতিঘর পর্যন্ত যাবে?

কটেজ এলাকা এখনও শুনশান স্তব্ধ। ঘাসে গাছপালায় ভিজে কোমল ধূসরতা। এখনও প্রজাপতিদের বেরুনোর সময় হয়নি। রাতে দেখা কটেজটা খুঁজে বের করতে একটু সময় লাগল। কিন্তু কাঠের গেটে তালা। ঘরের দরজায় তালা।

ভোরেই চলে গেছে? এখনও স্টেশনে গেলে হয়তো দেখা পাওয়া যাবে। কিন্তু এভাবে চলে যাওয়া কেন! বড় লজ্জার কারণ আমার পক্ষে। আমাকে ডিটেকটিভ ভেবেছে। ডিটেকটিভ কথাটা আমার বরাবর অসহ্য। একটা গালাগালিই গণ্য করি, কেন না বিচ্ছিরি 'টিকটিকি' টার্মের উৎস ওই কথাটাই।

তবে তুরুপের তাস এখন আমার হাতে। সুমিত্রের সেই চিঠিটা!

শেষপ্রান্তে একটা চওড়া পাথরে দাঁড়িয়ে রইলাম। সূর্যোদয় দেখার জন্য। নিচে খাঁড়ি। পূর্বে সমুদ্রের শিয়রে লালচে মেঘ। মেঘ ক্রমে ঘন হচ্ছিল। সমুদ্র জুড়ে চাপ চাপ রক্ততরঙ্গ। অসহ্য লাগল। ফিরে এলাম।

হোটেলের আগে বাঁদিকে পুরনো বিচের পথ ধরলাম। মাচাগুলো এখনও খালি। চায়ের সেই দোকানটা সবে খুলেছে। একটা বাচ্চা আঁচ দেবার যোগাড় করছে। একজন বুড়ো আদিবাসী বেঞ্চে বসে আছে। দোকানদার ধুনো জ্বেলে ধ্যান করছে।

বিচে সেই দৌড়বাজ ছেলেমেয়েদের দেখতে পেলাম। বালিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। বালি মাখছে। একটি মেয়ে দুঃসাহসে সমুদ্র ধারণ করতে বুক পেতে দাঁড়িয়ে গেল। একটা বড় ব্রেকার ভাঙচুর হয়ে এসে তাকে ফেলে দিল। বাকি দুজন হেসে অস্থির হল। এবার তিনজনেই বুক পেতে দাঁড়াল।

এখন সমুদ্র গলানো সোনার। কালো মেঘগুলো উঠে আসছে সমুদ্র পেরিয়ে। ক্যামেরায় টেলিলেন্স এঁটে তিনটি যৌবনের সমুদ্রকে আহ্বানের ছবি নিলাম। তারপর বিচে নেমে গতরাতের মতো অ্যাডভেঞ্চারে গেলাম।

pathagar.net

এখন অবাক লাগছিল নিজের নৈশ স্পর্ধা স্মরণ করে। কী দুঃসাহস না দেখিয়েছি! পাথর, টিলা, জঙ্গল এবং বালিয়াড়ির দুর্গমতা তো বটেই, সাপের কথা ভাবিইনি! যেখানে-যেখানে আমার জুতোর ছাপ পড়েছিল বালি বা বালিমেশানো মাটিতে, সাবধানে মুছে বা তার ওপর পা ফেলে-ফেলে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। তারপর হঠাৎ মনে হল, এই সতর্কতা অকারণ। শেষ বালিয়াড়ির মাথায় উঠতেই সামনে একটু দূরে বাতিঘরের নিচের খাঁড়ি দেখা গেল। আমার হাত কাঁপছিল। বাইনোকুলারে তন্নতন্ন খুঁজছিলাম কোনও ক্ষতবিক্ষত লাশ।

কোনও লাশ নেই। বাতিঘরের ওপরতলাটা দেখতে বাইনোকুলার তুলেছি, অমনি একটা লোক ধরা পড়ল বাইনোকুলারে। তার একটা পাশ দেখা যাচ্ছিল। তার চোখেও বাইনোকুলার। সে দূরের সমুদ্রে কিছু দেখছে। কোনও টুরিস্ট? ঝটপট ক্যামেরায় টেলিলেন্স পরিয়ে তার ছবি নিলাম।

বালিয়াড়ি থেকে পিছু হটে নেমে একটা বড় পাথরের আড়ালে গুঁড়ি মেরে বসলাম। এখান থেকে সমুদ্র এবং বাতিঘরের শীর্ষ দেখা যায়। কিন্তু সমুদ্রের প্রকাণ্ড ব্রেকারগুলো বাধা। কাজেই বাতিঘরের লোকটাকে দেখতে থাকলাম। একটু পরে সে অদৃশ্য হয়ে গেল। গেল তো গেলই।

সময় কাটতে চায় না। কিছুক্ষণের জন্য রোদ ইচ্ছেমতো সবকিছুকে ছুঁয়ে থাকার পর সমুদ্রের দিকে সরে গেল। তারপর ঘন মেঘের ছায়া এসে পড়ল। বৃষ্টির ভয় করছিলাম। কিন্তু বৃষ্টিটা এল না। সেই লোকটা বেরিয়ে এল বাতিঘরের দরজা দিয়ে। অমনি আবার তার কয়েকটা ছবি তুললাম। সে এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে ওপাশের জঙ্গলে ঢাকা টিলার আড়ালে চলে গেল। কিন্তু তাকে চিনে ফেলেছি। সেই গুপ্টাসায়েব!

আর লুকোচুরি না করে বাতিঘরের নিচের রাস্তায় চলে গেলাম। সেখান থেকে জনেশ্বরজীর বাড়ির গেট পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যায়। গুপ্টাসায়েব জঙ্গল ঘুরে যে পিচরাস্তায় পৌঁছেছিলেন তা বোঝা গেল। পিচরাস্তার বাঁক ঘুরে আস্তে সুস্থে এসে জনেশ্বরজীর বাড়িতে ঢুকে গেলেন।

আমার মাথায় এখনও অন্য চিন্তা। বাতিঘরের পশ্চিমদিকে চলে গেলাম। তারপর বাইনোকুলারে নিচের খাঁড়িতে এতক্ষণে সত্যিই একটা লাশ দেখতে পেলাম। কোনও অনিবার্যতার জন্য প্রস্তুত থাকলে বুদ্ধিসুদ্ধি টাল খায় না। খুঁটিয়ে দেখছিলাম, ফেনিল জলে দুলে দুলে ওঠা এবং পাথরের খাঁজে মাঝেমাঝে আটকে যাওয়া লাশের মাথাটা থেঁৎলে চ্যাপ্টা হয়ে গেছে। পরনে পোশাক বলতে কিছু নেই। প্রকৃতি থেকে যেভাবে মানুষ আসে, সেইভাবেই ফিরে গিয়েছে।

আর এখানে থাকা ঠিক নয়। গুপ্টারও বাইনোকুলার আছে। ঝোপঝাড়ে মিথ্যে প্রজাপতি ধরার ভঙ্গিতে নেট খুলে কিছুক্ষণ ছুটোছুটি করার পর সোজা

পিচরাস্তায় উঠলাম। তারপর মাঝেমাঝে আকাশে বুনোহাঁসের আগাম দু'একটা ঝাঁক খোঁজার চেষ্টা করতে করতে সি-ভিউয়ের দিকে হাঁটতে থাকলাম।

তাহলে কুণ্ডনাথের কথাটা ঠিকই ছিল। বাতিঘরে লাল আলো দেখা গেলেই নিচের খাঁড়িতে লাস পড়া অনিবার্য।...

বেলা নটায় কুণ্ডনাথন আমার ঘরে ব্রেকফাস্ট নিয়ে এল। বিনীতভাবে সে জানতে চাইল, আমি জগন্নাথ প্রজাপতি ধরতে পেরেছি কি না। আমি মাথা নাড়ায় সে একটু হাসল। চেষ্টাকৃত হাসি। গতরাত থেকে তার মুখে উদ্বেগ, অস্বস্তি এবং কাতরতার গাঢ় ছাপ লেগে আছে। সে কি বাতিঘরে আমার লাল আলো দেখার কথায় কুসংস্কারাচ্ছন্ন একজন সাধারণ লোকের প্রতিক্রিয়া?

সে চলে যেতে ঘুরেছে, তাকে ডাকলাম, 'কুণ্ডনাথন!'

সে তাকাল শুধু। আমার কণ্ঠস্বরে সন্দিগ্ধ হয়েছিল। বোবা চাউনি চোখে।

'ম্যানেজারসায়েব ফিরেছেন?'

'না স্যার?'

'কাল রাতে গুপ্টাসায়েবের গাড়ি এদিক থেকে ফিরে যেতে দেখেছিলাম।'

কুণ্ডনাথন একটু পরে বলল, 'গাড়ির শব্দ দু'বার শুনেছি। একবার চন্দনপুরম থেকে এসে হোটেলের সামনে দিয়ে যাওয়ার, আর একবার—কিছুক্ষণ পরে আবার চন্দনপুরের দিকে যাওয়ার। রাতে আমার ঘুম হয়নি। আপনি ফিরলেন, তখনও জেগে ছিলাম।

'তার মানে, গুপ্টাসায়েব, ম্যানেজারসায়েব এবং সেই চুস্ত পাঞ্জাবিপরা ভদ্রলোক প্রথমে চন্দনপুরমে যান। ম্যানেজারসায়েবের গত রাতে বাড়িতে থাকার কথা শুনলাম। আরুলাপ্পান বা মেরিকে বলে গিয়েছিলেন। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, গুপ্টা এবং সেই ভদ্রলোক জনেশ্বরজীর বাড়িতে ফেরেন। তারপর গাড়ি ফের চন্দনপুরমে গিয়েছিল। সম্ভবত সেই ভদ্রলোককে পৌঁছে দিতেই গিয়েছিল। এরপর গাড়িটা ফিরে আসার কথা।'

'নিশ্চয় ফিরেছিল। তখন হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'

'তুমি জানো ওটা গুপ্টাসায়েবের গাড়ি?'

জানি। উনি এলেই ম্যানেজারসায়েবের সঙ্গে দেখা করতে আসেন।

'ম্যানেজারসায়েবের তো গাড়ি আছে দেখেছিলাম।'

'শুনেছি গ্যারেজে দিয়েছেন। কলকব্জা খারাপ হয়েছে।' কুণ্ডনাথন এবার একটু ইতস্তত করে বলল, 'কেন এসব কথা জিজ্ঞেস করছেন স্যার?'

'খাঁড়িতে একটা লাস দেখে এলাম।'

কুণ্ডনাথনের গোঁফ কাঁপতে লাগল। চোখ দুটো বড় হয়ে গেল। ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বলল, 'আমি জানতাম!'

'লাসটা উলঙ্গ। মাথা থ্যাঁৎলানো। তাছাড়া বাতিঘরে প্রচুর রক্ত দেখেছি।'

'সেই সাংঘাতিক হাওয়ার পাল্লায় পড়েছিল কেউ।' সে ব্যস্তভাবে বলল। 'দরজার তালা ভাঙা ছিল?'

'হ্যাঁ।' ব্রেকফাস্টের সঙ্গে আমার কথাও চলছিল। খাওয়াটা আজ দ্রুত সেরে নিচ্ছিলাম। ন্যাপকিনে হাতমুখ মুছে কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বললাম, 'কিন্তু সমস্যা হল কুগুনাথন, তালা মানুষেরই ভাঙা। গ্যাসকাটার দিয়ে কাটা হয়েছে।

সে উত্তেজিতভাবে শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, 'স্নেকউইন্ডের তাপে তালা গলে যায় স্যার! পাঁচবারই দেখেছি তালা গলে গেছে। সবাই জানে।'

'পুলিশ কী বলে শুনেছ?'

'জানি না। আমি সামান্য লোক স্যার! তবে আসলামকে গ্রেপ্তার করার পর সবাই বলছে, আসলামই একাজটা করে। কিন্তু কেন সে তা করবে? এবার দেখুন, প্রমাণ হয়ে গেল। আসলাম থানার হাজতে থাকা সত্ত্বেও তালা গলে দরজা খুলে গেছে। বলুন স্যার! আসলাম কেন দোষী হবে?'

'কুগুনাথন! বাতিঘরের খাঁড়িতে আমার লাস দেখার কথা চেপে যাও।'

'কিন্তু স্যার—'

'না। খবর পুলিসের কাছে বরাবর যে-ভাবে যায়, সেইভাবেই যেতে দাও।'

'ঠিক আছে স্যার!'

পকেট থেকে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট বের করে ওকে দিলাম 'তোমার এবং মেরির বখশিস।'

সে টাকা নিয়ে সেলাম ঠুকে চলে গেল। চুরুট টানতে টানতে চোখ বুজে ভাবছিলাম, এবার আমার কী করা উচিত। সেইসময়ে পেছনের রাস্তায় ক্রমাগত গাড়ির শব্দ কানে এল। উঠে গিয়ে জানলায় উঁকি দিলাম।

পুলিসের জিপ, একটা ভ্যান, একটা অ্যাম্বুল্যান্স আর একটা ক্রেনবসানো লালরঙের ব্রেকভ্যান চলেছে কনভয়ের মতো। পুলিস যেভাবে খবর পায়, সেইভাবেই পেয়েছে তাহলে। নিচে গিয়ে দেখি, হোটেল কর্মচারীরা অনেকে গেটের কাছে, কেউ পোর্টিকোতে উত্তেজিতভাবে জটলা করছে। কুগুনাথনকে দেখতে পেলাম না। ধরেই নিলাম, সে বাতিঘরের খাঁড়ির দিকে ছুটে গেছে।

আস্তেসুস্থে হাঁটছিলাম পিচের রাস্তায়। একবার পিছু ফিরে দেখে নিলাম সাইকেল রিকশ, মোটরবাইক এইসব যানবাহনের ঝাঁক আসছে চন্দনপুরমের দিক থেকে। পায়ে হেঁটেও লোকেরা আসছে। স্নেকউইন্ডের ভয়ঙ্কর কীর্তি দেখতে এই উত্তেজিত অভিযান অনিবার্য ছিল। খবর হাওয়ায় রটে গেছে, নাকি ক্রেনটা দেখেই?

জনেশ্বরজীর প্রাসাদের গেটে চাকর-নোকর ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। সেই গাড়িটা লনে একটা গাছের তলায় নির্জীব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পিচ রাস্তা বেঁকে গেছে পশ্চিমে। রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলাম। সেই রাস্তায় দশকিমি এগুলে মাদ্রাজগামী হাইওয়ে পড়ে।

pathagar.net

আন্দাজ পঞ্চাশ মিটার যাওয়ার পর বাঁদিকে জঙ্গলের ভেতর একফালি পায়ে চলা পথ চোখে পড়ল। এই পথেই তখন গুপ্টাসায়েব বাতিঘর থেকে ফিরেছিলেন সম্ভবত।

পথটার ওপর কাঁটালতাগুল্ম ঝুঁকে আছে। প্রজাপতিধরা নেটস্টিক দিয়ে কাঁটা সরিয়ে-সরিয়ে হাঁটছিলাম। তারপর একটুকরো খোলা বালিয়াড়িতে পৌঁছলাম। বালিয়াড়িতে শরবন আর কেয়াঝোপ অজস্র। অনেক পাথরও গেঁথে আছে। হঠাৎ একটা কেয়াঝোপের তলায় কালোবালির এলোমেলো বিন্যাস দেখে থমকে দাঁড়ালাম। এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে সেখানে গেলাম। হাঁটু মুড়ে বসে দেখি, এখানে কিছু পোড়ানো হয়েছিল এবং ছাইগুলো বালিতে ইচ্ছে করেই মেশানো হয়েছে। হাতড়াতে গিয়ে চমকে উঠলাম। কোনও সিন্থেটিক জিনিসই পোড়ানো হয়েছে। আতস কাঁচে পরীক্ষা করে নিশ্চিত হওয়া গেল, জিনিসটা ফোটোফিল্ম।

তলায় হাত ভরে ওলটপালট বালির সঙ্গে যে আধপোড়া কুঁচি বেরুলো সেগুলো অবশ্যই ফটোগ্রাফের।

এ অবস্থায় সুমিত্রের ক্যামেরাটা কোথায় যেতে পারে অনুমান করা কঠিন নয়। দামি জাপানি ক্যামেরা খাঁড়ির জলে ফেলার মানে হয় না। গোপালকৃষ্ণন অনায়াসে ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু সুমিত্রের তোলা কিছু ছবির নেগেটিভ এবং প্রিন্ট যে এখানে পোড়ানো হয়েছে, এত আমি নিশ্চিত।

কেয়াঁঝোপের তলায় দুষ্কর্মটা করা হয়েছে। তাই তা কাল রাতে বৃষ্টির আগে না পরে, বোঝা গেল না। লক্ষ্য করলাম, চারপাশে বালির অবস্থা কেমন যেন অস্বাভাবিক। পায়ের দাগ মুছে ফেলার চেষ্টা স্পষ্ট। তবে সেটা সম্ভবত ভোরের দিকে আলো ফোটার পর করা হয়েছে।

আমার নিজের পায়ের ছাপ নষ্ট করার অর্থ হয় না। ঝোপটা গলিয়ে গেলাম, কেন গেলাম জানি না—অনেক সময় দেখেছি ইনটুইশন আমাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়। কেয়াপাতার কিনারার কাঁটা থেকে বাঁচতে গিয়ে টুপ টুপ করে লাল কয়েকটা ফোঁটা পড়ল। বালি তক্ষুনি সেগুলো শুষে নিল।

ওপাশে ঝলমলে রোদ পড়েছে। কারও রক্ত ছিটকে এসে পড়েছিল কেয়াঝোপটায়। রাতের বৃষ্টিতে ধুয়ে গেছে। সামনের বালি এবং ঘাসে ঢাকা বালিমেশানো মাটির দানাগুলো বাইনোকুলারের কাঁচে সেঁটে পাথরের চাঁইয়ের মতো দেখাচ্ছিল। ঘাসের পাতাও অস্বাভাবিক চওড়া। তলার রক্তের খয়েরি ধারা ছড়িয়ে আছে। তবে বালিটা এলোমেলো করে দেওয়া হয়েছে।

হত্যাকাণ্ডটা তাহলে এখানেই হয়েছিল। তারপর বাতিঘরের দরজার তালা গলিয়ে খুলে লাশটা তুলে নিয়ে গিয়ে ওপরতলার জানালা দিয়ে ঠেলে ফেলা হয়েছিল। তাই জানালায় অত বেশি রক্ত দেখেছি।

কিন্তু এসব কাজ মাত্র একজনের সাধ্যের বাইরে। একাধিক লোক ছিল।

তবে এবার আমি বুঝে গেছি লাসটা কার। কাজেই কোনও গাছের ছায়ায় নিশ্চিন্তে বসে চুরুট টানা যেতে পারে।

হোটেলের গেটে পৌঁছে পুলিসের দর্শন পেলাম। পুলিসের গাড়ি ছাড়াও কয়েকটা প্রাইভেট গাড়ি রাস্তায় এবং পোর্টিকোর তলা পর্যন্ত প্রলম্বিত। বোঝা যাচ্ছিল হোটেলের মালিকরা এবং স্থানীয় হোমরা-চোমরা লোকেরাও এসেছেন। আরুলাপ্পান পোর্টিকো থেকে বেরুল। ভাঙা গলায় বলল, 'দা ব্লাডি স্নেকউইন্ড।'

'ম্যানেজার গোপালকৃষ্ণনকে মেরেছে?'

আরুলাপ্পান বুকে ক্রস এঁকে আস্তে বলল, 'পুলিস ঝামেলা করছে। বোর্ডারদেরও জেরা করছে। আমি বুঝতে পারছি না কেন লোকটা রাত্রে বাতিঘরে গিয়েছিল। পুলিসের এই পয়েন্টটা ঠিক।'

পোর্টিকোয় আমাকে দেখে এক পুলিস অফিসার বললেন, 'আপনি বোর্ডার?'

'হ্যাঁ।'

'লাউঞ্জের একপাশে গিয়ে অপেক্ষা করুন। আপনাকে প্রশ্ন করা হবে।'

লাউঞ্জে সম্ভ্রান্ত চেহারার কয়েকজন ভদ্রলোক বসে আছেন। গুপ্টাসায়েবকেও দেখতে পেলাম। দুজন অফিসার জেরা করছেন মেরিকে। কুণ্ডনাথন কাতরমুখে ডাইনিং হলের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।

রিসেপশনের কাছাকাছি একটা চেয়ারে বসলাম। মেরিকে জেরা শেষ করে একজন অফিসার আমার দিকে তাকালেন। নিভে যাওয়া চুরুট জ্বেলে নিলাম। কানে এল, 'আপনি এখানে আসুন। শুনতে পাচ্ছেন?'

কথার ভঙ্গিতে পুলিসের চিরাচরিত অশালীনতা। কিন্তু পুলিসকেই আমার এবার বেশি দরকার। কাছে গিয়ে সামনাসামনি একটা খালি আসনে বসে পড়লাম।

'আপনি বোর্ডার?' বলে অফিসার হোটেল রেজিস্টারের পাতায় চোখ রাখলেন। 'কর্নেল নীলাদ্রি সরকার নাম? কলকাতা থেকে? বেড়াতে এসেছেন? বয়স সত্তর? আপনি তো রিটায়ার্ড সামরিক অফিসার?'

পকেট থেকে নেমকার্ডটা বের করে দিলাম।

কার্ডটা দেখে অফিসার জিজ্ঞেস করলেন, 'নেচারিস্ট্ কী?'

একটু হেসে বললাম, 'প্রকৃতির মধ্যে রহস্য খুঁজে বেড়াই। বিরল প্রজাতির পাখি আর প্রজাপতির পিছনে ছুটোছুটি করি। অর্কিড দেখলে সংগ্রহ করি। ছবি তুলি।'

অফিসারদ্বয় হাসলেন না, যদিও আমার কণ্ঠস্বরে যথেষ্ট রসিকতা ছিল। অপরজন বললেন, 'গত রাতে বারোটা নাগাদ আপনি বেরিয়েছিলেন?'

'একটি মেয়েকে তার কটেজে পৌঁছে দিতে গিয়েছিলাম।'

'জানি। কিন্তু আপনি ফিরেছিলেন রাত তিনটে নাগাদ। এতক্ষণ কোথায় ছিলেন?'

'সি বিচে!'

'অদ্ভুত!'

'আমি একজন অদ্ভুত মানুষ, অফিসার!'

'রসিকতা করবেন না। আপনি যে সত্যি কর্নেল ছিলেন, প্রমাণ দাবি করছি।'

প্রমাণ দিচ্ছি। আগে এই ছবিটা দেখুন, চিনতে পারেন কি না।'

কিটব্যাগ পিঠ থেকে নামিয়ে ছবিটা বের করতে যাচ্ছি, প্রশ্ন এল, 'ওটা কি ছাতা?'

'নাহ্। প্রজাপতিধরা নেট-স্টিক।'

'আপনার সবই অদ্ভুত।'

'ঠিক ধরেছেন। এবার ছবিটা দেখুন।'

ছবিটা দুজনে দেখাদেখি করলেন। তারপর প্রশ্ন এল, 'কার ছবি? কটেজের সেই যুবকটির? তাকে আমরা ধরে ফেলব। কলকাতায় খবর দেওয়া হয়েছে। অবশ্য জানি না কলকাতার পুলিস কতটা সহযোগিতা করবে। তারা তো রাজনীতি সামলাতেই ব্যস্ত থাকে।'

আস্তে বললাম, 'সব ইংরেজি দৈনিক ও নিখোঁজ তালিকায় এই ছবি বেরিয়েছিল।'

'আমরা লক্ষ্য করিনি।'

'২৮শে আগস্ট সকালে এর লাস আপনারা বাতিঘরের খাঁড়িতে পেয়েছিলেন।'

দুজন অফিসারই আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। একটু পরে একজন বললেন, 'মিলিয়ে দেখতে হবে। বিকৃত লাসের ছবি থানায় আছে। কিন্তু আপনি কীভাবে নিশ্চিত হলেন, ব্যাখ্যা চাইছি।'

'ব্যাখ্যা খুব জটিল। আপাতত এটুকু বলতে পারি, যুবকটি একজন ফোটোফিচারিস্ট।'

'আপনার আত্মীয়?'

'বলতে পারেন। সে এখানে এসেছিল সমুদ্রতরঙ্গ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন সংক্রান্ত সেমিনার কভার করতে। তার লাস ওই খাঁড়িতে পাওয়া যায়। আপনারা শনাক্ত করতে পারেননি বা চেষ্টা করা হয়নি। সে এই হোটেলে ২৭শে আগস্ট ছদ্মনামে চেকইন করেছিল। রেজিস্টার দেখুন। এ. কে. দাশগুপ্ত। তার লাসের খবর পেয়েই গোপালকৃষ্ণন ঝামেলার ভয়ে পরদিন ভোরে চেকআউট দেখিয়েছিলেন।'

দুই অফিসার রেজিস্টারের পাতা ওল্টাতে ব্যস্ত হলেন। খুঁটিয়ে দেখার পর বললেন, 'আপনি তা হলে নিছক বেড়াতে আসেননি? কে আপনি?'

'কর্নেল নীলাদ্রি সরকার।'

'আপনি প্রাইভেট ডিটেকটিভ!'

'ছিঃ! কথাটা একটা গালাগাল। আমি গোপালকৃষ্ণনের কাছে কথায়-কথায় সব জেনেছি।'

'আপনি সত্যিই অদ্ভুত লোক। যাই হোক, গোপালকৃষ্ণন মারা পড়েছেন। কাজেই আপনার জানার সত্যমিথ্যা ঠিক করা কঠিন।'

গোপালকৃষ্ণন আমাকে বলেছেন, বাতিঘরের স্নেকউইন্ড কলকাতার ফোটোফিচারিস্টের মৃত্যুর কারণ। জনেশ্বরজীরও মৃত্যুর কারণ। গোপালকৃষ্ণনের মৃত্যুর কারণও তা হলে স্নেকউইন্ড। সেই সাংঘাতিক ঘাতক হাওয়ার কবলে পড়ে ছটা মানুষের প্রাণ গেল। আমি গম্ভীর মুখে বলছিলাম কথাগুলো। চুরুটে শেষ টান দিয়ে কাছাকাছি একটা ছাইদানিতে ফেলে দিলাম। তারপর বললাম, 'কাল রাতে সি বিচে বসে থাকার সময় আমি দূরে কোথাও অদ্ভুত ধরনের শিসের শব্দ শুনেছিলাম। স্নেকউইন্ড নাকি শিস দিতে দিতে সমুদ্র থেকে উঠে এসে বাতিঘরে ঢোকে। শুধু এটাই আমি বুঝতে পারছি না ছ-জন লোক পরপর অতরাত্রে বাতিঘরে কেন গিয়েছিল?

গুঁফো কালো বেঁটে অফিসারটি তীক্ষ্ণদৃষ্টে আমাকে দেখছিলেন। একটু ঝুঁকে এসে বললেন, 'আপনি শিসের শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন?'

'তা-ই তো বললাম।'

'কিছু দেখতে পেয়েছিলেন?'

'তেমন কিছু না। তবে দূরের সমুদ্রের একটা জাহাজের আলো দেখছিলাম। আর—'

'বলুন!'

'সন্ধ্যার পরই আমার ঘরের ব্যালকনি থেকে বাতিঘরের মাথায় লাল আলো দেখেছিলাম। আলোটা দুবার জ্বলে নিভে গিয়েছিল।'

'লাল আলো?' অফিসারটি তাঁর সহযোগীর দিকে তাকালেন।

সহযোগী অফিসার সাদা পোশাকপরা। নিশ্চয় পুলিশের গোয়েন্দা। আস্তে বললেন, 'কুণ্ডনাথনও দেখেছে। কাজেই এটা একটা পয়েন্ট।'

বললাম, 'গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। লাল আলো দেখা গেলে স্নেকউইন্ড আসে এবং খাঁড়িতে লাশ পাওয়া যায়। স্থানীয় লোকের মুখে শুনেছি, হাওয়াটা এত গরম যে বাতিঘরের দরজার তালা গলে যায়—'

'আপনি কী শুনেছেন, সেটা কথা নয়। কী দেখেছেন সেটাই আমাদের জিজ্ঞাস্য।'

'যা যা দেখেছি, বললাম।'

'আপনি কবে কলকাতা ফিরবেন ঠিক করেছেন?'

'কিছু ঠিক করিনি। অন্তত একটা জগন্নাথ প্রজাপতি না ধরা পর্যন্ত ফিরছি না।'

'গুঁফো অফিসার চোখ পাকিয়ে বললেন, রসিকতা পছন্দ করি না। আপনি আমাদের অনুমতি ছাড়া কলকাতা ফিরতে পারবেন না।'

বেশিদিন থাকার মতো টাকাকড়ি আমার নেই। সি-ভিউয়ের খরচ বড্ড বেশি।'

গোয়েন্দা অফিসার একটু হেসে বললেন, 'টাকা ফুরিয়ে গেলে আমাদের জানাবেন।'

'আপনারা টাকা দেবেন নাকি?'

'নাহ্। আপনি আমাদের গেস্ট হয়ে থাকবেন।'

'লকআপে নয় তো?'

'হ্যাঁঃ।' নিজের রসিকতায় গোয়েন্দা অফিসার নিজেই হেসে উঠলেন।

গুঁফো অফিসার বললেন, 'ঠিক আছে। আপনি আসুন। দরকার হলে থানায় ডেকে পাঠাব।'

হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লাম। এবার সত্যিই জগন্নাথ প্রজাপতি ধরার অভিযানে চলেছি। অন্তত বাকি ফিল্মগুলো শেষ করে দুপুরেই প্রিন্ট করে ফেলতে হবে। বাইরে গেলে বাথরুম আমার এই কাজে ডার্করুম হয়ে ওঠে। সঙ্গে ওয়াশ-ডেভালাপ-প্রিন্টের সরঞ্জাম থাকে। বিশেষ করে এবার তো তৈরি হয়েই এসেছিলাম।

জগন্নাথ প্রজাপতি ধরা সত্যিই অসম্ভব। দুটো ডানা মেললে জগন্নাথদেবের মূর্তির আদল ফুটে ওঠে বলেই লোকেরা এই নাম দিয়েছে। বাইনোকুলারে দেখলাম রঙের আঁকিবুকিতে ওইরকম একটা রূপ ধরে নেওয়া যায়। এদের বোধশক্তি এত তীক্ষ্ণ যে তিনমিটার দূর থেকেই টের পায় হামলা আসছে। তবে ছবি নেওয়ার অসুবিধে ছিল না। বিচ দিয়ে ঘুরে আবার একটা অ্যাডভেঞ্চার হয়ে গেল। অনেক সময় নিজেই জানি না কী করছি এবং কেন করছি।

দেখলাম, বাতিঘরের দরজায় আবার তালা আঁটা হয়েছে। পুলিশ 'রুটিন জবে'র পথ ধরে চলে এবং নিঃসাড়, কৌতূহলহীন একটি শ্রেণীতে পরিণত। এ বিষয়ে আমার একটা অনবদ্য অভিজ্ঞতা আছে। বহুবছর আগে গ্রীষ্মের এক দুপুরে কলকাতা রাজভবনের উত্তরফটকের কাছে একটা লোক একজনকে ছুরি মারতে যাচ্ছে এবং আক্রান্ত লোকটি ড্রেনে নেমেছে। কাছাকাছি আর মানুষজন ছিল না সেই মুহূর্তে। শুধু ফটকে এক পুলিশপ্রহরী দাঁড়িয়ে ছিল এবং তার কোমরে চামড়ার খাপে ফায়ার আর্মস। আমার তাড়া খেয়ে আততায়ী পালিয়ে গেল। তখন প্রহরীটিকে বললাম, তার চোখের সামনে একটা মানুষ খুন হতে

pathagar.net

যাচ্ছিল এবং তার কাছে তো ফায়ার আর্মস আছে। সে গম্ভীর মুখে বলল, সে রাজভবনে 'ডিউটি' করছে। কাজেই বাইরে কী ঘটছে, তা নিয়ে তার কিছু করার নেই। বললাম, তবু একজন মানুষ হিসেবে কিছু করার ছিল না কি? অন্তত একটা ধমকই যথেষ্ট ছিল। প্রহরীটি আরও গম্ভীর হয়ে বলল, তাকে যা করতে বলা হয়েছে, তার বাইরে কিছু করার ক্ষমতা তার নেই। তাতে তার ঝামেলা বাড়বে।

কোনও একটি পদ্ধতির প্রতি যান্ত্রিক আনুগত্যই রাষ্ট্রীয় অভিপ্রায়। যাইহোক, আলব্যের কামু-কথিত 'প্রতিষ্ঠানের শক্তিশালী গেরিলা' সম্পর্কে পরে ভাবা যাবে। বাতিঘরের সামনে দিয়ে দক্ষিণের টিবির দিকে এগিয়ে গেলাম। পিছু ফিরে দেখলাম, দরজার কাছাকাছি একটা বেঁটে ঝাঁকড়া গাছের তলায় দাঁড়ানো দুজন বন্দুকধারী পুলিসপ্রহরী আমার দিকে হাত নেড়ে চলে যেতে ইশারা করছে। অতএব আমি চলে গেলাম।

কিছুক্ষণ পরে সমুদ্রের সমান্তরাল বালিয়াড়ির মাথায় উঠে একটা জেলে বসতি চোখে পড়ল। ঢালু বালিমেশানো মাটি ও পাথরের ওপর অজস্র ভেলানৌকো রাখা আছে। বসতির পেছনদিকের মাঠে জাল শুকোতে দেওয়া হয়েছে। মাঠটার ওধারে বহুদূর ছড়ানো লালফুল দাগড়াদাগড়া ফুটে আছে সবুজ ঢেউখেলানো কার্পেটে। বাইনোকুলারে সেই হাইওয়েটি দেখা যাচ্ছিল টিলা পাহাড়ের ফাঁকে।

বলেছি নিজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন ছিলাম না। বসতি থেকে আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে ছুটে এল কয়েকটা কুকুর। তারপর নাকে ঝাপটা দিল শুঁটকি মাছের পচা গন্ধ। কুকুরগুলোর অভ্যর্থনায় সাড়া না দেওয়ায় তারা ক্রমশ অবাক হতে হতে থেমে যাচ্ছিল। এইসময় উলঙ্গ ছোট ছেলেমেয়ের একটা দল 'সায়েব! সায়েব!' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে আমাকে ঘিরে ধরল। অভ্যাস অনুযায়ী তাদের চকোলেট বিলি করলাম এবং ছবি তুললাম। তারা চমৎকার পোজ দিল।

একটা কুঁড়েঘরের পিছনে ছায়ায় দাঁড়িয়ে একজন বুড়োমানুষ আমাকে দেখছিল। সমুদ্রের লোনা জল এই নুলিয়াদের প্রচণ্ড কালো এবং ক্ষয়াটে প্রত্নভাস্কর্য করে ফেলে। ব্রেকার পেরিয়ে দূরের সমুদ্রে এদের অভিযান দেখেছি। যথার্থ সমুদ্রজয়ী এইসব আদিম বীরের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে।

বুড়ো ভাঙাভাঙা হিন্দিতে তার ছবি তুলতে চাইল। ইচ্ছাপূরণ করলাম। বসতির ভেতর মেয়েরা সব কষ্টিপাথরের যক্ষিনী এবং যে যার জায়গায় টেরাকোটা হয়ে সেঁটে আছে। বুড়ো আমার প্রশ্নের উত্তরে বলল, সব জোয়ান এখনও মাঝদরিয়ায় লড়ছে। তবে তাদের ফেরার সময় হয়ে এল। বিকেলে চন্দনপুরম থেকে ট্রাক এসে দূরের রাস্তায় দাঁড়াবে। তারা মাছ পৌঁছে দেবে। তবে কোনও দিন মাছ আশাতীত হয়, কোনওদিন তেমন কিছুই না।

বললাম, বাতিঘরের খাঁড়িতে লাশ পড়ার খবর সে জানে কি না?

সে শুনেছে।

এ নিয়ে দুমাসে ছটা লাস পড়ল। তাই না?

তাই হবে। তবে এই বসতির তিনজন লাস হয়েছে।

তারা অতরাতে সমুদ্রে গিয়েছিল কেন?

সেটা তারাই জানে। বাতিঘরে রাতবিরেতে 'কাণ্ডিলম' আসে।

স্নেকউইন্ড? (মুখ ফসকে ইংরেজি বেরিয়ে গেল।)

হাওয়াসাপ। বাতিঘরের নিচে সমুদ্রের তলায় সুড়ঙ্গে তার বাসা।

'কাণ্ডিলম' কি বরাবর আসে ওখানে?

আসে। তার ঠাকুর্দা একবার তার পাল্লায় পড়েছিল। জোর বেঁচে যায়। তিনপুরুষ ধরে নুলিয়ারা জানে 'কাণ্ডিলমের' উপদ্রবের কথা। তাই তারা কখনই বাতিঘর এলাকার সমুদ্রে যায় না। রাতে যাওয়ার কথা তো ভাবাই যায় না তবে তারা হাওয়া শুঁকে টের পায় কখন কাণ্ডিলম সুড়ঙ্গ থেকে বেরুবে।

তিনজন রাত্রে গিয়েছিল। কাণ্ডিলম তাদের মেরেছিল। কেন গিয়েছিল তারা?

বসতির কেউ জানে না কেন গিয়েছিল। পুলিস খুব ঝামেলা করেছিল। তাদের বাবা-মায়েরা কিছু জানলে তো বলবে?

ভেলানৌকো নিয়েই গিয়েছিল কি?

হ্যাঁ। বসতির অনেক জোয়ান আছে, খাঁড়িতে ঢেউ বা পাথরের পরোয়া করে না। ওই তো সমুদ্রে কত পাথর দেখা যাচ্ছে। সেগুলো এড়িয়ে মাঝদরিয়ায় যেতে জানে নুলিয়ারা।

জনেশ্বরজীকে কি চেনে সে?

নামে জানে। রাজার অতবড় বাড়ি কিনেছিল যে, তার অনেক টাকা। 'কাণ্ডিলম' তাকে মারল।

মাছ বিক্রি করা হয় কার কাছে?

চন্দনপুরমে মাছের আড়তদার আছে। তার নাম দণ্ডরাঘবন।

গুপ্টাসায়েবকে কি সে চেনে?

কে সে? এমন নাম তার জানা নেই। কিন্তু তাকে এ সব প্রশ্ন কেন করা হচ্ছে? সায়েব কি সরকারের লোক?

'না' বলে তাকে একটা কুড়ি টাকার নোট দিলাম। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ইতস্তত করে সে দু-হাত বাড়িয়ে টাকাটা নিল এবং মাথায় ঠেকাল। তারপর কোমরের কাপড়ে গুঁজল। এবার জিজ্ঞেস করলাম, এই সমুদ্রে জাহাজ সে দেখেছে কি না?

রোজই দু-একটা জাহাজ মাঝদরিয়া দিয়ে যায়। দিনে যায়, রাতেও যায়।

কাছাকাছি স্পিডবোট দেখেছে কখনও দিনে বা রাতে।

সেটা কী জিনিস?

নৌকোর মতো গড়ন। প্রচণ্ড জোরে ছোটে। যন্ত্র তাকে ছোটায়।

একটি মেয়ে কাছাকাছি দাঁড়িয়েছিল। বলে উঠল, 'বোট্টা! বোট্টা!'

বুড়ো নুলিয়া বলল, হ্যাঁ বোট্টা। একবার রাতে দেখেছিল মনে পড়ছে।

মেয়েটি বলল, সে একবার নয়, কয়েকবার বোট্টা দেখেছে। খুব জোরালো আলো।

বুড়ো গম্ভীর মুখে বলল, 'কাণ্ডিলম'!

মেয়েটি তার সঙ্গে মাতৃভাষায় তর্ক জুড়ে দিল। তর্ক থামাতে মেয়েটিকে দশটা টাকা দিতেই হল। প্রায় একটা বাজে। এবার ফিরতে হবে।

বাইনোকুলারে দেখে নিলাম, কোথাও কেউ আমার দিকে লক্ষ্য রেখেছে কি না। তারপর হাত নেড়ে তাদের বিদায় জানিয়ে চলে এলাম। কুকুরগুলো দূরে দাঁড়িয়ে আমাকে বিদায় সংবর্ধনা জানাল।

ছবির নেগেটিভগুলো চমৎকার ছিল। সবগুলো প্রিন্ট করার দরকার ছিল না। বাতিঘরের ওপরে এবং নিচে দরজার সামনে গুপ্টাসায়েবের মোট তিনটে ছবি প্রিন্ট করতে দিয়েছিলাম। 'ডার্করুমে'। সেই ছবি শুকোতে দিয়ে ব্যালকনিতে বসে অপেক্ষা করছিলাম। পাঁচটা বাজে। এখন কফি দিয়ে যাওয়ার কথা কুণ্ডনাথনের।

পাঁচমিনিট দেরি করে সে এল। চেহারায় ঝড়ঝাপটা খাওয়া কাকতাড়ুয়ার ছাপ। বললাম, তুমি কি অসুস্থ কুণ্ডনাথন?

সে আস্তে বলল, 'না। আমার কিছু হয়নি।'

'কাণ্ডিলম তা হলে ম্যানেজারসায়েবকে মারল!'

'কাণ্ডিলম?' সে অবাক চোখে তাকাল। 'না স্যার! ম্যানেজারসায়েব জানতেন রাতে বাতিঘরে কাণ্ডিলম আসে। উনি কেন যাবেন সেখানে? ওঁকে খুন করে খাঁড়িতে ফেলে দেওয়া হয়েছে।'

'তুমি জানো?'

কুণ্ডনাথন জোরে মাথা নাড়ল। 'জানি না। কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছে।' একটু দ্বিধার সঙ্গে সে খুব আস্তে বলল, 'আপনাকে বলছিলাম, রাতে দুবার গাড়ির শব্দ শুনেছি। আরুলাপ্পান বলছিল, চুস্ত পাঞ্জাবিপরা যে লোকটা এসেছিল সে এলাকার সাংঘাতিক গুণ্ডা, মাছের কারবার আছে লোকটার।

'লোকটার নাম দণ্ডরাঘবন?'

সে চমকে উঠে বলল, 'আপনি চেনেন তাকে?'

'নাম শুনেছি। তো তুমি পুলিসকে বলেছ দণ্ডরাঘবন আসার পর গুপ্টাসায়েব এবং ম্যানেজার সায়েব বেরিয়ে যান?'

pathagar.net

'বললেই ভুল করেছি। আরুলাপ্পান চালাক ছেলে। দণ্ডরাঘবন আমাকে মেরে ফেলবে।' কুণ্ডনাথন কাঁপাকাঁপা গলায় বলল, আমি মরতে ভয় পাই না। কিন্তু আমার স্ত্রী ছেলেমেয়ে বুড়ো বাবা-মায়ের কী হবে?'

'দণ্ডরাঘবন কেন ম্যানেজারসায়েবকে খুন করবে?'

'গুপ্টাসায়েব ওকে দিয়ে খুন করিয়েছেন। আমার সন্দেহ।'

'গুপ্টাসায়েব কেন গোপালকৃষ্ণনকে খুন করাবেন?'

এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে খুব আস্তে কুণ্ডনাথন বলল, 'জনেশ্বরজী মারা যাওয়ার দিন গুপ্টাসায়েব হোটেলে এসেছিলেন। ম্যানেজারসায়েবের ঘরে দুজনে কী নিয়ে তর্ক হচ্ছিল। আমি চা দিতে গেলাম। দুজনের মুখ খুব গম্ভীর দেখলাম। চলে আসার সময় কানে এল গুপ্টাসায়েব বলছেন, ঠিক আছে এক লাখই দেব। এক সপ্তাহ সময় চাই। করিডরে একটু দাঁড়ালাম। আর চড়া গলায় কথা হচ্ছিল না। তবে একটা কথা কানে এল। ছবি।'

'ছবি?' আমি শান্তভাবেই বললাম, 'ছবির বদলে লাখ টাকা!'

কুণ্ডনাথন শ্বাস ছেড়ে বলল, 'তাই হবে। এখন মনে হচ্ছে ছবি নিয়েই ঝগড়া হচ্ছিল।'

pathagar.net

আমার উত্তেজনার কোনও কারণ তার ছিল না। বললাম, রিসেপশনে এখন কে আছে?

'মেরি।'

'ঠিক আছে। তুমি এস।

কুণ্ডনাথন টলতে টলতে বেরিয়ে গেল। উঠে গিয়ে দরজা এঁটে ডার্করুমে ঢুকলাম। আলো জ্বেলে দেখলাম, ছবি শুকিয়েছে। তিনটে ছবি খুলে নিয়ে দড়িটা খুললাম। লিন্টেনের মাথায় আটকানো কালো কাপড়টা খুলে ফেললাম। 'ডার্করুম' আবার বাথরুম হয়ে গেল।

বাকি কফি শেষ করে চুরুট ধরিয়ে ঘরদোর বন্ধ করে নিচে গেলাম। মেরিকেও এ-বেলা কাতর দেখাচ্ছিল। সে আমাকে দেখে আস্তে বলল, 'গুড ইভিনিং স্যার!'

'ইভনিং! মেরি, একটা টেলিফোন করতে চাই। থানার নাম্বারটা জানো?'

'এক মিনিট। আমি ধরে দিচ্ছি।'

সাড়া পেয়ে সে আমাকে টেলিফোন দিল। বললাম, 'অফিসার ইন-চার্জের সঙ্গে কথা বলতে চাই। হোটেল সি-ভিউ থেকে বলছি। আমি কর্নেল নীলাদ্রি সরকার।'

'একটু ধরুন।'

প্রায় এক মিনিট পরে ভারী গলায় সাড়া এল। 'বলুন কী করতে পারি আপনার জন্য?'

'আমি কর্নেল নীলাদ্রি সরকার বলছি। সি-ভিউ হোটেল থেকে।'

'হ্যাঁ। আমাদের অফিসার আপনার কথা বলেছেন আমাকে। আপনি কি কলকাতা ফিরতে চাইছেন? দুঃখিত কর্নেল সরকার! তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত—'

'তদন্ত শেষ।'

'তদন্ত শেষ? আমি রসিকতা পছন্দ করি না।'

'আমিও না। কয়েকটা কাজ এখনই করা উচিত পুলিশের। না হলে আমি মাদ্রাজ কাস্টমসকে ট্রাঙ্ককল করতে বাধ্য হব।'

'কী বললেন? কাস্টমস?'

'হ্যাঁ। কাস্টমস এবং এনফোর্সমেন্টের অ্যান্টিনার্কোটিড ডিপার্ট! ওরা আমাকে চেনে।'

'আপনি অদ্ভুত কথাবার্তা বলছেন!'

'মন দিয়ে শুনুন এবং লিখে নিন। দেরি করবেন না। গোপালকৃষ্ণনের বাড়ি সার্চ করুন। বাতিঘরের কয়েকটা ছবি পাওয়ার চান্স আছে। কোনও ক্যামেরা পেলে সিজ করুন। গোপালকৃষ্ণন বুদ্ধিমান ছিলেন। কাজেই একলাখ টাকার লোভে নেগেটিভগুলো দিলেও কয়েকটা প্রিন্ট রেখে দেওয়ার চান্স আছে। দুই, মাছের আড়তদার দণ্ডরাঘবনকে এখনই গ্রেফতার করুন! সে গোপালকৃষ্ণনের খুনী। তিন, জনেশ্বরজীর বাড়িতে গুপ্টাসায়েবকেও অ্যারেস্ট করুন। বাড়িটা তন্নতন্ন সার্চ করুন। ওর গাড়িটাও। নার্কোটিকসের পেটি পেয়ে যেতে পারেন। এই কেস প্রমাণের দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। তিনজন নুলিয়া, কলকাতার ফোটোফিচারিস্ট সুমিত্র গুহরায়, জনেশ্বরজী এবং গোপালকৃষ্ণনকে কাণ্ডিলম স্নেকউইন্ড মারেনি। মেরেছে গুপ্টা এবং দণ্ডরাঘবন। অন্তত গোপালকৃষ্ণনকে কোথায় মারা হয়েছে, আমি দেখিয়ে দেব।' কোনও সাড়া না পেয়ে বললাম, 'হ্যালো! আমার কথা বুঝতে পারলেন কি?'

'দেখছি।'

'দেখছি নয়। প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। খুনীরা পালিয়ে গেলে আপনি দায়ী হবেন।'

ফোন রেখে দিলাম। দেখলাম, মেরি চোখ বড় করে তাকিয়ে আছে। স্ফীত নাসারন্ধ্র। প্লেটে আঁকা মুখ। একটু হেসে তাকে আশ্বস্ত করলাম, 'তোমার উদ্বেগের কিছু নেই।'

লাউঞ্জে বসে কফি খাচ্ছিলাম। জোরালো বৃষ্টি এসে গেল। আলোয় বৃষ্টি দেখতে আমার ভাল লাগে না। কিন্তু পুলিশের দুটো গাড়ি গেছে জনেশ্বরজীর বাড়ির দিকে। এখনও ফিরছে না। রফা করে ফেলল কি না বলা যায় না। গুপ্টাকে দেখেই বুঝেছিলাম খলিফা লোক।

এইসময় টেলিফোন বাজল। মেরি ভীতু গলায় ডাকল, আপনার টেলিফোন স্যার!'

উঠে গিয়ে সাড়া দিলাম।

'কর্নেল সরকার? অফিসার-ইন-চার্জ মোহন আচারিয়া বলছি। দণ্ডরাঘবন লক-আপে। গোপালকৃষ্ণনের বাড়িতে পাঁচটা কালার প্রিন্ট পেয়েছি। ফ্ল্যাশে তোলা। গুপ্টা আর দণ্ডরাঘবন খাঁড়ি থেকে দড়িতে কিছু টেনে ওঠাচ্ছিল। পরপর ছবি সাজিয়ে বোঝা গেল, গুপ্টা দড়িটা ধরে একটা পেটি ওঠাচ্ছিল খাঁড়ি থেকে। দুঃসাহসী ফোটোগ্রাফারকে তেড়ে এসেছিল দণ্ডরাঘবন। হাতে একটা ছোট লোহার রড।'

হ্যাঁ ফোটোগ্রাফার সুমিত্র গুহরায়কে মেরে বডিটা বাতিঘরে তুলে নিয়ে গিয়ে খাঁড়িতে ফেলা হয়েছিল। মুখটা গোপালকৃষ্ণনের মতোই বিকৃত করা হয়েছিল। আমার ধারণা, জনেশ্বরজী গুপ্টার এই কারবার জানতে পেরে তাকে হুমকি দেন। তাই পার্টি চলার রাতে তাঁকেও কোনও ছলে ডেকে এনে একইভাবে মারা হয়। কাণ্ডিলম চমৎকার আবহাওয়া তৈরি রেখেছিল।

বুঝতে পারছি। কিন্তু তিনজন নুলিয়াকে মারার কারণ কী?'

'দণ্ডরাঘবন মাছের কারবারী। নুলিয়াদের সঙ্গে তার ভাল চেনাজানা আছে। জাহাজ থেকে স্পিডবোটে নার্কোটিকস পেটি পাঠানো হয়েছে। স্পিডবোট পাথরে ধাক্কা খেয়ে ভেঙে টুকরো টুকরো হওয়ার চান্স আছে। কাজেই নুলিয়াদের ভেলানৌকোর সাহায্য নেওয়া দরকার ছিল। দণ্ডরাঘবনের কাছে কথা আদায় করুন। আমার ধারণা তিনজন ডানপিটে নুলিয়া ব্ল্যাকমেল করছিল ওদের। তাই তিনজনকে একে-একে খতম করেছিল। যাইহোক, ক্যামেরার কী খবর?'

'পাওয়া গেছে। কিন্তু একটা পয়েন্ট স্পষ্ট হচ্ছে না কর্নেল সরকার! গোপালকৃষ্ণন ক্যামেরা পেলেন কীভাবে?'

'মৃতরা আর কথা বলবে না। তবে পয়েন্টটা ব্যাখ্যা করা চলে। গোপালকৃষ্ণনও সম্ভবত গুপ্টার দলে ছিলেন। গুপ্টা প্রায়ই হোটেলে আসতেন। ঘটনার সময় গোপালকৃষ্ণন যেভাবেই হোক, ক্যামেরাটা হাতিয়েছিলেন। সুমিত্রের হাত থেকে ছিটকে পড়ে থাকবে।'

'কিন্তু গোপালকৃষ্ণন ছবিতে নেই।'

'তা হলে নিশ্চয় পিছনে আড়ালে কোথাও গার্ড দিচ্ছিলেন।'

'কর্নেল সরকার! আমার মনে হচ্ছে, ফোটোগ্রাফার পালাতে গিয়ে গোপালকৃষ্ণনের পাল্লায় পড়েন। গোপালকৃষ্ণন তাঁর ক্যামেরা কেড়ে নেন।'

তা-ও সম্ভব। দণ্ডরাঘবন এসে ফোটোগ্রাফারের মাথায় রড মারে। বাকিটা স্পষ্ট।'

'ধূর্ত গোপালকৃষ্ণন ক্যামেরার ফিল্ম প্রিন্ট করিয়েছিলেন। কোথায় করিয়েছিলেন আমরা খুঁজে বের করব। তবে আপনি ঠিকই ধরেছেন। গোপালকৃষ্ণনও নুলিয়াদের মতো গুপ্টা এবং দণ্ডরাঘবনকে ব্ল্যাকমেল শুরু করেন। তাই গতরাতে তাঁকে মারা হয়।

'হ্যাঁ। নেগেটিভগুলোর বদলে এক লাখ টাকা দাবি করেছিলেন গোপালকৃষ্ণন। সাক্ষী আছে। কোথায় নেগেটিভগুলো কয়েকটা প্রিন্টসমেত পুড়িয়ে নষ্ট করা হয়েছে, আমি দেখেছি। কিন্তু গুপ্টার খবর পেলেন?'

'জনেশ্বরজীর বাড়িতে ওকে ধরা হয়েছে। বাড়ি সার্চ এখনও শেষ হয়নি। আমি ডিটেকটিভ ইনস্পেক্টর রঘুনাথ মিশ্রকে বলেছি, আপনার সঙ্গে দেখা করে আসবেন।'

'ধন্যবাদ। রাখছি।'

ফোন রেখে দিলাম। তারপর ঘরে ফিরে অমলকে লেখা সুমিত্রের চিঠিটা আবার খুঁটিয়ে পড়লাম। অমলের আচরণ, কাণ্ডিলমের মতো রহস্যময়। দেখা যাক, কোনও সূত্র মেলে কি না।

অমল,

তাড়াতাড়ি লিখছি। একটা চমকপ্রদ স্টোরির খোঁজ পেয়েছিলাম এখানে। হেডিং দিলাম 'চন্দনপুরম বাতিঘরে রহস্যময় হাওয়া সাপ', কিন্তু গতরাতে বাতিঘরের কাছে হাওয়া-সাপের জন্য ওঁত পাততে গিয়ে অন্য একটা রোমাঞ্চকর স্টোরির খোঁজ পেলাম। নার্কোটিকস স্মাগলিং র‍্যাকেট। হোটেল সি-ভিউ ওদের রদেঁভু। অপারেশন জোন হল বাতিঘর। তাই আজ বিকেলে সি-ভিউয়ে এসে উঠেছি। সতর্কতার জন্য তোর নাম-ঠিকানা ব্যবহার করেছি। কারণ তোর দাদা তো মাদ্রাজ পোর্টে কাস্টমস-চিফ। আমার কিছু বিপদ হলে তুই যেন অ্যাকশন নিস। এখানে চলে আসতেও পারিস। দীপাকে সঙ্গে আনলে বাড়তি আনন্দ পাবি। দীপারও ভাল লাগবে। বন্য আদিম সমুদ্রের একটা আলাদা স্বাদ আছে। প্রেমের জন্যও আছে অবাধ নির্জনতা। তোদের দুজনকেই প্রীতি ও শুভেচ্ছা। ইতি—

সুমিত্র

ইনল্যান্ড লেটার। আতসকাঁচে স্থানীয় ডাকঘরের তারিখটা পড়া যাচ্ছে ২৭ আগস্ট। কলকাতার ডাকঘরের ছাপ খুব অস্পষ্ট। ২ এবং 'এস' থেকে বলা চলে ২ সেপ্টেম্বর। তা হলে অমল মুখ বুজে ছিল কেন? সব কাগজে সুমিত্রের ছবি ছাপা হয়েছিল। চোখ এড়িয়ে গেলেও দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার জয়ন্ত চৌধুরিকে তার না-চেনার কারণও নেই। আজ ১৫ সেপ্টেম্বর। অমল আর দীপা এখানে এসেছিল ১৩ সেপ্টেম্বর। তার চেয়ে বড় প্রশ্ন, দীপাকে কাল রাতে লাউঞ্জে বসিয়ে রেখে কোথায় গিয়েছিল সে? ফিরল রাত একটায় এবং ভোরে দুজনে কটেজ থেকে উধাও হয়ে কলকাতা ফিরে গেল কেন?

বৃষ্টিটা হঠাৎ থেমে গেল। ঝাউবনের ভেতর দিয়ে সমুদ্রের গর্জন পরিশ্রান্ত হয়ে শ্বাসপ্রশ্বাসের ধ্বনিতে রূপ নিয়েছে। চিঠিটা ভাঁজ করে পকেটে রেখে ব্যালকনিতে গেলাম। আবার প্রশ্নটা ফিরে এল। অমলের আচরণ কাণ্ডিলমের চেয়ে রহস্যময়...।

ডিটেকটিভ ইনস্পেক্টার রঘুনাথ মিশ্র রুটিনমাফিক জানিয়ে গিয়েছিলেন, গুপ্টার গাড়ির সামনের আসনের তলার খোঁদলে তিনটে নার্কোটিকসের পেটি পাওয়া গেছে। মোট দাম আনুমানিক ৩০ লক্ষ টাকা। পেটিগুলো ওয়াটার প্রুফ কালো রঙের উৎকৃষ্ট পলিথিনে তৈরি, যা নাকি গুলি করেও ফাটানো যায় না। পূর্ব উপকূলের বন্দরে বন্দরে মাল পৌঁছে দিয়ে 'দা ওডিসি' নামে যে বিদেশি জাহাজটি ঘুরছে, তাকে তাড়া করা হবে। ওই জাহাজ থেকেই স্পিডবোটে পেটিগুলি নামিয়ে নুলিয়াদের ভেলানৌকোয় পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল। তবে কোনও প্রমাণের আশা কম।

আর কাণ্ডিলম সম্পর্কে নুলিয়াবসতিতে একটা আশ্চর্য খবর মিলেছে। নুলিয়ারা সন্ধ্যার দিকেই সমুদ্রের হাবভাবে নাকি টের পায়, বাতিঘরের নিচের খাঁড়িতে সুড়ঙ্গের ভেতর কাণ্ডিলমের ঘুম ভাঙছে। তাই বাতিঘরের ওপর উঠে আগাম লাল আলো জ্বেলে জাহাজকে নিষেধ করা হয়েছিল, আজ রাতে মাল পাঠিও না।

আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে কিছু যায় আসে না। প্রকৃতির রহস্য অন্তহীন। আমিও কাণ্ডিলমের এক প্রত্যক্ষদর্শী। তবে শিসের শব্দের একটা ব্যাখ্যা সম্ভব—যদিও ভুল বা ঠিক এ দাবি করছি না। বাতিঘরের ভেতর ঘোরালো সিঁড়ির মেরুদণ্ড হিসেবে যে লোহার ফাঁপা থামটি দাঁড়িয়ে আছে, সেটি সুপ্রাচীন। কোথাও কোথাও ছিদ্র থাকা সম্ভব। যার ভেতর দিয়ে সামুদ্রিক নৈশ ঘূর্ণি হাওয়াটা ঢুকলে তীক্ষ্ণ শিসের শব্দ হতে পারে। সকালে গিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে হবে।

রঘুনাথ মিশ্রের কণ্ঠস্বর নিরাসক্ত ছিল। সেটা স্বাভাবিক। কে এক বুড়োহাবড়া অবসরপ্রাপ্ত বাঙালি কর্নেল তাঁর মতো ঝানু গোয়েন্দা অফিসারকে টেক্কা দিল। তাঁর পক্ষে ব্যাপারটা হজম করা শক্ত।

রাত সাড়ে নটায় ডিনার সেরে লাউঞ্জে বসে কফি খাচ্ছিলাম। আরুলাপ্পান রিসেপশনে পা-দুটো তুলে দিয়ে কানে হেডফোন লাগিয়ে পপ শুনছিল (আর কী শুনবে তা ছাড়া?) এবং কুণ্ডনাথন এসে বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করে গেল, আর তাকে আমার দরকার আছে কি না। ছিল না।

একটু পরে দেখি, গেটের কাছে একটা সাইকেল রিকশ এসে দাঁড়াল। যারা নামল, তারা আমার বুকের ভেতরকার পুরনো যন্ত্রকে কাঁপিয়ে দিল। অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে বহুবার আমার থিওরিকে লাথি মেরে শুইয়ে দিয়েছে। এবারও তাই হল আর কী!

উঠে দাঁড়ালাম অভ্যর্থনার জন্য। নিশ্চয় আমি হেরে গেছি কোথাও। আস্তে বললাম, 'তোমরা—'

দীপা দ্রুত বলল, 'আপনার ঘরে চলুন।'

ঘরে গিয়ে ব্যালকনিতে বসলাম। ওরাও বসল। বললাম, 'আমি ভেবেছিলাম তোমরা কলকাতা চলে গেছ।'

দীপা বলল, 'না। আমরা ট্রেনের টিকিট বদলাতে গিয়েছিলাম।'

'সারাদিন কোথায় ছিলে?'

'নিউ-বিচের একটা হোটেলে'। দীপা একটু হাসল। 'অমল এত ভীতু জানতাম না। আপনাকে ভয় পেয়েছিল। আমিই টানাটানি করে ওকে নিয়ে এলাম। রিকশ দাঁড়িয়ে আছে। বেশিক্ষণ বসব না।'

'বলো অমল!'

অমল বিব্রতমুখে বলল, 'সুমিত্রের চিঠিটা আপনি নিয়ে এসেছেন শুনে আমি ভয় পেয়েছিলাম। অথচ এখানে আমার থাকা দরকার।

'চিঠিটা পেয়েও তুমি চুপ করে ছিলে কেন? কাগজে সুমিত্রের ছবি বেরিয়েছিল।'

চিঠি আমি পেয়েছি ১২ সেপ্টেম্বর। গুয়াহাটি এবং শিলং থেকে ফিরেছি, সেদিনই ডাকে চিঠিটা এল। দীপার মুখে কাগজে সুমিত্রের ছবির কথা শুনলাম। সেদিনই আমার ম্যাড্রাসি বন্ধু আইয়ারকে বলে ওর কটেজের চাবি নিলাম। রেলে দালালের থ্রু দিয়ে দুটো বার্থ ম্যানেজ করলাম।'

'এক মিনিট! চিঠিটা তুমি ১২ সেপ্টেম্বর পেয়েছিলে?'

'হ্যাঁ।'

হাসলাম। 'অদ্ভুত! ডাকঘরের সিল থেকে শ্রীমান ১ বেমালুম অদৃশ্য। আমি পড়েছি ২ সেপ্টেম্বর। যাইহোক, তারপর?'

'কাল সন্ধ্যায় সি-বিচে বসে থাকার সময় বাতিঘরের ওপর দুবার লাল আলো জ্বলতে এবং নিভতে দেখলাম। দূরের সমুদ্রে একটা জাহাজ থেকেও দুবার সার্চলাইটের মতো আলো জ্বলে নিভে গেল। সুমিত্র সি-ভিউ হোটেলের কথা লিখেছিল। তাই ভাবলাম, আজ রাতেই একটা অপারেশন হবে। অপারেশন-জোন বাতিঘর। তাই লাউঞ্জে দীপাকে বসিয়ে রেখে চুপিচুপি বাতিঘরে গিয়েছিলাম। একটা ঝোপের আড়ালে বসে আছি, টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে কারা আসছে দেখলাম। তারা বাতিঘরের দিকে এল না। দক্ষিণের জঙ্গলে ঢুকে গেল। কোনও সাড়া নেই আর। চলে আসব ভাবছিলাম। হঠাৎ দেখি বাতিঘরের দরজায় নীল আলোর ফ্ল্যাশ।'

'গ্যাসকাটারে দরজার তালা কাটছিল।'

pathagar.net

'তা-ই হবে। এবার ভাবলাম, পুলিশকে খবর দেওয়ার সময় হয়েছে। ফিরে এসে দীপাকে নিয়ে কটেজে যাব আগে। তারপর পুলিশ স্টেশন। এই ছিল প্ল্যান। কিন্তু এই হোটেলে ফিরে শুনি দীপাকে আপনি কটেজে রাখতে গেছেন। আপনাকে আমি ভুল বুঝেছিলাম। ক্ষমা চাইছি।'

কপট চোখ পাকিয়ে বললাম, 'ক্ষমা নেই। বলো!' তারপর হেসে ফেললাম।

অমল বলল, 'কটেজ থেকে আপনি বেরিয়ে যাওয়ার পর আমি গেলাম। দীপার মুখে শুনলাম আপনি আমাদের জিনিসপত্র সার্চ করে সুমিত্রের চিঠিটা নিয়ে গেছেন। আমার আর থানায় যাওয়া হল না। খুব ভয় পেয়ে গেলাম। উল্টে এবার আমিই না ফেঁসে যাই। দুজনে মরিয়া হয়ে কটেজ ছাড়লাম। হাঁটতে হাঁটতে বাস-স্টেশনে গেলাম। রাত তিনটেয় একটা বাস রেলস্টেশন হয়ে ম্যাড্রাস যায়।

দীপা তাকে থামিয়ে বলল, 'আমি ওকে ইনসিস্ট করলাম টিকিট রিফান্ড করতে। ফিরে এসে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বললাম। শেষে রাজি হল। কিন্তু কটেজে গেল না। সারাদিন শুয়ে কাটাল। যে হোটেলে উঠেছি, ওখানে খাওয়ার ব্যবস্থা নেই। তাই বাইরে খেতে গিয়েছিলাম। সেখানে শুনলাম, একটা স্মাগলিং র‍্যাকেটের লোকেরা ধরা পড়েছে। তখন—'

বাধা দিয়ে বললাম, 'অমল! তুমি মাদ্রাজে তোমার দাদাকে খবর দিয়েছ?'

অমল বলল, 'সুমিত্র জানত না। দাদা দিল্লি এয়ারপোর্টে আছেন এখন।'

দীপা উঠে দাঁড়াল। 'চলি কর্নেল সায়েব। বরং সকালে আসব। আমরা আরও তিনদিন থাকছি।'

ওদের বিদায় দিতে গেলাম লাউঞ্জ পর্যন্ত। তারপর আস্তে বললাম, 'যৌবন চরম সাহস দেখাতে পারে শুধু একটি ক্ষেত্রে। যাই হোক, শুভরাত্রি!'

দীপা তাকিয়েই চোখ নামাল! ভারতীয় নারীর সেই ঐতিহ্যগত শালীনতা, যার আটপৌরে নাম লজ্জা। আর অমল নিতান্ত গাড়োলের মতো হেসে গেল। সে জানত না, তার জীবনের বাতিঘরে রহস্যময় কাণ্ডিলম ঢুকেছে।...

pathagar.net

হনিমুন রহস্য

ইলিয়ট রোডে কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের তিনতলার অ্যাপার্টমেন্টে রবিবারের আড্ডাটা এদিন বেশ জমে উঠেছিল। আড্ডার যা নিয়ম। বাজারদর থেকে রাজনীতির হালচাল, তারপর দুর্নীতি-স্বজনপোষণ থেকে বাঁক নিয়ে প্রোমোটরচক্র এবং সেই সূত্রে কলকাতার বনেদি বাড়ি—তারপর সেইসব বাড়ি থেকে ভুত-প্রেত অতৃপ্ত আত্মার রোমহর্ষক বৃত্তান্ত এসে গেল।

কর্নেল চুরুটের ধোঁয়ার মধ্যে থেকে একটি-দুটি সরস মন্তব্য ছুঁড়ে অবশ্য ব্যাঘাত ঘটাচ্ছিলেন। তুমুল হাস্যরোল উঠে গা-ছমছম করা ভুতুড়ে আবহাওয়া নষ্ট করে ফেলছিল। আমার ধারণা, এর ফলেই গল্পের গতি ঘুরে গিয়েছিল রহস্যের দিকে। জীবনে কে কী রহস্যময় ঘটনা ঘটতে দেখেছেন, সেই প্রসঙ্গ এসে গেল।

বলা নিষ্প্রয়োজন, সুখ্যাত প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে কে হালদার, আমাদের প্রিয় 'হালদারমশাই' প্রত্যেকের বলা রহস্যজনক ঘটনার জট ছাড়াতে বক্তাকে জেরা করেছিলেন। এতে কিন্তু আড্ডা আরও জমাট হয়ে উঠেছিল।

ইতিমধ্যে ষষ্ঠীচরণ আর এক দফা কফি দিয়ে গেল।

লক্ষ্য করছিলুম, এতক্ষণ চুপচাপ বসে চোখ বন্ধ করে সিগারেট টানছিলেন একসময়ের প্রখ্যাত চিত্রকর বসন্তকুমার রায়। বয়স সত্তরের ওধারে। শীর্ণ শরীর। মাথায় সাদা একরাশ চুল। কোটরগত চোখ। কিন্তু চোখে একটা অদ্ভুত তীক্ষ্ণ দীপ্তি আছে। কেমন যেন জান্তব আর রহস্যময়।

আমার সঙ্গে ওঁর যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় কর্নেলের এই অ্যাপার্টমেন্টেই মাসদুয়েক আগে। কর্নেলের সঙ্গে ওঁর কোন সূত্রে পরিচয়, কর্নেল তা খুলে বলেননি। তবে দেশের বিখ্যাত মানুষজন যাঁরা, তাঁদের কার সঙ্গেই বা কর্নেলের পরিচয় নেই? তাই ওটা নিয়ে উচ্চবাচ্য করিনি।

এমন জমজমাট আড্ডায় ঐ ভদ্রলোকই নীরব, এটা অন্য কারও চোখে পড়েনি। কারণ প্রত্যেকেই নিজের কথা নিয়ে ব্যস্ত। ষষ্ঠী কফি দিয়ে গেলেও উনি চোখ বুজে আছেন দেখে বললুম, 'মিঃ রায়! কফি নিন।'

বসন্তবাবু চোখ খুললেন। সেই বন্য দীপ্তিটা যেন আরও তীব্র মনে হলো আমার। উনি একটু নিঃশব্দ হাসি হেসে কফির পেয়ালা তুলে নিয়ে বললেন, 'রহস্য! আনসলভ্‌ড্‌ মিস্ট্রি। হ্যাঁ! ঠিক তা-ই।'

পুলিশ অফিসার বরেন ভদ্র সহাস্যে বললেন, 'আছে নাকি মিঃ রায়ের গ্যালারিতে? ঝুলি খুলুন তাহলে।'

ব্রিগেডিয়ার ইকবাল সিংহ ভাঙা বাংলায় বললেন, 'দেরি করবেন না প্লিজ। ওয়েদার ঠাণ্ডা হইয়ে গেল।'

প্রাইভেট ডিটেকটিভ হালদারমশাই সম্ভবত জেরার জন্য তৈরি হয়ে বলে উঠলেন, 'কইয়া ফ্যালেন স্যার, হোয়াট ইজ দ্যাট আনসলভ্ড্ মিস্ট্রি?'

বসন্তবাবু কফিতে চুমুক দিলেন। তারপার জ্বলন্ত সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে ঘষে। আস্তে বললেন, 'আমার এই রহস্য আপনাদের মতো সাংঘাতিক নয়। রোমহর্ষক নয়। নেহাত সাদামাঠা। তবু—হ্যাঁ, এটা রহস্য। আমার জীবনের একটা রহস্য। এর জট বহু বছর ধরে চেষ্টা করেও খুলতে পারিনি। হাল ছেড়ে দিয়েছি শেষে। তো আপনারা যখন জানতে চাইছেন, তখন বলছি।'

উত্তেজিত প্রাইভেট ডিটেকটিভ বললেন, 'কন শুনি! আপনার সাদামাঠা রহস্য হেভি হইতেও পারে!'

বসন্তবাবু আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এখানে একজন যুবক আছে। বাকি সবাই প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধ। আমার একটু সংকোচ হচ্ছে—'

পাড়ার ডাক্তার তারক চক্রবর্তী দ্রুত বললেন, 'তাতে কি? জয়ন্তবাবু একালের ইয়ং ম্যান।'

কর্নেল হাসলেন। 'জয়ন্ত আমার সংসর্গে ক্রমে নিরাসক্ত বৃদ্ধ হয়ে গেছে। আপনি বলুন।'

বসন্তবাবু মিনিট দুয়েক চুপচাপ কফিতে চুমুক দিতে থাকলেন। ঘরে ততক্ষণে রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষার উত্তেজনা অনুভব করছিলুম। আসলে ভদ্রলোক এমনিতেই স্বল্পভাষী এবং আজকের আড্ডায় সারাক্ষণ নীরব থেকেছেন। তাই যেন একটা অস্বস্তিকর আবহাওয়া ঘনিয়ে উঠেছিল—তা উনি 'সাদামাঠা রহস্য' বা যা-ই বলুন। তা ছাড়া নিজেই তিনি বহু বছর সেই রহস্যের জট ছাড়াতে পারেননি। কাজেই প্রত্যেকের আগ্রহ তীব্র হয়ে ওঠা স্বাভাবিক ছিল।

এবার একটা সিগারেট ধরিয়ে বসন্তবাবু বললেন, 'সে আমার যৌবনের কথা। খুলেই বলছি, আমি মশাই বরাবর উড়নচণ্ডী স্বভাবের মানুষ ছিলুম। পানদোষ ছিল। ঘরে থিতু হয়ে বসার ইচ্ছে ছিল না। কাজ বলতে একটাই ধ্যানজ্ঞান—সেটা ছবি আঁকা।....

'তো এদিক-সেদিক টুঁ মারতে মারতে শেযাবধি একটা উপযুক্ত চাকরি পেয়ে গেলুম নামী বিজ্ঞাপন কোম্পানিতে। চন্দ্রাণী মজুমদারের সঙ্গে সেখানেই আলাপ। আমি ছবি আঁকতুম। লেআউট করতুম। আর চন্দ্রাণী তাতে লাগসই কথা জুড়ে দিত। চমৎকার সব বিজ্ঞাপন বেরিয়ে আসত দুজনের হাত দিয়ে।...

'কথা না বাড়িয়ে বলি, চন্দ্রাণীর সঙ্গে একমাসের মধ্যে আমার প্রেম শুরু হয়ে

গেল। তার একমাস পরে বিয়ে। বিয়েতে চন্দ্রাণীর একটাই শর্ত ছিল, আমাকে ড্রিঙ্ক ছাড়তে হবে। তবে হঠাৎ নয়—ক্রমে ক্রমে।....

'কিন্তু—না। এসবে কোনো রহস্য-টহস্য নেই। বিয়ের পর আমরা যথারীতি হনিমুনে যাওয়ার প্ল্যান করলুম। তখন চন্দ্রাণীই বলল, তার এক বন্ধুর বাবার একটা সুন্দর পাহাড়ি বাংলো আছে বিহারের কঙ্কপুরে। একবার সে তার বন্ধু কুন্তলার সঙ্গে সেখানে গিয়েছিল। সে নাকি মর্ত্যে এক স্বর্গ।....

'হ্যাঁ। স্বর্গই বলা চলে। বসতির শেষপ্রান্তে একটা টিলার গায়ে বাংলো। নামটাও সুন্দর, মুনভিলা। সেই টিলার পুরোটার মালিক নাকি চন্দ্রাণীর সেই বন্ধুর বাবা। টিলার দক্ষিণে পাহাড়ি নদী। আমার আক্ষেপ হচ্ছিল, ছবি আঁকার সরঞ্জাম নিয়ে যাইনি। কিন্তু কি আর করা যাবে? ওই দুর্দান্ত বয়সে চন্দ্রাণী নামে এক ডানাকাটা পরীকে বউ করতে পেরেছি। ছবি নয়, রক্তমাংসের মানবী। তাই হনিমুনে গিয়ে আমার পানের মাত্রাটা একটু চড়ে গিয়েছিল। চন্দ্রাণী বাধা দিচ্ছিল। তবে তার শর্তের সঙ্গে আমার শর্তের কথা শুনিয়ে দিচ্ছিলুম—অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে কমাব। অবশ্য জ্যোৎস্নার রাত এবং বসন্তকাল। প্রথম রাত্রে একটু বেসামাল হয়ে পড়েছিলুম, তা ঠিক।'

বসন্তবাবু হেলান দিয়ে চোখ বুজে শ্বাস ছাড়লেন জোরে। হালদারমশাই বলে উঠলেন, 'মিস্ট্রিটা কন প্লিজ!'

'হ্যাঁ। মিস্ট্রি।' বসন্তবাবু চোখ খুলে সোজা হয়ে বসলেন আবার। 'বাংলোর কেয়ারটেকারের নাম রামধন। বুড়ো মানুষ। কিন্তু শক্তসমর্থ গড়ন। তার বউ মারা গেছে। চন্দ্রাণীর বয়সী একটি মেয়ে আছে তার। নাম সুশীলা। তার স্বামী নাকি চোরচোট্টা লোক। জেলে গেছে। তাই সুশীলা এসে বাবার কাছে আছে। আমাদের রান্নাবান্না সে-ই করে দেয়। বাবা-মেয়ে দু'জনে পরিবেশন করে।....

'তো আমার মশাই আর্টিস্টের চোখ। সুশীলাকে বন্য সৌন্দর্যের প্রতীক মনে হয়। আমি ওর দিকে তাকিয়ে আছি দেখে চন্দ্রাণী কৌতুক করে—অথবা মেয়েলি ঈর্ষা—বুঝি না। আমি বলি, এই মেয়েটি আমার ন্যুড ছবির মডেল হতে পারত। চন্দ্রাণী বলে, দেখ ওকে রাজি করাতে পার নাকি। কৌতুক।....

'এভাবেই দুটো দিন গেল। তৃতীয় দিন রাত্রে আমি চন্দ্রাণীর বাধা সত্ত্বেও একটু বেশি ড্রিঙ্ক করে ফেললুম। তারপর কী হয়েছিল জানি না। একসময় ঘুম ভেঙে গেল। মাথা ভারী মনে হচ্ছিল। বুকের ভেতর অস্বস্তি। লক্ষ্য করলুম মশারি খাটানো আছে। আমার গায়ে চাদর চাপানো। জানলাগুলো খোলা। বাইরে জ্যোৎস্না। ঘরের ভেতর তত আঁধার নেই। মাথা কাত করে দেখলুম, চন্দ্রাণী আমার দিকে পিঠ রেখে একটু তফাতে শুয়ে আছে। তার গায়েও চাদর। আর ভেসে এল তার চুলের সুগন্ধ। হ্যাঁ—চন্দ্রাণী কি একটা সুগন্ধ ব্যবহার করত চুলে। সেক্সি গন্ধ—খুলে বলতে দ্বিধা নেই।'...

বসন্তবাবু আবার চুপ করলেন। হালদারমশাই বলে উঠলেন, 'কন।'

চন্দ্রাণীর গায়ে হাত দেওয়ার সাহস পেলুম না। কারণ [illegible] মনে পড়ল, সে আমাকে যাচ্ছেতাই অশালীন গাল-মন্দ করেছিল। করতেই পারে। আমার এত বাড়াবাড়ি করা উচিত হয়নি। হনিমুনে এসে মাতাল স্বামীকে কোন মেয়ে সহ্য করতে পারে?...

'শরীরের অস্বস্তির চাপে মশারি তুলে বের হয়ে দরজা খুললুম। তারপর বারান্দায় গেলুম। পাহাড়ি বসন্তকালের জ্যোৎস্নারাতে বেশ হিম। অথচ বাইরে অপার্থিব প্রাকৃতিক লাবণ্য। লনে নেমে গিয়ে কয়েক মিনিট খোলা আকাশের নীচে দাঁড়াতেই শরীরের ভেতরকার অস্বস্তিটা চলে গেল। তারপরই হঠাৎ কানে এল.. কারা লনের শেষপ্রান্তে চাপা স্বরে কথা বলছে। চমকে উঠেছিলুম। সুশীলা তার কোনো প্রেমিকের সঙ্গে কথা বলছে নিশ্চয়।.....

'পরে মনে হয়েছিল, আসলে আমি কিছুটা ড্রাঙ্ক ছিলুম। না হলে এসব ক্ষেত্রে কোনো ভদ্রলোক নাক গলাতে যায়?...

'তো আমি পা টিপে টিপে ঝোপের আড়াল দিয়ে ওদের কাছাকাছি গিয়ে গুঁড়ি মেরে বসে পড়লুম। আর—তারপরই হতবাক হয়ে দেখলুম মেয়েটি সুশীলা নয়, আমার বউ চন্দ্রাণী।'....

প্রাইভেট ডিটেকটিভ বললেন, 'অ্যাঁ কন কী? মিসেসেরে তো বিছানায় দেইখ্যা গেছেন!'

বসন্তবাবু শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বললেন, 'হ্যাঁ'। কিন্তু সেই মুহূর্তে আমার মাথার ঠিক ছিল না। তখনই উঠে দাঁড়িয়েছিলুম। হয় তো মুখে কোনো শব্দও বেরিয়ে থাকবে। লনের কোনায় গাছের ছায়া থেকে দুটি মূর্তি নিমেষে উধাও হয়ে গেল। দৌড়ে গিয়ে সেখানে কাকেও দেখতে পেলুম না। চারপাশে কেউ কোথাও নেই।...

'টলতে টলতে ঘরে গিয়ে সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিলুম। আশ্চর্য! মশারির ভেতরে চন্দ্রাণী তেমনি শুয়ে আছে। আমি দরজা বন্ধ করে আলো নিভিয়ে বিছানায় গিয়ে চন্দ্রাণীর গায়ে হাত রাখলুম। চন্দ্রাণী ঘুমিয়ে আছে। হাতের চাপ বেশি হলে চন্দ্রাণী জেগে গিয়ে ঘুমজড়ানো গলায় বলল, আমাকে ছুঁয়ো না। আমি তখন ধাঁধায় পড়ে গেছি। তাহলে কি আমি নেশার ঘোরে ভুল দেখে এসেছি? হ্যালুসিনেশন?....

বসন্তবাবু সিগারেটে শেষ টান দিয়ে ঘষে নিভিয়ে একটু হাসলেন। ডাঃ চক্রবর্তী বললেন, 'ইয়েস' হ্যালুসিনেশন। বহুদিন ড্রিঙ্ক করলে রাতের দিকে এমন একটা—'

প্রাইভেট ডিটেকটিভ তাঁর কথায় বাধা দিয়ে বললেন, 'সকালে মিসেসেরে কিছু জিগাইলেন না?'

বসন্তবাবু আবার চোখ বুজে বললেন, 'নাহ্। কথাটা শুনে চন্দ্রাণী আমার ওপর খাপ্পা হয়ে তখনই চলে যেত বলে ভয় হয়েছিল।'

'হঃ। বুঝছি। তারপর?'

pathagar.net

'পরের দিনটি আমরা অন্যদিনের মতোই কাটালুম। দেখলুম, চন্দ্রাণীর মেজাজ স্বাভাবিক হয়েছে। সন্ধ্যার পর চন্দ্রাণী যথারীতি আমাকে বেশি ড্রিঙ্ক করতে নিষেধ করল। আমি সেরাত্রে একটু সংযত থাকলুম। ডিনার খাওয়ার সময় সুশীলা একটু হেসে বলল, কাল রাত্রে সাহেবকে নিয়ে বহুত ঝামেলা হয়েছিল। চন্দ্রাণী বলল, আজ ঝামেলা করলে আমি সোজা স্টেশনে চলে যাব।....

'তো সেদিন প্রকৃতির মধ্যে ঘোরাঘুরি করছিলুম। ক্লান্তি ছিল। খাওয়ার পর এ রাত্রে খুব শিগগির ঘুম এসে গিয়েছিল। কখন বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়েছি, জানি না। একসময় গত রাতের মতো ঘুম ভেঙে গেল। সেইরকম মাথা ভার বুকের মধ্যে অস্বস্তি। ঘুরে দেখলুম, চন্দ্রাণী চাদর ঢাকা দিয়ে ঘুমিয়ে আছে। আমার দিকে পিঠ। ওর চুলের সেই সেক্সি গন্ধ ভেসে এল। কিন্তু ওকে জাগাতে ইচ্ছে হলো না। আসলে আমাকে গতরাতের সেই ভূতে পেয়েছিল। কিংবা বাইরে খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে শ্বাসপ্রশ্বাস নিলে শরীরটা ঝরঝরে হবে এই ধারণা— যে কোনো কারণে হোক, দরজা খুলে বেরিয়ে গেলুম। তারপর......' বসন্তবাবু হঠাৎ থেমে শ্বাস ছাড়লেন।

পুলিশ অফিসার বরেন ভদ্র বললেন, 'আবার আপনার স্ত্রীর কথাবার্তা শুনতে পেলেন নাকি?'

'হ্যাঁঃ। ঠিক গত রাতের মতোই। চন্দ্রাণী কার সঙ্গে কথা বলছে চুপিচুপি।' বসন্তবাবু আবার ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বললেন, 'এবার একটা হেস্তনেস্ত করতেই হয়। আমি চন্দ্রাণী বলে ডেকেই দৌড়ে গেলুম। কিন্তু ঝোপের গায়ে লতায় পা জড়িয়ে পড়ে আছাড় খেলুম। তারপর দেখি কেউ কোথাও নেই। উত্তেজনার পর তীব্র অবসাদে যেন নিজের মৃতদেহ বয়ে নিয়ে ঘরে ফিরলুম। আলো জ্বেলে দেখি, মশারির ভেতর চন্দ্রাণী শুয়ে আছে। অথচ এ রাতে যেটা আশ্চর্য, তা হলো, এ রাতে আবছা চন্দ্রাণীকে আমি এক পলকের জন্য দেখতেও পেয়েছিলুম। আর— নিজের স্ত্রীর কণ্ঠস্বর শুনে আমি চিনতে পারব না? তা ছাড়া জ্যোৎস্নায় তার পরনের নাইটিও লক্ষ্য করেছিলুম।...

'আমি দ্রুত ঘরে গিয়ে চন্দ্রাণীকে ঝাঁকুনি গিয়ে বললুম, ওঠ। ওঠ। আমি কিছু বুঝতে পারছি না। চন্দ্রাণীর ঘুম ভেঙে গেল। সে মশারি থেকে বেরিয়ে শান্তভাবে বলল, কী হয়েছে? এমন কণ্ঠস্বরে সে প্রশ্নটা করল, আর তার চোখের দৃষ্টি এত উজ্জ্বল যে আমি কি বলব, বুঝতে পারলুম না। একটু পরে বললুম, দেখ, আমরা আর এখানে থাকব না। চন্দ্রাণী বলল, কী হয়েছে বল তো খুলে? অতিকষ্টে শুধু বললুম এটা একটা ভুতুড়ে বাংলো।'

ব্রিগেডিয়ার কিবাল সিংহ হাসতে হাসতে বললেন, 'ঠিক, ঠিক। সহি বাত। আ হন্টেড বাংলো।'

প্রাইভেট ডিটেকটিভ গম্ভীরমুখে বললেন, 'আপনার ওয়াইফেরে পরে সব কথা কইছিলেন?'

বসন্তবাবু গম্ভীরমুখে বললেন, 'না। কঙ্কপুর থেকে ফেরার মাতলামির চোটে ডিভোর্স নিয়েছিল। তারপর সে কোথায় আ চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর আগের কথা।'

ডাঃ চক্রবর্তী উঠে দাঁড়ালেন। রায় দিয়ে গেলেন, 'হ্যালুসিনেশন। আপনার অবচেতন মনে নিশ্চয়ই স্ত্রীর প্রতি কোনো কারণে সন্দেহ ছি

বসন্তবাবু বললেন, 'জানত তাকে বিশ্বাস করতুম। তার কোনো প্রেমিক থাকলে টের পেতুম।'

হালদারমশাই একটিপ নস্যি নিয়ে বললেন, 'মিস্ট্রি। তবে এত বছর পর আর সলভ্ করণ যাইব না।'

ততক্ষণে প্রায় এগারোটা বাজে। আড্ডা ছেড়ে ডাঃ চক্রবর্তী, কিবাল সিং এবং বরেন ভদ্র একে একে বেরিয়ে গেলেন। প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে কে হালদার মুখ নামিয়ে আঙুল খুঁটতে থাকলেন। আমি দেখলুম, বসন্তবাবু আবার চোখ বুজে সিগারেট টানছেন। ঠোঁটের কোনায় একটুখানি তেতো হাসি যেন খোদাই করা। পাথরের মূর্তির মতো স্থির তিনি। শুধু সিগারেটটা একবার করে জ্বলে উঠছে।

কর্নেল নিষ্পলক দৃষ্টে তাকে লক্ষ্য করছিলেন। হঠাৎ তিনি বললেন, 'আচ্ছা মিঃ রায়—'

'আপনি যখন ঘর থেকে বেরিয়ে যান, তখন দরজা খুলেই বেরিয়েছিলেন?

'হ্যাঁ দরজায় ছিটকিনি দেওয়া ছিল।'

'বাইরে থেকে যখন ঘরে ফিরেছিলেন, তখন দরজা খোলা ছিল?'

'ছিল। পুরো খোলা।'

'পর-পর দু'রাতেই—'

বসন্তবাবু চোখ বন্ধ রেখেই বললেন, 'হ্যাঁ। দু'রাতেই দরজার অবস্থা একই ছিল।'

'বাংলোতে ফুলের গাছ বা ঝোপঝাড় ছিল?'

'ছিল। দেশিবিদেশি ফুলের বাগান ছাড়াও কেয়ারিকরা অনেক ঝোপ—তাছাড়া উঁচু গাছও ছিল। বলেছি তো! একেবারে প্রকৃতির মধ্যিখানে মুনভিলা যেন স্বর্গপুরী।'

কর্নেল একটু চুপ করে থাকার পর বললেন, 'আপনি যেখানে আপনার স্ত্রীর কণ্ঠস্বর শুনেছিলেন এবং তাঁকে দেখতে পেয়েছিলেন, সেখান থেকে আপনি যেখানে ওত পেতেছিলেন, তার দূরত্ব কত ছিল মনে আছে?'

'স্পষ্ট মনে আছে। বিশ-পঁচিশ হাতের বেশি দূরত্ব ছিল না।'

'যদি সত্যিই সেই মেয়েটি আপনার স্ত্রী হন, তা হলে তিনি যদি বাংলোর ঘরে ফিরে যান, আপনার তাঁকে দেখতে পাওয়ার চান্স ছিল কি?'

এবার বসন্তবাবু চোখ খুলে সোজা হলেন। তাঁর চোখের সেই তীক্ষ্ণ আগুন দীপ্তি ঝিলিক দিল। বললেন, 'নাহ্। দেখতে পাওয়ার চান্স ছিল না। কারণ আমার ডাইনে-বাঁয়ে দু'দিকেই অনেক ঝোপ ছিল।'

'আপনি সেই সময় বাংলোর দিকে ঘুরছিলেন কি?'

বসন্তবাবু ঈষৎ ঝাঁঝালো কণ্ঠস্বরে বললেন, 'না! না! আমি ওদের ঝোপঝাড়-গাছের ফাঁকে খুঁজছিলুম।'

'তার মানে, চন্দ্রাণী ঝোপের আড়াল দিয়ে দ্রুত বাংলোয় ফিরে গেলেও আপনার তা চোখে পড়ার কথা নয়?'

বসন্তবাবু নিষ্পলক তাকিয়ে বললেন, 'আমি বুঝতে পারছি না আপনি কী বলতে চান।'

কর্নেল হাসলেন। 'তখন আপনার মানসিক সুস্থতা থাকার কথা নয়। নেশার হ্যাং-ওভার এবং তারপর আপনার স্ত্রী চন্দ্রাণীকে কারও সঙ্গে গোপনে কথা বলতে দেখে প্রচণ্ড বিস্ময়—'

প্রাইভেট ডিটেকটিভ ঝটপট বলে উঠলেন, 'মাথায় গণ্ডগোল হওনের কথা। ক্যান কী, যে ওয়াইফেরে বিছানায় দেইখ্যা গেছেন, তার বাইরে গোপনে কার সঙ্গে কথা কইতে দেখা।'

কর্নেল হঠাৎ অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে বললেন, 'মিঃ রায় ঘুম ভাঙার পর বিছানায় দু'রাতে একটু তফাতে যাকে চাদরমুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকতে দেখেছিলেন, সে কেয়ারটেকারের মেয়ে সুশীলা।'

বসন্তবাবুর মুখ দিয়ে কী একটা কথা বেরুল, বোঝা গেল না। তারপর তিনি কপালে একবার করাঘাত করলেন শুধু। প্রাইভেট ডিটেকটিভ নড়ে বসলেন, 'হঃ। মাইয়াটা সুশীলা! আর কেউ হইতে পারে না।'

কর্নেল বললেন, 'হ্যাঁ মেয়েটি সুশীলা। এটা নির্ভুল অঙ্ক মিঃ রায়। আপনার স্ত্রী চন্দ্রাণীর কোনো প্রেমিক ছিল তা স্পষ্ট। সে কঙ্কপুর পর্যন্ত অনুসরণ করেছিল চন্দ্রাণীকে। চন্দ্রাণী তার সঙ্গে রফার চেষ্টা করতেই সুশীলার সঙ্গে গোপনে একটা ব্যবস্থা করেছিলেন। আপনার স্বভাব এবং অভ্যাস চন্দ্রাণীর জানা। তিনি সুশীলার চুলে তাঁর চুলের সুগন্ধ মাখিয়ে তাকে আপনার বিছানায় শুইয়ে প্রেমিকের সঙ্গে কথা বলতে বেরিয়েছিলেন। আপনি যদি দৈবাৎ জেগে ওঠেন, চুলের গন্ধে চন্দ্রাণী শুয়ে আছে ধরে নেবেন। আপনার সাদামাঠা রহস্যটার জট এই অঙ্ক দিয়েই খোলা যায়। এবার বাকিটা বুঝে নিন। চন্দ্রাণী ঘরে ফিরে বিছানায় শুয়ে পড়েন এবং সুশীলা বেরিয়ে যায়।'

বসন্তবাবুর হতে কাঁপছিল। কাঁপাকাঁপা হাতে সিগারেট ধরিয়ে আস্তে বললেন, 'আমি—আমি এত নির্বোধ!'

হালদারমশাই উত্তেজিতভাবে বলে উঠলেন, 'না মিঃ রায়। রহস্যই আপনারে নির্বোধ করছিল।'....

pathagar.net